[একত্রিংশ ভাগ] প্রথম সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা

সূচী

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

বিশেষ দ্রষ্টব্য—সদস্যগণের ঠিকানা পরিবর্ত্তন ঘটিলে, তাঁহারা যথাসময়ে কার্য্যালয়ে সংবাদ দিবেন।

ব্যোমকেশ-জীবন-চরিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একনিষ্ঠ সেবক কর্ম্মবীর ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের একখানি বিস্তৃত জীবন-চরিত লিখিবার জন্য ব্যোমকেশ-স্মৃতি-সমিতি ও পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি আমার উপর ভার দিয়াছেন।

স্বর্গীয় মুস্তফী মহাশয় বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের প্রসার ও প্রচারের জন্য নানাভাবে ব্যাপৃত থাকিলেও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গঠন, পরিপুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে জীবনদান করিয়া গিয়াছেন। পরিষদের সেবায় তিনি যেভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া গিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে নাই বলিলেই হয়। সাহিত্য-পরিষদের ন্যায় সাহিত্য-সম্মিলনের গঠনে ও ইহার পুষ্টিসাধন-কল্পেও তিনি অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। কারণ, তিনি জানিতেন, বাঙ্গালীর এই দুই অনুষ্ঠানের সফলতার উপর বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ উন্নতি নির্ভর করিতেছে—বাঙ্গালী একটি প্রধান জাতি বলিয়া জগতের সম্মুখে আত্মপ্রতিষ্ঠা-লাভে স্পর্দ্ধা করিতে পারিবে। সেই মহাপ্রাণ ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের জীবন-চরিত বাঙ্গালা-সাহিত্যের হিতকামী ব্যক্তিমাত্রেরই আলোচনার যোগ্য। বিশেষতঃ তাঁহার জীবনের সহিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট। পরিষৎকে ছাড়িয়া দিলে ব্যোমকেশের জীবন-কথা বলা যেমন চলে না, তেমনি ব্যোমকেশকে বাদ দিয়া পরিষদের ইতিহাসের কোন অধ্যায়ই সম্পূর্ণ হইবে না। সেই নিরভিমানী, সদাপ্রফুল্ল, অক্লান্তকর্ম্মী ব্যোমকেশের জীবন-কথা অনেকেই কিছু না কিছু অবগত আছেন।

স্বর্গীয় মুস্তফী মহাশয় স্বনামে ও বেনামে বহু প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাঁহার অনেক অপ্রকাশিত রচনাও হয় ত অনেক বন্ধু-বান্ধবের কাছে আছে। সেগুলির সন্ধান প্রদান করিলে বিশেষ উপকৃত হইব।

বঙ্গের নানা স্থানে তিনি শাখা-পরিষৎ-প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে, সাহিত্য-সম্মিলন আহ্বান এবং সাহিত্যিক তথ্যাদি সংগ্রহ-সম্পর্কে অনেকের সহিত পত্র ব্যবহার করিয়াছেন। সেই সকল পত্র কিংবা তাঁহার বিষয়ে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা জীবনচরিত-লেখকের পক্ষে বিশেষ মূল্যবান্ হইবে। এই জন্য আমি পরিষদের সদস্যগণের নিকট ও সাধারণের নিকট অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক উক্ত তথ্যাদি এবং তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত পত্রাদি নিম্ন-স্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইয়া দিবেন। আশা করি, তাঁহারা এই অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনে আমাকে সাহায্য করিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির,
২৪৩।১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীঅমিয়ভূষণ পণ্ডিত
সহকারী সম্পাদক,
ব্যোমকেশ-স্মৃতি-সমিতি।

বৈজ্ঞানিক-পরিভাষা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে বহুদিন হইতে বিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দ-সংগ্রহের কার্য্য চলিতেছে। সম্প্রতি, পরিষদের বিজ্ঞান-শাখার কর্ত্তৃত্বে নানা-সাময়িক পত্র ও পুস্তকাদিতে প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক-পরিভাষা সংগ্রহ ও সঙ্কলন করা হইতেছে। কার্য্য বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাগারে ও বিজ্ঞান-শাখার সভ্যগণের নিকট উক্ত শ্রেণীর পুস্তকাদি যাহা এ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, সে সমস্ত হইতেই সঙ্কলন-কার্য্য চলিতেছে। এ পর্য্যন্ত অনেক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। সমস্ত গ্রন্থ পরিষদের গ্রন্থাগারে আছে কি না, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। এই জন্য, এতদ্দ্বারা পরিষদের সদস্য ও সহৃদয় দেশবাসীর নিকট বিজ্ঞান-শাখার পক্ষ হইতে এই অনুরোধ জানাইতেছি যে, তাঁহাদের নিকট যদি কোন বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ থাকে, তবে পরিভাষা-সংগ্রহ কার্য্যের সৌকর্য্যার্থে পরিষৎকে তাহা দান করিলে কিংবা কিছু দিনের জন্য ধার দিলে, পরিষৎ তাঁহাদের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ থাকিবেন। বলা বাহুল্য, তাঁহাদের প্রদত্ত পুস্তক সযত্নে ব্যবহৃত হইবে ও কার্য্যান্তে ফেরত দেওয়া হইবে। এতদ্ব্যতীত, 'বৈজ্ঞানিক-পরিভাষা' প্রকাশিত হইলে গ্রন্থমধ্যে যথাস্থানে গ্রন্থদাতার এবং যাঁহারা গ্রন্থ ধার দিবেন, তাঁহাদের নাম কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লিখিত হইবে।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিজ্ঞান-শাখার আহ্বানকারী।

প্রাচীন পবিত্র তীর্থ

গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত কালীগড় গ্রামে ৺শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার মন্দির। ইহা একটি বহুপুরাতন সিদ্ধিপীঠ এবং বলযোগপীঠ নামে জনশ্রুতি আছে। এখানে পঞ্চমুণ্ডি আসন আছে। দেবতা, সিদ্ধেশ্বরী,—মহাকাল—ভৈরব। ই, আই, আর, হুগলী-কাটোয়া লাইনের জীরাট ষ্টেসনের অর্দ্ধ মাইল পূর্ব্বে মন্দির।

সেবাইত—
শ্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়

জিনবাণী

জৈন-ধর্ম্মের বিবিধ তথ্য-পূর্ণ নবীন মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীপান্নালাল বাকলীওয়াল,

সহকারী সম্পাদক শ্রীহরিসত্য ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি. এল্ এবং শ্রীসুরেন্দ্রনাথ শ্রাবক।

'জিনবাণী' বঙ্গবিহার অহিংসা ধর্ম্ম-পরিষদের মাসিক মুখপত্র। বিগত বৈশাখ মাস হইতে নিয়মিতরূপে প্রতি বাঙ্গালা মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হইতেছে। ইহাতে প্রতিমাসে জৈন-দর্শন, জৈন-পুরাণ, জৈন ইতিহাস, জৈন-সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে বহু গবেষণা-পূর্ণ ও সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

জৈন-ধর্ম্মের বিবিধ তথ্য সম্বন্ধে একরূপ অনভিজ্ঞ বাঙ্গালী জনসাধারণের মধ্যে সেই সকল তথ্য প্রচার করিবার জন্যই অহিংসা-পরিষদের প্রযত্নে এই সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ জৈন-ধর্ম্মকে অতি প্রাচীন বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন—বৌদ্ধ-ধর্ম্মেরও পূর্ব্বে যে ইহা আবির্ভূত হইয়াছিল, সে বিষয়ে আজ পণ্ডিত সমাজে মতদ্বৈধ পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারতীয় জনসাধারণ ত দূরের কথা, ভারতীয় অনেক পণ্ডিতও এই অতি প্রাচীন ধর্ম্মের সম্বন্ধে বিশেষ কোনও খোঁজ রাখেন না। অথচ বৌদ্ধ-ধর্ম্মের মত ইহা ভারতবর্ষ হইতে লুপ্তপ্রায় নহে—আজ পর্য্যন্ত লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী জৈনধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন। দর্শন, পুরাণ, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে জৈনদিগের সংস্কৃত ও প্রাকৃত গ্রন্থ সমূহ ভারতের গৌরবস্বরূপ হইয়া আজ পর্য্যন্ত সাধারণের অগোচরে জৈন ভাণ্ডারসমূহে সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। দুঃখের বিষয়, ভারতীয় পণ্ডিতগণের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধ-সাহিত্যের আলোচনার ফলে ভারতেতিহাসের অনেক অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশ আলোকিত হইয়াছে। জৈনধর্ম্ম ও উহার বিপুল সাহিত্য সেইরূপভাবে আলোচিত হইলে ভারতের রাজনৈতিক এবং ধর্ম্মবিষয়ক ইতিহাসের অনেক অজ্ঞাতপূর্ব্ব বিষয় আবিষ্কৃত হইয়া পড়িবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই উদ্দেশ্যেই এই পত্রিকা প্রকাশিত করা হইতেছে। সুতরাং সাম্প্রদায়িক বলিয়া ইহাকে উপেক্ষা করিবার কোনও হেতু নাই।

আমরা আশা করি, জ্ঞানপিপাসু বঙ্গবাসিমাত্রেই এই পত্রিকার গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইবেন। সাধারণের সুবিধার জন্য এই অনতিক্ষুদ্র (ডিমাই ৮ ফর্ম্মা ৬৪ পৃষ্ঠা) পত্রিকার প্রতি খণ্ডের নামমাত্র মূল্য ।০ চারি আনা এবং সডাক বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

উপহার! উপহার!!

'জিনবাণীর' প্রথম দুইশত গ্রাহককে 'পুরুষার্থ-সিদ্ধ্যুপায়' নামক অহিংসাবিষয়ক জৈনদিগের প্রামাণিক গ্রন্থ বঙ্গানুবাদ সহ আগামী ৺ শ্যামা পূজার সময় বিনামূল্যে উপহার দেওয়া হইবে। উপহার লাভে বঞ্চিত না হইতে হইলে সত্বর টাকা মণি অর্ডার করিয়া গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হউন।

শ্রীমাখনলাল ন্যায়ালঙ্কার

সম্পাদক, বঙ্গবিহার অহিংসা-ধর্ম্ম-পরিষৎ, ১৭—১৯ শ্যামবাজার ব্রীজ্ রোড, কলিকাতা।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

জৈন-দর্শনে স্যাদ্‌বাদ

(২)

এক্ষণে এই সপ্তভঙ্গী নয় কিরূপ, তাহা আরও একটু বিশদভাবে বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। সপ্ত-ভঙ্গের প্রথম ভঙ্গটী এইরূপ,—"স্যাৎ কথঞ্চিৎ স্বদ্রব্য-ক্ষেত্র-কাল-ভাব-রূপেণ অস্ত্যেব সর্ব্বং কুম্ভাদি।" আমরা কেবলমাত্র "কুম্ভঃ অস্তি"—এইভাবে বাক্য প্রয়োগ করিতে পারি না। কারণ, তাহা হইলে 'কুম্ভঃ অস্তি'—এই বাক্যে যে অস্তিত্বের আভাস আছে, সে অস্তিত্বকে একান্তভাবে ধরিতে হয়, সুতরাং অস্তিত্ব শব্দের সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপক অর্থ গৃহীত হয় বলিয়া, 'অস্তি' এই শব্দের দ্বারা 'মৃত্তিকা অস্তি', 'বৃক্ষঃ অস্তি', 'বস্ত্রম্ অস্তি'—এইরূপ বাক্যও সত্য বলিয়া গৃহীত হওয়া উচিত হইয়া পড়ে। আরও এক কথা, উহা দ্বারা যে কোন উপাদানে প্রস্তুত কুম্ভ, যে কোন কালে, যে কোন দেশে বিদ্যমান কুম্ভ, এবং যে কোন রূপ বা বর্ণবিশিষ্ট কুম্ভের অস্তিত্বের কল্পনা সম্ভব হইয়া পড়ে।

কিন্তু বাস্তবিক-পক্ষে কুম্ভটী স্বীয় উপাদান-দ্রব্য মৃত্তিকা অবচ্ছেদে বিদ্যমান আছে, জল প্রভৃতি রূপে নহে, এইরূপে স্বীয় ক্ষেত্রে অর্থাৎ দেশ অবচ্ছেদে বিদ্যমান পরক্ষেত্রে নহে, কুম্ভটী পাটলিপুত্র নামক দেশবিশেষে আছে, কান্যকুব্জে নহে। এইরূপে স্বীয় কাল অপেক্ষায় বিদ্যমান, কিন্তু পরকীয় কাল অপেক্ষায় নহে, কুম্ভটী শীতকালে বিদ্যমান, কিন্তু বসন্তে নহে। এবং উহা রক্তবর্ণের, কিন্তু পীতবর্ণের নহে। কিন্তু যদি কেবলমাত্র ঐকান্তিক অস্তিত্বের কথা বলা হয়, তাহা হইলে এ সকল ব্যাবর্ত্তকের অভাবে বস্তুর প্রতিনিয়ত স্বার্থ-স্বরূপের (Identity) অভাব হইয়া পড়ে। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে, প্রথম প্রকার বচন-ভঙ্গের দ্বারা কুম্ভটী কোন বিশেষ দেশ, কাল, উপাদান এবং রূপের অপেক্ষায় অস্তিত্ববান্ এবং আমরা বলিয়া থাকি—'স্যাৎ কুম্ভঃ অস্তি', বা আরও সংক্ষেপে 'স্যাদস্তি'। আবার যেহেতু এই কুম্ভের অস্তিত্বের অঙ্গীকার কেবল অন্যান্য যাবতীয় বস্তু ও তাহাদের ধর্ম্মের নাস্তিত্বের (Non-being) অঙ্গীকারের উপর নির্ভর করিতেছে, সুতরাং কেবল 'স্যাদস্তি' ইহাই বলা চলে না, 'স্যান্নাস্তি', ইহাও বলিতে হয়। তবে এই 'স্যাদস্তি' ও 'স্যান্নাস্তি' এই দুয়ের মধ্যে জ্ঞাতা বা বক্তার উদ্দেশ্য অনুসারে প্রাধান্য দিতে হয়। কখন বা তিনি অস্তিত্বের দিক্‌টাই বলিতে চান, তখন ঐ দিক্‌টাই প্রাধান্য লাভ করে; আর নাস্তিত্বদিক্‌টা গৌণ বা অপ্রধান হইয়া থাকে। কিন্তু অস্তিত্বের সঙ্গে নাস্তিত্ব ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট; একটী অন্যটী

ব্যতিরেকে থাকে না।[১] অতএব সপ্তভঙ্গী-নয়ের প্রথমটী হইল, 'স্যাদস্তি'; দ্বিতীয়টী 'স্যান্নাস্তি'। প্রথমটী বিধি-কল্পনা-প্রসূত; দ্বিতীয়টী নিষেধ-কল্পনা-প্রসূত।

সপ্তভঙ্গী-নয়ের তৃতীয় ভঙ্গ অতি সুগম। কেবলমাত্র বিধি ও নিষেধের ক্রমিক কল্পনা হইতে উৎপন্ন[২]। উহা এই প্রকার 'স্যাদস্তি স্যান্নাস্তি চ'। চতুর্থ ভঙ্গটী এইরূপে উদ্ভূত হয়। অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব ধর্ম্ম যদি যুগপৎ প্রাধান্য-সহকারে একই বস্তুতে আরোপিত হয়, তাহা হইলে বস্তুর স্বরূপ অনির্ব্বাচ্য হইয়া উঠে। ইহারই নাম অবক্তব্য নয়। প্রথম তিনটী নয় হইতে ইহার পার্থক্য এই যে, প্রথম দুইটীতে একবার বিধির প্রাধান্য ও আর একবার নিষেধের প্রাধান্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কোন বস্তুর অস্তিত্ব অঙ্গীকারের সঙ্গে সঙ্গেই তদিতর সমুদায় বস্তু এবং তদীয় অন্য যাবতীয় ধর্ম্মের নাস্তিত্বের অঙ্গীকার অনুস্যূত রহিয়াছে। তবে যখন আমরা কোন বস্তুতে অস্তিত্বের আরোপ করি, তখন উহাতে বিধির প্রাধান্য; আবার যখন নাস্তিত্বের আরোপ করি, তখন উহাতে নিষেধের প্রাধান্য। এই দুই স্থলেই বিধি ও নিষেধের প্রাধান্য ও অপ্রাধান্য অনুসারে বাক্য-বিন্যাস করা হইয়া থাকে মাত্র; ক্রম বা যৌগপদ্যের প্রসর নাই। কিন্তু তৃতীয় নয়ে বিধি-নিষেধ, উভয়েরই প্রধান্য থাকিলেও, ক্রমিক আরোপবশতঃ উহা চতুর্থ ভঙ্গ হইতে বিভিন্ন। চতুর্থ নয়ে বিধি এবং নিষেধ, উভয়ই প্রধান এবং উভয়ই সমকালে একই বস্তুতে আরোপিত হয়। একই কালে একই বস্তু 'অস্তি'ও বটে 'নাস্তি'ও বটে, সুতরাং মানব ধীর অগম্য এবং এজন্য অবক্তব্য, কিন্তু গত্যন্তর নাই। কারণ, বস্তুর স্বরূপই হইল—ঐরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মকে আশ্রয় দেওয়া। মানব-চিন্তাশক্তি এইখানে স্বীয় অক্ষমতা স্বীকার করিতে বাধ্য।

উপরি-উক্ত ভঙ্গ চারিটী পরস্পর মিলিত করিলে আরও তিনটী ভঙ্গের সৃষ্টি হয়। সুতরাং পঞ্চম ভঙ্গটীর প্রকার হইবে এইরূপ—'স্যাদস্তি চ অবক্তব্যঞ্চ'। বস্তুর অস্তিত্ব আছে, আবার অবক্তব্যও বটে। ষষ্ঠ ভঙ্গটী হইবে,—'স্যান্নাস্তি অবক্তব্যঞ্চ'। অর্থাৎ বস্তুর অস্তিত্ব নাইও বটে, আবার অবক্তব্যও বটে। এবং সর্ব্বশেষে সপ্তম ভঙ্গে আমরা পাই,—'স্যাদস্তি চ স্যান্নাস্তি চ স্যাদবক্তব্যঞ্চ'। বস্তুর অস্তিত্ব আছে—নাইও বটে; আবার অবক্তব্যও বটে। উপরি-উক্ত সপ্ত-প্রকার বচন-বিন্যাসের সমুদায়ের নাম সপ্তভঙ্গী নয়।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, বস্তুর ধর্ম্ম যখন অনন্ত, তখন বিধানপুরঃসর হউক বা নিষেধ-পুরঃসরই হউক, বচনভঙ্গও কেন অনন্ত হউক না, কেবল সপ্তপ্রকারই বা কেন হইবে? এ প্রশ্ন জৈনাচার্য্যগণ নিজেই উত্থাপিত করিয়া, নিজেই সমাধান করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন,

---

১। "তস্মাদ্বস্তুনোঽস্তিত্বং নাস্তিত্বেনাবিনাভূতং নাস্তিত্বং চ তেন ইতি। বিবক্ষাবশাচ্চ অনয়োঃ প্রধানোপসর্জনভাবঃ।"

—স্যাদ্বাদমঞ্জরী, পৃঃ ১৭৮

"The affirmation of any assertion and the denial of its contradictory are logical equivalents, which it is allowable and indispensable to make use of as mutually convertible"—Mill's *Examination of Hamilton's Philosophy*—pp. 471—472.

২। ক্রমতো বিধিনিষেধকল্পনয়া তৃতীয়ঃ।

যে, বস্তুর ধর্ম্ম অনন্ত, ইহা সত্য। কিন্তু যে কোন এক ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া বিধি-নিষেধপূর্ব্বক বচনবিন্যাস করিতে গেলে দেখা যাইবে যে, ঐরূপ সপ্তপ্রকার বচন-ভঙ্গেরই সম্ভাবনা; কারণ, উক্ত অবলম্বিত বস্তু-ধর্ম্ম-বিষয়ক জিজ্ঞাসার প্রবৃত্তি সপ্ত প্রকারের অধিক হইবার উপায় নাই। উহা সপ্তপ্রকারেই নিয়ন্ত্রিত। তাঁহারা বলেন যে, যেমন অস্তিত্ব এবং নাস্তিত্বের সাহায্যে সপ্তধা বচন-বিন্যাস সম্ভব দেখান গেল, ঐরূপ সামান্য ও বিশেষ, নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব প্রভৃতির সাহায্যেও সপ্তপ্রকারই বচন নির্দ্দেশ হইবে। যথা স্যাৎ সামান্যং, স্যাদ্বিশেষঃ, স্যাদুভয়ং, স্যাদবক্তব্যং, স্যাৎ সামান্যাবক্তব্যং, স্যাদ্বিশেষাবক্তব্যং, স্যাৎ সামান্যবিশেষাবক্তব্যম্। এস্থলেও বিধি নিষেধের প্রয়োগ অব্যাহত আছে। 'বস্তু স্যাৎ সামান্যং'—এই বাক্যে সামান্যের বিধান করা হইতেছে এবং স্যাদ্বিশেষঃ—এই বাক্যেও নিষেধ নিহিত আছে। কারণ, বিশেষ ব্যাবৃত্তিপরায়ণ, এবং ব্যাবৃত্তি অর্থে পার্থক্য বা পৃথক্করণ বুঝায়। যখন কোন বস্তু অন্য বস্তু হইতে ব্যাবৃত্ত, একথা বলা হয়, তখন আমরা বুঝি যে, প্রথম বস্তুটী দ্বিতীয় বস্তুটীর সহিত সমান নহে। সুতরাং বিশেষেও নিষেধ অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। এইরূপে নিত্যত্বানিত্যত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসম্বন্ধেও বিধি-নিষেধ-সহকারে সপ্তভঙ্গের উদ্ভব হইয়া থাকে। সুতরাং আমরা দেখিলাম যে, জৈনাচার্য্যগণের মতে বস্তুর ধর্ম্ম অনন্ত হইলেও, বচনভঙ্গ সপ্তধা নিয়মিত। সাতের বেশী হয় না। কিন্তু সাতের কমে নামিতে পারা যায় কিনা, সে কথা জৈনাচার্য্যগণ উত্থাপন করিবার আবশ্যকতা মনে করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। সে কথা আমরা পরে আলোচনা করিব। যাহা হউক, জৈনগণ বিবেচনা করেন যে, এই সপ্তপ্রকার বচনভঙ্গই বস্তু-সম্বন্ধে খাটে। কেন না, ইহাদের যে কোন একটী বচনভঙ্গ মাত্র পাক্ষিক, অথবা আপেক্ষিক সত্যের প্রকাশক, সুতরাং উহা প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হয় না। তাঁহারা বিবেচনা করেন যে, ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, বেদান্ত, মীমাংসা ও বৌদ্ধ আচার্য্যগণ প্রত্যেকেই এইরূপ এক একটী নয়ের আশ্রয় গ্রহণ করতঃ মাত্র খণ্ডসত্যে উপনীত হইয়াছেন। বস্তুস্বরূপ-পরিচায়ক অখণ্ড সত্যের সন্ধান করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সেই কারণ ঐরূপ পাক্ষিক বা খণ্ডসত্যের পরিচায়ক বচন-বিন্যাসের তাঁহারা নাম দিয়াছেন "বিকলাদেশ", "নয় সপ্তভঙ্গী" অথবা নয়াভাস। পক্ষান্তরে সমুদিত ভঙ্গসপ্তক বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ-প্রকাশে সমর্থ, সুতরাং অখণ্ড সত্যের পরিচায়ক। এজন্য উহার নাম "সকলাদেশ" অথবা "প্রমাণ-সপ্তভঙ্গী"[১]।

উপরে স্যাদ্বাদের এক প্রকার পরিচয় দেওয়া গেল। এক্ষণে আমরা উহা হইতে স্যাদ্বাদ-সম্বন্ধে কয়েকটী তথ্য সংগ্রহ করিতে পারি। সে কয়েকটী তথ্য এই,—প্রথমতঃ যদি প্রতীতিলব্ধ জ্ঞানে অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ না থাকে, তবে বাস্তবিক বস্তু অনন্ত এবং পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মের আধার। এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। দ্বিতীয়তঃ সত্তা (বিধি), অসত্তা (নিষেধ) এবং অবক্তব্য অথবা অনির্ব্বাচ্য এই কোটিত্রয়ে বস্তু-সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার বাক্য-বিন্যাসই

১। বিকলাদেশস্বভাবা হি নয়সপ্তভঙ্গী বস্ত্বংশমাত্রপ্ররূপকত্বাৎ।
সকলাদেশস্বভাবা হি প্রমাণসপ্তভঙ্গী যথাবৎ বস্তুপ্ররূপকত্বাৎ।"

—প্রমেয়কমলমার্ত্তণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ,—পৃ ২০৬ খ।

(judgment) সীমাবদ্ধ। তৃতীয়তঃ কোন এক প্রকার বাক্য-বিন্যাসই একান্ত সত্য হয় না, আপেক্ষিক সত্যের সূচনা করে মাত্র। তাহা হইলে স্যাদ্‌বাদে বাহ্যবস্তুর স্বরূপ হইতেছে এইরূপ। বস্তুর জ্ঞাতৃনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে (Realism), কিন্তু বস্তু-সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানই বস্তুর এক একটা দিক্ (aspects) অথবা এক এক রকম ধর্ম্মের বা বিকাশের (manifestations) গ্রহণ করিতে সমর্থ, সুতরাং পাক্ষিক সত্যের আভাস দেয় মাত্র, এবং এই অফুরন্ত বিকাশের পশ্চাতে যে স্বরূপ-শক্তি আছে, তাহার অস্তিত্ব উক্ত অনন্ত বিকাশের নিদান-স্বরূপ অবশ্য স্বীকার্য্য। তবে কি ইহা Herbert Spencerএর Transfigured Realismএর সহিত সমপর্য্যায়-ভুক্ত। একটু চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, Spencerএর চিন্তাপ্রণালী ও স্যাদ্‌বাদ ঠিক একই নহে। স্পেন্সরের মতেও বস্তুজগৎ জ্ঞান-জগৎ হইতে স্বতন্ত্র এবং আমাদের জ্ঞান কেবল উহার ভিন্ন ভিন্ন বিকাশেই সীমাবদ্ধ, সুতরাং উহা আপেক্ষিক সত্য প্রদান করে বটে। কিন্তু ঐ সকল ভিন্ন ভিন্ন বিকাশের অন্তর্নিহিত যে শক্তি আছে, তাহা এক ও অনন্ত (Absolute and Infinite) —যাহার বলে আপেক্ষিক (relative) সত্যগুলির উদ্ভব বা অস্তিত্ব সম্ভাবিত হয়। পক্ষান্তরে স্যাদ্‌বাদে বস্তুর বহুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং স্যাদ্‌বাদ ও স্পেন্সরের Transfigured Realism উভয়ই বস্তুতন্ত্রবাদী হইলেও স্পেন্সর একত্বের পক্ষপাতী (Monistic), পক্ষান্তরে স্যাদ্‌বাদ বহুত্বের পক্ষপাতী (Pluralistic Realism). এতদ্ভিন্ন স্পেন্সর আমাদের জ্ঞেয় জগতের (world of experience) ভিত্তিস্বরূপ যে এক স্বরূপশক্তির (Power) স্বীকার করিয়াছেন, তাহা কিন্তু তাঁহার মতে অজ্ঞেয় (unknown and unknowable); পক্ষান্তরে স্যাদ্‌বাদে বস্তুস্বরূপ-সম্বন্ধে জ্ঞান অস্বীকৃত হয় নাই।

আর এক কথা, স্যাদ্‌বাদে আমরা পাইলাম যে, সকল প্রকার জ্ঞানই আপেক্ষিক (relative truths). কিন্তু এই আপেক্ষিক ভাবটাই আবার নিজেই আপেক্ষিক। কোন প্রকার জ্ঞান আপেক্ষিক সত্য বলিলে ইহাই বুঝায় যে, উহার আপেক্ষিকতা অন্য কোন জ্ঞানের উপর নির্ভর করে বা উহাকে অপেক্ষা করে। সুতরাং এই প্রকার চিন্তাপ্রণালীর বশবর্ত্তী হইয়া আমরা অবশেষে এক অনপেক্ষ অখণ্ড সত্যের কল্পনা করিতে বাধ্য হই, যাহাতে এই অসংখ্য আপেক্ষিক সত্যের সমাধান হয়[১]। কিন্তু জৈনগণ তাঁহাদের অনেকান্তবাদ বা স্যাদ্‌বাদে এরূপ অবশ্য-উত্থাপনীয় অনপেক্ষ বা একান্ত সত্যের (Absolute truth) স্বরূপ-নির্ণায়ক কোন প্রশ্ন স্পষ্টভাবে উত্থাপিত করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহারা কেবল এইটুকু মাত্র আভাস দিয়াছেন যে, সপ্তভঙ্গী নয়ের সমুদিত প্রয়োগেই প্রামাণ্য; আর তদ্ভিন্ন যাবতীয় বাক্য-বিন্যাস প্রমাণাভাস—অর্থাৎ পাক্ষিক সত্য। অবশ্য জৈনগণ এক প্রকার জ্ঞানের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা তাঁহাদের '**কেবল জ্ঞান**'। এই জ্ঞানে সাধারণের অধিকার নাই। যাঁহার সমস্ত কর্ম্মের মল ধৌত হইয়া গিয়াছে—এক কথায় যিনি 'জিন' হইয়াছেন, তাঁহারই এই **বিশুদ্ধ জ্ঞান** (Pure Intelligence) যাহা আত্মার

১। Cf. Bradley's "Coherence view of Truth". "But though transcending these modes of experience, it includes them all fully".—*Essays on Truth and Reality*, pp. 343-44.

স্বাভাবিক সম্পত্তি, ফিরিয়া আসিয়াছে। এই 'কেবল জ্ঞান' বা বিশুদ্ধ জ্ঞানের স্বভাব এই যে, ইহার নিকটে দেশ বা কালকৃত ব্যবধান দূর হইয়া গিয়া বস্তুর স্বরূপজ্ঞান উদ্ভাসিত হয় ও একান্ত এবং অখণ্ড সত্য স্বয়ং প্রকাশ লাভ করে। (Intellectual Intuition ইহা অনেকটা Schellingএর মত) কিন্তু এই 'কেবল জ্ঞান' এক মুখ্যজ্ঞান ধরিয়া লইয়া বস্তুস্বরূপ-নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলে, জৈনগণের অনেকান্ত-বাদরূপ সিদ্ধান্তের হানি হয়।

এক্ষণে আমরা দেখিতে চেষ্টা করিব, (১) জৈনদিগের চিন্তাধারার সহিত ভারতীয় অন্যান্য দর্শনের কিরূপ সম্বন্ধ; (২) সত্তা, অসত্তা এবং অবক্তব্য বা অনির্ব্বাচ্য, এই কোটিত্রয় অবলম্বনে সপ্ত প্রকার বচনভঙ্গের বাস্তবিক অবকাশ আছে কিনা; এবং (৩) সর্ব্বশেষে স্যাদ্‌বাদের সহিত আধুনিক পাশ্চাত্য তর্ক-শাস্ত্রের কোন সাদৃশ্য আছে কিনা।

আমরা ইতিপূর্ব্বেই বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি যে, দর্শনশাস্ত্রের মতবাদগুলি প্রায়শঃ পূর্ব্ববর্ত্তী এবং সমকালীন অন্যান্য মতবাদের সংঘর্ষেই সমুৎপন্ন হয়। এক্ষণে দেখিতে চেষ্টা করা যাউক যে, জৈনদিগের স্যাদ্‌বাদ যখন প্রথমে জগতে ঘোষিত হয়, তখন ঐ প্রকার চিন্তার ধারা ভারতীয় অন্যান্য দর্শনে স্থান পাইয়াছিল কিনা। যে সময় ভারতে স্যাদ্‌বাদের ঘোষণা আরম্ভ হয়, সেই সময়ে ভারতে আরও দুইটী প্রধান চিন্তার ধারা প্রবাহিত ছিল। একটী বৌদ্ধ ও অপরটী ঔপনিষদিক জৈনদিগের ধর্ম্ম ও দার্শনিক গ্রন্থ আলোচনায় দেখা যায়, ভদ্রবাহু-রচিত "সূত্রকৃতাঙ্গ-নির্য্যুক্তি" নামক গ্রন্থে স্যাদ্‌বাদের সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ আছে। এই ভদ্রবাহুর জীবনকাল-সম্বন্ধে যে মতভেদ আছে, তাহার আলোচনায় আমাদের কোন প্রয়োজন নাই[১]। তবে মোটামুটি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায়, তিনি যে সময়ে তাঁহার মতবাদ প্রচার করেন, সে সময় বৌদ্ধগণের ধর্ম্ম ও দার্শনিক মত অনেক-পরিমাণে সংগঠিত হইয়াছিল[২], এবং বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য প্রভৃতি প্রাচীনতম উপনিষদ্‌গুলি রচিত হইয়াছিল[৩] এবং উহাদের চিন্তার ধারা এবং মতবাদগুলি সমসাময়িক দার্শনিক-জগতের উপর কতক-পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। আমাদের ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভদ্রবাহু সর্ব্বপ্রথম স্যাদ্‌বাদের প্রচার করিলেও পরবর্ত্তী জৈনাচার্য্যগণ উহার পরিপুষ্টি সাধন করিয়া গিয়াছেন। জৈনাচার্য্য উমাস্বাতি বাচকমুখ্য "তত্ত্বার্থাধিগমসূত্র" নামক জৈন-দর্শনের একখানি অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার প্রায় পাঁচশত বর্ষ পরে সমন্তভদ্র ঐ গ্রন্থের যে টীকা প্রণয়ন করেন, তাহার মুখবন্ধের নাম "আপ্ত-মীমাংসা"। এই আপ্ত-মীমাংসায় স্যাদ্‌বাদের পূর্ণ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, এবং সমন্তভদ্রের জীবনকাল আনুমানিক খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভ।

১। পরলোকগত মহাত্মা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ৺সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের মতে ভদ্রবাহুর কাল খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী। শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের মতে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী।

২। প্রায় সমুদায় ত্রিপিটক বৌদ্ধ-গ্রন্থ খৃষ্টপূর্ব্ব ২৪১ বৎসরের পূর্ব্বেই সঙ্কলিত হইয়া গিয়াছিল।—দাশগুপ্তের ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

৩। প্রাচীন উপনিষদ্‌গুলির সময় ৭০০—৬০০ খৃঃ পূঃ (ঐ)।

অতএব পরবর্ত্তী কালে মাণিক্য নন্দী-রচিত "পরীক্ষামুখসূত্র" (আনুমানিক ৮০০ খৃষ্টাব্দ), প্রভাচন্দ্র কবি-রচিত পরীক্ষামুখসূত্রের টীকা "প্রমেয়কমল-মার্ত্তণ্ড" নামক গ্রন্থ (আনুমানিক ৮২৫ খৃষ্টাব্দ) হরিভদ্র-রচিত "ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়" (১১৬৮ খৃষ্টাব্দ), মল্লিষেণ কৃত "স্যাদ্‌বাদমঞ্জরী" (১২১৪ শকাব্দ ১২৯২ খৃষ্টাব্দ[১]) প্রভৃতি গ্রন্থে স্যাদ্‌বাদের পরিপোষণের কথা ছাড়িয়া দিলেও, খৃষ্টীয় প্রথম হইতে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে স্যাদ্‌বাদের চিন্তা-প্রণালীর উপর বৌদ্ধ ও ঔপনিষদিক প্রভাব স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়।

এক্ষণে দেখা যাউক, স্যাদ্‌বাদের উপর বৌদ্ধ অনির্ব্বাচ্যবাদের প্রভাব কিরূপে সম্ভাবিত হইয়াছিল। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, স্যাদ্‌বাদের হস্তে ক্রীড়নক হইল তিনটী,—সত্তা, অসত্তা ও অবক্তব্য, অথবা সামান্য, বিশেষ ও অবক্তব্য ; অথবা নিত্য, অনিত্য ও অবক্তব্য, অর্থাৎ দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মের ক্রমিক উল্লেখ ও তাহাদের যুগপৎ প্রাধান্যবশতঃ বস্তুর অনির্ব্বাচ্যতা। বৌদ্ধ ত্রিপিটকের মধ্যে অভিধম্ম-পিটকের সুত্ত ও বিনয়-পিটকের সহিত প্রতিপাদ্য-বিষয়ে সাম্য থাকিলেও উহাদের অপেক্ষায় অভিধম্ম-পিটক অধিক-পরিমাণে যুক্তি-তর্কের সাহায্য গ্রহণ করে। আবার সেই অভিধম্ম-পিটকের মধ্যে "কথাবত্থু" নামক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তথায় বিরুদ্ধ-মতাবাদিগণের[২] খণ্ডনপ্রসঙ্গে দ্বিকোটিক তর্কের উত্থাপন করিয়া দেখান হইয়াছে যে, তাঁহাদের মতবাদগুলি পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবের আধার, সুতরাং অশ্রদ্ধেয়। ইহার কিছু পরে বৌদ্ধাচার্য্য নাগার্জ্জুনই (৪০১ খৃষ্টাব্দ) প্রকৃত-প্রস্তাবে তাঁহার শূন্যবাদ স্থাপন প্রসঙ্গে অস্তি, নাস্তি এবং অবক্তব্যরূপ ত্রিকোটিক যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। তিনি প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, কোন বস্তুরই কোন নিজস্ব 'স্বভাব' বা সত্তা নাই। তাপকে অগ্নির স্বভাব বলা যায় না। কারণ, তাপ এবং অগ্নি উভয়েই অন্য অনেক কারণের উপর নির্ভর করে। যাহা অন্যের উপর নির্ভর করে না, কেবল তাহাই কোন বস্তুর স্বভাব হইবার যোগ্য। তাপ অন্যের উপর নির্ভর করে, সুতরাং তাপ অগ্নির স্বভাব হইতে পারে না ; এবং জগতে এমন কোন বস্তু নাই, যাহা অন্যের উপর নির্ভর করে না, সুতরাং সর্ব্ববস্তুই নিঃস্বভাব। ইহাই প্রতীত্য-সমুৎপাদ বা শূন্যবাদের নিগূঢ় অর্থ। ফলতঃ যেমন আমরা কোন বস্তু-সম্বন্ধে "ইহার স্বভাব এই"— এরূপ বিধিপূর্ব্বক বাক্য প্রয়োগ করিতে পারি না, সেইরূপ "ইহার স্বভাব এরূপ নহে"—এরূপ নিষেধ-বাক্যও প্রয়োগ করিতে পারি না। সুতরাং বস্তু-স্বরূপ অনির্ব্বাচ্য হইয়া দাঁড়াইতেছে।

১। মল্লিষেণ তাঁহার পুস্তকের রচনা-কাল পুস্তকের শেষে স্বয়ং দিয়া গিয়াছেন,—

"শ্রীমল্লিষেণসূরিভিরকারি তৎপদগগনদিনমণিভিঃ।

বৃত্তিরিয়ং মনুরবিমিতশকাব্দে দীপমহসি শনৌ॥" (মনুরবি—১২১৪)

২। কথাবত্থুর টীকাকার এই কয়েকটী বিরুদ্ধমতবাদীর উল্লেখ করেন যথা,—মহাসঙ্ঘিকাঃ, লোকোত্তরবাদিনঃ, কক্কুলিকাঃ, প্রজ্ঞাপ্তবাদিনঃ, একব্যবহারিকাঃ এবং সর্ব্বাস্তিবাদিনঃ। ইহাদের মধ্যে মহাসঙ্ঘিকবাদে জৈন-সম্মত আত্মার কুৎস্ন-শরীর-ব্যাপিত্বের ন্যায় চিত্তের সর্ব্বশরীর ব্যাপিত্বের উল্লেখ আছে। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের "বৌদ্ধধর্ম্ম"-শীর্ষক প্রবন্ধাবলী দ্রষ্টব্য।—(নারায়ণ, ১৩২২, শ্রাবণ)।

দৃশ্যমান জগতে বস্তুনিচয় এক ক্ষণে উৎপন্ন হইতেছে, আবার পরক্ষণেই ধ্বংসলাভ করিতেছে। এইরূপ উৎপাদ ও ধ্বংস ব্যতিরেকে তাহাদের কোন নিজস্ব স্বভাব নাই। এ জগৎটাই এরূপ নিঃস্বভাব, উৎপাদ ও বিনাশের প্রবাহ মাত্র। ইহারই অপর নাম "প্রপঞ্চ-প্রবৃত্তি"। এই প্রপঞ্চ প্রবৃত্তির নাশেই নির্ব্বাণ; এবং নির্ব্বাণ ও শূন্য একই। নির্ব্বাণের স্বরূপ হইতেছে এই যে, উহা ভাবরূপও নহে, আবার অভাবরূপও নহে। নির্ব্বাণ ভাবরূপ হইলে, উহা কতকগুলি কারণ-সামগ্রী হইতে "সংস্কৃত" বা উৎপন্ন এবং যাহা উৎপন্ন, তাহা ধ্বংসশীল। আবার উহা অভাবস্বরূপও হইতে পারে না। কারণ, যখন শূন্যবাদে কোনরূপ ভাবপদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করা চলে না, তখন অভাব-পদার্থের অস্তিত্ব স্বতঃই নিরাকৃত হয়। সুতরাং দেখা গেল, নির্ব্বাণ ভাবস্বরূপও নহে; অভাব-স্বরূপও নহে। পরিশেষে মাধ্যমিকেরা নির্ব্বাণ বা শূন্যকে "চতুষ্কোটি বিনির্ম্মুক্ত" বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। অর্থাৎ উহা 'অস্তি'ও নহে, 'নাস্তি'ও নহে, তদুভয়ও নহে, অনুভয়ও নহে। উহা অনির্ব্বাচ্য বা জৈনের ভাষায় বলিতে গেলে, উহা অবক্তব্য। এইরূপে অস্তি, নাস্তি ও অবক্তব্য লইয়া বৌদ্ধ বিচারপ্রণালী জৈনের স্যাদ্‌বাদকে অনুপ্রাণিত করে নাই, এ কথা সাহস করিয়া বলা চলে না।

স্যাদ্‌বাদ ও বেদান্তের অনির্ব্বাচ্যবাদ। অদ্বৈতবাদে মায়া ও মায়াপ্রসূত এই জগৎ-প্রপঞ্চের স্বরূপ-নির্ণয়প্রসঙ্গেও ঠিক এই সত্তা, অসত্তা ও অবক্তব্যরূপ ত্রিকোটিক চিন্তা-প্রণালীর প্রয়োগ করা হইয়াছে। মায়া বা অবিদ্যার স্বরূপ কি না—উহা সৎ। কারণ, যাবৎ ব্রহ্মজ্ঞানের উৎপত্তি না হয়, তাবৎ উহার অস্তিত্ব আছেই ত এবং উহা জগৎ-প্রপঞ্চের প্রসবিত্রী বটেই ত। আবার ব্রহ্মজ্ঞান সমুৎপন্ন হইলেই উহার তিরোভাব, সঙ্গে সঙ্গে জগৎ-সংসারেরও তিরোভাব হয়, সুতরাং মায়া সৎও বটে, অসৎও বটে। পরন্তু উহা 'সদসত্ত্বাামনির্ব্বাচ্যা'। এইরূপে এই অনির্ব্বচনীয়া মায়া হইতে প্রসূত বলিয়া জগৎ-সংসারের যাবতীয় বস্তুই বিরুদ্ধ ধর্ম্মের আধার এবং অনির্ব্বাচ্য।

এই মায়ার স্বরূপ এবং অনির্ব্বাচ্যবাদ বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য প্রভৃতি অতি প্রাচীন উপনিষদে ঠিক এইরূপে প্রচারিত নাই সত্য এবং এমন কি, মায়া শব্দটী শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের পূর্ব্বে আর কোন উপনিষদে উক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই, ইহাও সত্য, তথাপি বৃহদারণ্যকের মৈত্রেয়ী-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ ও ছান্দোগ্যের ষষ্ঠ অধ্যায়ে মায়াবাদের এবং সঙ্গে সঙ্গে জগন্মিথ্যাত্বের প্রতিষ্ঠাকল্পে যে চিন্তাপ্রণালী আরব্ধ হইয়া, পরে ভগবান্ বাদরায়ণ ও শঙ্করাচার্য্য কর্তৃক অনুসৃত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চয়ই অন্ততঃ পরোক্ষভাবে জৈনাচার্য্যগণের চিন্তার ধারার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, এ কথা বলা বোধ হয় অসঙ্গত হয় না।

পক্ষান্তরে ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের তর্কপাদে "নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ" এই সূত্রের ভাষ্যে স্যাদ্‌বাদানুসারে একই বস্তুতে যুগপৎ সত্তা ও অসত্তাদিরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ অসম্ভব বলিয়া স্যাদ্‌বাদের খণ্ডনের চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার নিজের স্বীকৃত অদ্বৈতবাদ যদি বজায় রাখিতে হয়, তাহা হইলে অনির্ব্বাচ্যা মায়ার

সাহায্যে জগৎ-প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব সপ্রমাণ করিতে হয়। জগতের বস্তুজাত মায়াপ্রসূত বলিয়া তাহারাও সৎও বটে, অসৎও বটে, এজন্য অনির্ব্বাচ্য। সুতরাং বাস্তবিকপক্ষে তিনিও ত বস্তুতে সদসত্ত্বাদিরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের অধ্যাস করিয়াছেন। শুধু ইহাই নহে, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য সমগ্র তর্কপাদে ন্যায়, বৈশেষিক, বৌদ্ধ প্রভৃতি মতবাদ খণ্ডনপ্রসঙ্গে যে যুক্তিপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাও জৈনচার্য্যগণের চিন্তার ধারার অনেকটা অনুরূপ। তাঁহার পরে শ্রীহর্ষ তাঁহার "খণ্ডনখণ্ডখাদ্যে" অনির্ব্বাচ্যবাদ-সাহায্যে প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, এ জগতে কোন বস্তুই অস্তি বা নাস্তি—এইরূপ লক্ষণে লক্ষিত করা যায় না। উহা সৎও নহে, অসৎও নহে, আবার উহা সৎও বটে, অসৎও বটে; উহা সদসত্ত্বারূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয়; উহা অনির্ব্বাচ্য বা অবক্তব্য। এজন্য শ্রীহর্ষের খণ্ডনের অপর নাম "অনির্ব্বচনীয়তাসর্ব্বস্ব"। নৈয়ায়িকই শ্রীহর্ষের শরব্য। কারণ, নৈয়ায়িকই লক্ষণ-সাহায্যে বস্তুর অস্তিত্ব সিদ্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীহর্ষও নৈয়ায়িকের যত লক্ষণ উক্ত প্রকার ত্রিকোটিক যুক্তি-সাহায্যে একে একে তাহার সমস্ত খণ্ডন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, যখন লক্ষণ টিকিল না, তখন জগৎ-প্রপঞ্চের অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব নির্ব্বচন করা যায় না। এক কথায় উহা অনির্ব্বাচ্য।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে আমরা ইহা সংগ্রহ করিতে পারি যে, খুব সম্ভব প্রাচীন বৌদ্ধ ও ঔপনিষদিক ত্রিকোটিক বিচারপদ্ধতি দ্বারা পরোক্ষভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া জৈনগণ স্যাদ্বাদের অবতারণা করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ অনির্ব্বাচ্য বা শূন্যবাদ ও বৈদান্তিক অনির্ব্বাচ্যবাদের সহিত স্যাদ্বাদের প্রভেদ এই যে, বৌদ্ধ ও বৈদান্তিক—উভয়েই বস্তুকে এক হিসাবে বাধিত করিয়াছেন, স্যাদ্বাদ বস্তুস্বরূপ সাধিত করিয়াছে। বৌদ্ধমতে বাহ্য জগৎ শূন্য, বেদান্তমতে ব্রহ্মের পারমার্থিক সত্তার অপেক্ষায় ব্যাবহারিক জগৎ বাধিত এবং ব্যাবহারিক বাহ্যজগতের মধ্যেও এক উচ্চস্তরের সত্যের অপেক্ষায় নিম্নস্তরের সত্য বাধিত। স্যাদ্বাদ দেখাইয়াছে যে, বস্তু সত্তা ও অসত্তা, নিত্যতা ও অনিত্যতা, প্রভৃতি বিরুদ্ধ ধর্ম্মের আধার হইতে পারে। ঐরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশেই বস্তুর বস্তুত্ব সিদ্ধি। বিরোধি-ধর্ম্মাধ্যাস বস্তুর বাধিতত্ব বা শূন্যতা আপাদন করা দূরে থাকুক, বস্তুর বাস্তবতাই সম্পাদন করে। কারণ, প্রতীতি ও তদুপরি প্রতিষ্ঠিত অনুমান আমাদিগকে জ্ঞাপন করে যে, কেবল নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব, সামান্য ও বিশেষ, দ্রব্য ও পর্য্যায়—এই উভয়াত্মক বস্তুই আমাদের প্রয়োজন-সিদ্ধির সহায়। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এ সমুদায় বিষয় পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং বৈদান্তিক অনির্ব্বাচ্যবাদে জগৎ-প্রপঞ্চের বাধ ও বৌদ্ধ অনির্ব্বাচ্য বা শূন্যবাদে জগৎ-প্রপঞ্চের নাশ, পরন্তু জৈনের স্যাদ্বাদে জগতের প্রতিষ্ঠা।

আর এক কথা। আমরা পূর্ব্বে স্যাদ্বাদের সপ্ত প্রকার বচন-ভঙ্গের আলোচনা-কালে দেখিয়াছিলাম যে, জৈনাচার্য্যগণের মতে বস্তুর ধর্ম্ম অনন্ত হইলেও, বচনবিন্যাস সপ্ত প্রকার মাত্রই হইবে; কারণ, তাঁহারা বলেন যে, বচনভঙ্গ জিজ্ঞাসার প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করে এবং তাঁহাদের প্রদর্শিত সপ্ত প্রকার জিজ্ঞাসার পর আর সন্দেহের বা জিজ্ঞাসার অবসর থাকে না। সেইখানেই বচনের বিশ্রান্তি হয়। সুতরাং স্যাদস্তি, স্যান্নাস্তি, স্যাদস্তি চ স্যান্নাস্তি চ, স্যাদবক্তব্যঞ্চ, স্যাদস্তি চ

স্যাদবক্তব্যঞ্চ, স্যান্নাস্তি চ স্যাদবক্তব্যঞ্চ, স্যাদস্তি চ স্যান্নাস্তি চ, স্যাদবক্তব্যঞ্চ, এই **সপ্ত-প্রকারই** তাঁহাদের মতে আবশ্যকীয় বচনভঙ্গ। উহার কমও নহে, বেশী নহে। কিন্তু আমার মনে হয় যে, বস্তুস্বরূপ-সম্বন্ধে জৈনগণের মতবাদ সত্যের অদূরবর্ত্তী হইলেও, তাঁহাদিগের অঙ্গীকৃত বচনভঙ্গের **সপ্তপ্রকার** সম্বন্ধে সন্দেহ উত্থিত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। বস্তু অনন্ত ধর্ম্মের আধার, সুতরাং এক ধর্ম্ম অপেক্ষায় ইহার অস্তিত্ব স্বীকৃত হইলে, সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মান্তরের অপেক্ষায় ইহাতে নাস্তিত্ব আরোপ করিতে হয়। পরে ঐ অস্তিত্ব এবং নাস্তিত্বের ক্রমিক আরোপ করিলে 'স্যাদস্তি চ স্যান্নাস্তি চ' এইরূপ বিধি-নিষেধাত্মক বাক্যের প্রয়োগ বেশ বুঝা যায়। এবং অবশেষে সেই একই বস্তুতে যুগপৎ অস্তিত্ব এবং নাস্তিত্ব কল্পিত হইলে, বাস্তবিকই বস্তুস্বরূপ অবক্তব্য হয়, এপর্য্যন্তও বেশ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু ইহার পর পঞ্চম হইতে সপ্তম পর্য্যন্ত অবশিষ্ট তিনটির ভঙ্গের প্রয়োগের অবকাশ আছে বলিয়া অন্ততঃ আমার মনে হয় না। কারণ, চতুর্থ ভঙ্গে যাহাকে অবক্তব্য বলিয়া আপন ধীশক্তির অক্ষমতা মানিয়া লইলাম, আবার তাহার সম্বন্ধে বচনবিন্যাস কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, তাহা বুঝা যায় না। সুতরাং আমার এরূপ ধারণা যে, চতুর্থ ভঙ্গেই বস্তুসম্বন্ধীয় চিন্তার ও বাক্যের বিশ্রান্তি হওয়া উচিত। অথচ উহাতে জৈনগণের প্রতিষ্ঠিত বস্তুস্বরূপ-সম্বন্ধে সিদ্ধান্তের হানিও হয় না। অবশ্য ইহাই আমার ব্যক্তিগত ধারণা।

ইহার পর আরও একটী বিষয়ের আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতে ইচ্ছা করি। তাহা স্যাদ্‌বাদ ও আধুনিক পাশ্চাত্য তর্কশাস্ত্রের শাসনের সম্বন্ধে। স্যাদ্‌বাদের বিস্তারিত আলোচনায় বোধ হয়, ইহাই সংগ্রহ করিতে পারা যায় যে, বাস্তব-জগতে বস্তুর স্বরূপ এক প্রকার প্রহেলিকাময়। কারণ, কোন বস্তুকেই একান্তভাবে আছেও বলিতে পারি না, আবার নাইও বলিতে পারি না। নিত্যও বলিতে পারি না, আবার অনিত্যও বলিতে পারি না। একও বলিতে পারি না, আবার বহুও বলিতে পারি না। বস্তু তাহার নিজ স্বরূপের দ্বারা প্রতিনিয়তও বটে, আবার প্রতিনিয়ত নয়ও বটে। সেইজন্য জৈন আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়া বলিয়াছেন, বস্তুকে কোন এক বিশেষণে বিশেষিত করিতে যাইও না। করিতে গেলেই ভ্রমে পতিত হইবে। আমার মনে হয়, ইহার ন্যায় ব্যাবহারিক জীবনে শ্রদ্ধের উপদেশ আর নাই। পারমার্থিক সত্য থাকিতে পারে এবং তাহার সম্বন্ধে কোন এক প্রকার একান্ত-সত্য-প্রকাশক বাক্য-প্রয়োগ করা সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ ব্যাবহারিক জগতে আমাদের অবস্থান করিতে হইবে, যতক্ষণ প্রতীতির সাহায্যে বাহ্য বস্তু লইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে, ততক্ষণ আমার বোধ হয়, স্যাদ্‌বাদ-প্রদর্শিত বস্তুস্বরূপ আমাদের ব্যাবহারিক জীবনযাত্রায় বাস্তবিক সহায়তা করে। বস্তু বিরুদ্ধ-ধর্ম্মের আধার হইতে পারে এবং অবক্তব্যও হইতে পারে। কিন্তু উহাই প্রকৃত বস্তুর স্বভাব এবং প্রকৃত বস্তু লইয়াই আমাদের কারবার করিতে হয়; কতকগুলি কল্পিত আন্তর ভাবের সহিত নহে।

এস্থলে আরও একটী কথার উত্থাপন বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। আরিষ্টটলের তর্কশাস্ত্রে (Logic) Law of Identity, Contradiction এবং Excluded Middle নামে

তিনটী নিয়ম আছে। সেই তিনটী নিয়মের কার্য্য হইতেছে, ভাব-রাজ্যের সামঞ্জস্য নিরূপিত করা। Law of Identity অনুসারে আমরা বলিতে বাধ্য যে, যে বস্তুটীকে একবার যে প্রকার বলিয়া ধরিয়া লইব, কখনই তাহার ব্যতিক্রম হইবার উপায় নাই। যেমন A is A, ঘট ঘটই। A is B, এ কথা বলা চলে না, বা ঘটটী নূতন বা ঘটটী পুরাতন, এরূপ বাক্য প্রয়োগ করা চলে না। Law of Contradiction বলে যে, একটী মাত্র বস্তুতে দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম কল্পনা করা যায় না। A cannot be both B and not—B. ঘটটী মৃৎ-সংস্থানবিশেষও বটে, আবার মৃৎসংস্থানবিশেষ নয়ও বটে, একথা বলা যায় না। এইরূপে Law of Excluded middleএ বলা হয় যে বস্তু কোন দ্বিকোটিবিনির্ম্মুক্ত, এ কথা বলা চলে না। হয় বল, ঘট অস্তি, না হয় বল, ঘটটী নাস্তি; উহা 'অস্তি' ও 'নাস্তি'—এই দুই ভিন্ন অপর কিছু, এ কথা বলা চলে না। আজকালকার পাশ্চাত্য প্র্যাগ্ম্যাটিক্ তর্ক-শাস্ত্রবিদ্‌গণ বলিতে চান যে, ঐ সমস্ত নিয়ম পরিণাম বা পরিবর্ত্তনহীন আন্তর-জগতে খাটিতে পারে, কিন্তু বাস্তব-জগতে খাটে না। সেই জন্য Dr. Schiller তাঁহার Formal Logic নামক গ্রন্থে প্রাচীন আরিষ্টটলের মতবাদ-খণ্ডন-প্রসঙ্গে প্রথমেই প্রশ্ন তুলিয়াছেন, "Are they laws of thought or of things?" বাস্তব-জগতের বস্তু লইয়াই আমাদের কারবার করিতে হয়। সুতরাং আমাদের চিন্তার নিয়মাবলী এমন হওয়া উচিত যে, উহারা সেই বাস্তব-জগতের বস্তু-সমুদায়ের প্রকৃতি-নির্ণয়ে সমর্থ হয়। আজ আমরা এতক্ষণ স্যাদ্‌-বাদ আলোচনা-প্রসঙ্গে বস্তুর প্রকৃতি-সম্বন্ধে যে তথ্য সংগ্রহ করিলাম, ঠিক এই প্রকার বস্তুর প্রকৃতি-সম্বন্ধে ধারণা লইয়াই Schiller-প্রমুখ আধুনিক পাশ্চাত্য তর্কশাস্ত্রবিদ্‌গণ চিরন্তন বস্তুনিরপেক্ষ তর্কশাস্ত্রের (Formal Logic) সংস্কারসাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তাঁহারা দেখাইতে চেষ্টা করিতেছেন যে, আরিষ্টটল-কথিত একান্ত-স্বরূপতা (rigid identity) ভাবজগতে থাকিতে পারে, প্রকৃতিসিদ্ধ বস্তুজগতে ঐরূপ একান্তস্বরূপতার অস্তিত্ব নাই। প্রতি বস্তুই নিত্যও বটে, পরিণম্যমানও বটে, উহার স্বরূপতা বজায় রাখিয়াও অনুক্ষণ ভেদকে আশ্রয় দিয়া থাকে। উহাতে Identityও আছে, আবার differenceও আছে। জৈনের ভাষায় বলিতে গেলে, উহা উৎপাদ, ধ্রৌব্য ও ব্যয়যুক্ত। উহা 'অস্তি'ও বটে, 'নাস্তি'ও বটে, আবার অবক্তব্যও বটে। সুতরাং উপরি-কথিত একান্তবাদী Law of Identity, Contradiction এবং Excluded Middle নিয়মত্রয়ের অবকাশ বস্তুজগতে নাই।

শ্রীহরিমোহন ভট্টাচার্য্য

—০—

আমাদিগের অয়নাংশ *

আমাদিগের অর্থাৎ হিন্দুদিগের অয়নাংশ লইয়া যে গোলযোগ ঘটিয়া আছে, তাহার মীমাংসার কিছু সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। কয়েকবার ভারতের নানাস্থানে যে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের সভা আহূত হইয়াছিল, তাহাতে সমবেত সভ্যগণ কেবল বাগ্‌বিতণ্ডা করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। পঞ্জিকাকারগণ স্বেচ্ছামত অয়নাংশ স্থির করিয়া নিজ নিজ পঞ্জিকায় লিপিবদ্ধ করিয়া আসিতেছেন। অধিকাংশ পঞ্জিকাতেই সূর্য্যসিদ্ধান্তমতানুযায়ী সিদ্ধান্ত-রহস্য-মতে অয়নাংশ গণিত হইয়া আসিতেছে। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকায় স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় বাপুদেব শাস্ত্রীর মতানুসারে অয়নাংশ গ্রহণ করা কতদূর যুক্তিপূর্ণ, তাহার উল্লেখ করিবার আবশ্যকতা দেখি না। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীমান্ সাতকড়ি সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের প্রণীত "বঙ্গে পঞ্জিকা-সংস্কার" নামক পুস্তকে ইহার সবিশেষ আলোচনা আছে।

দুই বৎসর পূর্ব্বে আমার পরমবন্ধু শ্রীমান্ ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত Journal of the Department of Letters নামক সাময়িক পত্রিকার পঞ্চম খণ্ডে হিন্দুগণিত ও জ্যোতিষ-বিষয়ক কয়েকটী প্রবন্ধ একত্রে প্রকাশ করেন। প্রথম প্রবন্ধটীতে তিনি হিন্দুদিগের অয়নাংশ-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আধুনিক পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষের সাহায্যে তাহার মূলতত্ত্বের যথার্থতা প্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্তটী বিশেষ যুক্তিপূর্ণ মনে হওয়ায়, তাহা সাধারণ ও পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট উপস্থাপিত করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। বলিয়া রাখি যে, ইহা তাঁহার প্রবন্ধের অনুবাদ নহে; অয়নাংশের মূলতত্ত্বটী হিন্দু ও পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষের পক্ষ হইতে এভাবে আলোচনা করা হইয়াছে, যাহাতে সকলেই বিষয়টী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। আর এক কথা, জ্যোতিঃশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য-প্রকাশের উদ্দেশ্যে এ প্রবন্ধ লিখিত হয় নাই। কারণ, সে কথা আমার পক্ষে আদৌ খাটে না। এই প্রবন্ধ-পাঠে যদি সকলে অয়নাংশের মূলতত্ত্বটী যুক্তিপূর্ণ বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে যাহাতে ইহা কর্ম্মক্ষেত্রে গৃহীত হয়, ইহাই আমার উদ্দেশ্য।

উল্লেখ করিয়া রাখি যে আমাদের মধ্যে অনেকেই কোন সিদ্ধান্তের পক্ষে বা বিপক্ষে যুক্তিপূর্ণ প্রমাণ উপস্থাপিত করিতে না পারিয়া বৃথা বাদ-বিসংবাদ করিয়া থাকেন; তাঁহারা কোন বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া মতান্তর হইতে মনান্তরে উপনীত হন ও বৃথা গালাগালি করিয়াই ক্ষান্ত হন—ফলে কিছুই হয় না। কিন্তু বিজ্ঞানশাস্ত্রে এরূপ হওয়া অতীব দুঃখের বিষয়। বিজ্ঞান-শাস্ত্রে কোন বিষয় এইরূপ আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক ভিন্ন পরিমার্জ্জিত হইতে পারে না, ইহাতে আমরা আমোদ না পাইয়া রাগান্বিত হইব কেন? এই বিষম বুদ্ধিবৃত্তির ফলে আমাদের উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক, ক্রমশঃ অবনতি ঘটিতেছে।

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩৩১ বঙ্গাব্দের তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

প্রবন্ধটী পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথমতঃ, প্রাচীন সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষ-গ্রন্থে অয়নাংশ-সম্বন্ধে যাহা পাওয়া যায়, সেগুলি লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। সোমসিদ্ধান্ত, ব্রহ্ম-সিদ্ধান্ত, সূর্য্য-সিদ্ধান্ত, বৃদ্ধবসিষ্ঠ-সিদ্ধান্ত, বসিষ্ঠ-সিদ্ধান্ত, মহাসিদ্ধান্ত, ও সিদ্ধান্ত-শিরোমণিতে অয়নাংশ-সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাদের মূল, সরল অনুবাদ ও একটী করিয়া উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, অয়নাংশ-নিরূপণের মূলতত্ত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষের সাহায্যে অয়নাংশের মূলতত্ত্বের যথার্থতা প্রমাণ করা হইয়াছে। সাধারণের উপলব্ধির জন্য পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষের যে যে অংশ না জ্ঞাত থাকিলে উপস্থাপিত বিষয়টী হৃদয়ঙ্গমে অসুবিধা হইবে, তৎসম্বন্ধে প্রথমে কিছু লিখিত হইয়াছে।

চতুর্থতঃ, সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষ-গ্রন্থে অয়নাংশ নিরূপণের যে প্রক্রিয়াগুলি বিবৃত আছে, তাহাদের মূলতত্ত্ব পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষের সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

পঞ্চমতঃ, বিশুদ্ধরূপে অয়নাংশ-নিরূপণের উপায়-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে।

১। আমরা বেদাঙ্গ জ্যোতিষ এবং পিতামহ-সিদ্ধান্তে অয়নাংশের কোন উল্লেখ পাই নাই। ব্রহ্মস্ফুট-সিদ্ধান্তেও এ সম্বন্ধে কোন কথা দেখা যায় না। গ্রহলাঘবাদি আধুনিক গ্রন্থ অনাবশ্যক-বোধে আলোচিত হইল না।

(ক) সোমসিদ্ধান্ত। আমরা সোম-সিদ্ধান্তে সংক্ষেপে অয়নাংশ-নিরূপণের প্রক্রিয়ার উল্লেখ দেখিতে পাই। স্পষ্টাধিকারে ৩১ ও ৩২ শ্লোক উদ্ধৃত হইল,—

> যুগে চ ষট্‌শতৈকত্বে ভচক্রং প্রাক্ চ লম্বতে।
> তদ্‌গুণো ভূদিনৈর্ভক্তো দ্যুগণোঽয়নখেচরঃ॥
> তচ্ছুদ্ধচক্রদোর্লিপ্তা দ্বিশত্যাপ্তায়নাংশকাঃ।
> সংস্কার্য্যা জূকমেষাদৌ কেন্দ্রে স্বর্ণং গ্রহে কিল॥

একযুগে (মহাযুগে) ভচক্র ছয়শত বার পূর্ব্বদিকে লম্বিত হয়। এই সংখ্যা ভূদিন (অর্থাৎ সৃষ্টির আদি হইতে গত দিন-সংখ্যা) দ্বারা গুণ করিয়া গুণফলকে দ্যুগণ (অর্থাৎ এক যুগের দিন-সংখ্যা) দ্বারা ভাগ করিলে, অয়ন-খেচর (অয়নগতি) নির্ণীত হইবে।

ভূদিনের অয়নগতির শুদ্ধচক্রকে (অর্থাৎ ভুজজ্যাকে) ৬০০ ছয় শত দ্বারা বিভক্ত করিয়া ২০০ দুইশত দ্বারা গুণ করিলে, অভীষ্ট ভূদিনের অয়নাংশ পাওয়া যাইবে।

অয়নগ্রহ তুলাদি ছয় রাশিতে হইলে অয়নাংশ গ্রহে যোগ এবং মেষাদি ছয় রাশিতে থাকিলে বিয়োগ করিয়া সংস্কার করিতে হইবে।

প্রথম প্রক্রিয়াটী একটী ত্রৈরাশিক মাত্র—দ্যুগণ : ভূদিন : : ৬০০ : অভীষ্ট ভূদিনের অয়নগতি। (ক)

দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটী (ক) এর ভুজজ্যা নিরূপণ করা।

তৃতীয় প্রক্রিয়াটী ও একটী ত্রৈরাশিক—

৬০০ : অয়নগতির ভুজজ্যা : : ২০০ : অয়নাংশ। এই অয়নাংশ তুলাদি ছয় রাশিতে অবস্থিত হইলে, ইহা গ্রহে যুক্ত হইবে এবং মেষাদি ছয় রাশিতে থাকিলে বিযুক্ত হইবে।

উদাহরণ। ১৮৪৪ শকাব্দের ১লা বৈশাখের অয়নাংশ নিরূপণ।

সৃষ্টির আদি হইতে অভীষ্ট বর্ষ পর্য্যন্ত গতবর্ষ-সংখ্যা—

সৃষ্টির আদি হইতে কলিযুগের আদি পর্য্যন্ত		১৯৬?৯২০০০০
শকাব্দের আদি পর্য্যন্ত গত কলিবর্ষ	...	৩১৭৯
শকবর্ষ ...	...	১৮৪৪
	মোট	১৯৬৯৯২৫০২৩

অতএব অয়নগতি

$$= \frac{৬০০ \times ১৯৬৯৯২৫০২৩ \times \text{বর্ষের দিন-সংখ্যা}}{৪৩২০০০০ \times \text{বর্ষের দিন-সংখ্যা}}$$

= ২৭৩৬০০।২৫১ অংশ ৯ কলা।

ইহার চক্র (বৃত্তাংশ) = ২৫১ অংশ ৯ কলা।

ইহার ভুজজ্যা (বিষমপাদে অবস্থিত বলিয়া)

= ২৫১ অংশ ৯ কলা — ১৮০ অংশ

= ৭১ অংশ ৯ কলা।

সুতরাং অয়নাংশ $= \frac{৭১।৯ \times ২০০}{৬০০}$

= ৭১।৯ × ⅓ (১/৩)

= ২৩ অংশ ৪৩ কলা।

(খ) ব্রহ্মসিদ্ধান্ত। এই গ্রন্থ ব্রহ্মস্ফুট-সিদ্ধান্ত হইতে ভিন্ন। ব্রহ্মসিদ্ধান্তে আমরা অয়নাংশের বিস্তৃত বিবরণ দেখিতে পাই, তাহাতে বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মসিদ্ধান্তের গ্রন্থকার অয়নাংশ-বিষয়ে বিশেষ আকৃষ্ট ছিলেন এবং তাহা বিশেষরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১৮৪—১৯৩ শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

কর্ক্যাদিস্থা মৃগান্তস্থাঃ স্পষ্টেন্দ্রদগবাঙ্মুখাঃ।
প্রত্যব্দং যান্তি যাম্যোদগ্‌গমনে বিহিতেঽপি যৎ॥
তত্তৎ পশ্চাল্লবক্রান্তিপ্রসঙ্গাদত্রিদৃগ্‌লবাঃ।
ততোঽন্তথাঽথ প্রত্যব্দং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদ্ ব্রজন্তি হি॥
তত্তৎ পশ্চাল্লবক্রান্তিপ্রসঙ্গেঽপি নিজাস্পদাৎ।
পশ্চিমাংশক্রমপ্রাপ্তে প্রাক্ চক্রং চলিতং হিতং॥
যাবৎ স্পষ্ট্যাদিনির্দিষ্টস্থানং তাবৎ প্রভান্তি তে।
আদ্যেষু চরন্তাং তেষামন্তরং শান্তদাস্পদাৎ॥

তত্তৎপ্রাগংশকক্রান্তিপ্রাপ্তেঃ স্যাৎ প্রাগ্লবস্য চ।
প্রাক্ চক্রং চলিতং চেতি নারদৈবোপর্য্যতে॥
প্রাগংশক্রমমপ্রাপ্তে প্রাক্ চক্রং চলিতং ভবেৎ।
প্রাক্পশ্চাচ্চলনাংশোনাঃ স্বর্ণং স্যাম্ভাস্করাদিষু॥
ক্রান্তিকীলাংশলগ্নানাং লম্বনং হ্যগতং দ্বয়োঃ।
স্ফুটার্থময়নার্থং চ প্রত্যহং হ্যুদয়াস্তয়োঃ॥
যদ্দিনে যস্য কক্ষা চ তত্র তেষাম্ প্রবৃত্তিতঃ।
ইত্যেতদেকং চলনং প্রাক্ যুগেত্তানি চ ষট্শতম্॥
যুক্ত্যাঽয়নগ্রহস্তস্মিংস্তুলাদৌ প্রাক্চলং ভবেৎ।
তচ্ছুদ্ধচক্রে বিযুক্ত্যা মেষাদৌ প্রাক্ চলং ভবেৎ॥
অয়নাংশস্তদ্ভুজাংশাস্ত্রিঘ্নাঃ সন্তোদশোদ্ধৃতাঃ।
প্রাক্প্রত্যক্চলনং চক্রস্যোবেতি মনুতে তু যঃ॥

সৃষ্টির আদি হইতে পরবর্ত্তী কালে কর্কটের আদিতে এবং মকরের অন্তে স্থিত যাহা দক্ষিণ ও উত্তর দিকে প্রতি বৎসর নিয়মিতরূপে গমনাগমন করিতেছে, সেই সচলক্রান্তি পশ্চাদ্দিকে ২৭ সাতাইশ অংশ চালিত হয়. তবে তাহাতে এই অন্যথা যে, ইহা প্রতিবৎসর কিঞ্চিৎ করিয়া চালিত হয়। এইরূপে পশ্চিমদিকে চালিত ক্রান্তি নিজ স্থান হইতে ক্রমশঃ পশ্চিমাংশ প্রাপ্ত হইলে, ভচক্র পূর্ব্বদিকে চালিত হইতে থাকে এবং সৃষ্ট্যাদি স্থানে যাবৎ উপস্থিত না হয়, তাবৎ চলিতে থাকে। সচল ক্রান্তিপাতের নিজ স্থান হইতে আদিস্থানের অন্তর অয়নাংশ। নিজ পূর্ব্বগতি এবং পূর্ব্বাংশ-স্থিত ক্রান্তি পাইবার জন্য ভচক্র পূর্ব্বদিকে চালিত হয়—নারদও ইহা সমর্থন করিয়াছেন। ক্রমশঃ পূর্ব্বাংশ অপ্রাপ্তে (অর্থাৎ যতদিন পূর্ব্বাংশ প্রাপ্ত না হয়) চক্র পূর্ব্বদিকে চালিত হয়। (ভচক্রের) এই পূর্ব্ব ও পশ্চিমে চলনের জন্য অয়নাংশ সূর্য্যাদিতে যুক্ত এবং বিযুক্ত হয়। ক্রান্তিচ্ছায়া ও লগ্নের দিনগত লম্বন (পরিমাণ) এবং প্রত্যহ উদয়াস্তের স্পষ্টার্থ অয়নের জন্য (হইয়া থাকে)।

যে কক্ষায় ছিল, সেই কক্ষায় ক্রান্তিপাতের পুনরাগমনে এক অয়নচলন হয়। এক যুগে তাহা পূর্ব্বদিকে ৬০০ বার। অয়নগ্রহের তুলাদিতে পূর্ব্বদিকে গতি হইলে, অয়নাংশ যোগ করিতে হয়। মেষাদিতে শুদ্ধচক্রে পূর্ব্বদিক্গমনে বিয়োগ করিতে হয়।

অয়নগ্রহের ভুজাংশকে তিন গুণ করিয়া দশ ভাগ করিলে অয়নাংশ হইবে।

এইরূপে পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকে রাশিচক্রের গতি জানিতে হইবে।

দেখা যাইতেছে যে, ব্রহ্মসিদ্ধান্তকারের মতেও অয়নগ্রহ এক যুগে (মহাযুগে) ছয়শত বার পূর্ব্বদিকে চালিত হয়। তিনিও অয়নগ্রহের ভুজাংশ গ্রহণ করিতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তৎপরে যে প্রক্রিয়াটী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা সোমসিদ্ধান্ত হইতে ভিন্ন, তবে ইহাও একটী ত্রৈরাশিক—

১০ (৯০) : অয়নগ্রহের ভুজজ্যা : : ৩ (২৭) : অভীষ্ট অয়নাংশ।

উদাহরণ। ১৮৪৪ শকাব্দের ১লা বৈশাখের অয়নাংশ।

সৃষ্টির আরম্ভ হইতে গতবর্ষ ১৯৬৯৯২৫০২৩। এক মহাযুগে অয়নগ্রহের ৬০০ বার চলনের হিসাবে অভীষ্ট বর্ষ-সংখ্যায় অয়নগ্রহের চলন ২৭৩৬০।২৫১ অংশ ৯ কলা।

ইহার চক্রাংশ (বৃত্তাংশ) ২৫১ অংশ ৯ কলা।

ইহার ভুজজ্যা = ২৫১ অংশ ৯ কলা — ১৮০ অংশ

= ৭১ অংশ ৯ কলা

সুতরাং অয়নাংশ

$$= ৭১।৯ \times \frac{৩}{১০} \frac{(২৭)}{(৯০)}$$

= ২১ অংশ ২০ কলা ৪২ বিকলা।

(গ) **সূর্য্যসিদ্ধান্ত**। এই গ্রন্থে অয়নাংশের মূলতত্ত্ব ব্রহ্মসিদ্ধান্তের অনুযায়ী; অয়নাংশের বিবরণ কিন্তু সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। সূর্য্যসিদ্ধান্তখানি অন্যান্য সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষ-গ্রন্থগুলি অপেক্ষা অধিকতর সম্পূর্ণ ও প্রচলিত। ইহার অনেক টীকাও লিখিত হইয়াছে। অয়নাংশবিবরণ যে স্থলে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, তাহার পূর্ব্ব-পশ্চাৎ শ্লোকগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া মহামহোপাধ্যায় বাপুদেব শাস্ত্রী অয়নাংশের শ্লোকগুলি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বিবেচনা করেন। প্রক্ষিপ্ত হইলেও অয়নাংশের মূলতত্ত্বের যে কোন গোলযোগ নাই, তাহা অন্যান্য সিদ্ধান্ত-গ্রন্থের আলোচনায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

ত্রিপ্রশ্নাধিকারে ৯—১২ শ্লোকে অয়নাংশের কথা উল্লিখিত আছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

ত্রিংশৎ কৃত্যো যুগে ভানাং চক্রং প্রাক্ পরিলম্বতে।
তদ্গুণাদ্ভূদিনৈর্ভক্তাদ্ দ্যুগণাদ্যদবাপ্যতে ॥
তদ্দোস্ত্রিঘ্না দশাপ্তাংশা বিজ্ঞেয়া অয়নাভিধাঃ ॥
তৎসংস্কৃতাদ্ গ্রহাৎ ক্রান্তিচ্ছায়া চরদলাদিকম্ ॥
স্ফুটং দৃক্তুল্যতাং গচ্ছেদয়নে বিষুবদ্দ্বয়ে।
প্রাক্ চক্রং চলিতং হীনে ছায়ার্কাৎ করণাগতে ॥
অন্তরাংশৈরথাবৃত্য পশ্চাচ্ছেষৈস্তথাধিকে ॥

এক মহাযুগে ভচক্র ৩০ × ২০ বা ৬০০ বার পূর্ব্বদিকে লম্বিত হইতে থাকে (ভাস্করাচার্য্য ৩০০ বার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু সূর্য্যসিদ্ধান্তের টীকাকারগণ ৬০০ বার বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন)।

অহর্গণকে ৬০০ দিয়া গুণ করিয়া যুগের দিন-সংখ্যা দিয়া ভাগ করিলে যাহা হইবে, তাহার ভুজাংশকে ৩ দিয়া গুণ করিয়া ১০ দিয়া ভাগ দিলে যাহা হইল, তাহাই অয়নাংশ

অয়নাংশ সংস্কৃত গ্রহ হইতে ক্রান্তিচ্ছায়া চরদলাদি সাধিত হইবে।

অয়নে (অর্থাৎ উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ সংযোগে) এবং বিষুবদ্বয়ে দৃক্‌তুল্যতা দ্বারা ইহা প্রত্যক্ষ হইবে।

ছায়া হইতে প্রাপ্ত রবি (রবিস্ফুট) হইতে গণিতাগত রবি হীন হইলে চক্র পূর্ব্বগামী হয়। ছায়া সাধিত রবি হইতে গণিতাগত রবি অধিক হইলে উভয়ের অন্তরাংশ পরিমাণে ভচক্র পশ্চিমগামী হয়।

সূর্য্যসিদ্ধান্তের অয়নাংশের মূলতত্ত্ব ব্রহ্মসিদ্ধান্তানুযায়ী। প্রথম ও তৃতীয় প্রক্রিয়াটী ত্রৈরাশিক।

উদাহরণ। ১৮৪৪ শকাব্দের ১লা বৈশাখের অয়নাংশ।

সৃষ্ট্যাদি গতবর্ষ ১৯৬৯৯২৫০২৩ অভীষ্টবর্ষের অহর্গণে ভচক্রের পরিভ্রমণ।

$$= \frac{\text{অহর্গণ} \times ৬০০}{\text{যুগের দিন-সংখ্যা}}$$

$$= ২৭৩৬০।২৫১ \text{ অংশ } ৯ \text{ কলা।}$$

ইহার ভুজজ্যা ৭১ অংশ ৯ কলা।

সুতরাং অয়নাংশ

$$= ৭১।৯ \times \frac{৩}{১০}$$

$$= ২১ \text{ অংশ } ২০ \text{ কলা } ৪২ \text{ বিকলা।}$$

(ঘ) **বৃদ্ধবসিষ্ঠসিদ্ধান্ত**। এই সিদ্ধান্তের গ্রন্থকার মূলতত্ত্ব বজায় রাখিয়া একটী অপেক্ষাকৃত সহজ প্রক্রিয়ায় অয়নাংশ নিরূপণের পন্থা প্রদর্শন করিয়াছেন।

মধ্যমাধিকারে ৩৬—৩৮ শ্লোকে অয়নাংশ বর্ণিত আছে।

অষ্টাদশ শত ১৮০০ শিষ্টেঽব্দে
ভ২৭ বিনিঘ্নে বিভাজিতে বিষমে।
ভুক্তে যুগ্মে গম্যে খখগজচন্দ্রৈ ১৮০০
চলাংশকা স্বর্ণাঃ ॥

ছায়াগণিতাগতয়োর্ভানোর্বিবরং চলাংশকাস্তে বা।
ছায়ার্কাদ্‌গণিতার্কো হীনঃ পূর্ব্বোঽন্যথা পশ্চাৎ ॥
খচরাশ্চলন্তি তস্মাৎ পূর্ব্বে যুক্তাশ্চ পশ্চিমে হীনাঃ।
তস্মাদপমচ্ছায়া চরদলনাড্যাদিকং সাধ্যং ॥

১৮০০ বৎসরের অবশিষ্ট বর্ষকে (অর্থাৎ অভীষ্ট বর্ষ-সংখ্যকে ১৮০০ দ্বারা ভাগ দিলে, যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাকে,) ২৭ দিয়া গুণ করিয়া ১৮০০ দিয়া ভাগ করিলে অয়নাংশ হইবে।

অয়নাংশ অযুগ্মপাদে থাকিলে যুক্ত ও যুগ্মপাদস্থ হইলে বিযুক্ত হইবে।

ছায়াসূর্য্য ও গণিতসূর্য্যের প্রভেদ অয়নাংশ (নামে অভিহিত); ছায়ার্ক গণিতার্ক হইতে হীন হইলে অয়নাংশ পূর্ব্বে এবং অন্যথা হইলে পশ্চিমে অবস্থিত হয়।

সূর্য্যাদি গ্রহের পূর্ব্বে থাকিলে অয়নাংশ যুক্ত এবং পশ্চিমে থাকিলে অয়নাংশ বিযুক্ত হইবে। তাহা হইতে অপমচ্ছায়া চরদলনাড্যাদি সংস্কার করিতে হয়।

বৃদ্ধবসিষ্টসিদ্ধান্তের মূলতত্ত্ব ব্রহ্মসিদ্ধান্তমতানুযায়ী। প্রক্রিয়াটী একটী ত্রৈরাশিক।

এক যুগে অর্থাৎ ৪৩২০০০০ বৎসরে ভচক্র ৬০০ বার লম্বিত হয়, সুতরাং $\frac{৪৩২০০০০}{৬০০}$ বা ৭২০০ বৎসরে ইহা একবার লম্বিত হয়। এই সময়ে অর্থাৎ ৭২০০ বৎসরে অয়নাংশ পূর্ব্ব-পশ্চিমে ২৭ × ৪ বা ১০৮ অংশ গমনাগমন করে।

সুতরাং অয়নাংশের ২৭ অংশ গমনে $\frac{৭২০০}{৪}$ বা ১৮০০ বৎসর লাগে।

ক্রান্তি-বিন্দু নিরয়ণ-বিন্দু হইতে ২৭ অংশ পর্য্যন্ত পূর্ব্ব-পশ্চিমে পরিভ্রমণ করে বলিয়া গ্রন্থকার অভীষ্ট বর্ষ-সংখ্যাকে ১৮০০ দিয়া ভাগ দিতে বলিয়াছেন। ভাগফল যত হইবে, ততবার ক্রান্তি-পাতবিন্দু ও নিরয়ণবিন্দুর মিলন হইবে, সুতরাং ভাগশেষ যাহা থাকিবে, সেই বর্ষ-সংখ্যায় ক্রান্তি-বিন্দু নিরয়ণ-বিন্দু হইতে অপসৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

এক্ষণে ত্রৈরাশিক দ্বারা ঐ বর্ষ-সংখ্যার অয়নাংশ নির্ণীত হইবে।

১৮০০ : অবশিষ্ট বর্ষসংখ্যা : : ২৭ : অভীষ্ট বর্ষের অয়নাংশ।

উদাহরণ। ১৮৪৪ শকাব্দে ১লা বৈশাখের অয়নাংশ।

সৃষ্ট্যাদি গতবর্ষ ১৯৬৯৯২৫০২৩ $= \frac{১৯৬৯৯২৫০২৩}{১৮০০} =$ ১০৯৪৪০২ ভাগশেষ ১৪২৩

সুতরাং অভীষ্ট বর্ষের অয়নাংশ $= \frac{১৪২৩ \times ২৭}{১৮০০} =$ ২১ অংশ ২০ কলা ৪২ বিকলা।

(ঙ) **বসিষ্ঠসিদ্ধান্ত**। এই গ্রন্থে কেবল অয়নাংশ-নিরূপণের সঙ্কেত দেওয়া আছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে (স্ফুটগত্যাধিকারে) ৫৫ম শ্লোকে অয়নাংশ-নিরূপণের উপায় লিখিত আছে,—

অব্দাঃ খখদ্ব্যগৈ ৭২০০ র্ভাজ্যাস্তদ্দোস্ত্রিঘ্না দশোদ্ধৃতাঃ।
অয়নাংশা গ্রহে যুক্তা...

সৃষ্ট্যাদি গতবর্ষ ৭২০০ দ্বারা বিভক্ত করিয়া তাহার অংশাদির ভুজজ্যা তিন গুণ করিয়া ১০ দিয়া ভাগ করিলে অয়নাংশ হইবে। ইহা গ্রহে যুক্ত হইবে।

উদাহরণ। ১৮৪৪ শকাব্দে ১লা বৈশাখের অয়নাংশ সৃষ্ট্যাদি গতবর্ষ ১৯৬৯৯২৫০২৩

$$\frac{১৯৬৯৯২৫০২৩}{৭২০০} = \frac{১৯৬৯৯২৫০২৩ \times ৬০০}{৪৩২০০০০} = \text{২৫১ অংশ ৯ কলা}$$

• ইহার ভুজজ্যা = ২৫১।৯ − ১৮০ = ৭১ অংশ ৯ কলা।

সুতরাং অয়নাংশ $=$ ৭১।৯ $\times \frac{৩}{১০} \frac{(২৭)}{(৯০)} =$ ২১ অংশ ২০ কলা ৪২ বিকলা।

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, ইহার মূলতত্ত্ব ব্রহ্মসিদ্ধান্ত বা সূর্য্যসিদ্ধান্তমতানুযায়ী।

(চ) মহাসিদ্ধান্ত। আর্য্যভটের রচিত মহাসিদ্ধান্তে আমরা দুইটী পৃথক্‌গতির উল্লেখ দেখিতে পাই। প্রথমতঃ মধ্যমাধিকারের ১১ শ্লোকে সপ্তর্ষি-ভগণের উল্লেখ আছে। ইহাতে লিখিত আছে,—

সপ্তর্ষীণাং কুণিধুধিধুধ্বি

এককল্পে সপ্তর্ষিগণের ভগণ ১৫৯৯৯৯৮। দ্বিতীয়তঃ এই শ্লোকে ও তৎপরবর্ত্তী শ্লোকে অয়নগ্রহের ভগণ দেওয়া আছে,—

.........মসিহটমুধাঃ।

অয়নগ্রহস্য

অয়নগ্রহের ভগণ এক কল্পে ৫৭৮১৫৯।

আর্য্যভট দুইটী ভগণই এক কল্পের জন্য স্থির করিয়াছেন।

পুনশ্চ স্পষ্টাধিকারের ১৩ শ্লোকে অয়নাংশ বর্ণিত হইয়াছে—

অয়নগ্রহদোঃ ক্রান্তিজ্যা চাপং কেন্দ্রবদ্ধনর্ন স্যাৎ।

অয়নলবাস্তৎ সংস্কৃতখেটাদায়নচরার্দ্ধপলানি॥

অয়নগ্রহের (অর্থাৎ পূর্ব্বোল্লিখিত অয়নগ্রহ-ভগণের) ভুজজ্যা হইতে ক্রান্তিজ্যা নির্ণয় করিয়া তাহার চাপকে মেষাদি ৬ রাশিতে যুক্ত এবং তুলাদি ৬ রাশিতে বিযুক্ত হইবে। ইহাই অয়নলব অর্থাৎ অয়নাংশ। তৎসংস্কৃত খেট (গ্রহ) হইতে অয়ন (দৃক্‌কর্ম্মাদি) ও চরার্দ্ধপল নির্ণীত হয়।

উদাহরণ। ১৮৪৪ শকাব্দের ১লা বৈশাখের অয়নাংশ। সৃষ্ট্যাদি গতবর্ষ ১৯৬৯৯২৫০২৩।

এককল্পে অয়নগ্রহ-ভগণ ৫৭৮১৫৯

এক কল্পের বর্ষ-সংখ্যা ৪৩২০০০০০০০

সুতরাং ৪৩২০০০০০০০ : ১৯৬৯৯২৫০২৩ : : ৫৭৮১৫৯ : অভীষ্ট বর্ষ-সংখ্যায় অয়নগ্রহ ভগণাদি

$$\text{অভীষ্ট বর্ষসংখ্যায় অয়নগ্রহ ভগনাদি} = \frac{১৯৬৯৯২৫০২৩ \times ৫৭৮১৫৯}{৪৩২০০০০০০০}$$

$$= \frac{১১৩৮৯২৯৮৮১৩৭২৬৫৭}{৪৩২০০০০০০০}$$

$$= ২৭৩৬৪১।৬৩ \text{ অংশ } ২৬ \text{ কলা } ৫১\cdot৮ \text{ বিকলা}$$

বৃত্তের প্রথম পাদে থাকায় ৬৩ অংশ ২৬ কলা ৫১·৮ বিকলা ইহাই ভুজজ্যা।

৬৩ অংশ ২৬ কলা ৫১·৮ বিকলা = ৩৮০৬৮·৬ কলা

৩৮০৬·৮৬ কলার চাপ = ৩০৭৫·৪৬

পরমক্রান্তিজ্যার চাপ = ১৩৯৭

$$\text{অয়নগ্রহের ক্রান্তিজ্যার চাপ} = \frac{(৩০৭৫\cdot৪৬) \times ১৩৯৭}{৩৪৩৮}$$

$$= ১২২০\cdot৫৯৮ \text{ চাপ}$$

ইহার ধনু = ২২ অংশ ১ কলা ১২·৪৮ বিকলা

= অয়নাংশ (যুক্ত)।

এ স্থলে মহাসিদ্ধান্ত-সম্বন্ধে দুইটী বক্তব্য আছে। প্রথমতঃ, সপ্তর্ষি-ভগণের এক কল্পে যে সংখ্যা উল্লিখিত আছে, তাহাতে ভ্রম-প্রমাদ দৃষ্ট হয়, লিপি-প্রমাদবশতঃ ইহা ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়। সংখ্যাটী ৬টী অঙ্কবিশিষ্ট হইবে এবং সম্ভবতঃ ইহা ১৫৯৯৯৮ হইবে। এ বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করিব।

দ্বিতীয়তঃ, মহাসিদ্ধান্তের টীকায় মহামহোপাধ্যায় সুধাকর দ্বিবেদী অয়নগ্রহ-সম্বন্ধে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তৎপ্রকাশিত মহাসিদ্ধান্তের বিষয় বর্ণনার ৪ পৃষ্ঠা এবং contents এর ৩ পৃষ্ঠায় তিনি অয়নগ্রহ হইতে বাৎসরিক অয়নাংশ ১৭৩'৪৪৭৭ বিকলা স্থির করিতে চাহেন। তিনি লিখিয়াছেন—

এককল্পে অয়নগ্রহের ভগণ-সংখ্যা ৫৭৮১৫৯ × ১২৯৬০০০ বিকলা (অর্থাৎ ৩৬০ অংশের বিকলা-সংখ্যা); এবং এক কল্পের সৌর-বর্ষসংখ্যা দিয়া ঐ রাশিকে বিভক্ত করিলে এক সৌর বর্ষে অয়নগ্রহ চলন

$$=\frac{৫৭৮১৫৯ \times ১২৯৬০০০}{৪৩২০০০০০০০} \text{ বা ১৭৩'৪৪৭৭ বিকলা।}$$

ইহাকে তিনি এক সৌরবর্ষের অয়নাংশ বলিয়া স্বীকার করিতে চান। কিন্তু আর্য্যভটের মতে অয়ন-গ্রহের ৩৬০ অংশ-ভ্রমণে অয়নাংশের গমনাগমন ২৪ × ৪ = ৯৬ অংশ মাত্র হইবে। সুতরাং বার্ষিক অয়নাংশ =

$$\frac{১৭৩'৪৪৭৭ \times ৯৬}{৩৬০} = ৪৬'২৫২৭ \text{ বিকলা}$$

আমরা পরে ইহার যথার্থতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব।

(ছ) সিদ্ধান্তশিরোমণি। ভাস্করাচার্য্যের সিদ্ধান্তশিরোমণির গোলাধ্যায়ে ১৭ এবং ১৮ শ্লোকে অয়নাংশ সম্বন্ধে ইহা লিখিত আছে—

বিষুবৎক্রান্তিবলয়োঃ সম্পাতঃ ক্রান্তিপাতঃ স্যাৎ।
তদ্ভগণাঃ সৌরোক্তা ব্যস্তা অযুতত্রয়ং কল্পে॥
অয়নচলনং যদুক্তং মুঞ্জালাদ্যৈঃ স এবায়ং।
তৎপক্ষে ভগণাঃ কল্পে গোঙ্গর্ত্তুনন্দগোচন্দ্রাঃ॥

বিষুবরেখা ও ক্রান্তি-বৃত্তের সম্পাতে ক্রান্তিপাত হয়। সূর্য্যসিদ্ধান্তমতে ক্রান্তিপাতের ভগণ বিপরীত-গতিতে এক কল্পে তিন অযুত। মুঞ্জাল প্রভৃতি জ্যোতির্বিদগণ তাহাকে অয়নচলন বলিয়াছেন। তাঁহাদের মতে এককল্পে ক্রান্তিপাত-ভগণ ১৯৯৬৬৯।

*পণ্ডিত শ্রীরাধাবল্লভ স্মৃতি-ব্যাকরণ-জ্যোতিস্তীর্থ মহাশয়ের সঙ্কলিত সিদ্ধান্ত-শিরোমণির গোলাধ্যায়ের ১৪৭ পৃষ্ঠায় মুঞ্জালের অভিমত উদ্ধৃত হইয়াছে।

উত্তরতো যাম্যদিশং যাম্যান্ততদনুসৌম্যদিগ্‌ভাগং।
পরিসরতাং গগনসদাং চলনং কিঞ্চিদ্ ভবেদপমে॥

(চ) মহাসিদ্ধান্ত। আর্য্যভটের রচিত মহাসিদ্ধান্তে আমরা দুইটী পৃথক্‌গতির উল্লেখ দেখিতে পাই। প্রথমতঃ মধ্যমাধিকারের ১১ শ্লোকে সপ্তর্ষি-ভগণের উল্লেখ আছে। ইহাতে লিখিত আছে,—

সপ্তর্ষীণাং কুণিধুধিধুধ্বিজা

এককল্পে সপ্তর্ষিগণের ভগণ ১৫৯৯৯৯৮। দ্বিতীয়তঃ এই শ্লোকে ও তৎপরবর্ত্তী শ্লোকে অয়নগ্রহের ভগণ দেওয়া আছে,—

.........মসিহটমুধাঃ।

অয়নগ্রহস্য

অয়নগ্রহের ভগণ এক কল্পে ৫৭৮১৫৯।

আর্য্যভট দুইটী ভগণই এক কল্পের জন্য স্থির করিয়াছেন।

পুনশ্চ স্পষ্টাধিকারের ১৩ শ্লোকে অয়নাংশ বর্ণিত হইয়াছে—

অয়নগ্রহদোঃ ক্রান্তিজ্যা চাপং কেন্দ্রবদ্ধনর্ণ স্যাৎ।

অয়নলবাস্তৎ সংস্কৃতখেটাদায়নচরার্দ্ধপলানি॥

অয়নগ্রহের (অর্থাৎ পূর্ব্বোল্লিখিত অয়নগ্রহ-ভগণের) ভুজজ্যা হইতে ক্রান্তিজ্যা নির্ণয় করিয়া তাহার চাপকে মেষাদি ৬ রাশিতে যুক্ত এবং তুলাদি ৬ রাশিতে বিযুক্ত হইবে। ইহাই অয়নলব অর্থাৎ অয়নাংশ। তৎসংস্কৃত খেট (গ্রহ) হইতে অয়ন (দৃক্‌কর্ম্মাদি) ও চরার্দ্ধপল নির্ণীত হয়।

উদাহরণ। ১৮৪৪ শকাব্দের ১লা বৈশাখের অয়নাংশ। সৃষ্ট্যাদি গতবর্ষ ১৯৬৯৯২৫০২৩।

এককল্পে অয়নগ্রহ-ভগণ ৫৭৮১৫৯

এক কল্পের বর্ষ-সংখ্যা ৪৩২০০০০০০০

সুতরাং ৪৩২০০০০০০০ : ১৯৬৯৯২৫০২৩ : : ৫৭৮১৫৯ : অভীষ্ট বর্ষ-সংখ্যায় অয়নগ্রহ ভগণাদি

$$\text{অভীষ্ট বর্ষসংখ্যায় অয়নগ্রহ ভগনাদি} = \frac{১৯৬৯৯২৫০২৩ \times ৫৭৮১৫৯}{৪৩২০০০০০০০}$$

$$= \frac{১১৩৮৯২৯৮৮১৩৭২৬৫৭}{৪৩২০০০০০০০}$$

$$= ২৭৩৬৪১।৬৩ \text{ অংশ } ২৬ \text{ কলা } ৫১\cdot৮ \text{ বিকলা}$$

বৃত্তের প্রথম পাদে থাকায় ৬৩ অংশ ২৬ কলা ৫১·৮ বিকলা ইহাই ভুজজ্যা।

৬৩ অংশ ২৬ কলা ৫১·৮ বিকলা = ৩৮০৬·৮৬ কলা

৩৮০৬·৮৬ কলার চাপ = ৩০৭৫·৪৬

পরমক্রান্তিজ্যার চাপ = ১৩৯৭

$$\text{অয়নগ্রহের ক্রান্তিজ্যার চাপ} = \frac{(৩০৭৫\cdot৪৬) \times ১৩৯৭}{৩৪৩৮}$$

$$= ১২২০\cdot৫৯৮ \text{ চাপ}$$

ইহার ধনু = ২২ অংশ ১ কলা ১২·৪৮ বিকলা

= অয়নাংশ (যুক্ত)।

এ স্থলে মহাসিদ্ধান্ত-সম্বন্ধে দুইটী বক্তব্য আছে। প্রথমতঃ, সপ্তর্ষি-ভগণের এক কল্পে যে সংখ্যা উল্লিখিত আছে, তাহাতে ভ্রম-প্রমাদ দৃষ্ট হয়, লিপি-প্রমাদবশতঃ ইহা ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়। সংখ্যাটী ৬টী অঙ্কবিশিষ্ট হইবে এবং সম্ভবতঃ ইহা ১৫৯৯৯৮ হইবে। এ বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করিব।

দ্বিতীয়তঃ, মহাসিদ্ধান্তের টীকায় মহামহোপাধ্যায় সুধাকর দ্বিবেদী অয়নগ্রহ-সম্বন্ধে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তৎপ্রকাশিত মহাসিদ্ধান্তের বিষয় বর্ণনায় ৪ পৃষ্ঠা এবং contents এর ৩ পৃষ্ঠায় তিনি অয়নগ্রহ হইতে বাৎসরিক অয়নাংশ ১৭৩.৪৪৭৭ বিকলা স্থির করিতে চাহেন। তিনি লিখিয়াছেন—

এককল্পে অয়নগ্রহের ভগণ-সংখ্যা ৫৭৮১৫৯ × ১২৯৬০০০ বিকলা (অর্থাৎ ৩৬০ অংশের বিকলা-সংখ্যা); এবং এক কল্পের সৌর-বর্ষসংখ্যা দিয়া ঐ রাশিকে বিভক্ত করিলে এক সৌর বর্ষে অয়নগ্রহ চলন

$$=\frac{৫৭৮১৫৯ \times ১২৯৬০০০}{৪৩২০০০০০০০} \text{ বা } ১৭৩.৪৪৭৭ \text{ বিকলা।}$$

ইহাকে তিনি এক সৌরবর্ষের অয়নাংশ বলিয়া স্বীকার করিতে চান। কিন্তু আর্য্যভটের মতে অয়ন-গ্রহের ৩৬০ অংশ-ভ্রমণে অয়নাংশের গমনাগমন ২৪ × ৪ = ৯৬ অংশ মাত্র হইবে। সুতরাং বার্ষিক অয়নাংশ =

$$\frac{১৭৩.৪৪৭৭ \times ৯৬}{৩৬০} = ৪৬.২৫২৭ \text{ বিকলা}$$

আমরা পরে ইহার যথার্থতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব।

(ছ) **সিদ্ধান্তশিরোমণি**। ভাস্করাচার্য্যের সিদ্ধান্তশিরোমণির গোলাধ্যায়ে ১৭ এবং ১৮ শ্লোকে অয়নাংশ সম্বন্ধে ইহা লিখিত আছে—

বিষুবৎক্রান্তিবলয়োঃ সম্পাতঃ ক্রান্তিপাতঃ স্যাৎ।
তদ্ভগণাঃ সৌরোক্তা ব্যস্তা অযুতত্রয়ং কল্পে॥
অয়নচলনং যদুক্তং মুঞ্জালাদ্যৈঃ স এবায়ং।
তৎপক্ষে ভগণাঃ কল্পে গোহঙ্গর্ত্তুনন্দগোচন্দ্রাঃ॥

বিষুবরেখা ও ক্রান্তি-বৃত্তের সম্পাতে ক্রান্তিপাত হয়। সূর্য্যসিদ্ধান্তমতে ক্রান্তিপাতের ভগণ বিপরীত-গতিতে এক কল্পে তিন অযুত। মুঞ্জাল প্রভৃতি জ্যোতির্বিগণ তাহাকে অয়নচলন বলিয়াছেন। তাঁহাদের মতে এককল্পে ক্রান্তিপাত-ভগণ ১৯৯৬৬৯।

*পণ্ডিত শ্রীরাধাবল্লভ স্মৃতি-ব্যাকরণ-জ্যোতিস্তীর্থ মহাশয়ের সঙ্কলিত সিদ্ধান্ত-শিরোমণির গোলাধ্যায়ের ১৪৭ পৃষ্ঠায় মুঞ্জালের অভিমত উদ্ধৃত হইয়াছে।

উত্তরতো যাম্যদিশং যাম্যান্তাত্তদনুসৌম্যদিগ্ভাগং।
পরিসরতাং গগনসদাং চলনং কিঞ্চিদ্ভবেদপমে॥

বিষুবদপক্রম-মণ্ডল-সম্পাতে প্রাচিমেষাদিঃ।
পশ্চাত্তুলাদিরনয়োরপক্রমাসম্ভবঃ প্রোক্তঃ॥
রাশিত্রয়ান্তরেঽস্মাৎ কর্কাদিরমুক্রমান্মৃগাদিশ্চ।
তত্র চ পরমাক্রান্তি জিন-ভাগ-মিতার্থ তত্রৈব॥
নির্দ্দিষ্টোঽয়নসন্ধিশ্চলনং তত্রৈব সম্ভবতি।
তদ্ভগণাঃ কল্পে স্যুর্গোরস-রস-গোঽঙ্ক-চন্দ্র-মিতাঃ॥

উত্তর হইতে দক্ষিণে এবং দক্ষিণ হইতে উত্তরে গগনে বিদ্যমান ক্রান্তি চলিতে চলিতে কিঞ্চিৎ সরিয়া যাইতেছে। বিষুবদ্‌বৃত্ত ও ক্রান্তিবৃত্তের সম্পাতের পূর্ব্বদিকে মেষাদি এবং পশ্চিমদিকে তুলাদি রাশি ক্রান্তিবৃত্তে অবস্থিত। ক্রান্তিপাত হইতে তিন রাশি অন্তরে যথাক্রমে কর্কটাদি ও মকরাদিতে পরমক্রান্তি অবস্থিত। তাহাই অয়নসন্ধি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট এবং সেই স্থান হইতে অয়ন-চলনের আরম্ভ। এককল্পে তাহার ভগণ ১৯৯৬৬৯। এসম্বন্ধে আমরা আবার আলোচনা করিব।

২। এক্ষণে উল্লিখিত সিদ্ধান্তগ্রন্থগুলিতে অয়নাংশ-নিরূপণের মূলতত্ত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক।

(ক) প্রথমতঃ, সোমসিদ্ধান্ত, ব্রহ্মসিদ্ধান্ত, সূর্য্যসিদ্ধান্ত, বৃদ্ধবসিষ্ঠসিদ্ধান্ত এবং বসিষ্ঠসিদ্ধান্তের মূলতত্ত্ব একপ্রকার। আমরা দেখিতে পাই যে, (১) অয়নগ্রহ (বা ভচক্র) এক মহাযুগে ৬০০ বার পূর্ব্বদিকে চালিত (ঘূর্ণিত হয়), (২) তৎসঙ্গে ক্রান্তিপাতবিন্দু নিরয়ণবিন্দু হইতে কয়েক অংশ (৩০ বা ২৭) সরিয়া গিয়া আবার নিরয়ণবিন্দুতে আগমন করতঃ অপর দিকে ঐ কয়েক অংশ (৩০ বা ২৭) পর্য্যন্ত সরিয়া গিয়া আবার পশ্চাৎপদ হইয়া নিরয়ণ-বিন্দুর সহিত মিলিত হয়। এসম্বন্ধে আবার দুইমত দেখা যায়—(১) সোমসিদ্ধান্তের এবং (২) অন্যান্য সিদ্ধান্ত-গ্রন্থগুলির মত। (১) সোমসিদ্ধান্ত-মতে ক্রান্তিপাত-বিন্দু নিরয়ণ-বিন্দুর উভয়দিকে ৩০ অংশ পর্য্যন্ত চালিত হয় এবং অয়নগ্রহের একবার পূর্ণপরিবর্ত্তনে (৩৬০ অংশ) ক্রান্তিপাতবিন্দু মোট ৩০ × ৪ বা ১২০ অংশ গমনাগমন করে।

ধরা যাউক, নিরয়ণ-বিন্দু হইতে অয়নগ্রহ ও ক্রান্তিপাতবিন্দু চালিত হইল। অয়নগ্রহ যখন ৯০ অংশে (অর্থাৎ প্রথম পাদের শেষে) উপস্থিত হইল, তখন ক্রান্তিপাতবিন্দু নিরয়ণ-বিন্দু হইতে ৩০ অংশ সরিয়া আসিয়াছে। অয়নগ্রহ চলিতে চলিতে ১৮০ অংশে উপস্থিত হইলে, ক্রান্তিপাতবিন্দু পশ্চাৎপদ হইয়া নিরয়ণ-বিন্দুর সহিত মিলিত হইল। অয়নগ্রহ যখন ২৭০ অংশে আসিয়া পড়িল, ক্রান্তিপাতবিন্দু তখন নিরয়ণ-বিন্দুর অপরদিকে চালিত হইয়া তাহা হইতে ৩০-অংশ দূরে উপস্থিত হইল। অবশেষে যখন অয়নগ্রহ ৩৬০ অংশে অর্থাৎ আদ্য-স্থানে আসিয়া নিরয়ণ-বিন্দুর সহিত মিলিত হইল; ক্রান্তিপাতবিন্দুও পশ্চাদ্‌গতিতে উহাদের সহিত একত্র হইল।

সুতরাং কোন নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক বর্ষের অয়নাংশ নির্ণয় করিতে হইলে নিম্নলিখিত প্রণালীতে উহা সাধিত হয়। (১) অভীষ্ট-বর্ষে অয়নগ্রহের ঘূর্ণন-সংখ্যা নির্ণয় করিতে হইবে। অয়নগ্রহের পূর্ণপরিবর্ত্তনে অয়নাংশ শূন্য হয় বলিয়া পূর্ণপরিবর্ত্তনের পর যে অংশকলাদি অবশিষ্ট থাকে

তাহা হইতেই অয়নাংশ নির্ণীত হয়। এক মহাযুগে অয়নগ্রহ চলন ৬০০ বার হয়, সুতরাং ত্রৈরাশিক দ্বারা অভীষ্ট-বর্ষসংখ্যায় অয়নগ্রহ চলন নির্ণীত হয়। (২) অবশিষ্ট অংশকলাদির ভুজ-সংস্কার করিতে হইবে। এক্ষণে ইহার আবশ্যকতা দেখা যাউক। অয়নগ্রহ যখন ৯০ অংশে আসিল, ক্রান্তিপাতবিন্দু ৩০ অংশে আসিয়া পৌঁছিল। প্রথম পাদে অবস্থিতির দরুণ নিরায়ণ-বিন্দু হইতে উভয়ের দূরত্ব নির্দ্দিষ্ট হয়, সুতরাং অয়নগ্রহ যতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহাই তাহার ভুজজ্যা, এস্থলে অয়নগ্রহের দূরত্ব নির্ণয় করা সহজসাধ্য। অয়নগ্রহ যখন ৯০ অংশ হইতে দ্বিতীয়পাদে গমন করিবে, তখন তাহার সঙ্গে ক্রান্তিবিন্দু পশ্চাৎপদ হইয়া নিরয়ণ-বিন্দুর দিকে অপসৃত হইতে থাকিবে, এক্ষণে নিরয়ণ-বিন্দু হইতে অয়নগ্রহের দূরত্ব (অয়নাংশসম্বন্ধে) লইতে হইলে ১৮০ অংশ হইতে তাহার স্থানের দূরত্ব পশ্চাদ্‌গণনায় তাহার ভুজজ্যা গ্রহণ করিতে হইবে, এইরূপে তৃতীয়পাদে প্রথমের মত এবং চতুর্থপাদে দ্বিতীয়ের মত ভুজজ্যা নির্ণীত হইবে। (৩) অয়নগ্রহের অবশিষ্ট অংশাদির ভুজজ্যা হইতে ত্রৈরাশিক দ্বারা অয়নাংশ নির্ণীত হইবে। কারণ, আমরা দেখিয়াছি যে, অয়নগ্রহের ৯০ অংশ গতিতে অয়নাংশের ৩০ অংশ গতি হয়।

৯০ : ৩০ : : অয়নগ্রহের অংশাদির ভুজজ্যা : অয়নাংশ।

(২) ব্রহ্মসিদ্ধান্ত, সূর্য্যসিদ্ধান্ত, বসিষ্ঠসিদ্ধান্ত ও বৃদ্ধবসিষ্ঠ-সিদ্ধান্তের মত এক প্রকার। তাহাদের মত সোমসিদ্ধান্তমতানুযায়ী, তবে এই প্রভেদ যে, তাহাদের মতে অয়নগ্রহের ৯০ অংশ চালনে ক্রান্তিপাত-বিন্দু ২৭ অংশ চালিত হয়। আধুনিক পাশ্চাত্য জ্যোতিষের মতে ইহা মোটামুটি ২৬ অংশ ৩০ কলা।

(খ) দ্বিতীয়তঃ, আর্য্যভটের মত উল্লিখিত সিদ্ধান্তজ্যোতিষগ্রন্থগুলির মত হইতে কয়েক বিষয়ে ভিন্ন। (১) আমরা মহাসিদ্ধান্তে সপ্তর্ষি-ভগণের উল্লেখ দেখি। সপ্তর্ষি-নক্ষত্রপুঞ্জের ধ্রুবতারার চতুর্দ্দিকে একবার পূর্ণ পরিবর্ত্তনকে সপ্তর্ষি-ভগণ কহে, এক কল্পে তাহা ১৫৯৯৯৯৮ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং আর্য্যভটের মতে ২৭০০ বৎসরে এক সপ্তর্ষি-ভগণ হয় ইহাই আধুনিক পাশ্চাত্য জ্যোতিষের মতে Precessional period ; আধুনিক মতে ইহা ২৫৮৬৮ বৎসর। ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, লিপিপ্রমাদবশতঃ ২৭০০০ বৎসর ২৭০০ বৎসরে পরিণত হইয়াছে ২৭০০০ বৎসর হিসাবে ইহার বাৎসরিক গতি ৪৮ বিকলা হয়। সম্ভবতঃ ১৫৯৯৯৯৮ স্থলে ১৫৯৯৯৮ হইবে। (২) আর্য্যভটের মতে অয়নাংশ-নিরূপণ এক্ষণে আলোচনা করা যাউক। প্রথমতঃ, তাঁহার মতে অয়নগ্রহ ভগণ এককল্পে ৫৭৮১৫৯, অন্যান্য সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষ-গ্রন্থাপেক্ষা হীনতর। দ্বিতীয়তঃ, তিনি ক্রান্তি-পাত-বিন্দুর নিরয়ণ-বিন্দুর উভয় দিকে গমনাগমন না ধরিয়া পরমক্রান্তি-বিন্দুর (Solstitial Point) নিরয়ণ-বিন্দুর উভয় পার্শ্বে গমনাগমন হইতে অয়নাংশ নিরূপণ করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ, তাঁহার মতে অয়নগ্রহের ক্রান্তিজ্যাই অয়নাংশ বলিয়া পরিগণিত হইবে। চতুর্থতঃ, অয়নগ্রহের পূর্ণ ঘূর্ণনে পরমক্রান্তি-বিন্দু নিরয়ণ-বিন্দু হইতে ২৪ অংশ করিয়া উভয় দিকে গমনাগমন করে। যদিও তিনি তাহা স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করেন নাই, তথাপি তাহা সহজেই নির্ণীত হয়। অয়নগ্রহ যেমন সরিতে থাকে,

পরমক্রান্তি-বিন্দুও নিরয়ণ-বিন্দু হইতে সরিতে থাকে। অয়নগ্রহ যখন ৯০ অংশে আসিয়া পড়ে, তখন ইহার ক্রান্তিজ্যা ২৪ অংশ, সুতরাং ইহাই অয়নাংশ। অয়নগ্রহ দ্বিতীয় পাদে উপস্থিত হইলে, অয়নগ্রহের ভুজজ্যা ক্রমশঃ কমিতে থাকিবে বলিয়া তাহার ক্রান্তিজ্যাও কমিতে থাকিবে এবং পরমক্রান্তি আবার নিরয়ণ-বিন্দুর দিকে ধাবিত হইবে। অয়নগ্রহ ১৮০ অংশে থাকিলে, পরমক্রান্তি নিরয়ণ-বিন্দুর সহিত মিলিত হইবে। অয়নগ্রহ তৃতীয় পাদে উপনীত হইলে, প্রথম পাদের ন্যায় পরমক্রান্তি নিরয়ণ-বিন্দু হইতে সরিতে থাকিবে (তবে অপর দিকে) এবং অয়নগ্রহ ২৭০ অংশে আসিলে পরমক্রান্তি নিরয়ণ-বিন্দু হইতে আবার ২৪ অংশ দূরে আসিয়া পড়িবে। অয়নগ্রহ চতুর্থ পাদে আসিলে পরমক্রান্তি-বিন্দু পশ্চাৎপদ হইয়া নিরয়ণ-বিন্দুর দিকে ধাবিত হইবে, এবং অবশেষে অয়নগ্রহ ও পরমক্রান্তি-বিন্দু নিরয়ণ-বিন্দুর সহিত মিলিত হইবে। আধুনিক পাশ্চাত্য জ্যোতিষ-মতে ইহা ২৪ অংশ ৩০ কলা। পঞ্চমতঃ, অয়নগ্রহের ক্রান্তিজ্যার পরিমিত অয়নাংশ নির্দ্ধারিত হয় বলিয়া দেখা যাইতেছে যে, অয়নগ্রহের চলনের হার (rate) একরূপ হইলেও, অয়নাংশের গতির হার সমরূপ হইবে না। যেমন অয়নগ্রহ প্রতি বৎসর সমহারে চালিত হইতে থাকে, অয়নাংশের গতি কিন্তু প্রতি বৎসর বিভিন্ন হইতে থাকিবে। পর পর কয়েক বৎসরের অয়নাংশ নির্ণয় করিলেই, তাহা প্রতীয়মান হইবে।

(গ) তৃতীয়তঃ, মুঞ্জাল ও ভাস্করের অয়নাংশ একেবারে অন্যান্য গ্রন্থকারের অয়নাংশ হইতে ভিন্ন। মুঞ্জালের মতে এককল্পে ক্রান্তিপাত-ভগণ ১৯৯৬৬৯ অর্থাৎ এক ক্রান্তিপাত-ভগণে ২১৬৩৬ বৎসর লাগে এবং এক বৎসরে তাহার গতি ৫৯·৯ বিকলা। ইহা কিন্তু অয়নগ্রহ নহে—পাশ্চাত্য জ্যোতিষের precessional period নহে, তাহা আর্য্যভটের মতে ২৭০০০ বৎসর। পাশ্চাত্য মতে precessional period (অয়নাংশ) ২৫৮০০ বৎসর এবং বৎসরে তাহার গতি ৫০·২ বিকলা ? পাশ্চাত্য জ্যোতিষিগণের মতে ইহার হার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। নিউকোম্ব সাহেবের মতে বাৎসরিক হার

= ৫০·২৫৮ বিকলা + ০·০০০ ২২২ (খ্রীষ্টাব্দ—১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ)।

সুতরাং ভাস্করের সময় ও তাহার পূর্ব্বে ইহার বাৎসরিক গতি ৫০·২ বিকলা অপেক্ষাও কম ছিল, ২৭০০০ বৎসর হিসাবে তাহার গতি ৪৮ বিকলা হয়, সুতরাং মুঞ্জালের ক্রান্তিপাত-ভগণ precessional period বলিয়া গ্রহণ করিবার বিশেষ বাধা আছে। আমরা পরে দেখিব যে, ক্রান্তি-পাত-বিন্দু যেমন পশ্চিম দিকে চালিত হইতেছে, তৎসঙ্গে মন্দোচ্চ (aphelion) পূর্ব্বদিকে চালিত হইতেছে এবং ইহার বাৎসরিক গতি গড়ে ১১·৮ বিকলা। দুই গতি যোগ করিলে ৬২ বিকলা হয়, সুতরাং ক্রান্তিপাত-বিন্দু হইতে ধরিলে মন্দোচ্চের গতি অথবা মন্দোচ্চ হইতে ধরিলে ক্রান্তি-পাত-বিন্দুর বার্ষিক গতি মোটামুটি ১কলা হইবে এবং ইহাই মুঞ্জালের ক্রান্তিপাত-ভগণের বার্ষিক গতি বলিয়া মনে হয়। পাশ্চাত্য মতে ক্রান্তিপাত-ভগণ মোটামুটি ২০৯৮৬ বৎসর। সুতরাং দেখা গেল যে, মুঞ্জালের ক্রান্তিপাত-ভগণ পাশ্চাত্য জ্যোতিষের মন্দোচ্চ বিন্দু হইতে ক্রান্তিপাত-বিন্দুর রাশিচক্রে সম্পূর্ণ ভ্রমণ (অর্থাৎ মন্দোচ্চ-বিন্দু হইতে অপসৃত হইয়া তাহার সহিত পুনর্ম্মিলন)।

৩। এক্ষণে আধুনিক পাশ্চাত্য জ্যোতিষের সাহায্যে আমাদের অয়নাংশের মূলতত্ত্ব উদ্ঘাটন করা যাউক। আবশ্যক বোধে অয়নাংশ-সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আধুনিক পাশ্চাত্য জ্যোতিষ-সম্বন্ধে কিছু সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয় সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

কৃষ্ণপক্ষে কোন মেঘশূন্য রজনীতে তারকাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিলে, আমরা দেখিতে পাই যে, তারকাগুলি একত্রে পরস্পরের সম্বন্ধে স্থান পরিবর্ত্তন না করিয়া আকাশমার্গে পরিভ্রমণ করিতেছে তন্মধ্যে কতকগুলি পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া পশ্চিমে অস্ত যাইতেছে, আবার কতকগুলি ধ্রুববিন্দুর (North Pole) চারিদিকে বৃত্তাকারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; তাহারা প্রকৃতপক্ষে অস্তগত না হইলেও, দিবসে সূর্য্যের আলোকে অদৃশ্য থাকে। এই তারকাপুঞ্জের সম্পূর্ণ ঘূর্ণনে (অর্থাৎ একস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া আবার সেই স্থানে আসিতে) প্রায় একদিন ও এক রাত্রি অতিবাহিত হয়। যে সময়ে কোন একটী তারকার সম্পূর্ণ ঘূর্ণন সাধিত হয়, সেই সময় নাক্ষত্র-দিন নামে অভিহিত। আমাদের ঘটিকাযন্ত্রে নির্ণীত সময় হিসাবে এক নাক্ষত্র-দিনের পরিমাণ ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেণ্ড। গোলাকার পৃথিবীর নিজ অক্ষদণ্ডের চতুর্দ্দিকে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে ঘূর্ণনের জন্য আমরা পৃথিবীর উপর হইতে আকাশমার্গস্থ তারকাগুলিকে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে ঘুরিতে দেখি, বাস্তবিক তাহারা আমাদের সম্পর্কে নিশ্চল। পৃথিবীর কাল্পনিক অক্ষদণ্ড (axis of rotation) উভয়দিকে বর্দ্ধিত করিয়া দিলে, যে দুই স্থলে তাহা আকাশ-মার্গ ভেদ করিবে, তাহা উত্তর ও দক্ষিণ ধ্রুববিন্দু। আমরা পৃথিবীর উত্তর গোলার্দ্ধে বাস করি, এজন্য কেবল উত্তর ধ্রুবটী দেখিতে পাই; যাঁহারা দক্ষিণ গোলার্দ্ধে বাস করেন, তাঁহারা দক্ষিণ ধ্রুবটী দেখিতে পান; আর যাঁহারা বিষুবরেখার উপর বাস করেন, তাঁহারা দুইটী ধ্রুবই ক্ষিতিজ রেখায় দেখিবেন। আমরা উত্তর ধ্রুবের চারিদিকে তারকাগুলি ঘুরিতে দেখি।

পৃথিবীর তলদেশস্থ যে কোন স্থান হইতে আকাশ গোলার্দ্ধের ন্যায় দেখায় এবং পৃথিবীর ঐ স্থানটী তাহার কেন্দ্রস্বরূপ মনে করা যায়। এইরূপে আমরা পৃথিবীর চতুর্দ্দিকস্থ আকাশ একটী বৃহৎ গোলকরূপে মনে করিতে পারি এবং পৃথিবীকে তাহার কেন্দ্রস্থ বলিতে পারি। এই আকাশ-গোলকে আমরা উত্তর ও দক্ষিণ ধ্রুব (পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর সমরেখায়) স্থির করি এবং ঐ উভয় ধ্রুবের সমদূরে আকাশমার্গে একটী বৃত্ত অঙ্কিত করা হয়, যাহার নাম বিষুবন্মণ্ডল (Equinoctial or Celestial Equator)। পৃথিবীর বিষুবদ্বৃত্তের সমতল আকাশমার্গে বর্দ্ধিত করিলে, তাহা বিষুবন্মণ্ডলের সহিত মিলিত হইবে। আবার দুই ধ্রুবের মধ্য দিয়া আকাশ-মার্গে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত বহু বৃত্ত কল্পনা করা হয়, তাহাদের নাম ঘটিকা-বৃত্ত (Hour circle)। আমরা আকাশগোলকে ঐরূপ ২৪ বৃত্ত কল্পনা করি; প্রত্যেকে এক এক ঘণ্টা অন্তরে থাকে। পৃথিবীর তলদেশস্থ কোন স্থানের যাম্যোত্তর বৃত্তের (meridian) সমতল আকাশমার্গে বর্দ্ধিত করিয়া দিলে, তাহা যে স্থলে মিলিত হইবে, তাহাও বৃত্তাকার; এই বৃত্তের নাম আন্তরীক্ষ যাম্যোত্তর বৃত্ত (Celestial meridian)। কোন স্থানের শীর্ষদেশে যদি ঘটিকাবৃত্ত থাকে, তাহা তখন আন্তরীক্ষ যাম্যোত্তর বৃত্তের সহিত মিলিত হইয়া যায়।

একণে সূর্য্য-সম্বন্ধে কিছু জানা আবশ্যক। আমরা দেখি, সূর্য্য প্রতিদিন তারকাবলীর মত পূর্ব্বে উদিত হইয়া পশ্চিমে অস্ত যাইতেছে, আবার পরদিন প্রাতে উদিত হইতেছে। কিন্তু সূর্য্যের ও নক্ষত্রগণের গতির মধ্যে কিছু প্রভেদ আছে। আমরা যদি সন্ধ্যার পর এমন কয়েকটী তারকা দেখিয়া রাখি, যাহারা সূর্য্য অস্ত যাইবার কিছুক্ষণ পরে অস্ত যায় এবং যদি সেগুলিকে প্রতিদিন লক্ষ্য করিয়া যাই, আমরা দেখিব যে, তাহারা ক্রমশঃ আরও শীঘ্র অস্ত যাইতেছে এবং অবশেষে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই অস্ত যাইতেছে এবং সন্ধ্যার সময় অদৃশ্য হইয়া যায়। কিছুকাল পর দেখিব যে, সেগুলি প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই উদিত হইতেছে এবং নিশ্চয় সূর্য্যাস্তের বহু পূর্ব্বেই অস্ত যাইতেছে। এইরূপে ৩৬৫ দিবস গত হইলে, আমরা আবার সন্ধ্যার পর ঠিক সেই সময়ে ঐ তারকাগুলি দেখিতে পাইব। ইহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, যদিও সূর্য্য ও তারকাগুলি প্রতিদিন উদিত ও অস্তমিত হইতেছে, তারকাগুলি প্রথমতঃ সূর্য্যের সহিত উদিত ও অস্তমিত হইয়া ক্রমশঃ অগ্রে উদিত ও অস্তমিত হইতে হইতে বৎসরান্তে (৩৬৫ দিনে) আবার একসঙ্গে উদিত ও অস্তমিত হয়। তারকাগুলি অগ্রগামী হয় এবং সূর্য্য পশ্চাৎপদ হইয়া পড়ে সুতরাং আমরা সূর্য্যের দ্বিবিধ গতি বলিতে পারি—(১) তারকাদিগের সহিত পূর্ব্ব-পশ্চিমে গতি (ঘূর্ণন) এবং (২) ক্রমশঃ পশ্চাৎপদ হওয়ায়, পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে আকাশমার্গ বেষ্টন করিয়া পুনরায় সেই তারকাপুঞ্জের সহিত মিলনের জন্য গতি। সূর্য্যের তারকাদের সহিত পূর্ব্ব-পশ্চিমে একদিনের গতি গড়ে ২৪ ঘণ্টায় সাধিত হয় অর্থাৎ নক্ষত্রদের তুলনায় সূর্য্যের গতিতে ৪ মিনিট সময় বেশী লাগে—অর্থাৎ সূর্য্য প্রতিদিন ৪ মিনিট করিয়া পিছাইয়া পড়িতেছে। পৃথিবীর নিজ অক্ষদণ্ডের চতুর্দ্দিকে বর্ত্তনবশতঃ আমরা তারকাপুঞ্জের ন্যায় সূর্য্যের পূর্ব্বপশ্চিমে দৈনিক গতি দেখিতে পাই ; বাস্তবিক পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ-সম্পর্কে সূর্য্য নিশ্চল। সূর্য্যের দ্বিতীয় গতির পথ অর্থাৎ সূর্য্য আকাশমার্গে যে বৃত্তাকার পথ অবলম্বন করিয়া বৎসরে একবার পশ্চাদ্‌গতিতে ঘুরিয়া আসিতেছে, সে কক্ষার নাম ক্রান্তিবৃত্ত (ecliptic)। ক্রান্তিবৃত্তের উভয় পার্শ্বে প্রায় ৮ অংশ-পরিমিত স্থানের তারকাপুঞ্জ লইয়া আমাদের রাশিচক্র। ক্রান্তিবৃত্ত ও বিষুবন্মণ্ডল সমান্তরাল নহে এবং উভয়ে দুই বিপরীত স্থানে ছেদিত হয়। এই মিলনস্থান-দ্বয়কে ক্রান্তিপাত (Equinoctial points) কহে। যে ক্রান্তিপাত হইতে সূর্য্য বিষুব-মণ্ডলের দক্ষিণ হইতে উত্তরদিকে গমন করে, তাহা মেষক্রান্তি (First point of Aries) এবং যাহা হইতে বিষুবন্মণ্ডলের উত্তর হইতে দক্ষিণে গমন করে, তাহার নাম তুলাক্রান্তি (First point of Libra)। এই দুই ক্রান্তিপাতের ব্যবধানে বিষুবন্মণ্ডল ও ক্রান্তিবৃত্তের যে স্থানদ্বয় পরস্পর হইতে সর্ব্বাপেক্ষা দূরে থাকে, তাহা পরমক্রান্তি নামে অভিহিত (Solstitial points). আমরা উত্তর গোলার্দ্ধে থাকিয়া যদি প্রতিদিন সূর্য্যের উদয় ও অস্ত-স্থান পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকি, দেখিতে পাইব যে, ২১এ মার্চ্চের পর (৭।৮ই চৈত্রের পর) সূর্য্য মেষক্রান্তিপাত হইতে প্রতিদিন উদিত হইবার সময় উত্তরদিকে উর্দ্ধে সরিয়া যাইতেছে এবং তিন মাসকাল এইরূপে সরিতে সরিতে পরমক্রান্তিস্থানে উপনীত হয়। সূর্য্য আবার দক্ষিণদিকে সরিয়া আসিয়া তিনমাসে তুলাক্রান্তির

উপর আসিয়া পড়ে এবং আরও দক্ষিণে নামিতে থাকিয়া, তিন মাসে অপর পরমক্রান্তি-স্থানে উপনীত হয় এবং পুনরায় ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া বাকি তিন মাসে মেষক্রান্তিপাতে আসিয়া পড়ে। সূর্য্যের চারিদিকে পৃথিবীর নিজ কক্ষায় ভ্রমণের জন্য আমরা সূর্য্যকে পরিভ্রমণ করিতে দেখি। পৃথিবী নিজ অক্ষদণ্ডের চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে নিজ কক্ষ দিয়া যেমন পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে অগ্রসর হইতে থাকে, সূর্য্যকে আমরা বিপরীত দিকে আকাশমার্গে তারকামণ্ডলের মধ্য দিয়া পশ্চাৎপদ হইতে দেখি। পুনশ্চ পৃথিবীর বিষুবদ্বৃত্ত এবং তাহার কক্ষের সমতল পরস্পরকে ছেদ করে বলিয়া, ক্রান্তিপাতের সৃষ্টি হইয়াছে এবং সূর্য্যকে বিষুবন্মণ্ডলের একবার উত্তরে ও একবার দক্ষিণে যাইতে দেখি।
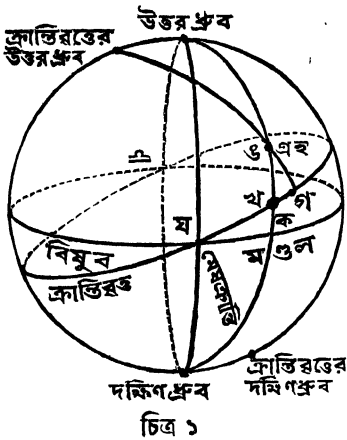
আকাশমার্গে কোন জ্যোতিষ্কের স্থান নির্দ্দেশ করিতে হইলে, আমরা প্রধানতঃ দুইটী পন্থা অনুসরণ করি (চিত্র ১)। প্রথমতঃ, আমরা বিষুবন্মণ্ডলের উপর তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারি। আমরা যদি ঐ জ্যোতিষ্কের উপর দিয়া এমন একটী বৃত্তাংশ (ধনু) কল্পনা করি, যাহা ধ্রুবদ্বয়ের উপর দিয়াও গমন করিয়া বিষুবন্মণ্ডলকে ছেদ করে, তাহা হইলে, ঐ ধনু দ্বারা জ্যোতিষ্কটীর স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারি। মেষক্রান্তি হইতে বিষুবন্মণ্ডলে ঐ ছেদস্থান পর্য্যন্ত যে ধনু থাকে, তাহাকে সরলোত্থান (Right ascension) বলে, (যেমন চিত্রে ঘক) আর ঐ ধনুর যে খণ্ড জ্যোতিষ্কটী ও বিষুবন্মণ্ডলের সহিত ছেদের মধ্যবর্ত্তী হয়, তাহা ঐ

চিত্র ১

জ্যোতিষ্কটীর ক্রান্তি বা declination নামে অভিহিত (যেমন ঙক)। আমরা right-ascension এবং declinationএর দ্বারা কোন জ্যোতিষ্কের স্থান-নির্দ্দেশ করিতে পারি। দ্বিতীয়তঃ, ক্রান্তিবৃত্তের উপর আমরা কোন জ্যোতিষ্কের স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারি। আমরা বিষুবন্মণ্ডলের ধ্রুবের ন্যায় ক্রান্তিবৃত্তের দুইটী ধ্রুববিন্দু কল্পনা করিতে পারি এবং right ascensionএর মত ক্রান্তিবৃত্তের ধনুকে Longitude (স্ফুট, যেমন ঘগ) ও declinationএর মত ধনুর খণ্ডকে latitude (যেমন ঙগ) বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। এই দুইএর দ্বারা আমরা জ্যোতিষ্কটীর স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারি।

আমরা ইতিপূর্ব্বে নাক্ষত্রিক দিনের কথা উল্লেখ করিয়াছি। এই সময়ে কোন একটী নক্ষত্র কোন স্থানের যাম্যোত্তর বৃত্তের উপর হইতে চলিতে আরম্ভ করিয়া আবার তাহার উপর আসিয়া পড়ে। যে সময়ে মেষক্রান্তি যাম্যোত্তর বৃত্তের উপর আসিয়া পড়ে, সেই সময় হইতে নাক্ষত্রিক দিনের আরম্ভ ধরা হয়। আমাদের সৌরমণ্ডলের (অর্থাৎ মধ্যস্থ সূর্য্য ও তাহার গ্রহ-উপগ্রহ ধরিয়া সৌরমণ্ডল) চতুর্দ্দিকে বহু দূরে তারকাগুলি বিক্ষিপ্ত, সুতরাং আমরা সহজেই বুঝিতে পারিব যে, পৃথিবীর নিজ অক্ষদণ্ডে ঘূর্ণনের জন্য ইহার তলদেশে প্রত্যেক স্থানই দিবারাত্রে (এক-

দিনে) একবার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া আসিতেছে ; তজ্জন্য ক্রান্তিপাত এক বার যাম্যোত্তর বৃত্তের উপর দিয়া গমন করে। এক নাক্ষত্রিক দিন আমাদের সৌর দিন অপেক্ষা কম। যে সময়ে মেষক্রান্তি যাম্যোত্তর বৃত্তের উপর আসিয়া পড়ে, তখন এক নাক্ষত্রিক দিনের শেষ এবং দ্বিতীয় নাক্ষত্রিক দিনের আরম্ভ হয় বলিয়া ঘড়ী নাক্ষত্রিক দিন-পরিমাণার্থ চালিত হইলে, তাহা ঐ সময়ে শূন্য ঘণ্টা মিনিটাদি প্রদর্শন করিবে। এইরূপ ঘটিকাযন্ত্র নাক্ষত্রিক সময় নিরূপণের জন্য ব্যবহৃত হইবে। কারণ, নাক্ষত্রিক দিন আবার নাক্ষত্রিক ঘণ্টা-মিনিটাদিতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

এক্ষণে সৌর দিন (solar day) কাহাকে বলে, দেখা যাউক। সূর্য্য স্থানীয় যাম্যোত্তর বৃত্ত অতিক্রম করিয়া পুনরায় তাহার উপর আসিতে যে সময় লাগে, তাহাই একটী সৌর দিন। এক বৎসরে ৩৬৫.২৪১৪ অথবা ৩৬৫¼ সৌর দিন। সূর্য্যের ক্রান্তিবৃত্ত ধরিয়া আকাশমার্গে একবার ঘুরিয়া আসিতে যে সময় লাগে, তাহাই সৌর-বৎসর। সূর্য্যঘড়ি (Sundial) দ্বারা সৌরদিনের সময় নিরূপিত হয়। সৌর-দিনগুলি সব সমান নহে ; তাহার কারণ, ক্রান্তিবৃত্তে সূর্য্যের গতি সমভাব নহে, অর্থাৎ পৃথিবীর নিজকক্ষে দৈনিক গতি সমভাবে সাধিত হয় না। সৌরদিনগুলি সব অসমান হওয়ায়, সাধারণ ঘটিকা-যন্ত্রের দ্বারা তাহাদের প্রকৃত সময় নিরূপণ করা অসম্ভব। সৌরদিনগুলির পরিমাণ অসমান হওয়ায় ঐ সকল দিনের ঘণ্টা-মিনিটাদিও সব অসমান জানিতে হইবে। এ কারণ জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতগণ একটী মধ্যসূর্য্য বা গণিতসূর্য্য কল্পনা করিয়াছেন। প্রকৃত বা প্রত্যক্ষ সূর্য্যের একবার ক্রান্তিবৃত্তে ঘুরিয়া আসিতে যে সময় লাগে (অর্থাৎ এক সৌরবর্ষে), সেই সময়ে এই কাল্পনিক সূর্য্যকে বিষুবন্মণ্ডলে একবার ঘুরিয়া আসিতে স্থির করা হয়। এই সময়কে সৌরদিন-সংখ্যা-হিসাবে বিভক্ত করিয়া এক এক ভাগকে মধ্য-সৌরদিন বলিয়া স্থির করা হয়, সুতরাং মধ্য-সৌরদিনগুলি পরিমাণে সমান বুঝিতে হইবে এবং তজ্জন্য সাধারণ ঘটিকাযন্ত্রের সাহায্যে মধ্য-সৌরদিনের সময় নিরূপিত হইয়া থাকে।

এক্ষণে দেখা গেল যে, মধ্য-সৌরদিনগুলি সব সমান, কিন্তু প্রকৃত সৌরদিনগুলি সেরূপ নহে ; তাহাদের কতকগুলি পরিমাণে বৃহত্তর, কতকগুলি ক্ষুদ্রতর। আবার কতকগুলি মধ্য-সৌরদিন অপেক্ষা বৃহত্তর, কতকগুলি সমান, আর কতকগুলি ক্ষুদ্রতর ; তবে প্রভেদ বেশী নয়। মধ্য-সৌরদিনের কোন নির্দ্দিষ্ট সময় ও প্রকৃত সৌরদিনের কোন নির্দ্দিষ্ট সময় (যেমন মধ্য-সৌরদিনের ১২ ঘটিকা ও প্রকৃত সৌরদিনের ১২ ঘটিকা), এই উভয়ের অন্তর্বর্ত্তী সময় (মধ্য-সৌরদিনের সময় হইতে হিসাবে) Equation of time বা সমকালপ্রভেদ নামে অভিহিত। সচরাচর আধুনিক পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষ ও পঞ্জিকায় মধ্যাহ্ন সময় লওয়া হয়। গণিত-সূর্য্যের মধ্যাহ্নকাল হইতে প্রত্যক্ষ সূর্য্যের মধ্যাহ্নকালের অন্তরই মধ্যাহ্নে সমকাল-প্রভেদ। যখন মধ্যসূর্য্য অগ্রগামী হয়, অর্থাৎ মধ্য-সৌরদিনের মধ্যাহ্ন প্রকৃত সৌরদিনের মধ্যাহ্নের পূর্ব্ববর্ত্তী হয়, তখন সমকালপ্রভেদ যুক্ত হইবে ; আর যদি মধ্য-সৌরদিনের মধ্যাহ্ন পশ্চাতে থাকে, তাহা হইলে সমকালপ্রভেদ বিযুক্ত হইবে। বৎসরের মধ্যে চারিবার মধ্যসূর্য্য ও প্রত্যক্ষ-সূর্য্য একস্থানে থাকে বলিয়া সমকালপ্রভেদ কিছুই থাকে না ; ৩।৪ ঠা

বৈশাখ, ১।২রা আষাঢ়, ১৬।১৭ই ভাদ্র ও ১০।১১ই পৌষ—এই চারিদিনে এইরূপ ঘটিয়া থাকে। পাশ্চাত্ত্য নাবিক-পঞ্জিকায় প্রতিদিনের সমকালপ্রভেদ হিসাব করিয়া লিপিবদ্ধ থাকায়, তাহা হইতে উভয় দিনেরই সময় হিসাব করিয়া লওয়া যায়।

এক্ষণে গণিত বা মধ্য এবং প্রত্যক্ষ সৌরদিনের প্রভেদের (অর্থাৎ সমকাল-প্রভেদের) কারণ দেখা যাউক। প্রথমতঃ ঐ প্রভেদের মূলতত্ত্ব আলোচনা করা যাউক। ইহার কারণ দুইটী। (১) পৃথিবীর কক্ষ ঠিক বৃত্তাকার নহে—তাহা বৃত্তাভাস (elliptical)। বৃত্তে একটী কেন্দ্র থাকে, কিন্তু বৃত্তাভাসে দুইটী foci বা উপকেন্দ্র থাকে। বৃত্তাভাসের এক উপকেন্দ্রে বা focusএ সূর্য্য অবস্থিত। কক্ষের যে স্থান সূর্য্যের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটস্থ, তাহা পেরিহেলিয়ন (perihelion) নামে অভিহিত এবং যে স্থান সর্ব্বপেক্ষা দূরস্থ, তাহা আপ্‌হেলিয়ন (aphelion) বা মন্দোচ্চ নামে অভিহিত। যে রেখা পেরিহেলিয়ন হইতে আপ্‌হেলিয়ন পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তাহাকে line of the apsides বা উচ্চরেখা কহে। (২) ক্রান্তিবৃত্ত ও বিষুবন্মণ্ডল সমান্তরাল না হইয়া কিছু তির্য্যক্‌ভাবে থাকায়, পরস্পরে দুই বিপরীত স্থানে ছেদিত হইয়া ক্রান্তিপাতের সূচনা করিয়াছে। আমরা পৃথিবীর উপর বাস করিয়া তাহার যাম্যোত্তর রেখাগুলির (যাহারা বিষুবদ্‌বৃত্তের সমকোণে মেরুদ্বয়-মধ্যে অর্দ্ধবৃত্তাকারে বিস্তৃত) পরস্পরের দূরত্ব হইতে সময় নিরূপণ করিতে পারি এবং তজ্জন্য মধ্যসূর্য্যকে বিষুবদ্‌বৃত্তের উপর কল্পনা করিতে বাধ্য হই। এই মধ্যসূর্য্যের সহিত তুলনার জন্য ক্রান্তিবৃত্তে চালিত প্রত্যক্ষ-সূর্য্যের স্থান ক্রান্তিবৃত্ত হইতে বিষুবন্মণ্ডলে যথাযথ গ্রহণ করিয়া থাকি। ক্রান্তিবৃত্ত ও বিষুবন্মণ্ডল সমান্তরাল নয় বলিয়া প্রত্যক্ষসূর্য্য ক্রান্তিবৃত্তে যদি সমগতিতে ভ্রমণ করিত, তাহা হইলেও, বিষুবন্মণ্ডলে তাহার গতি সমভাবে হইতে পারে না, তাহার উপর আবার প্রত্যক্ষসূর্য্য নিজ কক্ষায় বিষমগতিতে ভ্রমণ করে। এই জন্য মধ্যসূর্য্য ও প্রত্যক্ষসূর্য্যে গতির প্রভেদ লক্ষিত হয়।

পৃথিবীর কক্ষের আকৃতির বৃত্তাভাসবশতঃ যে সমকালপ্রভেদ ঘটিয়া থাকে, তদ্‌বিষয়ে এক্ষণে আলোচনা করা যাউক (চিত্র ২)। ভৌতিক নিয়মাধীনে পৃথিবী যখন পেরিহেলিয়নের নিকট
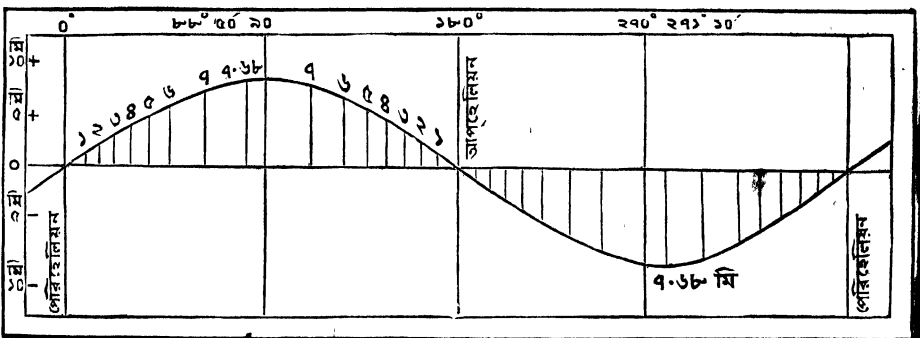
চিত্র ২

আসিয়া পড়ে, তখন তাহার গতি সর্ব্বাপেক্ষা বেগশালিনী হয় এবং তজ্জন্য প্রত্যক্ষসূর্য্য যে হারে ক্রান্তিবৃত্তে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে (অর্থাৎ পৃথিবী পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে) গমন করিতেছে, তাহা মধ্য-সূর্য্যের গতির হার অপেক্ষা অধিকতর। নিজ অক্ষদণ্ডের চারিদিকে পৃথিবীর পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে ঘূর্ণনবশতঃ প্রকৃত সৌরদিনগুলি মধ্য-সৌরদিন অপেক্ষা দীর্ঘতর। পেরিহেলিয়নে প্রকৃত সৌরদিনের কোন নির্দ্দিষ্ট সময় কাল্পনিক মধ্য সৌরদিনের ঐ নির্দ্দিষ্ট সময় একসঙ্গে থাকে বলিয়া, এই সময়ে সমকালপ্রভেদ শূন্য হয়। কিন্তু পেরিহেলিয়নের পর যত দিন গত হয়, প্রত্যক্ষ-সৌরদিনগুলি ক্রমশঃ দীর্ঘতর হইতে থাকে বলিয়া, তাহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট সময় কাল্পনিক মধ্য-সৌরদিনগুলি ঐ নির্দ্দিষ্ট সময়ের পশ্চাতে সরিয়া যায় এবং সমকালপ্রভেদ এখন যুক্ত হয়। তিন মাসের শেষে সমকাল প্রভেদ + ৭ꣳ মিনিট হয়, কিন্তু তাহার পর আবার প্রত্যক্ষ-সৌরদিনগুলি খর্ব্বতর হইতে থাকে এবং তজ্জন্য সমকালপ্রভেদও কম হইতে থাকে। তিন মাসের শেষে (অর্থাৎ পেরিহেলিয়ন হইতে ছয় মাসের শেষে) আবার ঐ দ্বিবিধ দিনগুলির পরিমাণ সমান হওয়ায়, সমকালপ্রভেদও শূন্য হইয়া পড়ে; এই সময় পৃথিবী মন্দোচ্চে বা আপ্‌হেলিয়নে অবস্থিতি করে। পৃথিবী যেমন আপ্‌হেলিয়ন হইতে আবার কক্ষের অপরদিক্ দিয়া যাত্রা করে, তখন প্রত্যক্ষ দিনগুলি কাল্পনিক মধ্য-দিনগুলির অগ্রগামী হওয়ায়, তাহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্য-সৌরদিনের সময়ের অগ্রে অবস্থিত করিতে থাকে; তজ্জন্য সমকাল-প্রভেদ হীন হইতে থাকে। ক্রমশঃ তিন মাসের শেষে সমকালপ্রভেদ ৭ꣳ মিনিট পর্য্যন্ত হইয়া আবার অবশিষ্ট তিন মাসে কম হইতে হইতে পেরিহেলিয়নএ তাহা শূন্য হইয়া পড়ে। সুতরাং দেখা গেল যে, পেরিহেলিয়ন এবং আপ্‌হেলিয়ন—এই দুই স্থানে সমকালপ্রভেদ শূন্য এবং দুইএর মধ্যস্থানে সর্ব্বাধিক প্রভেদ ৭ꣳ মিনিট যুক্ত বা বিযুক্ত হইয়া থাকে।

এক্ষণে ক্রান্তিবৃত্ত ও বিষুবন্মণ্ডলের পরস্পর তির্য্যগ্‌ভাবে অবস্থানবশতঃ সমকালপ্রভেদের বিষয় আলোচনা করা যাউক। ১ম ও ৩য় চিত্র দ্বারা বিষয়টী স্পষ্টীকৃত হইবে। মেষক্রান্তি হইতে
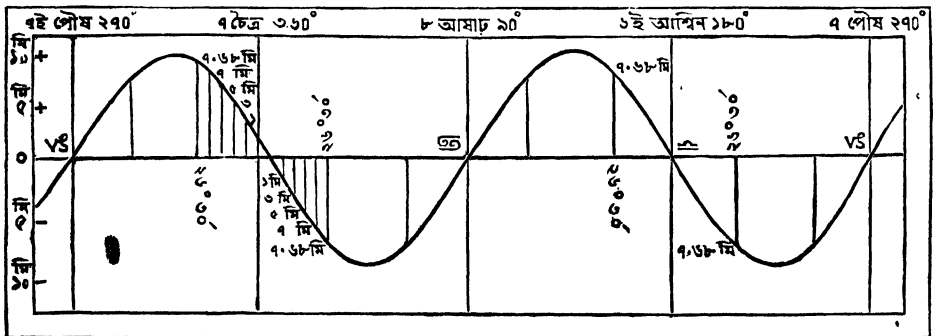
চিত্র ৩

প্রত্যক্ষ ও কাল্পনিক মধ্যসূর্য্যের গতি ধরা হউক। প্রত্যক্ষসূর্য্য ক্রান্তিবৃত্তে ও কাল্পনিক মধ্যসূর্য্য বিষুবন্মণ্ডলে গমন করিতেছে। দুই ক্রান্তিপাতস্থানে ও দুই পরমক্রান্তি-স্থানে সমকালপ্রভেদ

সমান হইবে। কারণ, এই চারি স্থানে তাহাদের সরলোত্থান (right ascension) সমান হইয়া থাকে। অন্য স্থানে উভয়ের সরলোত্থান সমান হয় না। মেষক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রকৃত-সৌরদিনগুলি কাল্পনিক মধ্যসৌরদিনের অগ্রগামী হওয়ায়, সমকালপ্রভেদ বিযুক্ত হইবে এবং দেড়মাসে প্রভেদ সর্ব্বাধিক হইয়া (−১০ মিনিট) অবশিষ্ট দেড়মাসে আবার শূন্য হইয়া যায়। তৎপরে দেড়মাসে সমকালপ্রভেদ +১০ মিনিট হইয়া আবার কমিতে থাকিয়া শূন্য হইয়া পড়ে, এক্ষণে সূর্য্যদয় তুলাক্রান্তিতে উপস্থিত হয়। এইরূপে পুনর্ব্বার সমকালপ্রভেদ প্রথমে −১০ মিনিট এবং শূন্য হইয়া আবার + ১০ মিনিট হইবার পর সূর্য্যদয় মেষক্রান্তিতে উপস্থিত হয়।

আমরা দ্বিবিধ কারণবশতঃ সমকালপ্রভেদ বিভিন্নভাবে আলোচনা করিলাম। কিন্তু আমরা যাহা প্রকৃতপক্ষে দেখিতে পাই, তাহা এই দুই প্রকার সমকালভেদের মিলন-ফল।

পৃথিবীর কক্ষের বৃত্তাভাসবশতঃ প্রকৃত-সৌরদিন ও মধ্যসৌরদিনের কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রভেদ (অর্থাৎ সমকাল) প্রভেদ ৭½ মিনিটের অধিক হয় না—

মধ্যসৌরসময়—প্রকৃত সৌরসময় = +৭½ মিনিট।

প্রকৃত সৌর সময়—মধ্য সৌর সময় = −৭½ মিনিট।

ক্রান্তিবৃত্তের তির্য্যগ্‌ভাবে স্থিতির কারণ সমকালপ্রভেদ ১০ মিনিট পর্য্যন্ত হইতে পারে—

মধ্য সৌরসময়—প্রকৃতসৌরসময় = +১০ মিনিট।

প্রকৃত সৌরসময়—মধ্য সৌর সময় = −১০ মিনিট।

এক্ষণে দেখা যাউক, দুই কারণবশতঃ সমকালপ্রভেদ একত্র করিলে, কোন কোন সময়ে তাহা শূন্য হইবে। প্রথমতঃ যদি উভয় কারণেই এক সময়ে সমকালপ্রভেদ শূন্য হয়, তাহা হইলে সমকাল ভেদের মিলনফল শূন্য হইবে। দ্বিতীয়তঃ, যদি প্রথম কারণবশতঃ সমকাল-প্রভেদ +৭½ মিনিট হয় এবং দ্বিতীয় কারণবশতঃ−৭½ মিনিট হয়, তাহা হইলে একত্রিত সমকালপ্রভেদ শূন্য হইবে। বিষুবন্মণ্ডলের মেষক্রান্তির নিকটস্থ যে স্থানে সমকালপ্রভেদ শূন্য হয়, তাহাই প্রাচীন হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদগণ নিরয়ণ-বিন্দু বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। * শূন্য সমকালপ্রভেদ বৎসরে চারিবার ঘটিয়া থাকে—দুই ক্রান্তিপাত-বিন্দু ও দুই পরমক্রান্তির সন্নিকটে। আমরা পরে দেখিব যে, ক্রান্তিবিন্দুদ্বয় নিরয়ণ-বিন্দু হইতে ২৬ অংশ ৩০ কলা পর্য্যন্ত দুই দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, প্রাচীন হিন্দু জ্যোতির্বিদগণ তাহা ৩০ অংশ বা ২৭ অংশ বলিয়া ধরিয়া গিয়াছেন। অপর নিরয়ণ-বিন্দুদ্বয় পরমক্রান্তির দুই পার্শ্বে ২৪ অংশ ৩০ কলা পর্য্যন্ত বিক্ষিপ্ত হইতে পারে। আর্য্যভট তাহা ২৪ অংশ ধরিয়া গিয়াছেন।

---

* সাধারণতঃ আমরা "নিরয়ণ-বিন্দু" রেবতী নক্ষত্রে স্থিত বলিয়া মনে করি। সূর্য্যসিদ্ধান্তে "পৌষ্ণান্তে-ভগণঃ স্মৃতঃ" এই পদের অর্থ "পৌষ্ণস্য রেবতীযোগতারায়া অন্তে নিকটে প্রদেশে" রঙ্গনাথের টীকায় পাওয়া যায় বলিয়া এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে আমরা সূর্য্যসিদ্ধান্তের শ্লোকের অর্থ "সূর্য্যের নিকটে" করিলে বুঝিতে পারিব, ইহা পৃথিবীর কক্ষের 'পেরিহেলিয়ান ও সূর্য্যের দিক্ হইতে আপ্‌হেলিয়ান-স্থানে অবস্থিত এবং যখন গণনা আরম্ভ হইয়াছিল, সে সময়ে তাহা রেবতী নক্ষত্রের সঙ্গে মিলিত ছিল। (পরিশিষ্ট দেখুন)।

আমরা এক্ষণে নিরয়ণ-বিন্দু হইতে ক্রান্তিপাতদ্বয়ের উভয় দিকে ২৬ অংশ ৩০ কলা পর্য্যন্ত বিক্ষেপের কারণ নিদর্শন করিতে চেষ্টা করিব। আমরা দেখিয়াছি যে, পৃথিবীর কক্ষের বৃত্তাভাসবশতঃ এবং বিষুবন্মণ্ডলের সহিত ক্রান্তিবৃত্তের বক্রভাবে স্থিতির দরুণ সমকালপ্রভেদ ঘটিয়া থাকে। যদি পৃথিবীর কক্ষ (অর্থাৎ ক্রান্তিবৃত্ত) এবং ক্রান্তিপাতদ্বয় চিরকাল নিশ্চল হইয়া একস্থানে অবস্থিতি করিত, তাহা হইলে সমকালপ্রভেদ এক সময়ে একপ্রকার হইত—ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন হইত না। কিন্তু দুই কারণে বৎসরের পর বৎসর সমকালপ্রভেদের সময় পরিবর্ত্তন হইতেছে এবং তজ্জন্য ক্রান্তিপাতবিন্দু ও নিরয়ণ-বিন্দু—এই উভয়ের পরস্পরের দূরত্বেরও পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। প্রথমতঃ পৃথিবীর বৃত্তাভাসকক্ষ অতি ধীরে ধীরে ঘূর্ণিত হইতেছে, ইহাকে আমরা পেরিহেলিয়নের গতি বলি। সুতরাং পেরিহেলিয়ন ও আপ্‌হেলিয়ন একস্থানে নির্দ্দিষ্ট না থাকায়, সমকালপ্রভেদের সময়ও ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ, বিষুবন্মণ্ডলের বিপরীত-ঘূর্ণনে ক্রান্তিপাতদ্বয় কক্ষ-বর্ত্তনের বিপরীত দিকে অপসরিত হইতেছে এবং তজ্জন্যও সমকালপ্রভেদের সময় পরিবর্ত্তিত হইতেছে। মোট সমকাল প্রভেদের সময় এই দুই পরিবর্ত্তনের জন্য প্রতি বৎসর অতি অল্পপরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

উপরোক্ত দুইটী পরিবর্ত্তনের উপর আরও দুইটী পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়, তদ্দ্বারাও সমকালপ্রভেদের এত অল্পপরিমাণ বিভিন্নতা লক্ষিত হয় যে, তাহা গণ্য না করিলে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। প্রথমতঃ বৃত্তাভাস কক্ষের আকার অতি ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, কিন্তু ইহা এত অল্প যে, বহুবৎসর পর্য্যন্ত তজ্জন্য গণনার কিছু ক্ষতি হয় না। তবে সোমসিদ্ধান্তে যে অয়নাংশের গতি ৩০ অংশ, পরে ব্রহ্মসিদ্ধান্তাদিতে ২৭ অংশ এবং আধুনিক হিসাবে ২৬ অংশ ৩০ কলা—এই যে পার্থক্য হিন্দুগণের স্থূল গণনার উপর সমুদায় নির্ভর না করিয়া, অন্ততঃ কিছুও কক্ষের আকৃতির পরিবর্ত্তনের উপর নির্ভর করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। দ্বিতীয়তঃ ক্রান্তিবৃত্ত এবং বিষুবন্মণ্ডলের সম্পাতে যে কোণ হয় (যাহাকে আমরা পরমক্রান্তি বলি) তাহা অতি ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। ইহা উপস্থিত বৎসরে প্রায় অর্দ্ধ বিকলা করিয়া কমিয়া আসিতেছে। ইহা দ্বারাও সমকালপ্রভেদের বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে না।

পেরিহেলিয়ন ও ক্রান্তিপাতবিন্দুর বিপরীত দিকে ঘূর্ণনের জন্য ক্রান্তিবিন্দু ও নিরয়ণ-বিন্দুর মধ্যস্থ দূরত্ব ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। অনুমান ৪০০০ খৃষ্টপূর্ব্বে আপ্‌হেলিয়ন ও মেষক্রান্তি নিরয়ণবিন্দুর সহিত একস্থানে অবস্থিত ছিল। তদবধি আপ্‌হেলিয়ন কক্ষের ঘূর্ণনবশতঃ প্রতিবৎসর ১১·৮ বিকলা করিয়া পূর্ব্বদিকে সরিয়া যাইতেছে এবং মেষক্রান্তি প্রতি বৎসর ৫০·২ বিকলা করিয়া পশ্চিমদিকে সরিয়া যাইতেছে, কাজেই আপ্‌হেলিয়ন হইতে মেষক্রান্তির দূরত্ব প্রতিবৎসর ১১·৮+৫০·২ অথবা ৬২ বিকলা করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে; এ কারণ সমকালপ্রভেদ প্রতিবৎসর পরিবর্ত্তিত হইতেছে এবং নিরয়ণ-বিন্দুর স্থানও পরিবর্ত্তিত হইতে বাধ্য হইতেছে। ক্রান্তিপাত ও আপ্‌হেলিয়নের বিপরীত বর্ত্তনে নিরয়ণ-বিন্দু উভয়ের মধ্যে আসিয়া পড়ে এবং ক্রান্তিপাত হইতে পূর্ব্বে অপসারিত হইতে থাকে। পৃথিবীর কক্ষের বৃত্তাভাসবশতঃ সমকালপ্রভেদ

০৪ মিনিট হইয়া থাকে এবং ইহা পেরিহেলিয়নের ৯০ অংশ (সূক্ষ্মরূপে ৮৮ অংশ ৫০ কলা) দূরে অবস্থিত এবং একদিকে যুক্ত ও অপরদিকে বিযুক্ত (অথবা আপ্‌হেলিয়ন হইতে ৯০ অংশ, একদিকে বিযুক্ত ও অপরদিকে যুক্ত)। সুতরাং যদি ক্রান্তিবৃত্তের তির্য্যগ্‌ভাববশতঃ সমকাল-প্রভেদ ঐ স্থানে ৭৪ মিনিট হয় এবং যুক্ত স্থানে বিযুক্ত ও বিযুক্ত স্থানে যুক্ত হয়, তাহা হইলে বিষুবমণ্ডলের ঐ স্থানে মিলিত সমকালপ্রভেদ শূন্য হইবে এবং তথায় নিরয়ণ-বিন্দুর অবস্থিতি হইবে। এইরূপ হইতে গেলে ক্রান্তিপাতবিন্দুকে আদ্য-স্থান হইতে ২৭ অংশ (২৬ অংশ ৩০ কলা) পশ্চিমে সরিয়া যাইতে হইবে। এক্ষণে আপ্‌হেলিয়ন মেষক্রান্তি হইতে ৯০+২৭ বা ১১৭ অংশ দূরে যাইয়া পড়িবে। কিন্তু ক্রান্তিবৃত্তের উপর তাহার স্থান ১২০ অংশ দূরে হইবে। আপ্‌হেলিয়ন মেষক্রান্তিপাত হইতে আরও অগ্রসর হইতে থাকিলে, নিরয়ণ-বিন্দু ক্রান্তিপাতের দিকে ধাবিত হইবে। যখন আপ্‌হেলিয়ন মেষক্রান্তি হইতে ১২০+৬০ বা ১৮০ অংশ দূরে যাইবে এবং পেরিহেলিয়ন মেষক্রান্তির উপর আসিয়া পড়িবে, তখন নিরয়ণ বিন্দুও উহাদের সহিত মিলিত হইয়া যাইবে। আপ্‌হেলিয়ন আরও চলিতে চলিতে যখন মেষক্রান্তি হইতে ১৮০+৬০ বা ২৪০ অংশে (পেরিহেলিয়ন ৬০ অংশে) আসিয়া পড়িবে, তখন নিরয়ণ-বিন্দু মেষক্রান্তিপাতের অপরদিকে ২৭ অংশ দূরে আসিয়া উপস্থিত হইবে। অবশেষে যখন আপ্‌হেলিয়ন সরিতে সরিতে ২২০+১৪০ বা ৩৬০ অংশে উপনীত হইবে, নিরয়ণ-বিন্দুও আবার প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ আপ্‌হেলিয়নের সহিত মেষক্রান্তিতে আসিয়া উপস্থিত হইবে। আমরা যদি নিরয়ণ-বিন্দুকে স্থির ও নিশ্চল ধরি, তাহা হইলে ক্রান্তিপাতবিন্দুকে নিরয়ণ-বিন্দুর পূর্ব্বপশ্চিমে ২৭ অংশ পর্য্যন্ত গমনাগমন ধরিতে পারি। এইরূপে আমরা মেষক্রান্তি ও তুলাক্রান্তি—উভয়কেই নিরয়ণ-বিন্দুর পূর্ব্বপশ্চিমে ২৭ অংশ পর্য্যন্ত গমনাগমন ধরিতে পারি। পরমক্রান্তিদ্বয়কে ঐ রূপে ২৪ অংশ ৩০ কলা পর্য্যন্ত গমনাগমন করিতে দেখা যায়। দুইখানি অভ্রপট্টে অথবা সেলিউলয়েড্‌ পট্টে দ্বিবিধ সমকাল-প্রভেদ (চিত্রানুরূপ) পৃথক্‌ পৃথক্‌ অঙ্কিত করতঃ দুইটী পট্টকে বৃত্তাকারে বন্ধন করিয়া একটী অপরটীর ভিতরে রাখিয়া বিপরীত দিকে ঘুরাইলে মিলিত সমকালপ্রভেদ শূন্যের স্থান অর্থাৎ নিরয়ণ-বিন্দুর স্থান স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। গোলত্রিকোণমিতির সাহায্যেও বিষয়টী প্রমাণ করা যায়, তাহা অনাবশ্যক ও অপেক্ষাকৃত কঠিনবোধে পরিত্যক্ত হইল।

এক্ষণে ক্রান্তিপাতের নিরয়ণ-বিন্দু হইতে অপসৃত হইয়া ২৭ অংশ দূরে গমন করতঃ পুনর্ব্বার তাহার সহিত মিলিত হইয়া, অপর দিকে ২৭ অংশ যাইতে কত সময় অতিবাহিত হয়, তাহার আলোচনা করা যাউক।

আমরা দেখিয়াছি—

(১) মেষক্রান্তিপাত হইতে আপহেলিয়নের ১১৭ অংশ (১২০ অংশ) গমনে নিরয়ণ-বিন্দু মধ্যস্থ হইয়া মেষক্রান্তিপাত হইতে ২৭ (৩০ অংশ) সরিয়া আসে। নিরয়ণ-বিন্দু হইতে ধরিলে এক দিকে আপ্‌হেলিয়ন ৯০ অংশ দূরে এবং অপরদিকে মেষক্রান্তি ২৭ অংশ দূরে অবস্থিত থাকে।

আপহেলিয়ন—৯০ অংশ—নিরয়ণ-বিন্দু—২৭ অংশ—মেষক্রান্তি…(ক)

(২) মেষক্রান্তি-পাত হইতে আপ্‌হেলিয়ন আরও ৬০ অংশ দূরে চালিত হইলে, অর্থাৎ মোট ১২০+৬০ বা ১৮০ অংশ অপসৃত হইলে নিরয়ণ-বিন্দু মেষক্রান্তি-পাতের উপর আসিয়া পড়ে। তখন নিরয়ণ-বিন্দু হইতেও আপ্‌হেলিয়ন ১৮০ অংশ দূরে থাকে (২৭কে মোটামুটি ৩০ ধরা হইল)

আপহেলিয়ন—৬০+৯০+২৭ অংশ—{ মেষক্রান্তি / নিরয়ণ-বিন্দু }…(খ)

(৩) মেষক্রান্তিপাত হইতে আপ্‌হেলিয়ন আরও ৬০ অংশ সরিয়া গেলে অর্থাৎ মোট ১২০+৬০+৬০ বা ২৪০ অংশ সরিয়া গেলে, নিরয়ণ-বিন্দু ক্রান্তিপাতের অপরদিকে ২৭ অংশ সরিয়া যাইবে। নিরয়ণ-বিন্দু হইতে ধরিলে আপ্‌হেলিয়ন ২৪০+৩০ = ২৭০ অংশে দূরে থাকিবে।

আপ্‌হেলিয়ন—৬০+৬০+৯০—মেষক্রান্তি—২৭ (৩০)…(গ)

(৪) অবশেষে মেষক্রান্তিপাত হইতে আপ্‌হেলিয়ন আরও ১২০ অংশ, অর্থাৎ মোট ১২০ ৬০+৬০+১২০ বা ৩৬০ অংশ সরিয়া গেলে (অর্থাৎ পুনরায় মেষক্রান্তির সহিত মিলিত হইলে), নিরয়ণবিন্দুও পশ্চাৎপদ হইয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইবে।

আপ্‌হেলিয়ন
নিরয়ণ-বিন্দু } …(ঘ)
মেষক্রান্তি

আমরা আপ্‌হেলিয়ন, নিরয়ণ-বিন্দু এবং মেষক্রান্তিপাতবিন্দুর চতুর্বিধ সম্পর্ক (ক-ঘ) দেখিলাম। এক্ষণে তাহাদের ব্যবধানে যে সময় অতিবাহিত হয়, তাহার আলোচনা করা যাউক। বলিয়া রাখিতে হইবে যে, এত প্রাচীন কালের হিসাব মোটামুটি ভিন্ন হইতে পারে না, সুতরাং গণনা সবই স্থূল বলিয়া ধরিতে হইবে। এমন কি, আধুনিক পাশ্চাত্য জ্যোতিষের মতেও এত অধিক বর্ষের গণনা সূক্ষ্ম হইতে পারে না। আমরা দেখিলাম যে, প্রতি বর্ষে আপ্‌হেলিয়ন ক্রান্তিপাত হইতে ৬২ বিকলা (৬১·৯) করিয়া সরিয়া যাইতেছে; উপস্থিত তাহা মোটামুটি এক কলা বলিয়া ধরা যাইবে।

আদ্য-কাল এবং প্রথম সম্পর্কের (ক) ব্যবধান আপ্‌হেলিয়নের গতি ১২০ অংশ হওয়ায় ১২০×৬০÷১=৭২০০ বৎসর। তদ্রূপ প্রথম (ক) এবং দ্বিতীয় সম্পর্কের (খ) ব্যবধানে ৬০×৬০÷১=৩৬০০ বৎসর অতিবাহিত হইবে। দ্বিতীয় (খ) এবং তৃতীয় (গ) সম্পর্কের ব্যবধানে ৬০×৬০÷১=৩৬০০ বৎসর অতিবাহিত হইবে। অবশেষে তৃতীয় (গ, এবং এক চতুর্থ সম্পর্কের (ঘ) ব্যবধান ১২০×৬০÷১=৭২০০ বৎসর হইবে। সর্ব্বসুদ্ধ ২১৬০০ বৎসর হইবে। সুতরাং ক্রান্তি-বিন্দু হইতে আরম্ভ করিয়া আপ্‌হেলিয়নের এক সম্পূর্ণ ঘূর্ণন দ্বারা তাহার সহিত পূর্ণমিলনে ২১৬০০ বৎসর অতিবাহিত হইবে। তাহা হইলে এক মহাযুগে আপ্‌হেলিয়ন বা পেরিহেলিয়নের গতি [illegible] বা ২০০ বার সাধিত হয়। ২১৬০০ বৎসর মোট

হিসাব বলিয়া ধরিতে হইবে ; আধুনিক মতে সূক্ষ্ম গণনায় ২০৯৮৬ বৎসর হয়। মুঞ্জাল ও ভাস্করের অয়নচলন এই আপ্‌হেলিয়নের গতি, তাঁহাদের মতে ইহার এক পূর্ণঘূর্ণনে ২১৬০৬ বৎসর অতিবাহিত হয়। তাঁহারা ক্রান্তিপাতকে আপ্‌হেলিয়নের স্থান হইতে চালিত বলিয়া ধরেন।

৪। এক্ষণে প্রাচীন সিদ্ধান্তগ্রন্থে উল্লিখিত অয়নাংশ-নিরূপণের মূলতত্ত্ব পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষের তুলনায় আলোচনা করা যাউক।

আমরা আপ্‌হেলিয়নের এক সম্পূর্ণ ঘূর্ণনের সময় ২১৬০০ বৎসর দেখিয়াছি এবং ঐ সময়ে অয়নাংশের নিরয়ণ-বিন্দুর উভয় পার্শ্বে ২৭ অংশ পর্য্যন্ত গমনাগমন দেখিয়াছি। আপ্‌হেলিয়ন এক যুগে ২০০ বার ঘূর্ণিত হয়, তাহাও জানিয়াছি।

সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষগুলির মতে এক যুগে চক্রের বা অয়নগ্রহের পূর্ব্বদিকে ৬০০ বার গতি লিখিত হইয়াছে এবং ৯০ অংশ অয়ন-গ্রহের গতিতে ২৭ অংশ (বা ৩০ অংশ) অয়নাংশের গতি হয়। আমরা পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষের মতে এই অয়নাংশের সম্পূর্ণ গমনাগমন তিন ভাগে বিভক্ত করিতে পারি—(১) ৭২০০ বৎসরে নিরয়ণ-বিন্দু হইতে পূর্ব্বদিকে ২৭ অংশ গমন ; (২) পূর্ব্ব-দিক্ হইতে নিরয়ণ-বিন্দু অতিক্রম করিয়া পশ্চিমদিকে ২৭ অংশ গমন ; ইহাতে ৩৬০০+৩৬০০ বা ৭২০০ বৎসর লাগে ; (৩) পূর্ব্বদিকে আবার ঐ ২৭ অংশ গমন করিয়া নিরয়ণ-বিন্দুর সহিত মিলন ; ইহাতে ৭২০০ বৎসর লাগিবে। এই হিসাবে অয়নগ্রহের গতিও তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়—(১) ৯০ অংশ, (২) ৯০+৯০ বা ১৮০ অংশ ; (৩) ৯০ অংশ। এই তিন গতির সমষ্টি ৩৬০ অংশ। সুতরাং অয়নগ্রহের পূর্ব্বগতি (নিরয়ণ-বিন্দু হইতে পূর্ব্বদিকে লঙ্ঘন—ইহাই সিদ্ধান্তগ্রন্থগুলিতে স্পষ্ট করিয়া লিখিত আছে) অর্থাৎ ইহার গতিসমষ্টির ⅓ ভাগ যদি এক যুগে ৬০০ বার সাধিত হয়, তবে তাহার সম্পূর্ণ গতি (৩৬০ অংশ ব্যাপিয়া) এক যুগে ⅓×৬০০ বা ২০০ বার সাধিত হইবে। সুতরাং আমরা এক সম্পূর্ণ অয়নগ্রহের ঘূর্ণন একযুগে ২০০ বার ধরিতে পারি এবং অয়নগ্রহকে আপ্‌হেলিয়ন বা পেরিহেলিয়নের গতির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে, তবে তাহার গতি ক্রান্তিপাতবিন্দু হইতে না ধরিয়া নিরয়ণ-বিন্দু হইতে ধরিতে হইবে। অয়নগ্রহের গতি এইরূপে একযুগে ৬০০ বার সাধিত হইলে, অয়নাংশের গতিও ঐ সময়ে ৬০০ বার সাধিত হইবে। অয়নগ্রহের এক পূর্ণাবর্ত্তনে অয়নাংশ শূন্য হয়, এজন্য কোন অভীষ্ট বর্ষ-সংখ্যার অয়নাংশ-নিরূপণে অগ্রে অয়নগ্রহের পূর্ণাবর্ত্তনের পর অবশিষ্ট অংশ-কলাদি হইতেই অয়নাংশ নির্দ্ধারিত হইবে। তাহা ত্রৈরাশিক সাহায্যে অনায়াসেই নিরূপিত হইবে।

এক যুগের দিনসংখ্যা : অভীষ্ট বর্ষের দিনসংখ্যা : : ৬০০ : অভীষ্ট বর্ষের দিন-সংখ্যায় অয়ন-গ্রহের গতি। গতিতে যে ভগ্নাংশ থাকিবে, তাহাই অংশ-কলাদিতে পরিণত করিলে অবশিষ্ট অংশ-কলাদি হইবে।

অয়নাংশ নিরয়ণ-বিন্দুর পূর্ব্বপশ্চিমে গণনা করা হয় বলিয়া অয়নগ্রহের পূর্ণগতির পর অবশিষ্ট অংশ-কলাদি নিরয়ণ-বিন্দু হইতে নিরূপিত হওয়া আবশ্যক ; তজ্জন্যই তাহাদের ভুজ-সংস্কারের আবশ্যকতা। এই বিষয় পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে।

অয়নগ্রহের অংশ-কলাদির ভুজজ্যা হইতে অয়নাংশ নিরূপিত হইবে। আমরা জানি যে, অয়নগ্রহের ভুজজ্যা ৯০ অংশ হইলে অয়নাংশ নিরয়ণ-বিন্দু হইতে ২৭ অংশ (সোমসিদ্ধান্তমতে ৩০ অংশ) দূরে থাকিবে। এক্ষণে ত্রৈরাশিক-সাহায্যে অয়নাংশ নিরূপিত হইবে।

৯০ : অয়নগ্রহের অংশকলাদির ভুজজ্যা : : ২৭ : অয়নাংশ

৫। অবশেষে পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষের মতে বিশুদ্ধরূপে অয়নাংশ নিরূপণের প্রণালী আলোচনা করা যাউক।

আমরা জানিয়াছি যে, মধ্যসূর্য্যকে বিষুবন্মণ্ডলে ঘূর্ণিত বলিয়া কল্পনা করা হয়। প্রত্যক্ষসূর্য্য ক্রান্তিবৃত্তে পরিভ্রমণ করে। সমকাল প্রভেদ নির্ণয় করিবার জন্য প্রত্যক্ষসূর্য্যের গতি বিষুবন্মণ্ডলে নির্দ্ধারিত করা আবশ্যক এবং সম্ভবপর, তবে নির্দ্দিষ্ট স্থানের কিছু প্রভেদ লক্ষিত হয়; যেমন, ক্রান্তিবৃত্তে সূর্য্যের স্থান অর্থাৎ সূর্য্যের দ্রাঘিমা (লঙ্গিটিউড্—longitude) ১২০ অংশ হইলে বিষুবন্মণ্ডলে সূর্য্যের স্থান অর্থাৎ সূর্য্যের সরলোত্থান (রাইট্-আসেন্সান্—Right ascension) ১১৭ অংশ। এস্থলে বলিয়া রাখা উচিত যে, সূর্য্যের স্থান উভয় বৃত্তেই মেষক্রান্তি হইতে গণিত হয়। কারণ, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ ও মধ্যসূর্য্যের গতি একস্থান হইতে আরম্ভ ধরা যাইবে। মিলিত সমকালপ্রভেদ শূন্য হইলে (অর্থাৎ নিরয়ণ-বিন্দুতে) বিষুবন্মণ্ডলে চালিত মধ্যসূর্য্য এবং তাহাতে নির্দ্ধারিত প্রত্যক্ষসূর্য্য একসঙ্গে মিলিত হয়। নিরয়ণ-বিন্দু হইতে আপ্‌হেলিয়ন ৯০ অংশ দূরে থাকিলে মেষক্রান্তিপাত অপরদিকে ২৭ অংশ দূরে থাকে এবং তখন অয়নাংশ ২৭ অংশ বলিয়া গৃহীত হয়। কাজেই মেষক্রান্তি হইতে তন্নিকটস্থ নিরয়ণ-বিন্দুর দূরত্ব (ঐরূপে তুলাক্রান্তি হইতে তন্নিকটস্থ নিরয়ণ-বিন্দুর দূরত্ব) অয়নাংশ বলিয়া পরিগণিত। যে সময়ে সমকালপ্রভেদ শূন্য হইবে, সেই সময়ে প্রত্যক্ষসূর্য্যের বিষুবন্মণ্ডলে নির্দ্ধারিত স্থানের নিকটস্থ ক্রান্তিপাত (মেষ বা তুলাক্রান্তি) হইতে দূরত্বই অয়নাংশ হইবে। অর্থাৎ নিকটস্থ ক্রান্তিপাতবিন্দু হইতে গণিত নিরয়ণ-বিন্দুতে প্রত্যক্ষসূর্য্যের দ্রাঘিমা বা সরলোত্থানই অয়নাংশ বলিয়া গৃহীত হইবে।

যখন মেষক্রান্তিতে সমকালপ্রভেদ বিযুক্ত হইবে, তখন মেষক্রান্তি নিরয়ণ-বিন্দুর পূর্ব্বে থাকিবে, যখন যুক্ত হইবে, তখন মেষক্রান্তি নিরয়ণ-বিন্দুর পশ্চিমে থাকিবে। নিরয়ণ-বিন্দু মেষক্রান্তির পূর্ব্বে অয়নাংশযুক্ত এবং পশ্চিমে থাকিলে অয়নাংশবিযুক্ত হইবে। ইহাও সিদ্ধান্তগ্রন্থে উল্লিখিত আছে।

এক্ষণে নাবিকপঞ্জিকার সাহায্যে অয়নাংশ কিরূপে সূক্ষ্মভাবে গণিত হইতে পারে, দেখা যাউক। ১৮৪৪ শকাব্দের ১লা বৈশাখের (আদিতে) অয়নাংশ নিরূপণ করা যাউক। প্রথমতঃ, ১৮৪৪ শকাব্দের আদি ইংরাজি সনের কত তারিখ, তাহা নিরূপণ করিতে হইবে। কেবল ইংরাজি সন জানিলেই চলিতে পারে; কারণ, ইংরাজি সনের প্রথম যে দিন সমকালপ্রভেদ শূন্য হইবে, সেই দিনেই নিরয়ণ-বিন্দুর মেষক্রান্তির নিকট স্থিতি বলিয়া ধরিতে হইবে। ১৮৪৪ শকাব্দ ইংরাজি ১৯২২ সনের সম বলিয়া, আমরা ঐ সনের নাবিকপঞ্জিকা হইতে মেষক্রান্তির নিকটস্থ নিরয়ণ-বিন্দুর স্থিতিকাল ১৫।১৬ এপ্রিলের মধ্যে পড়িয়াছে জানিতে পারিব। দ্বিতীয়তঃ, এই দুই দিনের

মধ্যে কোন সময় সমকালপ্রভেদ শূন্য হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক। তৃতীয়তঃ ঐ সময়ের সূর্য্যস্ফুট নাবিকপঞ্জিকা হইতে নির্ণয় করিয়া যাহা হইবে, তাহাই বিশুদ্ধ অয়নাংশ হইবে।

নিরয়ণ-বিন্দুর স্থিতিকাল অথবা সমকালপ্রভেদ শূন্য হইবার সময় নিরূপণ করিতে হইলে দুইটির একটী পন্থা অনুসরণ করা যাইতে পারে। প্রথম পন্থাটী অতি সহজ এবং একটী ত্রৈরাশিক প্রক্রিয়া মাত্র, তবে ইহার ফল স্থূল হইবে। দ্বিতীয় পন্থাটী অপেক্ষাকৃত জটিল, তবে ইহার ফল সূক্ষ্ম।

প্রথম প্রক্রিয়া।

১৫ই এপ্রিল, সমকালপ্রভেদ −০ মিনিট ১০'৭৯ সেকেণ্ড } গ্রিণউইচের বেলা
১৬ই এপ্রিল, সমকালপ্রভেদ +০ মি ৪'০৫ সে } ১২টার সময়

দুইএর প্রভেদ +০ মি ১৪'৮৪ সে

সুতরাং ১৪'৮৪ : ১০'৭৯ : : একদিন : দিনের ভগ্নাংশ

দিনের ভগ্নাংশ $= \frac{১০৭৯}{১৪৮৪} =$ ১৭ ঘণ্টা ২৭ মি ০'৪৮ সে।

নাবিকপঞ্জিকায় দিবা ১২টার সময়ে ঐ সমকালপ্রভেদ লিখিত হওয়ায় সমকালপ্রভেদ শূন্যের সময় ১৭ ঘ ২৭ মি ০'৪৮ সে − ১২ ঘণ্টা = প্রাতঃকাল ৫টা ২৭ মি ০'৪৮ সে। ইহা গ্রীণউইচের ঘটিকা হিসাবে বুঝিতে হইবে।

কলিকাতার দেশান্তর ৫ ঘ ৫৩ মি ২১সে এবং কলিকাতা গ্রীণউইচের পূর্ব্বে স্থিত বলিয়া তাহা যুক্ত হইবে।

সুতরাং কলিকাতায় সমকালপ্রভেদের শূন্যকাল ৫টা ২৭ মি ০'৪৮ সে + ৫টা ৫৩ মি ২১সে = ১১টা ২০ মি ২১'৪৮ সে হইবে। ইহা নিরয়ণ-বিন্দুর অবস্থিতি-কাল।

দ্বিতীয় প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় অগ্রপশ্চাৎ কয় দিনের সমকালপ্রভেদ ধরিতে হইবে।

এপ্রেল সমকালপ্রভেদ	প্রথম প্রভেদ	দ্বিতীয় প্রভেদ
১৪ই −০ মি ২৫'৯৯ সে ($ক^{১}$)		
	+১৫'২০ সে ($খ^{১}$)	
১৫ই −০ ১০'৭৯ ($ক^{০}$)		−০'৩৬ সে ($গ^{১}$)
	+১৪'৮৪ ($খ_{০}$)	
১৬ই +০ ৪'০৫ ($ক_{১}$)		−০'৩৮ সে ($গ^{০}$)
	+১৪'৪৬ ($খ_{২}$)	
১৭ই +০ ১৮'৫১ ($ক_{২}$)		

বেসেল (Bessel)-কৃত অন্তর্নিবেশ (interpolation) সূত্র (formula) হইতে গঠিত নিম্নলিখিত সূত্রের সাহায্যে সূক্ষ্মরূপে দিনের ভগ্নাংশ নিরূপিত হইবে।

$$দিনের\ ভগ্নাংশ = \frac{-ক^{০}}{খ_{০} - \left(\frac{গ^{১}+গ^{০}}{২}\right)\times\frac{১}{২} - \left(\frac{গ^{১}+গ^{০}}{২}\right)\times\frac{১}{২}\times\frac{+ক^{০}}{+খ^{০}}}$$

= ১৭ ঘ ২৩ মি ২১'৪৮ সেকেণ্ড।

সুতরাং সমকালপ্রভেদের শূন্যকাল = সকাল ৫টা ২৩ মি ২১.৪৮ সেকেণ্ড।

কলিকাতার সমকালপ্রভেদের শূন্যকাল = ১১টা ১৬ মি ৪৮.৪৮ সে।

গ্রিণউইচ ঘটিকায় সমকালপ্রভেদের শূন্যকালের সূর্য্যের স্ফুট গ্রহণ করিলে তাহাই অয়নাংশ হইবে। এ কারণ পর পর কয়দিনের সৌরস্ফুট নাবিকপঞ্জিকা হইতে উদ্ধৃত হইল।

এপ্রিল	১২টার সময়ের সৌরস্ফুট				প্রথম প্রভেদ	দ্বিতীয় প্রভেদ
১৩	২২ অংশ	৪৬ কলা	১৭.৭ বিকলা	(ক^{২})		
					৫৮ক ৪৪.৪ বি (খ^{২})	
১৪	২৩	৪৫	২.১	(ক^{১})		−১.৮ বি (গ^{২})
					৫৮ ৪২.৬ (খ^{১})	
১৫	২৪	৪৩	৪৪.৭	(ক^{০})		−১.৭ (গ^{১})
					৫৮ ৪০.৯ (খ$_{০}$)	
১৬	২৫	৪২	২৫.৬	(ক$_{১}$)		−১.৮ (গ^{০})
					৫৮ ৩৯.১ (খ^{১})	
১৭	২৬	৪১	৪.৭	(ক$_{২}$)		−১.৬ (গ^{১})
					৫৮ ৩৭.৫ (খ$_{২}$)	
১৮	২৭	৩৯	৪২.২	(ক$_{৩}$)		

দেখা যাইতেছে যে, ১৫।১৬ই এর মধ্যে কোন এক সময়ের সৌরস্ফুট নিরূপণ করিতে হইবে। এই সময়কে দিনের কোন অংশ হিসাবে (কারণ, আমরা প্রতিদিনের স্ফুট পাইতেছি) "স" বলিয়া ধরিলে, ১৫ই তারিখের ১২টা হইতে তাহা $ক^{স}$ বলিতে পারা যায়। এক্ষণে বেসেলের সূত্রমত $ক^{স}$ নিরূপিত হইবে। $ক^{স}$ই আমাদের অয়নাংশ।

$$ক^{স} = ক^{০} + সখ^{০} + \frac{স(স-১)}{২}\left(\frac{গ^{১}+গ^{০}}{২}\right)$$

এস্থলে $স = ১৭ঘ\ ২৭\ মি\ ২৭.৪৮\ সে = \frac{৩২০২৪৭২}{৪৪১৯৪৯৭}$ দিন

$$সুতরাং\ অয়নাংশ = ২৪\ অংশ\ ৪৩\ ক\ ৪৪.৭\ বিকলা + \frac{৩২০২৪৭২}{৪৪১৯৪৯৭} \times ৫৮ক\ ৪০.৯\ বিকলা$$

$$+ \frac{৩২০২৪৭২}{৪৪১৯৪৯৭} \times \left(\frac{৩২০২৪৭২}{৪৪১৯৪৯৭} - ১\right)$$

$$\times \frac{১}{২} \times \left(\frac{-১.৭-১.৮}{২}\right)$$

$$= ২৫\ অংশ\ ২৬\ ক\ ১৬\ বিকলা।$$

এইরূপে নাবিকপঞ্জিকার সাহায্যে পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী বর্ষের অয়নাংশ নির্ণয় করিলে ইহার বার্ষিক গতি জানা যাইবে। কয়েক বর্ষের অয়নাংশ নিরূপণ করিতে পারিলে ইহার গতির হার শুদ্ধরূপে জানা যাইতে পারে। কিছু অধিক গত বর্ষসংখ্যার অয়নাংশ ধারাবাহিকরূপে স্থির করিয়া, তাহাদের সাধারণীকরণ (integration) প্রক্রিয়ার দ্বারা এমন একটী নিয়ম গঠিত হইতে পারে, যাহাতে নাবিকপঞ্জিকার বিনা সাহায্যে বহু বর্ষ পর্য্যন্ত অয়নাংশ গণিত হইতে পারে।

ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সূর্য্যসিদ্ধান্তে "পৌষ্ণান্তে ভগণঃ স্মৃতঃ" কথাগুলিতে রেবতী নক্ষত্রের শেষে ভগণের আদি না বুঝাইতে পারে। এই বাক্যাবলী সোমসিদ্ধান্তে এবং ব্রহ্ম-সিদ্ধান্তেও দেখা যায়। ভাস্করাচার্য্যও রেবতী নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এ কারণে পৌষ্ণান্তে অর্থে রেবতীর অন্তে ধরিলে আমরা দেখি যে, আদিবিন্দু সচল না হইয়া নিশ্চল হইবে এবং তাহা আমাদের মূল তত্ত্বের প্রমাণের বিপক্ষে যাইবে। কিন্তু আমরা সিদ্ধান্তজ্যোতিষগুলির পূর্ব্বের নানা গ্রন্থ আলোচনা করিয়া জানিতে পারি যে, তৎকালে নক্ষত্রের আদি অশ্বিনী বলিয়া ধরা হইত না। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে কৃত্তিকার নিকট আদিবিন্দু অবস্থিত বলিয়া উল্লেখ আছে। আবার পিতামহসিদ্ধান্তে আদিবিন্দুর স্থান ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে ছিল। মহাভারত রচনাকালে শ্রবণা নক্ষত্রকে আদি বলিয়া ধরা হইত। এতদ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, আদিবিন্দু সচল এবং হিন্দুগণ বহুদিন হইতে আদিবিন্দুর স্থান নির্দ্দেশ করিয়া আসিতেছেন।

শ্রীএকেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ

—০—

অশুদ্ধি সংশোধন

পৃষ্ঠা	১৩	পংক্তি	২৫	"ঘাম্যোদগ" "ঘাম্যোদগ্" হইবে।
পৃষ্ঠা	„	„	৩১	"তেষামন্তরং শান্তদাম্পদাৎ"। "তেষামন্তরংশান্তদাম্পদাৎ" হইবে।
পৃষ্ঠা	১৪	পংক্তি	১০	"বিযুক্ত্যা" "বিযুক্ত্যা" হইবে।
পৃষ্ঠা	„	„	১২	"ষঃ" "ষঃ" হইবে।
পৃষ্ঠা	১৫	পংক্তি	১৯	"কৃত্যে" "কৃত্যো" হইবে।
পৃষ্ঠা	„	„	২৩	"বিষুবদ্বয়ে" "বিষুবদ্বয়ে" হইবে।
পৃষ্ঠা	১৬	পংক্তি	২৫	"নাভাদিকং" "নাভ্যাদিকং" হইবে।

মুর্শিদাবাদের একটী প্রাচীন লিপি *

আমি ইতিপূর্ব্বে পরিষৎ-পত্রিকার চতুর্বিংশ খণ্ডের তৃতীয় সংখ্যায় "মুর্শিদাবাদের কয়েকখানি লিপি" নামক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলাম। সে সময় তথাকার যে সকল শিলালিপি আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, উক্ত প্রবন্ধে সমস্তই সন্নিবেশিত ছিল। প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানীর রাজধানী বড়নগরের অপর পারে অধুনা দেবীপুর নামক যে গণ্ডগ্রাম অবস্থিত আছে, এক কালে তাহা সাধু মোহান্তদিগের লীলাক্ষেত্র ছিল। বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে সর্ব্বশ্রেণীর ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিরা উক্ত স্থানে মানবদেহের সার্থকতার জন্য আসিয়া মন্দির-মঠাদি প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক সাধুসঙ্গমে ও ধর্ম্মযাজনে জীবন যাপন করিতেন। পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর স্রোতের কবলে অধিকাংশ ধ্বংস হইয়া উক্ত দেবীপুর গ্রামের সামান্য অংশই এক্ষণে বর্ত্তমান আছে। উক্ত গ্রামে প্রসিদ্ধ তিনটী আখ্ড়া বা মঠ ছিল। প্রত্যেক মঠেই এক বা ততোধিক মন্দির প্রতিষ্ঠিত এবং তাহাতে দেবসেবা ও অতিথি-সৎকারাদির সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। এক্ষণে উক্ত গ্রামের সেই আখ্ড়াগুলির বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা ভগ্নাবশেষে ও জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। কিছু দিবস পূর্ব্বে তথাকার মধ্যম আখ্ড়ায় একটী শিলালিপি রক্ষিত আছে শুনিয়া, আমি তাহা দেখিতে যাই। উক্ত আখ্ড়ার একটী গৃহে কাল প্রস্তরের একটী বৃহৎ শিলালিপি দেখিতে পাই। সে সময় আমার নিকট তাহার প্রতিলিপি (rubbings) লইবার কোন সরঞ্জাম ছিল না। পূর্ব্বপ্রদেশের প্রত্নবিভাগের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আমার বন্ধু শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দীক্ষিত মহাশয় গত শ্রাবণ মাসে পরিদর্শন উপলক্ষে তথায় গমন করিলে, আমিও তাঁহার অনুসরণ করিয়া ঐ প্রস্তরটী তাঁহাকে দেখাই। আমাদের সঙ্গে ইতিহাস-প্রেমিক শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস সরকার মহাশয়ও ছিলেন। সেই সময় এই শিলালিপির ছাপ লওয়া হয়, তাহাই আজ আপনাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ২৮ ইঞ্চি ও প্রস্থে ১৪।০ ইঞ্চি, কঠিন কাল প্রস্তরে তোলা অক্ষরে ক্ষোদিত। ইহার চারি ধারও সুন্দর নক্সায় শোভিত। সমস্ত লিপিটী মধ্যভাগে একটী স্থূল রেখা দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত, উপরিভাগে দেবনাগরী অক্ষরে হিন্দী ভাষায় পাঁচটী কবিতা লিখিত আছে। নিম্নভাগ আর একটী স্থূল রেখা দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত; তাহার বাম দিকে বাঙ্গালা অক্ষরে পদ্যে ও দক্ষিণ দিকে পারসী কবিতায় লিপিটী ক্ষোদিত আছে। উপরোক্ত চারি ধারে প্রত্যেকটীর মধ্যভাগে দেবনাগরী অক্ষরে হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষায় দেবতাদিগের নমস্কার ক্ষোদিত আছে। এইরূপ তিন ভাষাযুক্ত শিলা-লিপি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না।

শিলালিপির সারাংশ এই যে, বিক্রমসংবৎ ১৭৮১, শকাব্দা ১৬৪৬ বর্ষে বৈশাখ মাসে অক্ষয়-তৃতীয়া দিবসে মহারাজ গন্ধর্ব্ব সিংহ বাহাদুরপুরের সন্নিকট দেবীপুরের দক্ষিণে গঙ্গাতীরে

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩৩০ বঙ্গাব্দের নবম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

জমি ক্রয়পূর্ব্বক ধর্ম্মার্থে হরিমন্দির নির্ম্মাণ ও কূপ খনন করাইয়াছিলেন। লিপিতে জমির পরিমাণ বাইশ বিঘা আট কাঠা, এবং চৌহদ্দী—পশ্চিমে গঙ্গার আইল, উত্তরে দেবীপুর ও দক্ষিণে বাহাদুরপুর লিখিত আছে। ঐ জমি রত্নেশ্বরের স্ত্রীর নিকট হইতে ক্রয় করার উল্লেখ হিন্দী, বাঙ্গালা ও পারসী—এই তিনটী ভাষাতেই আছে। হিন্দী ও বাঙ্গালা ভাষায় কেবলমাত্র রত্নেশ্বরের স্ত্রীর নিকট উদ্যান হইতে খরিদ করার বিষয় লিখিত আছে। কিন্তু পারসী ভাষাতে ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব রত্নেশ্বরের বিধবা পত্নী ঈশ্বরী দেবীর উদ্যান হইতে লাখরাজ জমি খরিদ করার উল্লেখ থাকায়, রত্নেশ্বরের স্ত্রীর পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। লেখকের নাম রামকৃষ্ণ উল্লেখ আছে।

উপরোক্ত দেবীপুর ও বাহাদুরপুর গ্রামদ্বয়ের অস্তিত্ব এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। বঙ্গদেশের যে ইতিহাসগুলি সচরাচর পাওয়া যায়, তাহাতে উল্লিখিত মহারাজ গন্ধর্ব্ব সিংহের কোন বিবরণ দেখা যায় না। তিনি নিশ্চয়ই বঙ্গদেশের কোন না কোন স্থানের প্রতিপত্তিশালী পুরুষ ছিলেন। হিন্দীতে নৃপ গন্ধর্ব্ব সিংহ ও পরে তাহার বিশেষণস্বরূপ মহারাজ শব্দ লিখিত আছে। বাঙ্গালায় মহারাজা গন্ধর্ব্ব সিংহ বাহাদুর এবং পারসীতে কেবলমাত্র রাজা গন্ধর্ব্ব সিংহ লিখিত আছে। যাহা হউক, গন্ধর্ব্ব সিংহ যে, সে সময়ে কোন খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

এই শিলালিপির আর একটী বিবেচ্য বিষয়ে আমি আপনাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। সেটী এই যে, ইহার হিন্দী ভাষার লিপিতে বিক্রম সংবৎ ১৭৮১ লিখিত আছে। বাঙ্গালা ভাষার লিপিতে শকাব্দা "ষোলষস" ও অঙ্কে "৪৬ সনে" অর্থাৎ ১৬৪৬ সনের উল্লেখ আছে। ইহার সামঞ্জস্য হওয়াই বিবেচ্য বিষয়। সংবৎ ১৭৮১ ও শকাব্দা ১৬৪৬ এই দুইয়ে অমিল নাই। কিন্তু ঐ সনে হিজরী ১১৪৬ স্থলে ১১৪২ হওয়া উচিত ছিল। যদি উপরোক্ত সংবৎ কিংবা শকাব্দা এবং হিজরী—এই দুই সন তারিখ, একটী জমি ক্রয় করিবার ও অপরটী শুভদিনে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার সময় ধরা যায়, তাহা হইলে, হিন্দী ও বাঙ্গালা ভাষার লিপির সন তারিখই অর্থাৎ সম্বৎ ১৭৮১, শকাব্দা ১৬৪৬ বৈশাখ শুক্লা তৃতীয়া—(অক্ষয়তৃতীয়া) মন্দির-প্রতিষ্ঠার সময় বলিয়া ধরা উচিত। জমি ক্রয়ের সময় অবশ্য ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে হইবারই কথা; অথচ পারসী ভাষার লিপির সন তারিখ তাহার আরও তিন চারি বৎসর পরের সময় নির্দ্দেশ করিতেছে। এ সম্বন্ধে আমার আর কোনরূপ সাধন না থাকায়, আমি কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই। এক্ষণে এই অপ্রকাশিত শিলালিপির লিখিত মহারাজ গন্ধর্ব্ব সিংহ সম্বন্ধে যদি কোন সুবিজ্ঞ ব্যক্তি তত্ত্বানুসন্ধানপূর্ব্বক তাহার ফলাফল প্রকাশিত করেন, তাহা হইলে আমার পরিশ্রম বিশেষ সফল হইবে।

শিলালিপির বঙ্গাক্ষরে অক্ষরান্তর

(দেবনাগর)

১। শীর্ষভাগে—শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেবজ্ সদাসহাই।

২। দক্ষিণভাগে—শ্রীলছমনায় নমঃ।

৩। নিম্নভাগে—শ্রীগণেশায় নমঃ ॥ শ্রীঃ ॥

৪। বামভাগে—শ্রীরঘুনাথায় নমঃ ॥

(উপর অংশে দেবনাগর)

১। সম্বতু ১৭৮১ বৈশাষ মাস সুদি তীজ ॥ শ্রীনৃপ গন্ধর্ব্ব সিংঘ ভুব মোললে বয়ো ধর্ম্মকো-বীজ ॥ দেবপুরী অস্থানু য়

২। হ বাগু গঙ্গকে তীর ॥ জর খরীদি লীনোঁ সৌঙ্গে শ্রীহরিসুত্রণকোঁ ধীর ॥ রত্তনেস্থরকী নারিনেঁ দয়ৌ খুশী করি মোল ॥ থ

৩। রি রোপী মহারাজনেঁ ধর্ম্মপুরী অডোল। উত্তর দেবীপুর বসে পচ্ছিম গঙ্গা আলি ॥ মেঁড বহাদুর পুর লগী দচ্ছিন

৪। পূরব থালি ॥ বীঘা বীস পর দোয়হৈ আঠ বিসে পরিমাঁন ॥ হরিমন্দিলু কীন্হো তহাঁ বাঁধ্যৌ কূপ নিরবাঁন ॥ ৫ ॥

(নিম্নে বাম অংশে বাঙ্গালা)

১। ওঁ শ্রীমহারাজা গন্ধর্ব্ব সিংহ বাহাদুর রত্নে—

২। সয়ের ত্রি স্থানে বাগ হইতে বাইশ বিঘা আট

৩। কাঠা ইহ পশ্চিমে গঙ্গার আলি উত্তরে দেবীপু—

৪। র পূর্ব্ব দক্ষিণ বাহাদুরপুর জর খরিদ লইয়া

৫। সকাব্দা সোলষস ৪৬। সনে বৈসাখ মাষের ×

৬। অক্ষয়ত্রিতীয়া দিবশে হরিমন্দির ও কূপ দিলা।

(নিম্নে দক্ষিণ অংশে পারসী)

১। রাজা গন্ধরব্ সিন্হ্ বহাদুর বাগ্ করদন্দ জর খুরীদ শুদ নমুদ অন্দর হবেলী চাহসীরাঁ অকজীদ।

২। মী-গিরফ্ৎ অজ নিজদ মুসমাত ঈশ্বরী দেবা চোবুদ, অহ্লিয়ে রত্তনেসর জুন্নারদার মুত্তবক্ক বজুদ।

৩। বিস্তউ দো বিঘা মোয়াজী হস্ত বিস্ওয়ে লাখরাজ, হদ্দ মঘরিব আওজ দরিয়ায়ে মৌজ দর মৌজমিজাজ।

৪। পূর বহাদুর হর দো সুদ মসরীফ ও জনুব দারদ জমীন, তা শমাল হদ্দ দেবীপুর মোকর্রর শুদ। আমীন।

৫। অজ তবারিখ নহুম শব্বাল দহ উ শশ্ সনহ্ জলুস, য়ক হজার উ য়কসদ উ চেহল উ শশ্ হিজরী মনুষ

৬। অজু খৎ-ই রামকৃষ্ণ

শ্রীপূরণচাঁদ নাহার

—০—

মুর্শিদাবাদের একটি প্রাচীন লিপি

"মুর্শিদাবাদের একটী প্রাচীন লিপি"
পাঠ সম্বন্ধে মন্তব্য

শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার মহাশয় আমাদের সমক্ষে এই অপূর্ব্ব ত্রিভাষাময় লিপিখানি উপস্থিত করিয়াছেন, আমরা তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

কিন্তু দেবনাগরী ও বাঙ্গালা অংশে প্রদত্ত তারিখ তিনি যেরূপ পড়িয়াছেন, আমরা তাহা গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। তিনি স্বকীয় পাঠ অবলম্বন করিয়া দেবনাগরী ও বাঙ্গালা অংশের সংবৎ ও শকাব্দের সহিত ফারসী অংশের হিজরী সনের অসামঞ্জস্য দেখিয়াছেন, এবং তাঁহার প্রবন্ধের শেষ প্যারাগ্রাফে সেই অসামঞ্জস্যের কারণ নির্দ্দেশ করিবার প্রয়াস করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমি উভয়ে মিলিয়া এই লিপিখানির ভূষার ছাপাটি আলোচনা করি। ফারসী পাঠটিও আমরা পড়ি। শ্রীযুক্ত রাখাল বাবু ফারসী অংশের তারিখটী লইয়া অনুশীলন করেন। আমরা দেখিতেছি, লিপিতে কোনও অসামঞ্জস্য নাই।

দেবনাগরী অংশে প্রথম ছত্রে তারিখ এই দেওয়া আছে :—

সংবতু ১৭৯১ বৈসাষ (ষ=খ) মাস সুদি তীজ ॥

শ্রীযুক্ত পুরণচাঁদ বাবু ১৭৮১ পড়িয়াছেন। স্পষ্ট ১৭৯১ আছে, ১৭৮১ নহে।

বাঙ্গালা অংশে পঞ্চম ও ষষ্ঠ ছত্রে তারিখ এই আছে :—

সকাব্দা সোলষ পাচপোন বৈসাখ মাসের অক্ষয় ত্রিতিয়া দিবশে ॥

অর্থাৎ শকাব্দা ১৬৫৫ বৈশাখ মাস অক্ষয় তৃতীয়া।

শ্রীযুক্ত পুরণচাঁদ বাবু পড়িয়াছেন, "সকাব্দ সোলষস ৪৬। সনে" ইত্যাদি। এই পাঠ মোটেই আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। "পঞ্চান্ন" স্থলে "পাচপোন" বঙ্গদেশে বিরল নহে। "সোলষস ৪৬"—অর্দ্ধ অংশ অক্ষর বিন্যাসের দ্বারা, অর্দ্ধ অংশ সংখ্যা-লেখের দ্বারা—এইরূপে কাল-নির্দ্দেশ একেবারে দুর্লভ। শ্রীযুক্ত পুরণচাঁদ বাবু "পা" কে "স ৪" পড়িয়াছেন, "চ" কে "৬" ধরিয়াছেন, "পোন" কে '। সনে' পড়িয়াছেন। ইহাতেই যত গোল।

সংবৎ ১৭৯১=শকাব্দা ১৬৫৫=খ্রীষ্টীয় ১৭৩৪, এখানে কোনও গোল নাই।

ফারসী অংশের পঞ্চম ছত্রে তারিখ এই দেওয়া আছে :—

অজ্ তৱারিখ ই নহুম্ শব্‌বাল দহ্ উ শশ্ সনহ্ জলুস য়ক্ হজার উ য়ক্ স্বদ্ উ চিহিল উ শশ্ হিজরহ্।

রাজ্যাঙ্ক (সনহ্ জলুস্) ১৬ (দহ্-উ-শশ্) ৯ই শওয়াল, এক হাজার এক শত চল্লিশ ও ছয় হিজরী (=১১৪৬ হিজরী)।

দিল্লীতে মুহম্মদ শাহ হিজরী ১১৩১ হইতে ১১৬১ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজত্বের ষোড়শ বর্ষ = ১[illegible] হিজরী। ১১৪৬ হিজরী ১৪ জুন ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ হয়। ১১৪৬ হিজরীর শওয়াল মাস ১৭৩৪ সালের মার্চ্চে পড়ে। সুতরাং ১৭৯১ সংবৎ = ১৬৫৫ শকাব্দ = ১১৪৬ হিজরী—এই তিনে বেশ মিল আছে।

দেবনাগরী অংশের ভাষা রাজস্থানী-মিশ্র ব্রজভাষা; চতুর্থী বিভক্তিস্থলে "নে" ("রতনেসুরকী নারিনেঁ দয়ৌ" = রত্নেশ্বরের স্ত্রীকে দিল) রাজস্থানীর বিভক্তি।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

—o—

ধনুর্ব্বান লয়ে হাথে লক্ষন আইল সাথে
বাঁসা কৈল পঞ্চবটী বন।
বনে জত দুখ পাই না কহি রামের ঠাই
মুখ হেরি জুড়ায় জিবন॥
তিলার্দ্ধেক জদি রাম না থাকেন নিজ ধাম
মন মোর উচাটন করে।
নিরক্ষিলে চাঁদমুখ হৃদয়ে বড়ই সুখ
সজ্যা করি কুসের উপরে॥
লঙ্কাপুরে অষ্ট মাস না থাকি প্রভুর পাস
হিয়া সুন্ন হইল আমার।
রামপদ না দেখিয়া কান্দয়ে আমার হিয়া
রহিলাম সাগরের পার॥
বল বাপু হনুমান কেমন আছেন রাম
আমার বিরহে পোড়ে মন।
হনু বলে সুন মাতা কি কব রামের কথা
প্রবোধিতে না পারে লক্ষন॥
কি কহিব বিধাতারে সকলি করিতে পারে
মিন নাহি জল ছাড়া বাঁচে।
কিত্তিবাস কহে বানি না কান্দিহ ঠাকুরানি
পুন জাবে শ্রীরামের কাছে॥
পবননন্দন সুনহ বচন
ত্বরায় আনহ রাম।
বহু দিন হৈলে কাতি দিব গলে
সুকাবে জানুকি নাম॥
অশোককাননে চিন্তি রাত্রদিনে
ভূমেতে লিখি শ্রীরাম।
লিখিতে লিখিতে দেখি আচম্বিতে
নবদুর্ব্বাদলশ্যাম॥
প্রভুর অঙ্গরি দেখি চক্ষু ভরি
আজি মোর সুপ্রভাত।
অষ্ট মাস মোরে শাগরের পারে
রাখিলেন রঘুনাথ॥

রাবনের চেড়ি মারে সভে বেরি
কেমনে ধরিব প্রান।
রামে জদি দেখি তবে প্রান রাখি
সুন বাপু হনুমান॥
দেবর লক্ষন কিসের কারন
তত্ত্ব নাহি মোর করে।
মোর দুখ শেষ বুঝিনু বিশেষ
বিধি মিলাইল তোরে॥
সুন হনুমান কহি তব স্থান
জত দুখ আমি পাই।
হেন অষ্ট মাস নিত্য উপবাস
কহিও প্রভুর ঠাই॥
রাক্ষসের ঘরে প্রান কাঁপে ডরে
নারির কতেক প্রান।
বিসম রাক্ষস বচন কর্কস
সদা করে অপমান॥
প্রভু নারায়ন বধিয়া রাবন
উদ্ধার করুন মোরে।
শ্রীঅজোধ্যানগরে গিয়া নিজ ঘরে
প্রনাম করিব তারে॥
কিত্তিবাস কয় না করিয় ভয়
লঙ্কাজয়ি হবে রাম।
অশোকের বনে ভাব নারায়নে
মুখে বল রাম নাম॥ (পৃ° ২৯।২-৩০।২)

শেষ ৫৭ সংখ্যক পুথির অনুরূপ। পুষ্পিকার পর,—

তোমার চরনে এই নিবেদন রাম।
ধন পুত্র লক্ষি দিয়া পুরায় মনস্কাম॥
ইহা বিনে অন্য কিছু নাহি প্রয়োজন।
মনের মানস পূর্ণ কর নারায়ন॥
তব পদে ভক্তি সদা মাগি এই বর।
মরনে স্বরন দিও রাম গদাধর॥

এই মহাত্ম্য কোর রাম বাপের ঠাকুর।
অশেষ পাপে মুক্তি করি লবে নিজ পুর॥
রাম রাম প্রভু রাম কোমললোচন।
কৃপা কর রামচন্দ্র লইলাম স্মরণ॥
তোমা বিনে অকিঞ্চনে নাহি কেহ আর।
অন্তকালে ও পদে মতি রাখিবে আমার॥
এই নিবেদন মোর শুন নারায়ন।
গঙ্গাজলে রাম বলে ত্যজি এ জীবন॥

৬২। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩১/২×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২-৪৯,৫১-৫৭। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৫৫ সাল। খণ্ডিত। প্রাপ্তিস্থান, বর্দ্ধমান।

আরম্ভ,—

করেছি দারুন কর্ম্ম তোর পিতা বধ।
প্রানে[র] অধিক তোরে বাসিরে অঙ্গদ॥
সরমে করহ পার সন্যগন নঞা।
সিতা অন্যসন কর আমা পানে চেঞা॥
সিতা বিরহে মোর ব্যাকুল অন্তর।
সভার স্মরন নিলাম সুন রে বানর॥
হইলাম জানকিহারা পঞ্চবটি বনে।
বিধুমুখি সিতারে মোর তাই পড়ে মনে॥

ইহার পর ৫৯ সংখ্যক পুথির সহিত অনেকটা মেলে।

মধ্য,—

বসিলেন দুই জনে ডাকি নিজ মন্ত্রিগনে
প্রধান প্রধান জুথে জুথে।
সুগ্রিবেরে শঙ্গে করি গমন করিলা হরি
মাল্যবান গিরি করি হাথে॥
চাহিঞা সুগ্রিবের পানে ধারা পড়ে দু নয়নে
কহিতে লাগিলা রঘুবর।
তোমার শহায় মিতা উদ্ধার করিব সিতা
তবে স্থির আমার অন্তর॥
শ্রীরামে[র] করিব কাজ কহে সুগৃব মহারাজ
তুমি জার সঙ্গে রঘুবর।
কপিদল সঙ্গে লব সমুদ্র তরিঞা জাব
স্ববংশে বধিব লঙ্কেশ্বর॥
প্রভু তোমার চিন্তা কি সিতার তত্ত্ব পেঞাছি
উর্দ্ধারিব জনকনন্দিনি।
আমার বচন রাখ দিন কর মুস্তি ডাক
উঠে সভে দিঞা জয়ধ্বনি॥
কপিগন লাখে লাখে ব্রহ্মার নন্দন ডাকে
প্রস্তু কর মুস্তি জম্ববান (?)।
মাহিন্দ্র ক্ষেন গুনে দিল কটকে আনন্দ হইল
ধনু লঞা গা তুলিলা রাম॥
জাত্রা করি রঘুবির চলিলা শাগরতির
পরিহরি গিরি মাল্যবান। (পৃ° ৩৮।১)।

অন্ত,—

মাহিন্দ্র ক্ষেন গননা করিলা জাম্ববান।
কোদ্রণ্ড করিঞা স্কন্দে গা তুলিলেন রাম॥
অজানলম্বিত ভুজ নিলকান্তি তনু।
নিতম্বে বাকল সাজে রামরম্ভা জানু॥
কোকনদ জিনি পদ নোখচন্দ্র সাজে।
হেরিঞা রামের রূপ বিধু পড়ে লাজে॥
গোউর বরন শঙ্গে সুমিত্রাকিশোর।
হেরিঞা দোহার রূপ আনন্দে বানর॥
সাজিল বানর জত গাছ পাথ[র] হাথে।
ভল্লুক বানর শব চলে চতুর্ভিতে॥
নল নিল প্রভিতি আর হরিতাল বরন।
নানা বর্ন্নের মেঘ জেন ছাইল গগন॥

শেই মেঘ মর্দ্ধে রামচন্দ্র হইলেন চন্দ।
দেখিঞা সুগ্রিবের কত হইল আনন্দ॥
উদয় করিল বিধু কি কহিব কথা।
সুমিত্রানন্দন তাথে বিদ্দু [্য]তে[র] লতা॥
জাঙ্গালে চরন দিলা কৌশল্যাকিশোর।
আপনাকে ধন্য মানে বশএ বানর॥
অঙ্গে অঙ্গে বানর শব হঞা মেলামেলি।
গগনে লাঙ্গুড় উঠে রামজয় ধ্বনি॥
চলিল বানর জত নহি লেখা জোখা।
লাঙ্গুড় উটেছে জেন দেখিতে পতকা॥
জলধর গর্জ্জে জেন হাকিছে বানর।
শব্দ প্রবেশিল গিঞা লঙ্কার ভিতর॥
প[া]চিরে উটিঞা জত রাক্ষশ দেখিল।
সাগর করিঞা বন্ধ রাঘব আইল॥
সুমুদ্র হইঞা পার রাজিবলোচন।
সুভদিনে লঙ্কা প্রবেসিলা নারায়ন॥
পড়িল বানর জত লঙ্কার ভিতর।
ঘের ঘের সুব্দ করে ডাকিছে বানর॥
বানরের সিংহনাদে টলে লঙ্কাপুরি।
মৃগচর্ম্ম পাতিঞা বশিলা জটাধারি॥
সুমুখে সুগ্রিব রাজা বামে জম্বুবান।
রামের দক্ষিনভাগে ব্যেলের শস্তান॥
কৃতাঞ্জলি রাম আগে অঞ্জনানন্দন।
রাঘবে ঘেরিঞা আছে জত কপিগন॥
কেহ বলে বিলম্বে আর প্রওজন কি।
এককালে ধরি লঙ্কার রসাতলে নি॥
কেহ বলে ভাঙ্গ বেটার কনক পাচির।
কেহ বলে পড় লঙ্কার ধর দশসির॥
কেহ বলে একবার রামের আজ্ঞা নিব।
চার দণ্ডের মর্দ্ধে লঙ্কা সমুদ্রে ডুবাব॥
এই জুক্তি করে শব জতেক কপিগন।
হেরিঞা আছএ শব রামের বদন॥

সুমুদ্র করিঞা বন্ধ রাম হইলা পার।
ঘেরিল কনক লঙ্কা কৌশল্যাকুমার॥
বশিলা জানকিনাথ লঙ্কার ভিতরে।
সুন্দরাকাণ্ডের কথা শাঙ্গ এত দুরে॥

৬৩। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২-৬, ৮-৫৩। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১০ পঙ্ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৬২ সাল। খণ্ডিত।

মধ্য,—

রাক্ষষ দেখিলে নর ভয়ে জেন জরে।
একেশ্বরি জানকি রাক্ষসিগন মারে॥
ঝরেতে ব্যাকুলি জেন কলার বালুরি।
সিতার দুর্গতি করে রাবনের চেরি॥
রাক্ষসের ভক্ষ নর ভুঞ্জে ব্যবহার।
কোথাহ নাহিক দেখি হেন অনাচার॥
মার কাট চেরি সব তাহে নাই ডর।
রাম ছারি কেহ নহে প্রানের ইশ্বর॥
কোথাএ আছেন রাম কোমললোচন।
তি[নি]ন প্রভু বিনে মোর অভাগ্য জিবন॥
ধুলায় ধুসর হয়্যা উটিলা সত্তরে।
বিক্ষডাল ধরি সিতা কান্দে উশ্চস্বরে॥
হনুমান আছেন সিংসপা বিক্ষডালে।
রাম বলে জানকি কান্দেন তার তলে॥
কোথা গেলে রামচন্দ কৌসল্যা সাযুরি।
অপমান করে মোর রাবনের চেরি॥
ভাগ্য[ব]ন্ত লোক দেখে কোমললোচন।
সেই প্রাননাথ সনে নাহি দরসন॥
কত পাপ করিলাম পাপের নাই অবসান।
তেই সে চেরির হাথে এত অপমান॥

প্রান ছারিতে চাহি না হয় বাহির।
আর কত দুঃখ সব মানুস স্বরির॥
আজু জদি প্রভু মোর লঙ্কাপুরে এসে।
রাক্ষস করেন খের চক্ষুর নিমিসে॥
কত কত রাক্ষসেরে করিলা সংহার।
দুঃখিনি জানকি ডাকে না কর্যা উর্দ্ধার॥
আমি এত দুঃখ পাই রাম জদি সুনে।
লঙ্কা খণ্ড খণ্ড করে ফেলে এক বানে॥
রভাগিনি স্থি আমি বর দুরাচারী।
তেই রপমান করে রাবনের চেরি॥
আমার চক্ষুর জল নাহিক বিশ্রাম।
এইমন লঙ্কাপুরি করুন আমার রাম॥
শ্রীরামের বানে হউক রাক্ষস সংহার।
রাক্ষসের চিতাধুমে হউক রন্দকার॥
সুকিনি গিধিনি ছাআ করুক আকাষে।
শ্রীগাল কুকুর তুষ্ট রাক্ষসের মাংসে॥
কেহ জদি এসে থাকে রামের রনুচর।
এই দুঃখ কহো গিআ রামের গোচর॥
সিতা লক্ষি সাপ দেন হয় বিপরিত।
সুন্দরায় রচে কিত্তিবাষ পণ্ডিত॥

(পৃ০ ১৬৯।১-১৭।১)

ধিক ধিক ধিক জন্ম ধিক তোর পরাক্রম
ধিক তোর কুলের রাচার।
ব্রহ্মবংসে জন্ম জার এমন তার কদাচার
রপজস ঘোচএ সংসার॥
মারিচ বদন দিআ পলালি পরান লয়্যা
সন্ন ঘরে সিতা কৈলি চুরি।
ভুবন বিনাষে জে শ্রীরাম পুরুষ সে
সোষক হয়্যা সিংহি কৈলি বৌরি॥
তোরে আমি দেখি জেন ক্ষুদ্র পিপিলিকা হেন
মাকরের ডিম্ব লঙ্কাপুরি।
মারিআ হাতের কাতা ছিরে পেলি দষ মাথা
সিতা নিআ প্রভুর বরাবরি॥
দসানন তুই পাপি সুই একেলা কপি
রন কর বুঝি তোর বল।
রাপনার ভুজবলে চরনপ্রভাব তলে
বল লঙ্কা নেঙ রর্সাতল॥
লঙ্কা নি নাঙ্গুরে জরি নিমিসে সাগর তরি
বল জাই রঘুনাথের আগে।
রামের আজ্ঞা পাইলাম জিজ্ঞাসিআ আইলাম
পাসরিলাম তোর বাপের ভাগ্যে॥
হনুর বচন সুনি পার্থ মিত্র কানাকানি
আর লঙ্কার নাহিক নিস্তার।
বিবিসনে লাগে সঙ্কা নিশ্চএ মজিল লঙ্কা
কিত্তিবাষের লাচারি সুসার॥

(পৃ০ ২৯।১)

শেষ,—বানরসৈন্য সহ রামচন্দ্রের লঙ্কা-প্রবেশ এবং যুদ্ধে ভস্মলোচনের অধীন রাক্ষস-সেনার পরাভব। ইহার পর একখানি বিচ্ছিন্ন পত্রে নিম্নলিখিত লাচাড়ীটি আছে,—

সুন প্রভু দেব রাম বিভিসন মোর নাম
রাবনের কনেষ্ট সহদর।
বৈদেহি দিবার তরে অনেক বুঝালাম তারে
হিত না সুনিল লঙ্কেস্বর॥
মোর বাক্যে কোপে জলে কাটিবারে খর্গ তোলে
তুমী তায় রাখিলে আমারে।
লাথি মাইল মোর বুকে লঙ্কা ছাড়ি মনদুঃখে
আইলাম তোমার বরাবরি॥
মনেতে করিল আস হইব তোমার দাষ
ছাড়িলাম গৃহ সুত নারি।
লোকমুখে সুনি আমী দয়ার সাগর তুমী
গুননিধি দিনে দয়া করি॥
রাবন করিতে নাস ছলে আইসে বনবাস
অনাথপালন গুননিধি।

তোমার নামের গুনে সমনে দমন মানে
এ নামে বঞ্চিত কারে বিধি ॥
বিভিসনের স্তব সুনি তুষ্ট রাম গুনমুনি
ক্ষনে মনে করেন বিশ্বাস।
জেবা জনে সুনে ভনে বর দান নারায়নে
লাচারি রচিল কির্ত্তিবাষ ॥

৬৪। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—৫১। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০-১২ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৬৭ সাল (১১১৩ সালের পুথি দেখিয়া লিখিত)। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

মধ্য,—

আমার বচন সুন রাজিবলোচন।
জুক্তি বোলি ডাক দেখি পবননন্দন ॥
হনুমান বিনে কেবা লংঘিবে সাগর।
সুনিআ আস্যাজ্য কথা কহে রঘুবর ॥
বড় বড় বির জার নারিল লংঘিতে।
হনুমান কেমনে যাইবেক সমুদ্রপারেতে ॥
মন্তি বলে জন্মকথা সুন রঘুবর।
জে কালে জনম হৈল হনুমান বানর ॥
পঞ্চ দিনের জখন হৈল হনুমান।
অঞ্জনা বানরি গেলা করিবারে স্নান ॥
পর্ব্বতে সুতিএ ছিল মহাবির হনু।
প্রাতঃকালে অরুন উদয় হই[ল] ভানু ॥
ক্ষুধাএ পিড়িত হএ পবননন্দন।
লম্ফ দিএ উঠে বির লক্ষেক জোজন ॥
ধরিল সুর্য্যের রথ আপনার তেজেতে।
চমৎকার হৈল সুর্য্য লাগিল ভাবিতে ॥

ইন্দ্রের সদনে গিআ কহে দিবাকর।
আর কে জন্মিল রাহু সংসার ভিতর ॥
ধরিল আমার রথ আসি বিমানেতে।
এন সুনি দেবরাজ চাপি ঐরাবতে ॥
হাতে বজ্জ করি ইন্দ্র লড়িল সঘনে।
উপনিত হৈলা আসি হনুমানে স্থানে ॥
সিন্দুরে মণ্ডিত দেখি করিকুম্ভস্থল।
হনুমান বলে পায়্যা পাকা বিম্বফল ॥
ছাড়িআ সুর্য্যের রথ ধরি কোরিশুণ্ড।
নখে করি বিদারিএ মাতঙ্গের মুণ্ড ॥
মহাক্রোধে পুরন্দর ধেনুক টানিল।
আকর্ন্ন পুরিএ বান হনুরে মারিল ॥
আকাসমণ্ডল হৈতে পড়ে হনুমান।
চুর্ন্ন হএ গেল দেহ বাজি ইন্দ্রবান ॥
শ্চান করি অঞ্জনা আসি পুত্রেরে দেখিঞা।
বজ্জাঘাতে অঙ্গ ভঙ্গ রএছে পড়িআ ॥
অস্তি চর্ম্ম কোলে করি করএ রোদন।
শ্বরন করিল তবে দেবতা পবন ॥
অঞ্জনার শ্বরনে পবন মলয় ছাড়িআ।
দুজনে রোদন করে হনুমানে নঞা ॥
পবন বলএ মোর বৈরি পুরন্দর।
উনুপাচাস্ব কৈল্য মোরে গর্ব্ভের ভিতর ॥
পুতের উপরে মোর করে বজ্য বিটি।
তবে শে পবন আজি নাসে ব্রহ্মার ছিটি ॥
এত বলি উনুপচাস নিল কুড়াইয়ে।
মরিচে সকল জিব বাউ বর্দ্ধ হএ ॥
সুনিএ নারদের মুখে ব্রহ্মাদি দেবতা।
বাহনে চাপিএ জান হনুমান জোথা ॥
হংস্বের উপরে ব্রহ্মা হৈলা আরহন।
বৃসবে চাপিয়া জাত্রা করে পঞ্চানন ॥
সিংহের উপরে চাপি চলিলা পাব্বতি।
মউর উপরে চলে কাত্তিক সেনাপতি ॥

মুসক উপরে জাত্রা করে লম্বোদর।
মগরবাহনে জান জলের ইশ্বর॥
ছাগল উপরে অগ্নি হয়্যা আরোহন।
মহিসবাহনে চাপি চলিলা সমন॥
গরুড় উপরেতে চলিলা গদাধর।
উপনিত হৈলা সব পবন গোচর॥
ব্রহ্মা বলে তব পুত্র দিব বাঁচাইঞা।
শৃষ্টি রক্ষা কর তুমি বাউকে ছাড়িআ॥
এত বলি অস্তি চর্ম্ম করি একত্তর।
কুমণ্ডলের জল দিল হনুর উপর॥
জয়ধ্বনি দিআ গা তুলেন হনুমান।
দেখিএ আনন্দ কত অঞ্জনার প্রাণ॥
একে একে বর দেন জত দেবগণ।
ব্রহ্মা বলে ব্রহ্মঅস্তে না হবে মরন॥
গোবিন্দ বোলিলা মোর সুদরসন হতে।
না হবে তোমার মিত্তু আমার কৃপাতে॥
আনল বলিছে সুন হনু মহাবল।
তোমার পরসে আমি হই[ব] সিতল॥
বোরুন বলেন সুন অঞ্জনানন্দন।
জলনিধির জলে তোমার না হবে মরন॥
সিব বলেন সুল হৈতে পাবে পোরিত্রান।
ইন্দ্রবজ্রে না মরিবে সুন হনুমান॥
প[া]র্ব্বতি বলেন সুন মোর অসি হৈতে।
না মরিবে হনুমান আমার কৃপাতে॥
জম বলেন দণ্ড অস্তে না হবে মরন।
মোর বানে মিত্যু নাহি কহে সড়ানন॥
এত বোলি বর দিলাম জত দেবগনে।
সুনাইলা জাম্বুবান রাজিবলোচনে॥
সিসুকালের পরাক্রম সুন রঘুবর।
লম্ফ দিএ ধরেছিল দেব দিবাকর॥
এখন দিগুন বল করে দিলে রাম।
আপুনি দিএছ জারে তারকব্রহ্ম নাম॥
সুনিয়া মন্ত্রির কথা রামের উলাস।
সুন্দরাকাণ্ডের কথা রচেন কিত্তিবাস॥*॥
উঠিএ জানকিনাথ চান হনু পানে।
'আসিএ অঞ্জনাসুত বন্দিলা চরনে॥
বানর করিয়া কোলে ধরি দুটি হাত।
ছল ছল আখি দুটি কহে রঘুনাথ॥
তিভূবনে ক্ষাতি রাখ অঞ্জনাকুমার।
নিতান্ত জানিহ হনু ভরসা তোমার॥
জানকির বাত্রা আন ধুমুদ্র লংঘিএ।
মিনি মুলে দুটি ভাইকে লইবে কিনিএ॥
জানকির বিরহে মোর বিদরএ মন।
সিতা বিনে অন্দকার এ তিন ভুবন॥
এত সুনি হ[নু]মান কহে জোড় করে।
ভিত্যকে এমন কর কোন কার্য্যের তরে॥
(পৃ° ৩১২-৫১)

পশু জাতি অল্প ফলে তৃপ্ত হবে কেনে।
শ্রীরামের অন্ন পানে চাহে ঘনে ঘনে॥
এবারে গুরুর ফল কি জুক্তি করিব।
ভুভার:লালসা অতি রহিতে নারিব॥
পিতা সম রামচন্দ্র পুত্র সম আমি।
খাইব তোমার অন্ন ক্ষেমা কোর তুমি॥
এত বোলি অন্ন মুখে ফেলি দিল।
সে বারে বানরের কণ্টে আঠি জে লাগিল॥
পড়িএ অবনিতলে রামগুন গায়।
উদরে নামিল আঠি করে হায় হায়॥
(পৃ° ১৯১২)।

হোথা রাজা রাক্ষসে সুধায় দসানন।
জাঙ্গাল ভাঙ্গিএ মেলি কতেক জোজন॥
রাক্ষস বলেন রাজা সুন লঙ্কেশ্বর।
জে পর্ব্বত আনিআছে এক এক বানর॥
এক লক্ষ রাক্ষস ধরি নাড়াতে নারিলাম।
রাত্রে গীয়া এক জোজন জাঙ্গাল ভাঙ্গিলাম॥
রাবন বলিছে ধিক রাক্ষসের বল।
এত কাল রাজ ভোগে পুষিলাঙ নিষ্ফল॥

আজি রাত্রিকালে রথে আপুনি সাজিব।
চারি দণ্ডে সমস্ত জাঙ্গাল ভাঙ্গি দিব॥
দিন গেল রাত্রি হইল সাজিছে রাবন।
বাজিছে দামামা বাগু সুখি দসানন॥
সাজায় পুষ্পক রথ কাঞ্চন তার নাম।
ব্রহ্মার নিৰ্ম্মীত রথ অতি অনুপাম॥
সনার কলস সব রথধ্বজে সাজে।
চৌদিগে রথখানার জয়ঘণ্টা বাজে॥
রজত কিংকিনি রথে রাঙ্গা পাটের দড়া।
চৌদিগে নিৰ্ম্মিত রথে নেতের পাছড়া॥
দস মুণ্ডে মকুট পরিল দসানন।
সর্ব্বাঙ্গে পরিল রাজা রতন অভরন॥
দস হাতে দস ধনু পীস্টে বান্ধা তুন।
রথের উপরে চাপে রাজা দসানন॥
নয় লক্ষ রাক্ষস সাজিল রাজার সাথে।
রাত্রিকালে জায় রাজা জাঙ্গাল ভাঙ্গিতে॥
নিদ্রাগত হএ আছে জত কপীগন।
রথ হইতে জাঙ্গালে নাম্বিল দসানন॥
কুড়ি হাতে করি জেই ধরিল সিখর।
সুল হাথে করি আসি ডাড়াল সঙ্কর॥
দেখি প্রনাম করে লঙ্কার ইস্বর।
জাঙ্গাল উপরে তুমি কি লাগি সঙ্কর॥
সুলপানি বলে সুন রাজা দসানন।
জাঙ্গালের রক্ষক দিলেন রাজিবলোচন॥
হাসিছে রাবন রাজা সুনি হরের কথা।
মানুসের স্বহায় তুমি দেবাদি দেবতা॥
এত সুনি সদাসিব রাবনেরে কয়।
রামচন্দ্রে বুঝিলাম না জান পরিচয়॥
পুন্নব্রহ্ম রামচন্দ্র লক্ষি জনকঝি।
রাম মন্ত্রে উপাসক আমি হইছি॥
জাঙ্গাল ভাঙ্গিতে সক্তি নাহিক তোমার।
লঙ্কা মুখে ফেরে জায় না থা[কি]হ আর॥

দসানন বলে বুঝি মোরে হলে বাম।
ভোজবিদ্যা দি তোমায় ভুলাইল রাম॥
সুন সদাসিব ভলা যেমন তোমার লিলা
না হইলে মোরে কিপাবান।
দেখিয়া বোরির বল বেলা পেঞা কৈলে ছল
মত্তি ধরি ভয় দেখা ান॥
রাবন তোমার ভক্ত জানে ইহা তিজ[গ]ত
তাথে তোমার এতেক ছলনা।
হেন সেবক ঘুনা করি ভাসাইলা লঙ্কাপুরি
তোমায় আর সেবিব কোন জনা॥
লয়্যাছিলাম পদছায়া জানিলাঙ জতে [কি] দয়া
বুঝিলাম ঠাকুরালিপনা।
কোলাস গিরি ছাড়িয়া বিপক্ষের পক্ষ হঞা
জাঙ্গালে বসিয়াছ থানা॥ ইত্যাদি।
(পৃ° ৪৬।১-২)

শেষ ৬২ সংখ্যক পুথির অনুরূপ।

৬৫। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪½ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-১৫, ১৭-৪১। প্রতি পৃষ্ঠায় ১৩-১৪ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

মধ্য,—

অন্ত[ঃ]পুরে জানকির না পেএ সন্ধান।
চঞ্চল হইল মনে পবনসন্তান॥
হনু বলে আইলাম সুমুদ্রের পার।
সিতা না দেখিএ দেখি কুচ্ছিত আকার॥
চোরের মত এস্যেছিলাম চোরের মত জাব।
বিরপনা লঙ্কাপুরে কিছু জানাইব॥
জুবতির জটে জুটে করিএ বন্ধন।
রাবনের কেসে বান্ধে পবননন্দন॥ (পৃ° ৭।১)

বিরবাহু সুবাহু ঘর তাহার দক্ষিনে।
তার পর গেল বির অতিকাভুবনে॥
বিরলে বসিএ বির রাম নাম ডাকে।
দাণ্ডাইএ হনুমান দেখিল তাহাকে॥
তার পর গেল বিভিসনের ভুবনে।
দ্বারে আরোপিত জার তুলুসিকাননে॥
দ্বারেতে আছএ লেখা শ্রীরামের নাম।
বৈষ্ণবের চিহ্ন সব দেখে হনুমান॥ (পৃ০ ৭।২)
নিদ্রা হৈতে উঠিএ বসিল দশানন।
রমনির জটে জটে করিছে বন্ধন॥
জটে জটে বান্ধা জত আছএ জুবতি।
দেখিএ আশ্চর্য্য ভাবে লঙ্কার ভুপতি॥
এমন আসূচজ্জ কর্ম্ম করে কোন জন।
উগ্রচণ্ডা দ্বারি জার চোকী দেবগন॥ (পৃ০৮।২
মন্দোদরি বলে রাজা কহিএ তোমারে।
মন্দবাক্য কভু না বলিবে জানকিরে॥
সিবমন্তে পাসউকভঞ্জহ সঙ্করে।
রামমন্ত্র জপেন সিব কহিএ তোমারে॥
গুরুর গুরু পরমগুরু তাঁর বিবাহিতা।
সাস্তের [সিদ্ধান্ত] সিতা তব গুরুমাতা॥
জানকি আনিয়া হৈল কর্ম্ম অদভুত।
লঙ্কা মর্দ্ধে অবস্ত এসেছে রামদুত॥ (পৃ০ ৯।১)
সুনি ক্রোধে পুর্ন হএ লঙ্কাঅধিপতি।
বিভিসনের বক্ষস্থলে মারিলেক নাথি॥
রামকে ডাকিয়া ভুমে পড়ে বিভিসন।
বর্জ্জপদাঘাতে পড়ে হএ অচেতন॥
পদাঘাতে বিভিসন হইল কাতর।
অচেতন হএ পড়ে অবনি উপর॥
অতিকা আসিএ বিভিসনে কোলে নিল।
নেতের বসনে তার অঙ্গ মুছাইল॥
বৈষ্টব পরসে তার হইল চেতন।
অতিকা কহিল খুড়া না কর রোদন॥
পদাঘাত নয় তোমার ছত্রদণ্ড হল্য।
অতপর রাবনেরে কমলা ত্যাগিল॥ (পৃ০ ৩০।১)

৬৬। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩½×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৫-৫১। প্রতি পত্রে ১০ পঙ্ক্তি। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

মউর উপরে কাত্তিক দেবসেনাপতি॥
মুসক উপরে জাত্রা করে লম্বোদর।
মকরবাহনে জান দেব জলেস্বর॥
ছাগল উপরে অগ্নি হএ আরহন।
মহিস উপরে চাপী চলিলা সমন॥ ইত্যাদি।

এই অংশে ৬৪ সংখ্যক পুথির সহিত মিল আছে।

মধ্য,—

পথে পথে আভরণ পেলি আইস তুমি।
কুড়ায়া তোমার হার রেখাছিলাম আমি॥
সে হার দিলাম আমি রাজিবলোচনে।
চিনিতে তোমার হার দিলেন লক্ষনে॥
লক্ষন বলেন প্রভু সুন রঘুমুনি।
আভরনের মর্দ্ধে আমি নেপুর মাত্র চিনি॥
চরনের ধুলা নিতে মোর অধিকার।
চরন দেখিয়া মাএর হইতাম নমস্কার॥
ডালে হইতে হনু কহে সুন জনকঝি।
রামমুখে তারকব্রহ্ম নাম পেয়্যাছি॥
সুগ্রীবের সঙ্গে রাম মৈত্র করিয়া।
বলিবক্ষ বিদারিলা ধনুর্ব্বান নিয়া॥
সুগ্রীবে রাজত্ত্ব দিয়া কিস্কিন্দানগরে।
একর্ত্ত হয়াছে জড় জতেক বানরে॥

সত অক্ষহিনি বানর ভালুক জুথে জুথে।
মাল্যবানে থানা দিল সুগ্রীব সহিতে ॥
চৌদিগে বানর গেল তোমার অন্যাসনে।
সমুদ্র হইতে পার নারে কোন জনে ॥
শ্রীরামচন্দ্র বলে তরিলাম আমি।
দুথ সব তোমার না ভাবিহ তুমি ॥
পরিচয় পেয়া মাএর হৃিদয় জুড়ায়।
ধরিয়া তরুর ডাল বানরে সুধায় ॥
মৃতদেহে প্রানদান কে করিলি মোর।
জনমে জনমে ধার না সুধিব তোর ॥
কাতরে জানকি বলে মোর বাক্য রাখ।
জুড়াক পরান আমার রাম বল্যা ডাক ॥
এথন পৃর্ত্তয় মোর নাহি লয় প্রানে।
রাক্ষসে দারুন মায়া নানা জন্ত্র জানে ॥
জদি ভুলাইতে আইল্যা দুথিনির মোন।
তোরে পাঠাইয়া জদি দিলেক রাবন ॥
কল্পনা করিয়া জদি বসিআছ আসী।
ডালে হইতে ভুমে পড় হয়্যা ভস্মরাসী ॥
জদি নাথের দুত বট রামের কিঙ্কর।
নাম সুনালি জেন জুড়াল্য অন্তর ॥
উল্যাসে সংবাদ লয়্যা আইলি মোর ঠাঞি।
চারি জুগে অমর হও মিত্তু হবে নাঞি ॥
রামপাদপদ্রে জদি থাকে মোর মোন।
এড়াবে সমন দায় পবননন্দন ॥
সুনি প্রেমে পুলকিত হইয়াছে তনু।
অশ্রুজলে পরিপুর্ন মহাবির হনু ॥
শ্রীরাম জানকি বল্যা ডালেতে বসিয়া।
অসোকের বৃক্ষ হইতে পড়ে গড়াইয়া ॥
জানকির পাদপদ্রে পড়ে গড়াইয়া।
দাণ্ডায় অঞ্জনাসুত কৃতাঞ্জলি হয়া ॥
বিষতপ্রমান দেখি বানরের গা।
মনেতে বিস্ময় হয়্যা ভাবে সিতা মা ॥

রামতর্ত্ত দিলেক ইহার এই কলেবর।
কেমনে লঙ্ঘিয়া আইল বিলক্ষ সাগর ॥
জানকি বলেন জদি বট রামদুত।
দেখিয়া তোমার অঙ্গ লেগেচে অদ্ভুত ॥
প্রাননাথ সঙ্গে জদি হয়্যাছে দরসন।
বল দেখি রামচন্দ্রের কেমন বরন ॥
এত সুনি কহিতে লাগীল হনুমান।
কহি রামের পরিচয় কর য়বধান ॥
আজানুলম্বিত ভুজ অতি য়নুপাম।
সিরেতে চাঁচর জটা দুর্ব্বাদলস্যাম ॥
পদ্রকে জিনিয়া দুই নয়ান কোমল।
ইন্দ্রধনু ভুরুভঙ্গি করে টলটল ॥
সুমেরুসিঙ্গ জিনি বক্ষ নাভি গভির।
অতি সে দয়ার নিধি তোমার রঘুবির ॥
সিতার পৃত্তয় হয় সুনি বিরের কথা।
এবারে জিজ্ঞাসা করেন রামচন্দ্র কোথা ॥
হনু বলে মাল্যবানে আছেন রঘুনাথে।
ভালুক বানর সব সুগ্রীবের সাথে ॥
জানকি জিজ্ঞাসা করেন পবননন্দনে।
কি চেষ্টা দেখেন রাম কও বিবরনে ॥
হনু কহে সুন মাতা জনকের ঝি।
তব নাম করেন রাম ইহা সুনেছি ॥
জানকি বলেন বাপু কহ দেখি সুনি।
আর কে তার সঙ্গে আছে একা রঘুমুনি ॥
কান্দিছে অঞ্জনাসুত সুন মোর বচন।
রাম সঙ্গে আছে তার অনুজ লক্ষন ॥
সুনিয়া নয়ানজলে ভাসে জনকঝি।
দেওরের তর্ত্ত বাছা তোরে জিজ্ঞাসী ॥

(পৃ০ ১৪-১।২, ১৫-১।)

শেষ ৬২ সংখ্যক পুথির সহিত মিলে।

৬৭। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২-১৯, ৩৬-৪৫, ৪৭-১১২.। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

মধ্য,—

দুর কর অভিমান দেহ রে অভয় দান
শুন বাছা পবননন্দন।
এই সব সেনাপতি দেবতার পুত্র নাতি,
জত দেখ তর্জ্জন গর্জ্জন॥
সাগর তরিবার বেলে কেহো ত না মাথা তুলে
সভাকার বুঝিলাম * ।

* * * * * *

* * * * ॥

সঙ্কটে করিতে পার তুমা বিনে নাঞী আর
একে একে বুঝিলাম বিচার।
অশিম বিক্রম তুমি * * পবনগামি
তাহে তুমি রূদ্র অবতার॥
সর্গ মর্ত্ত নাগপুরি ত্রিভুবনে গতি করি
তুমা এসব নাঞি আঁটে।
সতেক জোজন সার হেলায় হইবে পার
এনা কি বিসম বড় বটে॥
তুমি ত প্রধান বির পরম ধার্ম্মিক ধির
পরম পণ্ডিত গুনবান।
এই জে বানরবৃন্দু সভাকার তুমি ইন্দু
কেহো নহে তুমার সমান॥
উঠ উঠ কোপীরাজ চিন্তহ রামের কাজ
যুগ্রিবেরে সত্যে কর পারে।
খণ্ডাহ শিতার ভয় সভে জেন ধন্ত কঅ
জস জেন ঘুসয়ে সংসারে॥
আমার বচন রাখ ঝাঁট জেয়া শিতা দেখ
সভাকার মন কর সুখি।
তোমার বাপের পুন্ন্যে দেসে জাই সব জনে
রোঘুনাথের চাঁন্দমুখ দেখি॥
অঙ্গদে এতেক বলি করিছেন কলাকলি
দেখিআ হাশিলা জাম্বুবান।
বানিকণ্ঠে কহে পুন মন দিয়া সভে শুন
হনুমানের জন্মের বাখান॥

(পৃ০ ৪।২-৫।১)

উদ্ধৃত পদটি বাণীকণ্ঠের রচনা। এ ব্যক্তি কে, জানিবার উপায় নাই।

ভয়ঙ্কর রাক্ষশি দেখিআ ত ভয় বাশি
তাথির ভিতরে জনকনন্দিনি।
কে দেই আহার পানি জাগি পুহায় রজনি
জেন হরিনিকে বেড়িল বাঘিনী॥
হনুমান চল বাছা শিতার উর্দ্দেসে।
অনাথিনি দেবি শিতা সোকে হয়্যা দুখিতা
বেড়িআছে দুরন্ত রাক্ষসে॥
শ্রীরাম লক্ষন খুসি সুখি সিতা চন্দ্রামুখি
বানররাজ সুগ্রিব হব খুসি।
আমা সভার বোল রাখ আর কোন জনা দেখ
তুমি গেলে সভে হব সুখি॥
তুমি সাগর হইলে পার বানর কটকের নিস্তার
রাম লক্ষন হরিস অপার।
সিতা দেবির উর্দ্ধার রাবনের ঘুচে অহঙ্কার
তুমার জশ ঘুশিব সংসার॥
জল স্থল অন্তরিক্ষে জে তুমা হইতে দেখে
সে সকল পড়য়ে তরাসে।
শুন্দরাকাণ্ডের শুন্দর গিত সর্ব্বলোক হরশিত
রচিল পণ্ডিত কির্ত্তিবাস॥

(পৃ০ ৬।১-২)

৬১ সংখ্যক পুথির 'জনকনন্দীনি সিতা

শ্রীরামের বনিতা' ইত্যাদি ত্রিপদীটির সহিত উদ্ধৃত অংশের কতক মিল আছে।

বাছা হনুমান সেল রহিল হৃদিমাঝে।
আর না দেখিল রাম   লুকাল্য জানকি নাম,
পরিনামে বুঝিলাম কাজে॥
কাহারে কহিব ইহা   কহিতে বিদুরে হিয়া[১]
মন দিআ শুন হনুমান।
জনম ভরিআ দুখ   কোন কালে নাহি সুখ
কত সহে অবলার প্রান॥
ছিলাম বাপের ঘরে   সে দুখ কহিব কারে
হরধনু পন কৈল পীতা।
প্রভু আসি মুনিসঙ্গে   জজ্ঞ রাখিবার রঙ্গে
বিভা কৈল অভাগিনি সিতা॥
সশুরমন্দিরে বাস   সভে ছিল দস মাস
চোদ্দি বৎসর বসি বনে।
তাতে বিধি হল্য বাম   মৃগছলে গেলা রাম
সৈন্য ঘরে হরিল রাবনে॥
বিধি বড় নিদারুন   অতিসয় নিকরুন
বনে মোরে না দিল গুআন্ত।
কনকের মৃগি হয়্যা

ইহার পর ৪৬ সংখ্যক পত্রের অভাব।

পঠমঞ্জরি রাগ॥

রাজারে নোওাইয়া মাথা সুক সারন কহে কথা
শুন হে লঙ্কার লঙ্কেশ্বর।
এ কথা কহিব কায়   কেবা পতিত জায়
জলনিধি উপরে পাথর॥
সিন্ধুমধ্যে ভাসে শিলা   বানর চাপে গুলা গুলা
থিয়ারিআ জেন খেলা করে নাঅ।
বানর দির্ব্ব কাচুটি ধরে   পারিজাতমালা পরে
পঞ্চস্বরে গিত গেয়্যা বেড়ায়॥

বানরের নেঙ্গুড়গুলা   জেন দেখি মেঘমালা
এক চাপে ভেদিল গগন।
সুর্জ্জ ছাড়ি নিজ কান্তি   পলাইলা নিসাপতি
কম্পিত হইলা তারাগন॥
ঘরপড়া জেন ঠান   কোটি কোটি বলবান
দাণ্ডাইয়া আছে রামের পাসে।
জবে দেই রাম আজ্ঞাখানি শুমেরু ভাঙ্গিআ য়ানি
রামচন্দ্র না করেন প্রকাসে॥
পুর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিন বড়ই আশ্চর্য্য কথন
সাগর পরিক্ষা লক্ষ জোজন।
নদ নদি কন্দ রন   জত জত ফিরি বন
সর্ব্বত্রে দেখি বানরগন॥
বানর বড় বলবান   পর্ব্বতে দেই টান
উপাড়য়ে সর্ব্ব মহাবল।
অচল কুচল নাড়ে   স্যঙ্গে গগন জোড়ে
গজ খায়ে মন্দাকিনির জল॥
জাঙ্গাল বান্ধে নল নিল   অতুল বিক্রমসিল
পর্ব্বতগুলা বাম হাথে লোফে।
আড়ে দস জোজন   জাঙ্গাল পত্তন
পাথর বৈশায় কাঁপে কাঁপে॥
দুই চরের বোল সুনি   ত্রাসিত নৃপমনি
কি বলিলি শুক সারন।
হেন বোল প্রকাস   [হৈল তোর মতি নাস]
কিম্বা পথে দেখিল সপন॥
দ্বাদস সুর্য্যের উদয়   তবে পরতিত হয়
প্রত্যক্ষে দেখাব নয়নে।
সপ্ত সাগর একিকালে   জদি হয় নিজ্জলে
তবে ত এ কথা প্রমানে॥
রাজা কঅ এ কথা শুনি   পবন ডাকিআ আনি
পুষ্পক রথ করহ সাজন।
দুই চর জত কঅ   মোর মনে কিছু [না] লয়
ইহা [আমি] দেখিব নয়ানে॥

১। হিআ বা হিয়া।

রাজা উঠিআ আইল সৈর্য্য বির্জ্জ অঙ্গে হইল
নির্ভেজ হইল ঘুচিল মনের আনন্দ।
কির্ত্তিবাস কবি কঅ মনে রাজা পেয়্যা ভয়
দেখিতে নাড়িলা সেতবন্ধ॥
(পৃ০ ১০৫।২-১০৬।২)
সেতুবন্ধনে পুথি শেষ হইয়াছে।

৬৮। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩১/২×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ১-২, ১৫-৪৪। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৬৬ সাল। খণ্ডিত। প্রাপ্তিস্থান, বর্দ্ধমান।

মধ্য,—

হিত বুঝাইতে হইলাম লাথির ভাজন।
সবংসে রামের হাথে তোমার মরন॥
পূর্ব্বকথা কহি ভাই তাহে দেহ মন।
বনজুয়া হাথি বনে চড়ে নিতি নিতি॥
পোষনিয়া হাথি দায় তাহার সংহতি॥
পোষনিয়ার দেখাদেখি পৈষে কাটগড়া।
তখন বেদেতে বান্ধে পায়ে দিয়া দড়া॥
জ্ঞাতির মিসালে হৈল জ্ঞাতির বন্ধন।
তোমার সঙ্গেতে আমী মরি কী কারন॥
জমের দ্বারেতে তুমি রহিলে বন্দন।
মরনকালে স্বঁরিহ আমার বচন॥
এ ধন সম্পদ পায়্যা মর্ত্ত হইলে তুমি।
রামের স্বরন নিতে এই জাই আমী॥
তবে জদি ক্রপানিধি ক্রপা নাই করে।
রামনাম লয়্যা প্রান তেজিব সাগরে॥
তথাপী তোমার সঙ্গে না রহিব এথা।
পতিতে স্বরন রাম দিবেন সর্ব্বথা॥
স্বরনপঞ্জর রামচন্দ্র গুননিধি।
চরনে স্বরন নিব জনম অবধি॥
অনাথপালন দয়া অপার মহিমা।
ব্রহ্মা আদি দেবগন দিতে নারে সিমা॥
সভামধ্যে ডাক দিয়া বলে বিবিসন।
ইহার মধ্যে আমার সঙ্গি হবে কোন জন॥
জে জাইবে মোর সঙ্গে বড়ই সেয়ান।
ঘর সব রক্ষা পায় তাহার পরান॥
রাম জারে সদয় সাফল তার তনু।
সাক্ষাত পাইল পবনের পুত্র হনু॥
নল আনল পাত্র ভিম সম্পাতি।
ডাক দিয়া বলে তারা জাইব সংহতি॥
সেইখানে ছিল তার পুত্র তরন।
পিতা পুত্রে লই গিয়া রামের স্বরন॥
কুপিল শুনিয়া পুত্র পিতার উত্তর।
তোমা হেন নহি আমী প্রানেতে কাতর॥
জ্ঞাতি ছাড়িব আর লঙ্কার আওয়াষ।
মানুষের স্বরন নিব লোকে উপহাষ॥
বিবিসন বলে পুত্র জিয়ন্তে মলি।
আজি হইতে তর্পনের দিব তিলাঞ্জলি॥
তার পর বিবিসন গেল মায়ের স্থানে।
হিত বুঝাইতে লাথি মারিলে রাবনে॥
লঙ্কা হৈতে খেদারিয়া দিলেক আমারে।
স্বরন লইতে জাই রাম বরাবরে॥
নিকষা বলেন বাছা সুন বিবিসন।
রন্ধন করিয়া দি করহ ভোজন॥
উৎকট সময় জাকু বেলা অবসানে।
তবে সে জাইহ প্রভু রাম দরসনে॥
জোড়হাথে-জননিরে করে নিবেদন।
সকল ভুঞ্জিব সুখ রাঘবমিলন॥
মায়ের চরন তবে করিল বন্দনা।
স্ত্রীর নিকটে গেল জেখানে সরমা॥
হিত বুঝাইতে লাথি মারিলে আমারে।
রামের স্বরন নিব কহিল তোমারে॥

জাবত লঙ্কায় রাম নাহি আনি আমী।
তাবত সিতার প্রান রক্ষা কর তুমি ॥
সরমা সুন্দরি বলে সুন প্রানপতি।
রাঘবচরন বিনা অন্য নাই গতি ॥
সুভক্ষণে বিবিসন রথে গিয়া চড়ে।
কিত্তিবাষ বলে লঙ্কায় দায় পড়ে ॥

(পৃ° ৩৪।১-৩৫।১)।

৬৯। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩½ × ৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-৩০। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। অসম্পূর্ণ।

হনুমানের জন্ম-বৃত্তান্ত হইতে আরম্ভ। ৬১ সংখ্যক পুথির সহিত মিল আছে।

পূর্ব্বকথা কহি তাহা কর অবধান।
স্বর্গে বিন্তা[ধরি পুষ্পগন্ধা] তার নাম ॥
তার কন্যা হইল নামে অঞ্জনা বানরি।
বিন্তাধরি কন্যা সেই পরমসুন্দরি ॥
অঞ্জনার রূপের কথা বড়ই অদ্ভুত।
রূপে আলো করে জেন পড়িছে বিদ্যুৎ ॥
মলয়া পর্ব্বতে আছে কেসরির ঘর।
অঞ্জনা লইয়া কেলি করে নিরন্তর ॥
ইর্ষারূপে ধরিতে হইল মানুসি।
পর্ব্বত উপরে আছে পরম রূপসি ॥
চৈত্র মাস প্রবেস জবে বসন্ত সময়।
হেন কালে পবন গেল পর্ব্বত মলয় ॥
তথায় বসন্ত বায়ু বহিছে পবন।
কামেতে জর্জ্জর হইল অঞ্জনার মন ॥
সন্ধান না পায় পবন কেসরি দুর্জ্জয়।
পবন চাহিয়া তার না পায় সময় ॥
মলয় বসন্তে হৈল অঞ্জনা ব্যাকুল।
ঋতুস্থান করিতে গেল নর্ম্মদার কুল ॥
সন্ধান পাইয়ে তথা গেল ত পবন।
ঝরে বসন উরাইয়া দিল আলিঙ্গন ॥
অঞ্জনা বলেন পবন কৈলে কোন কর্ম্ম।
কোন কার্য্যে নষ্ট কৈলে পতিব্রেতা ধর্ম্ম ॥
দেবতা হইয়া তুমি কর হেন কাজ।
বানরি করিলে ইর্ষা নাহি কিছু লাজ ॥
কেসরি জানিলে মোর সংসয় জীবন।
সাপিব তোমারে আমি শুনহ পবন ॥
পবন বলে আর কিছু না বল অঞ্জনা।
রমনির রূপে নর পাসরে আপনা ॥
দেবে মহাপাপ হয় পরস্ত্রী গমনে।
জাতি কুল বিচার তার করে কোন [জনে]॥
দুঃখ সম্বরিয়া তুমি জাহ নিজ ঘরে।
মহাবির জন্মাইবে তোমা[র] উদরে ॥

শেষ,—

কাপিছে সকল অঙ্গ তোমার তরাসে।
কেমনে কহিব কথা মনে নাহি আইসে ॥
হাসিয়া বলিছে তবে রাজা লঙ্কেশ্বর।
সত্ত কথা কহ মোরে কিছু নাহি ডর ॥
হনুমান বলে সুন দিই পরিচয়।
সূর্য্যবংসে অজোধ্যার রাম মহাসয় ॥
দুর্জ্জয় রাক্ষস হৈল ভুবনে অজয়।
ইন্দ্র জম কুবের জাহারে করে ভয় ॥
দেবগনে ধরি সদা করে অপমান।
ক্ষিরদসয়নে ছিলা প্রভু ভগবান ॥
কান্দিয়া দেবতাগন কহে আর ঠাই।
রাক্ষসের হাতে প্রভু আর রক্ষা নাই ॥
দেবগনের দুঃখ দেখি প্রভু নারায়ন।
রাক্ষস নাসিতে জন্ম লইলা আপন ॥
চারি অংসে জন্ম লয়ে দসরথের ঘরে।
লক্ষিরূপা সিতা ছিলা মিথিলা নগরে ॥

বিবাহ করিয়া রাম প্রভু নারায়ন।
ছল করি সত্ত পালিবারে আইলা বন॥
নাসিতে রাক্ষসকুল প্রভু গদাধর।
বাস কৈলা পঞ্চবটির বনের ভিতর॥
হাতে ধনুর্ব্বান সদা সহিতে লক্ষন।
জার নাম সুনি ভয় করয়ে সমন॥
মৃগ মারিবারে বনে গেলা রঘুবর।
সিতা চুরি কৈলে তুমি পায়ে সর্ম ঘর॥
দেখাদেখি হইলে জানিতে দসানন।
এক বানে দেখাইতেন জমের ভুবন॥
বালি রাজা আছিল বানরের অধিপতি।
সুগ্রিব তাহার ভাই কিস্কিন্দা বসতি॥
বালি রাজা সুগ্রীবের রাজ্য নাহি দিল।
সুগ্রিবের নারি বলে কারিয়া নইল॥
বালির ভয়তে সদা সুগ্রিব আকুল।
কান্দিয়া ফিরয়ে বনে খায় ফল মূল॥
রিস্যমুখ পর্ব্বতে রহিলা বহু দিন।
বালির ভয়েতে বসি কান্দে রাত্রিদিন॥
সিতা খুজি ফেরেন রাম সেই তো কাননে।
পর্ব্বত উপরে দেখা হইল দুই জনে॥
আপনা আপন দুঃখ কহে দুই জন।
মৈত্রতা করিল দোহে হরসিতমন॥
পিতিজ্ঞা করিয়া রাম কহেন সুগ্রিবেরে।
বালি মারি রাজ্য আমি দিব জে তোমারে॥

৭০। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, তুলোট কাগজ। আকার, ১৪½ × ৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৩০২। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১১৭৪ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, মেদিনীপুর।

আদি,—

রামায় রামচন্দ্রায় ইত্যাদি শ্লোক।

ক্ষিরোদ পন্নগ সিজে স্বেত সপ্ত দ্বিপ মাঝে
গুপ্তবেসে ছিলা নারায়ন।
অমরের স্তুতি পায়্যা সুর্য্যকুলে পদ্ম হয়্যা
জর্ম্মিলা রাবণসংহারন॥
বালক কালের লিলা যজ্ঞ রাখিবারে গেলা
হরধনু ভাঙ্গী আচম্বিতে।
খণ্ডিলে জনকভিত রঞ্জিলে জানকিচিত
ভৃগুর রুন্ধিলে স্বর্গপথে॥
পরসিয়া পদরেনু পাসানে মানুসতনু
কৃপায় চণ্ডালে কৈলে সখা।
পিত্রিবাক্যে গেলা বন উদ্ধারিলে কপীগন
পাপের নাহিক জার লেখা॥
হেন কপী সংহতি বন্ধ কৈলে নদিপতি
ত্রিভুবনে জয় জয় ঘোষে।
কপিগন নল হেতু সাগরে বান্ধিলে সেতু
জলেতে পাসান তরু ভাসে॥
মারিয়া অশেষ বৈরি অজোধ্যায় দণ্ডধারি
বেদবতি নয়্যা অনুবন।
অনাথ জনার বন্ধু কেবল করুনাসিন্ধু
তুমী প্রভু সেবকবৎসল॥
ধ্যানে কিঞ্চিত ধ্যান যোগী হৈলা পঞ্চানন
নারদ বিনাতে গুন গায়।
ব্রহ্মা আদি জত দেবে উ পদপঙ্কজ সেবে
কপীরা পরমপদ পায়॥
তুয়া পদ অর্ঘ্য জল ক্ষাতি গঙ্গা মহিতল
ত্রিপথগামিনি নাম ধরি।
পরসিলে বিন্দু জল ইন্দ্রপদ করতল
হেলায় সমনভয় তরি॥

চরনকমল রাঙ্গা তাহাতে মৃনাল গঙ্গা
হরসীরে মালতির মালে।
তুয়া কির্ত্তিল যা অই বাল্মিকি বাখানে তাই
প্রসাদে রাখিহ পদতলে ॥

পরবর্ত্তী ত্রিপদীটিও প্রসাদ দাসের ভণিতাযুক্ত। তাহার পর,—

মঙ্গল রাগ ॥

প্রনমহো রাম দসরথের কুমার।
লক্ষন কনেষ্ট জার অংশ অবতার ॥
জনকনন্দি[নি] সীতা লক্ষ্মী মুর্ত্তিবতি।
বন্দিব চরণ তার করিয়া ভকতি ॥
ভরথ সত্রুঘ্ন বন্দো দুই সহোদর।
অঞ্জলি করিয়া বন্দো বাল্মিকি মুনিবর ॥
মহামুনি বাল্মিকি বন্দো হাথে করি তাল।
শ্লোকছন্দে রামায়ন রচিল রসাল ॥
অবতার হৈতে ছিল সাটী হাজার বৎসর।
ভবিস্বতি পুরান কৈল বাল্মিকি মুনিবর ॥
সে সকল কবিত্ত লোকে বুঝিতে বিসম।
কির্ত্তিবাস করিল সরস মনোরম ॥
ফুলিয়ার মুখটী পণ্ডিত কীর্ত্তিবাস।
জাহার প্রসাদে রামায়ন হইল প্রকাস ॥*॥
যোড়হাথে বন্দো হনুমানের চরন।
হনুমান বন্দিয়া গাইব গীত রামায়ন ॥
আদিকাণ্ডে রামের জন্ম সিতা দেবীর বিভা।
রার্য্য হারাইলা রাম অজোধ্যা আসিয়া ॥
অরন্য[১] কাণ্ডে করিলা রাম প্রবেস কাননে।
অরন্যকাণ্ডে সিতা চুরি করিল রাবনে ॥
কাণ্ডে কাণ্ডে রঘুনাথের সর্ব্ব অপচয়।
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে মৈত্রলাভ কটকসঞ্চয় ॥
সুন্দরাকাণ্ডে সেতুবন্দ গীত মনোহর।
কটক সহিত পার হল্যা রঘুবর ॥
পাঁচ কাণ্ডে গাইল গিত নানা রসভাস।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইব গীত বন্দিয়া কীর্ত্তিবাস ॥*॥
রঘুবর সুন্দর রাম হে রাম
নবদূর্ব্বাদলস্যাম রাম ॥
সুন্দরাকাণ্ডে গাইল গীত সুন্দর কাহিনি।
লঙ্কাকাণ্ডে সুন কটকের হানাহানি ॥
বন্দ গেল সাগর কটক হইল পার।
দিনে দিনে রাবনের টুটে অহঙ্কার ॥
অহঙ্কার টুটে রাজার বাড়ে অভিমান।
অভিমানে খসিল হাথের গুয়া পান ॥
ফাফর হইল রাবন রাজা মনে মনে গুনে।
সুক সারন দুই চরে ডাক দিয়া আনে ॥
চোরে বলি সুক সারন মন্ত্রির প্রধান।
রামের কটক চর্চ্চিয়া আইস মোর স্থান ॥

(পৃ০ ২।২—৩।১)

অই দেখ লঙ্কেস্বর বসিয়াছেন রঘুবর
নীল কলেবর সুসোভন।
অঙ্গদ চাপীছে হাথ বিরাসনে রঘুনাথ
অই দেখ বামেতে লক্ষন ॥
সুগ্রিব দক্ষিনভাগে জাম্বুবান রামের আগে
অই দেখ বির হনুমান।
কেসরি কুমুদ পাসে বসিয়াছেন হরিসে
বির সব পর্ব্বত প্রমান ॥
মায়া মারিচের চাম তাহার উপরে রাম
অই দেখ হাথেতে কোদণ্ড।
বিভিষন রামের কাছে নানা মত যুক্তি দিছে
বুঝিল্যাও লঙ্কা লণ্ডভণ্ড ॥ ইত্যাদি।

(পৃ০ ৭।১)

ভালুক বানর লয়্যা সাগরের পার হয়্যা
রহিলেন জলনিধি তিরে।
রাক্ষস পাইল সঙ্কা কম্পমান হৈল লঙ্কা
দেখিলেক অন্তরিক্ষচরে ॥

১। 'অযোধ্যা' হইবে বোধ হয়।

ততক্ষনে সাজিল ধাড়ি গদা টাঙ্গী নিল বাড়ি
বান এড়িল্যাঙ খরসান।
আমি তোর বড় বির মনে নাহি হৈল স্থির
কাটীয়া করিল দুই খান॥
ভয়ানক হয়্যা মন পালাইল লক্ষন
রঘুনাথের হের দেখ মাথা।
সুগ্রিব অঙ্গদ বির বিভিষন অস্থির
অঙ্গদ দেখিয়া পাল্য ব্যথা॥ ইত্যাদি।
(পৃ০ ১৪।২—১৫।১)

মায়ের বচন সুনি দসানন বলে বানি
সুন সর্ব্ব পাত্রমিত্রগন।
ই তিন ভুবনমাঝে দেব দৈত্য যত আছে
কারে না ডরায় দসানন॥
আপনার বাহুবলে সংসার জিনিল হেলে
চন্দ্র সুর্য্যে সঙ্কা নাহি করি।
সে মোরে দেখায় ডর জত বলি নিসাচর
বানরে বেড়িল তব পুরী॥
রাম সে মানুসজাতি তাকে কেন মোর ভিতি
সীতা কেন সমর্পিব তারে।
আপনি করিয়া রন বিনাসিব কপীগন
শ্রীরামে পাঠাব যমপুরে॥ ইত্যাদি
(পৃ০ ২০।২)

যোড়হাথে হনুমান কর রাজা অবধান
সর্ব্বকথা কহি তোমার ঠাঞি।
আছিল্যাঙ দ্বারে দ্বারি কোন জন করিল চুরি
জদি জানি তোমার দোহাই॥
দ্বারে ছিল্যাঙ একেশ্বর মায়া পাতে নিসাচর
সে কথা কহিতে ভয় করি।
সঙ্গে ছিল বিভিষন জারে কৈলে অপেক্ষন
তাহার সন্ধানে হৈল চুরি॥
বসিষ্ঠের রূপ ধরে দণ্ড কমণ্ডলু করে
আমার সমুখে উপনিত।
নানা জন্ত্র কৈল মোরে রাম দেখিবার তরে
বিভিষন আইল ঝটীত॥ ইত্যাদি
(পৃ০ ১৯০।১)

সুন সুন মহাঁসয় করি আমি পরিচয়
প্রথমেতে ... ...।
কহি কথা অকপটে জন্মিনু অঞ্জনাপেটে
মহাবলি পবন মোর পীতা॥
কর তুমী অবধান নাম মোর হনুমান
সুগ্রিব রাজার সঙ্গে থাকি।
বালি সহোদর তার নিল রার্য্য অধিকার
সুর্য্যসুত হৈলা বড় দুখি॥
বালির পাইয়া ত্রাষ ঋষ্যমুখে কৈলা বাস
সে পর্ব্বতে বালি জাত্যে নারে।
সাঁপ দিল এক রিসি অতেব নির্ভয়ে বসি
নিবেদিল তোমার গোচরে॥ ইত্যাদি
(পৃ: ২২৯।১)

সোকভরে মন্দোদরি রাবনের পায়ে ধরি
বিলাপ করএ নানা ভাঁতি।
বিসম রামের সরে গেলে প্রভু কোথাকারে
শরীর লোটায় তোমার খিতি॥
তোমার গমন সুনি প্রভা হরে দিনমনি
চন্দ্র নাহি জায় সিরোপরি।
সেই মুণ্ড ভুমিতলে শ্রীরামের বানজালে
দেখি প্রান ধরিতে না পারি॥
চন্দন তিলক ভালে সোভে দস কপালে
তাহে বহে সোনিতের ধার।
সীরেতে মকুট সোভা নানা জাতি ফুল আভা
কি হইল ত্রিদয়ের হার॥
কেবা নিল কর্ন্নভুষা হিন হৈল তব দসা
ভুমিতে সয়ন কি কারন।
সোনার পালঙ্কমাঝে থাকিতে রাক্ষসরাজে
নানা পুষ্প তাহে সুসোভন॥ ইত্যাদি
(২৫৭।২)

অন্ত,—

চতুর্দ্দিগে হর্ষে করে জয় জয় রোল।
নানা বাদ্য বাজে রার্য্যে লোকের গণ্ডগোল॥
গন্ধর্ব্বে গীত গায় নাচে বিদ্যাধরি।
আনন্দে পুর্ন্নিত রার্য্য অযোধ্যা নগরি॥
স্বর্গে দুন্দুভি বাদ্য বাজায় দেবগন।
বসিষ্ট মুনি লক্ষনে করিলা আলিঙ্গন॥
দেয়ান ভাঙ্গীয়া উঠিলা কমললোচন।
আপন আপন বাসায় গেলা সর্ব্বজন॥
সুনিতে কৌতুক বড় রাম অবতার।
ইহা ত সুনিলে নাহি যমের অধিকার॥
দস হাজার বৎসর ছিল লোকের জিবন।
জেষ্ট থাকিতে নহে কনেষ্টের মরন॥
ব্রাহ্মন সুনিলে পায় ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান।
বেদবিহিত পায়্যা হয় বিপ্রের প্রধান॥
জার চরিত্র সুনিলে লোকে পাইব নিস্তার।
লোক নিস্তারিতে কৈল রাম অবতার॥
ক্ষেত্রি সুনিলে হয় পৃথিবির রাজা।
মহারাজা হইয়া পালয়ে সর্ব্বপ্রজা॥
বৈস্য সুনিলে হয় মহাধনে ধনি।
লক্ষ্মি অনুগত তাহে হয়েন আপুনি॥
বন্ধ্যা সুনিলে হয় সেই পুত্রবতি।
বিধোবা সুনিলে হয় পরমমুকতি॥
সধবা সুনিলে হয় সোহাকে আগুলি।
দুর্ব্বল সুনিলে হয় বলে মহাবলি॥
যে বাঞ্ছা করিয়া মনে যেই জন সুনে।
সেই বাঞ্ছা পুর্ন্ন হয় রামায়ন শ্রবনে॥
মুনির বাক্য মিথ্যা নয় পুর্ন্ন হয় কাম।
ইহা জানি অহর্ন্নিসি বল রাম রাম॥
সতি শ্রী সুনিলে সেই কভু নহে রাণ্ড।
এত দুরে সাঙ্গ হৈল পোথা লঙ্কাকাণ্ড॥
কৌসল্যানন্দন সেই জানকীজিবন।
সেই পদে মতি অতি করিয়া স্থাপন॥
লিখিলাঙ পোথা দোস ক্ষেমিবে আমার।
মনিনাঞ্চ মতিভ্রম আমি কোন ছার॥

৭১। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩$\frac{1}{2}$×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-১০২; ২৩ সংখ্যক পাতা দুইখানি। প্রতি পৃষ্ঠায় ১৪ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১১৯৫ সাল।

আদি,—

প্রথম লঙ্কাকাণ্ড অঙ্গদের রায়বার।
শ্রীরাম লক্ষনেতে মন্ত্রনা কৈলা সার॥
সুগ্রিবে বোলেন শুন বচন আমার।
মিতা কোন বির পাঠাব লঙ্কা করিতে রায়বার॥
সুগ্রিব বোলেন জাইবেন পবননন্দন।
তাহা সুনি বলিছে তবে বির জাম্বুবান॥
রাবণ বলিবে এই বেটা বই বির নাহি আর।
তেই শে কারণে বেটা আইশে বারেবার॥
হনুমান বলি ঘৃন্না করিবে রাবণ।
রায়বার করিবে অঙ্গদ বালির নন্দন॥
অঙ্গদ বলিঞা তবে ডাকিলা গদাধর।
আইলা অঙ্গদ বির বিক্রমে বিসাল॥
ধাইঞা প্রনাম করিল গিঞা রামের চরনে।
কোন আজ্ঞা কর প্রভু রাম নারায়ণে॥
শ্রীরাম বোলেন আইশো বাছা বালির নন্দন।
তুমি গিঞা ভর্চ্ছিআ ত আইসো গা রাবণ॥
আমার আরতি জায় লঙ্কার ভিতরে।
মোর সিতা হরিলে পাপিষ্ঠ লঙ্কেশ্বরে॥

অভয় মানিঞা আইলাম সাগরের জলে।
শেই সাগর পার হৈলাম বড় পুন্ন্যফলে॥
এবে কোন বির তার কব্রিবে নিস্তার।
কাটিঞা ফেলিব তার দশ মুণ্ড কর॥
তুমি স্নে অঙ্গদ হয় বুদ্ধে বৃহস্পতি।
লঙ্কাতে দিলাম তোরে প্রথম আরথি॥

মধ্য,—

ধন্ত মাল্যানি বোলে পুত্র করিঞা কোলে
রাবণ রাজার পাটেশ্বরি।
ওরে পুত্র অতিকায় তোরে জুদ্ধ না জুয়ায়
বিষ্ণু আইলা রামরূপ ধরি॥
তোর পিতা অবোধা না সুনে কাহার কথা
পাপবুদ্ধে হরে পরনারি।[১]
হস্তি সিংহের আগে জুদ্ধ করে ছাগ বাঘে
নাহি দেখি নাহি সুনি কানে।
কুম্ভকর্ন্ন দুর্জ্জয় জম জারে করে ভয়
শে পড়িল রঘুনাথের বাণে॥
সপনে দেখিল আমি লক্ষ্মণবানে মৈলে তুমি
বের্থ নহে আমার সপন।
সাত পাচ পুত্র নাই তুমি মাত্র মোর ঠাই
প্রান রাখ সুনহ বচন॥ ইত্যাদি
(পৃ° ২৪।১—২)

সিতাসিরে দিঞা দুই হাত কোথা গেলা রঘুনাথ
আমারে করিঞা অনাথিনি।
বড় আমার ছিল সাদ এবে হৈল পরমাদ
আমি এবে হৈলাম একাকিনী॥
খাট পাট সিংহাসন তাথে তোমার সয়ন
এখন কেনে লোটায় ভুমিতলে।
বিস বরিসন হৈল দুই ভাইএর প্রাণ গেল
বড় দুঃখ আমার কপালে॥

বিধি সঙ্গে বাদ ছিল রামধন কাড়ি নিল
আর আমার হবে কোন গতি।
ধুলাএ ধোশর গা মুখেতে নাহিক রা
নিশব্দ হইলা দুই ভাই॥
আরে নিদারুণ বিধি হারাইলাম গুণনিধি
আমার কপালে ছিল এই।
মাতা পিতা কেহো নাঞী নাই সহোদর ভাই
আমি আর জাব কার কাছে।
ত্রিজটার হাতে ধরি বিস্তর মিনতী করি
মোর ভাগ্যে কত দুঃখ আছে॥
জদি আজ্ঞা দেহ তুমি বিশ খাঞা মরি আমি
এই দণ্ডে জাই রামের পাশ।
সিতার করুনা সুনি ফাটিছে পাশানখানি
নাছাড়ি রচিলা কির্ত্তীবাশ॥*॥
(পৃ° ৩৪।১—২)

দশ মুণ্ড কুড়ি কর স্তুতি করে লঙ্কেশ্বর
তুমি রাম শাক্ষাত নারায়ণ।
ইন্দ্র বরুণ জম জিনিল আমি ত্রিভুবণ
তুমি মোরে কৈলে নিপাতন॥
তুমি নিলা মূর্ত্তু সর চমকিত কলেবর
ত্রাসে ফেলিলাম ধনুর্ব্বাণ।
নিশ্চয় হৈল মরণ শাক্ষাতে আইলা জম
রামরূপ মনে করি ধ্যান॥
মুদি কুড়ি নয়ন রাম জপে রাবণ
পুলকে পুর্ন্নিত হৈল অঙ্গ॥ ইত্যাদি।
(পৃ° ৮২।১)

কান্দে রানিগণ দিঞা আলিঙ্গন
কান্দে মন্দোদরি সতী।
এ রূপ জৌবণ সব অকারণ
তোমা বিনে পাই গতি॥

১। এইখানে দুই পঙ্‌ক্তি ছাড় হইয়াছে মনে হয়।

শুন প্রাণেশ্বর দেহ ত উত্তর
প্রাণ পোড়ে মুখ চাঞা।[১]
দেবতার নারি স্বর্গবিদ্যাধরি
সে কারণে কৈলা ৰিভা॥
সকল আপণ নহিল রাজণ
কান্দে মুখে দিঞা মুখ।
হা নাথ ৰলি কান্দে ভুজে ভুজ বান্ধে
দেখিঞা বিদরে বুক॥
কোন নারি বোলে দেহ প্রভু কোলে
কেহো করে হাহাকার।
করি স্মঙরন জালি হুতাশন
জাইব সঙ্গে তোমার॥ ইত্যাদি
(পৃ° ৮৩।২)

অন্ত,—

হনুমান দেখি সিতা হাথে নিলা হার।
হারের মুল্য দিতে নাঞী জগত সংসার॥
রত্নমুল্য[২] হার সেই অমুল্য পাথর।
হার দেখি বানর সব হইলা ফাফর॥
বানরগন বোলে কাকে হবে সম্মান।
কোন বির পত্রিবেক সিতা দেবির দান॥
রামের মোন বুঝি সিতা হইলা লর্জ্জিত।
হাথে হার করিঞা সিতা হইলা রামের ভিত॥
সিতার মুখ দেখি রাম রাজা হাঁসে।
হার দেও সিতা জাহাকে মোন আসে॥
বলে সিংহ বির বুদ্ধে বৃহস্পতি।
তার প্রসাদে আমি পাইলাঙ ঐব্যাহৃতি॥
পাত্র মধ্যেত পাত্র বিরমধ্যে বির।
সর্ব্বময় মন্ত্রি বির বুদ্ধে গভির॥
জোড়হাথে আগাইলা বির হনুমান।
বহুমুল্য হার সিতা হনুকে দলা দান॥
হনুমানের গলে দিলা বহুমুল্য হার।
রামনাম না দেখিঞা ভাবেন আপার॥
হাথে করি হার বির ফেলাইলা জলে।
আসিঞা প্রনাম কৈলা রামপদতলে॥
রাম বোলেন স্বুন পবননন্দন।
কোথাএ রাখিলা হার কহত কারন॥
স্বুনিঞা রামের কথা বির হনুমান।
হারমধ্যে নাই প্রভু তোমার এক নাম॥
হনুমান মুখে স্বুনি এতেক বচন।
হনুমানের গলে ধরি রাম দিলা আলিঙ্গন॥
নানা রত্ন দান রাম দিলা পৌরস্কার।
বানরেত সর্ব্ব কৈলা রামের ভাণ্ডার॥
জোড়হাথে বর মাগে বির হনুমান।
দেব দানব গন্ধর্ব্ব রাক্ষস বিদ্যমান॥
তোমার গুণ প্রকাস হইবে এইখানে।
অনাহত গতি মোর হবে সেইখানে॥
সন্ধ্যা ভঙ্গ হইলে প্রভু না ভাবিহ রোস।
বিহান রামায়ন পঢ়ে তার এই[৩] দোস॥
দস দণ্ড পরে তোমার গুণ সেবি।
রোগ পিড়া না হইবে হবে চিরঞ্জিবি॥
জাবত পর্ব্বত থাকিবে সাগরের পানি।
চন্দ্র সূর্য্য জাবত থাকিবে দিবস রজনি॥
জুবরাজ হবেক সর্ব্ব ভোগে তুমি।
রোগ সোক নহিবেক বলিলাঙ আমি॥
হনুমানকে বর দিলা সিতা ঠাকুরানি।
নানা ভোগ তোমার আসিবে আপুনি॥
জথা তথা থাকিবেক হইবে নিরুগি।
দেবতায় তোমাকে জোগাবে উপভোগ॥
সভা তুষ্ট করেন রাম ধন দিঞা দানে।
সভা করি বৈসেন রাম দেব অধিষ্টানে॥

১। এইখানে খানিকটা ছাড় পড়িয়াছে।
২। 'রত্নময়' হইবে।
৩। 'নেই' বা 'জেই' হইবে।

সভা করি রামচন্দ্র করিলা দিয়ান।
চতুর্দ্দিগের মুনি আইলা করিতে কল্যান ॥
কির্ত্তীবাস পণ্ডিতের অমৃতের ভাণ্ড।
এত দুরে সমাপ্ত হইলা লঙ্কাকাণ্ড ॥

৭২। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার ১৪×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ১১-৫২, ৬৯-১১৮, ১৬৩-২০৮। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১১ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২১৯ সাল। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

সিংহবাহনে আইলা দেবি ত পার্ব্বতি ॥
আইলে দেবতাগন বসিলা শারি শারি।
গন্ধর্ব্ব গিত গায় নাচে বিস্তাধরি ॥
সভা মর্দ্ধে ভগবতি বসিলে এক ভিতে।
ক্রধ করি গেলা গৌরি মহাদেবের ভিতে ॥
ভাঙ্গড় উন্মত সিব বেড়াও সথানে।
কোন গুনে পুজি তোমায় লঙ্কার রাবনে ॥
ধন জনে মজিল কনক লঙ্কাপুরি।
কেমনে কারনে তুমি আছ অধিকারি ॥
আপনার হাথে রাবন আপনি কাটে মাথা।
হেন সেবকে তোমার তিলেক নাহি ব্যেথা ॥
রাবন হেন সেবকেরে তোমার নাহি দয়া।
য়ার কোন জন তোমার না লৈবে পদছায়া ॥
এত জদি মহাদেবেরে বলিলা পার্ব্বতি।
পার্ব্বতির বচনে কুপিলা পসুপতি ॥
বামা জাতি স্ত্রি তোমার কারে নাহি সঙ্কা।
আপনি জুদ্ধ করিয়া রাখ কনকপুরি লঙ্কা ॥
তপ করিয়া মৈল রাবন দস হাজার বৎসর।
অমর হইতে ব্রহ্মা নাহি দিল বর ॥

মধ্য,—

বারমাসিয়া ফল ছিল সুগৃবের পাষে।
প্রসাদ দিল সুগ্রিব রাজা জতো মোনে আইষে ॥
পাকা ডালিম দিল বিদারিত সান্ধি।
বাওন নারিকেল দিল আসি হাজার কান্দি ॥
হাড়িয়া হাড়িয়া তাল দিল খাইতে মধুর।
অমৃত সমান দিল ক্ষির খাজুর ॥
নিয়ংশ আম্র দিল খাইতে রসাল।
বিঘত প্রমান কোষ দিল হাজার কাঠাল ॥
নানা বর্ন্নে ফল দিল পিওল বর্ন্নে রাঙ্গা।
মধুপান করিতে দিল আসি হাজার ডোঙ্গা ॥
সেই সব ডোঙ্গার কি কহিব বাখান।
পচিশের বন্দো জেন ঘর একখান ॥
রাজপ্রসাদ জত রাজার ঠাঞি পায়।
তিন লক্ষ বানরে অঙ্গদের বোঝা বয় ॥
পরামানিক বানর পাইয়া কত করে দান।
কতো দিয়া বির বোঝারুস করিল সম্মান ॥
আপন থানায় গেল বির দক্ষিন দুয়ার।
কির্ত্তিবাস রচিল অঙ্গদ রায়বার ॥

(পৃ০২১।১-২)

অঙ্গদে দেখিয়া বির ইন্দ্রজিত রোষে।
গালাগালি পাড়ে এখন জত মনে আইসে ॥
আমায় বাপকে গালি দিয়া পালাইলে ডরে।
তোর মা সঙ্গি করিল জিয়ন্ত ভাতারে ॥
বাপ মরিলে তোর মাকে নিল আনে।
ধিক ধিক বানরা তোর ধিক জিবনে ॥
জার কারনে মৈল তোর বাপ বানররাজা।
প্রানে উঠাইয়া করিব তার কাজ ॥
জনা কত মারিল রাম আমার গ্যায়াতি।
সহিতে না পারি আমি ক্ষেত্রিজাতি ॥

(পৃ০ ২৩।১)

রথ আইল রমনাঝে সোনার সহস্র ঘণ্টা বাজে
নানা সঙ্গে দেবের বাজন।
সোনার চাকা চারি ভিতে রথ আইল আচম্বিতে
পুলকিত সকল রানরগন ॥
সোনার পুতলি চারি কোনে রথ আইল মধ্যস্থলে
চারি ভিতে সোনার চাঙ্গড়া।
রথখান সোনার চাকা সোনার থামে দিয়া ঢাকা
পবনবেগে গতি যষ্ট ঘোড়া ॥
জখন এড়ে ঘোড়ার বাগে কেহ নাহি পায় লাগে
ঘোড়ার মুখে সোনার কড়িয়ালি।
স্বর্গে হইতে য়াইল রথ আগুলিয়া রহে পথ
মেঘে জেন পড়িছে বিজলি ॥

(পৃ০ ১৬৪।২)

জয় জয় জয় রঘুনাথে।
দেব হরিসে ফুল বরিসে
পড়িছে রামের মাথে ॥
বধিয়া বৈরি প্রচণ্ড রাম নাচেন কোদণ্ড
আনন্দে নাচেন প্রভু রাম।
জতেক দেবতাগন করে পুষ্প বরিসন
এতো দিনে পাইল পরিত্রাণ ॥
সঙ্খ ঘণ্টা স্বর্গে বাজে আনন্দে দেবোতা নাচে
গন্ধর্ব্বে গিত নাটন।
জতেক অপছরা হাতে লইয়া অষসরা
পুষ্পবিষ্টি করে দেবগন ॥

(পৃ০ ১৭২।১)

রামের নিকট অঞ্জনার বিরুদ্ধে হনুমানের অনুযোগ প্রবন্ধটি কচিৎ কোন পুথিতে পাওয়া যায়। উহা এইরূপ,

অকারনে তোরে আমি গর্ব্ভেতে ধরিনু।
অঞ্জনাপুত্র তুমি নাম জার হনু ॥
কহিলে সিতার কথা হরিল রাবন।
ধিক থাকুক জানকির ত্রেথায় জিবন ॥
বিস্তর দুঃখ পাইয়া রাম বধিলে লঙ্কেশ্বরে।
রাম হইয়া জুর্দ্ধ করেন ধিক থাকুক লক্ষনেরে ॥
জাহার বানের মুখে নিকলে আনল।
এক বানে বধিতে নারিলে রাবন মহাবল ॥
সুনিঞা রামের নিন্দা কিছু নাহি বলে।
হনুমানের অঙ্গ ভেজে নয়ানের জলে ॥
কান্দিতে কান্দিতে হনু করিল গমন।
রঘুনাথের আগে গিয়া দিল দরসন ॥
রাম বলে হনুমান কান্দো কি কারনে।
হনুমান কান্দো কেনে কহ বিবরনে ॥
হনু উঠিয়া বলে রাম নিবেদন করি।
তোমায় মন্দ বলিয়া গালি দিল ত বানরি ॥
আজ্ঞা কর রাম উহার লইব জিবন।
রাম বলেন স্থির হয় পবননন্দন ॥
হেন কথা মুখে বাপু না বল কখন।
কেন গালি দিল তার জানি বিবরন ॥
এ কথা বলিয়া রাম করিলা উঠানি।
মলয়া পর্ব্বতে গেলা রাম রঘুমনি ॥
বসিয়াছে অঞ্জনা প্রগাণ্ডশ্বরির।
অঞ্জনারে দেখিয়া ত্রাস পাইলা রঘুবির ॥
রামকে দেখিয়া অঞ্জনা করিলা প্রনাম।
রাম বলে তোমার পু[ত্রি] বির হনুমান ॥
সার্থক পুত্র তুমি ধরোছ উদরে।
এমত বির আমি না দেখি সংসারে ॥
রাম বলেন অঞ্জনা কহি তোমার স্থানে।
কেন মোরে গালি দিলে কিসের কারনে ॥
অঞ্জনা বলে আরে সুন হনুমান।
মাএর দোষ কহিতে হয় রাম বিদ্যমান ॥
হনু বলে এখন কপট কথা ছাড়।
রামচন্দ্র হইতে মোর মা বাপ কি বড় ॥

বানরি বলে তবে সুন নারায়ন।
জে লাগিয়া গালি দিলাম সুন বিষরোন ॥
আপনে রাম তুমি বিষ্ণু অবতার।
তবে কেনে এত দুঃখ পাইলে আপার ॥
কোপদৃষ্টে রাবনে চাহিতে রঘুনাথে।
সবান্ধবে রাবন তবে হইতে নিপাতে ॥ ইত্যাদি
(পৃ° ১৮৮।১-২)

শেষ,—

[কুবের] বলেন রথ তোরে নিলেক রাবনে।
রথের উপর পুত্রবধু করয়াছে গমনে ॥
* * রাম করিল অবতার।
রামের সেবা করিলে রথ তোমার উর্দ্ধার ॥
জখন রঘুনাথ করিবেন সর্গ আরহন।
তখ[ন] তুমি আমার ঠাঞী করিহ গমন ॥
চলিল রথখান কুবিরের আদেষে।
গেল আইল রথখান চক্ষের নিমিষে ॥
কুবিরের আজ্ঞায় রথ করিল আগুসার।
শ্রীরামের স্থানে রথ আইল পুনুর্ব্বার ॥
কুবিরের কথা কৈলা জোড় করি হাথ।
সুনিঞা হাসেন রাম রঘুবংষের নাথ ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না জায় খণ্ডন।
ঐ রথে পিতা পুত্রে হইবেক রন ॥
অন্তরিক্ষে রহে রথ রামের আদেসে।
আজ্ঞা হইলে আইশে জায় চক্ষের নিমিষে ॥
শ্রীরামের আগে রথ রইল অজধ্যায়।
নিরবধি রঘুনাথের চন্দ্রমুখ চায়।
একেতো রামের গুনে কি দিব তুলনা।
হাজার[১] গুনে পাষান মানবি কাষ্ট হল সোনা ॥
ক্বিৰ্ত্তিবাষ রচিল গিত অমৃতের ভাণ্ড।
এত দুরে সমাপ্ত হইল লঙ্কাকাণ্ড ॥

১। 'জাহার' হইবে

এই অবধি লঙ্কাকাণ্ড সমাপ্ত হইল।
অতঃপর শেষকাণ্ডে উত্তরা রহিল ॥
কির্ত্তিবাষ পণ্ডিতের মধুর বচন।
শ্রীরামের পিরিতে হরি বল সর্ব্বজন ॥

৭৩। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-২৪০। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১০ পঙক্তি। লিপিকাল, সন ১২৫৯ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, মেদিনীপুর।

আরম্ভ,—

রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং ইত্যাদি—

বান্ধা গেল সিন্ধু রামচন্দ্র হইলা পার।
বানরে ঘেরিল গিয়া লঙ্কার দুয়ার ॥
ফাঁফর হইয়া রাবন ভাবে মনে মনে।
যুক শারন পাত্রে রাজা ডাক দিয়া আনে ॥
যুক শারন বলি তোরা মন্ত্রির প্রধান।
বানর কটক চচ্যা আইশ্য শাবধান ॥
গাছ পাথরে বান্ধা গেল শাগর গম্ভির।
তিভুবনে হেন কর্ম্ম করে কোন বির ॥
রাম লক্ষন বিভিশন যুগ্রিব নৃপতি।
ভাল মতে জানি আইশ্য জত শেনাপতি ॥
একে একে জানিবে কাহার কত বল।
কটকের বল বুদ্ধি বুঝিবে শকল ॥
বল বুদ্ধি বিক্রম জার জতেক মন্ত্রনা।
কোনখানে কোন বির দিয়া আছে থানা ॥
কেবা কোন অস্ত্র ধরে কার কি বাশনা।
আচম্বিতে আশি পাছে রনে দেয় হানা ॥
রাজার কাছে রাজপাত্র কোন জনা থাকে।
বিচার করিয়া মনে দেখিবি শভাকে ॥

রাজার চরন চর বন্দিলেন মাথে।
রাজার আদেশে জায় কটক দেখিতে ॥

মধ্য,—

বুক শারন দুই চর　　ত্রাশে কাঁপে থরহর
বানরে বেড়িল জল স্থল।
দুর্জ্জয় শমর ধির　　প্রতাপে প্রচণ্ড বির
পদভরে মহি টলবল ॥
শুন রাজা লঙ্কেশ্বর　　আমরা তোমার চর
মির্থ্যা বাক্য কভু নাহি বলি।
জে দেখি রামের বান　　কার নাহি পরিত্রান
লঙ্কায় পড়িল আথালি ॥
বশি আছেন রঘুনাথ　　অঙ্গদ চাপিছে হাথ
সুগ্রিবের উরুপএ শিরে।
শ্রীরামের চরন　　চাপিছেন দুই জন
কেশরি আর হনুমান বিরে ॥ ইত্যাদি।
(পৃ° ৪।১-২)

মায়ামুণ্ড করি কোরে　　কান্দে শিতা উর্চ্চস্বরে
দুগ্‌র্গম শাগর হইলা পার।
জে মৈত্র শঙ্গে আইলে　　শেহ ত ছাড়িয়া গেলা
অভাগিনির নহিল উর্দ্ধার ॥
হরি হরি কেবা কার　　শত্ত পক্ষ আপনার
প্রান দিব গরল ভুখিয়া।
অগ্নিকে নাহিক ডর　　কঠোরি করিব ভর
কান্দে শিতা মুর্চ্ছিত হইয়া ॥
দুরন্ত দৈবের গতি　　বিদেশে হারালাম পতি
ভাই বন্ধু কেহো কার নয়।
শম্পদের ভাগি বটে　　জখন পরান ছুটে
মিত্যুকালে কেহ নাহি রয় ॥ ইত্যাদি।
(পৃ° ১৬।১-২)

বুড়ি[র] বচন জদি হইল অবশান।
রনের শক্তি পেয়্যা বলে বুড়া মাল্যবান ॥
শাত তাল গাছ রাম বিন্ধে এক শরে।
চৌদ্দ হাজার রাক্ষশ জার এক বানে মরে ॥
বাহুবলে মারিলা রাম বালি জে বানর।
জার তেজে বান্দা গেল অলংঘ্য শাগর ॥
রামের বিক্রম শুনি রাক্ষশ তরাশি।
তুমি জত বিক্রম কর শভে হিন বাশী ॥
অহঙ্কার না করিহ তোরে বলি হিত।
বিপরিত অমঙ্গল দেখি নিতি নিত ॥
ঘোড়ার পেটে গাদা জর্ম্মে নেউলে ইন্দুর।
হস্তিতে বিরাল হয় শুকরে কুকুর ॥
মাতঙ্গ ছাড়িল দানা অশ্ব ছাড়ে ঘাশ।
কন্দনের ধারাতে তিতিল দুই পাশ ॥
আহার করিতে তারা জদি করে শাদ।
অল্প আহার কৈলে গুলা গুলা নাদ ॥
শুকুনি গিধিনি জত ডাকে পেঁচা পাখি।
রাত্তিযোগে নিদ্রা গেলে দু[ঃ]সপন দেখি ॥
প্রিতি দ্বারে উগী পাড়ে কাল এক বুড়ি।
বিপরিত হাসি ভুমে জায় গড়াগড়ি ॥
মিনি ঝড়ে বিক্ষ পড়ে শহিতে নারে ধরা।
গগন হইতে পড়ে রকতের ধারা ॥
মহাসব্দ করি উঠে সাগরের পানি।
এ শব লক্ষনে রাজা বৈরি নাই জিনি ॥
বিরূপাক্ষ বলে বুড়া মনের পরিতাপে।
তপ্ত তৈলে জল হেন রাবন হেন কোপে ॥

(পৃ° ১৯।২-২০।১)

পুছে রাজা লঙ্কেস্বর　　তুমি কার কোঙর
হয়্যা আইলে শ্রীরামের চর।
কহ আমি মহাবির　　ডাক ছাড় গভির
কিবা নাম ধরিশ বানর ॥
আমার নাম অঙ্গদ　　শুন ওরে রাক্ষস
ঘন ঘন পাশর আপনা।
বালি নামে যেই জন　　আমি তার নন্দন
জার হাথে পেলে বিড়ম্বনা ॥

রাক্ষস জাতি নিশাচর না চিন আপন পর
তোর ভাইকে রাম কৈল মিত ।
শ্রীরামের আজ্ঞাকারি দিল তারে লঙ্কাপুরি
বিভিসনে করিয়া পুজিত ॥
রামের বিক্রম যত তোমাকে কহিব কথ
বিদিত হইব কালি তোরে ।
এক বানে তোরে মারি পাটাইব জমপুরি
কার বাপে কি করিতে পারে ॥
(পৃ° ৩১।১)

শিতা রথের উপরে চড়ি জেখানে শ্রীরাম পড়ি
কান্দে শিতা মুর্চ্ছিত হইয়া ।
পুরুশ পরেশ তুমি অবলা জুবতি আমি
মড়া হয়্যা রহিলাম পড়িয়া ॥
ভালে মারে করাঘাত কোথা গেলে প্রাননাথ
গলিয়া গলিয়া পড়ে হিয়া ।
তুঁশেতে অনল ফেলি তাহে দিল ঘৃত ঢালি
অন্তরেতে উঠিল জলিয়া ॥
রামের বদন দেখি কান্দে শিতা চন্দ্রমুখি
এ রূপ জৌবনে দিলে দুখ ।
দাড়িম্বের ফল জেন আপুনি বিদরে হেন
তেমত বিদরে মোর বুক ॥ ইত্যাদি
(পৃ° ৪৭।১)

অতিকা লক্ষনে রন দেখি চিন্তে দেবগন
শ্রীরাম দাণ্ডাল রনস্থলে ।
দেব দানব কির্ন্নর গন্ধর্ব্বাদি বিস্তাধর
সূর্য্য দেখে গগনমণ্ডলে ॥
অতিকা জে মহারথি ভয় পাইল ক্ষিতিপতি
মহাবির রনেতে প্রচণ্ড ।
অক্ষয় শন্ধান লক্ষন বিরের বান
কাটীয়া করিল খণ্ড খণ্ড ॥
লক্ষন বলেন বির রনে কত যুস্থির
ধার্ম্মিক বলিয়া তোমার নাম ।
আমি জুঝি ভুমিতলে তুমি রথের উপরে
তেই তোরে বিধি হইলা বাম ॥
অতিকা বলে লক্ষন যুন মোর বচন
ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম তব জ্ঞান ।
রাম বিরের চুড়ামুনি রনের ভেদাভেদ জানি
বৈরি বল হইতে পারে প্রান ॥
অতিকা কৈল জোড়হাত যুন হে জানকিনাথ
রনে শাক্ষি হয় নারায়নে ।
আমি বৌরির নন্দন ভাই তোমার লক্ষন
অস্ত্র বাটী দেহ ত আপনে ॥
তুমি জান শব কর্ম্ম তৈলক্ষ্য উর্জ্জল ধর্ম্ম
ধর্ম্ম বিনে অন্য নাহি গতি ।
তুমি শভাকার প্রান গোলোকের ভগবান
রনে শাক্ষি হয় রঘুপতি ॥ ইত্যাদি—
(পৃ° ৯৩।১)

বিরবাহু রনস্থলে বিনয় করিয়া বলে
নিবেদন করি শভাতলে ।
দেবগনে স্তুতি করি ছাড়ান গোলোকপুরি
মায়ায় জন্ম দশরথের ঘরে ॥
বিশ্বামিত্র মহাঋিশি অজোধ্যা নগরে আশি
তোমায় মাগিল নিপবরে ।
রাজার ঠাঞি তোমা পেয়ে চিত্তে আনন্দিত হয়্যা
নয়্যা গেল মিথিলা নগরে ॥ ইত্যাদি
(পৃ° ১৭৮।১)

রাম জুড়িলেন মিত্তুশর কাঁপে রাবন থরহর
ত্রাশেতে ফেলিল গাণ্ডিবান ।
কুড়ি চক্ষে বহে বারি লঙ্কাপুরের অধিকারি
রামচন্দ্রে কর্এ ধিয়ান ॥
দশ মুণ্ড কুড়ি কর স্তব করে লঙ্কেশ্বর
তুমি শে শাক্ষাত নারায়ন ।
কুবের বরুন জম জিনিলাম ত্রিভুবন
তুমি মোরে কৈলে নিপাতন ॥ ইত্যাদি
(পৃ° ২০৪।১)

শেষ,—

রাঘবের ধর্ম্ম দ্বিজ দুস্‌খিতের দান।
দিয়া সভাকার রাম পুরিলা শম্মান ॥
রামচন্দ্র করিলেন শভার পুরস্কার।
জোড়হাথে স্তুতি করে পবনকোঙর ॥
লক্ষন ধরেন ছত্র রামের উপর।
শত্রুঘন শ্যাম অঙ্গে ঢুলায় চামর ॥
অহর্নিশি প্রজাগন নিরখএ আশি।
অজোধ্যাতে উদয় হইল রামশশি ॥
ঘুচিল দুখির দুখ রাম আগোমনে।
আনন্দে ভাশিল সব পশু পক্ষগনে ॥
সুস্‌ক পুষ্প বৃক্ষে ফুটাল নানা ফুল।
মধুপানে মকরন্দ[১] হইল অনুকুল[২]
বশিষ্ট বামদেব সে কুলের পুরহিত।
সদাই আসিয়া কহেন পুরানসঙ্গিত ॥
অপছর্ব্বরি কিন্নর্ব্বরি মগ্ন সদা নির্ত্তগিতে।
আনন্দে উছর্ব্ব সদা হয় অজোধ্যাতে ॥
হইল অজোধ্যাপুরি বৈকণ্ঠ সমান।
কির্ত্তিবাস কৈল লঙ্কাকাণ্ড সমাধান ॥

৭৪। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-১৫৬। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। অসম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

রামায় রামচন্দ্রায় ইত্যাদি।
সাতকাণ্ড পোঁথা গাই রামায়ন ভিতর।[৩]
সুন্দরাকাণ্ডের গিত সুনিতে কাহিনি।
লঙ্কাকাণ্ডে সুন সকল বিরের হানাহানি ॥

বন্দ গেল সাগর কটক হৈল পার।
দিনে দিনে রাবন রাজার টুটে অহঙ্কার ॥
চিন্তিত রাবন রাজা গুনে মনে মনে।
ডাক দিঞা আনে চর সুক সারনে ॥
রাজআজ্ঞা পাইঞা তখন সুক সারন নড়ে।
রাজব্যবহারে চর দণ্ডবং করে ॥
আইস আইস সুক সারন চরের প্রধান।
রামের কটক চীনিঞা আইস সাবধান ॥
গাছ পাথরে বন্ধ গেল সাগর গম্ভির।
ত্রিভুবনে হেন কর্ম্ম করে কোন বির ॥
বল বুদ্ধি রামের কত বিক্রম মন্ত্রনা।
ভালমতে চর্চ্চিঞা আইস জনে জনা ॥
রাম লক্ষন চর্চ্চিহ সুগ্রিব বিভিসনের মতি।
ভাল মতে চর্চ্চিহ সভে আছে কতি কতি ॥
রামের আগে থাকে পাত্র কোন জনা।
কোনখানে বানর লঞা করএ মন্ত্রনা ॥
কোনখানে থাকে বানর কোথা খায় পানি।
লঙ্কা চাপিঞা কবে করিবেক উঠানি ॥
রাজার আদেশ চর বন্দিলেক মাথে।
রাজাকে প্রনাম করি চলিলা হরিসে ॥

মধ্য,—

সুন রাজা লঙ্কেশ্বর আমীত তোমার চর
মন্ত্রনা করিএ উচিত।
বৈরি রাম মহাসয় লঙ্কার দেখি সংশয়
রাখিতে নারিবে কোন জনে ॥
দেব দানব গন্ধর্ব্ব আমী কটক চিনি সর্ব্ব
আমাকে না চিনে কোন জন।
বিসম বানরগোলা করএ কটকে খেলা
দেখিতে মুর্চ্ছিত হয় ততক্ষনে।
দেখিঞা রামের রূপ চিন্তিতে বিদরে বুক
দেখিল রাম বিষ্ণু অবতার। ইত্যাদি

(পৃ: ৮।১)

১। 'মধুকর' হইবে। ২। 'আকুল' হইবে।
৩। ইহার পরের পঙ্‌ক্তিটি ছাড় হইয়াছে।

রাত্রি পোহাইতে জখন আছে [দণ্ড] ডেড়।
হেন সময়ে লঙ্কাপুরির চতুর্দ্দিগে বেড় ॥
কনকপুরিতে নিদ্রা জায় কারু নাই সাড়া।
গায় গায় বানর উঠিল জেন সার পিপিড়া ॥
আগে মহিন্দ্র দিবিধ উঠিল বানর এক চোটে।
লঙ্কায় বাহিরে জে ছিল তাহার ঘর লুটে ॥
উর্ব্বরের সেনাপতি উঠে সতবলি।
সাগরের ঢেউ জেন কটকের কলকলি ॥
সুসেন বৈদ্য লঙ্কা বেড়ে রাজার সসুর।
চর্দ্দ হস্থির মুণ্ড মুটকিতে করে চুর ॥
বিসম ভর্ল্লুক ভাই নঞা কুড়া কুড়া।
তাহার পাছ লঙ্কা বেড়ে জাম্বুবান বুড়া ॥
অঙ্গদ বানর বেড়ে বালির নন্দন।
জাহার বোলে উঠে বৈসে সকল বানরগন ॥
তার পাছে লঙ্কা বেড়ে রাক্ষস বিভিসন।
বিস্তর সম্ভ মহে তারা সভে পঞ্চ জন ॥
হনুমান বেড়ে লঙ্কা বানরে বাখানী।
জার ভএ লঙ্কার লোক না খায় অর্ন্ন পানি ॥
বামে সুগ্রীব রামের দক্ষিনে সহদর।
লঙ্কায় উঠিলা রাম তৈলক্ষসুন্দর ॥

(পৃ° ১৩৷২-১৪৷১)

রনে আইলা রাবন লইঞা কুমারগন
রাক্ষস সব করিঞা সাজন।
চড়িঞা বিচিত্র রথে আইলা রামের অগ্রতে
চমকিত দেখি বানরগন ॥
রাম বামহাথে গাণ্ডিব করি ডাকেন মৈত্র মৈত্র করি
সুন মিত্যা বিভিসন রাক্ষস।
অন্ধকার চতুর্ভিত সুর্য্য নহে প্রকাসিত
রনস্থলে আইলা কোন জনা ॥
বিভিসন বোলেন রাম রথ দেখি অনুপাম
নবদণ্ড ধরে দেবগন ॥

(পৃ° ৪৬৷১)

রনে পড়িলা মেঘনাদ হৈল এত পরমাদ
জেই পুত্রে জিনে পুরন্দর।
নর বানরের বানে হেন পুত্র মরে রনে
কেমতে ও জিবেক লঙ্কেশ্বর ॥
রাবন কুড়িহাথে মারে তালি লোটাঞা বেড়ায় বলি
হাহাকার করে দস মুখে।
কুড়ি নয়ানের জল করে জেন ছল ছল
কান্দে রাজা পুত্রসোক দুখে ॥
ইন্দ্র জোম বন্দি করে ঐরাবতের পৃষ্টে চড়ে
দেবগন জাহাকে বিস্মিত।
পুত্র নাগফাস জানে বন্দি করে দেবগনে
ইন্দ্র জিনি নাম ইন্দ্রজিত ॥
রাবন ক্ষেনে ক্ষেনে মোহ জায় ক্ষেনে চেতন পায়
কান্দে রাজা এড়িঞা নিস্বাস।
সরস্বতির চরন করিঞা বন্দন
লাচাড়ি রচিল কির্ত্তিবাস ॥ (পৃ° ১০২৷১)
পড়িল দস সির দেবতা হইলা স্থির
আনন্দে সভে বেড়ান নাচিঞা।
দেবতা করএ নিত্য গন্ধর্ব্বে গাএন গিত
প্রভু রামের জয় জয় দেখিঞা ॥
বলিছেন বজ্রপানি পোহাইল রজনি
পড়ি গেল সভার দুর্য্যয়।
সভার পরিত্রান করিলেন ভগবান
আর কাহুকে নাহি ভয় ॥
সর্গ্রে দুন্দবি বাজে দেখি নাচেন দেবরাজে
নাচিছেন সকল নাচনি।
বাল্মিকের চরন করিঞা স্মঙরন
নাচাড়ি রচিল কিত্তিবাস ॥ (পৃ° ১৩৯৷২)

শেষ,—

বসিঞা আছেন চাণ্ডাল রাম করিঞা ধ্যান।
লাফ দিঞা সেইখানে নাম্বিলা হনুমান ॥
রাজ অভরণ গোহকের গলে পুষ্পের মাল।
হনুমান কথা কন সুনেন চণ্ডাল ॥

শত্রু মারিঞা আইসেন রাম অজদ্ধা নগর।
সঙ্গে লঞা আসিছেন রাক্ষস বানর॥
রাম সিতা দেখিতে তুমি কর আগমন।
রামের সেবক আমার নাম হনুমান॥
রাম লক্ষন সিতার বার্ত্তা জানাইল সর্ব্বর।
পবনের পুত্র মুঞি জাতিএ বানর॥
সুগ্রিবের পাত্র আমী রামের কিঙ্কর।
তোমাকে বার্ত্তা দিতে মোরে পাঠাইলা গদাধর॥
হরিসে পুছেন গোহক গদ গদ ভাসে।
এমত দিবস হবে আমার রাম আসিবেন দেসে॥
কিত্তিবাস পণ্ডিত গান করে হাত ধরি।
বাল্মিক মুনির চরনে নমস্কার করি॥*॥

নাছাড়ি॥

রাম আইলা দেসে নগরে পড়ে সাড়া।
দাম গুড়ু গুড়ু বাদ্য বাজে নাচে চণ্ডালপাড়া॥
রাম আইলা দেসে হনুমানের মুখে সুনি।
মৃত সরিরে জেন সঞ্চরে পরানি॥
জগাই মাধাই দুটী ভাই নাচে পুলক হঞা।
গোহক চণ্ডাল নাচিছেন করতালি দিঞা॥

৭৫। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

১২৮।২ সংখ্যক পত্রে অদ্ভুতাচার্য্যের ভণিতা পাওয়া যায়। উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪½×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ।০—৮।৶০। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্ক্তি। হরপের ছাঁদ পুর্ব্বাঞ্চলের অনুরূপ। প্রদাতা, স্বর্গীয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর।

আরম্ভ,—

বানরে বেড়িয়া তবে দুই চর ধরে।
বিভিসনের আজ্ঞায়ে সমাই তাকে মারে॥
আপনেহি বিভিসনে বোলে বানরেরে।
রামের সাক্ষাতে লও বান্ধি দুই করে॥
বসি আছে রামচন্দ্র ত্রিলোক্যসুন্দর।
দক্ষিন পাসে বসি আছে সুগ্রিব বানর॥
বাম পাসে বসি আছে অনুজ লক্ষন।
জোড়হাতে দাণ্ডাই আছে জত বানরগন॥
হেন কালে দুই চর বান্ধিয়া বানরে।
রাজ ব্যেবহারে গিয়া দণ্ডবত করে॥
ডরে ডরাইয়া চর জিবনের এড়ে আস।
করজোড়ে কহে কথা শ্রীরামের পাস॥
কটক চরিতে আমা পাঠাইল রাবনে।
মারিয়া আনিল মোরে রাজা বিভিসনে॥
আপনে বুঝিয়া ফল করহ উচিত।
রাবনের চর মুঞি কহিলুঁ বিদিত॥

মধ্য,—

সারনের কথা জদি হৈল অবসান।
সুক চরে কহে কথা রাজা বিত্তমান॥
জতেক কটক রাজা দেখিল সারনে।
মুঞি জে দেখীলুঁ গোসাঞি কহোঁ বিত্তমানে॥
ধুর্ম্ম ধুর্ম্মাক্ষ দেখীলুঁ ডাঙ্গর তার গলা।
রাজার প্রতাপ ধরে সুগৃবের সালা॥
কালা বর্ন্ন দেখি জার গায়ে লোমাবলি।
সুর্য্যের প্রতাপ ধরে বলে মহাবলি॥
অঞ্জনিয়া বানর ঘড় অঞ্জন আকৃতি।
লেখা জোখা নাই তার কটক জত ইতি॥
বিক্রমে বিসাল বৈসে নর্ম্মদার তিরে।
তথা হতে আসিছে ধুর্ম্মাক্ষ মহাবিরে॥
তোমার বিক্রম জত সংষারবিদিত।
ধুর্ম্ম ধুর্ম্মাক্ষ্যের বিক্রম বিসম চরিত্র॥
শ্রুতসেন সমে আছে কপি কুটি কুটি।
শ্রুতসেনের কটক গোশাঞিঁ দেখীতে না আটি॥

ইত্যাদি (পৃ০ ৩১—২)

সুগৃব বানররাজা বির অবতার।
বানর হতে সর্ব্ব কার্য্য করহ বিচার॥
ব্রহ্মার আখি হতে জন্মিল কনকা বানরী।
অঙ্গুলি দিয়া ব্রহ্মা তাকে ভুমিতলে পাড়ি॥
কোন জাতি উপজিল ব্রহ্মা চাহে একদৃষ্টি।
সুন্দরি বানরি হৈল দেবতার তুষ্টি॥
বানরি সৃজিয়া থুইল আপনার পাসে।
দেবগন তথা গেল ব্রহ্মার সম্বাসে॥
বানরির রূপ দেখী দেবতা হবিলাস।
ব্রহ্মাতে জিজ্ঞাসা করে বচন প্রকাস॥
ব্রহ্মার গোচরে সবে পুছন্ত সাদরে।
কোন জাতি নারী গোসাঞি কেন রূপ ধরে॥
ব্রহ্মা বোলে তোমা তরে সৃজলুঁ বানরি।
তোমা দিলুঁ সুন্দরী নেও আপনার পুরি॥
মন্দার পর্ব্বতে দেবে লইয়া বানরি।
পর্ব্বতের মধ্যে গীয়া নানা কেলি করি॥
কেলি করিয়া গোসাঞি বানরি তোসে বরে।
মোর বির্য্যে পুত্র হৈব তোমার উদরে॥
দেব দানব গন্ধর্ব্ব পিচাস আর সর্প।
ত্রিভুবনে না সহিব তোর পুত্রদর্প॥
তার সনে রতি করি দেব পুরন্দর।
বানরি রমন করি তারে দিল বর॥
দুই পুত্র হৈব তোর জনক সঁসর।
দুই পুত্র হৈব রাজা বানর উপর॥
কিস্কিন্দার রার্জ্য ভোগ করিব প্রচুর।
কিস্কিন্দার ফল মুল খাইব মাধুর।
নররূপে রাম জবে আসিব সংসার।
একজন সোহাএ হৈয়া করিব উপকার॥

ইত্যাদি

(পৃ০ ৫।১-২)

বিসম বানর মেলা না বুঝি কপট কলা
বিদিত হইল ততক্ষন।
দেখীলুঁ জে রামমুখ হেরিতে বিধরে বুক
বুঝিলুঁ সাক্ষ্যাতে নারায়ন॥১॥
না দেখিলে নরবুলি দেখি সেই ক্ষনে ভুলি
তোমা ধাড়ি লৈছে রঘুবর।
ততপর রাজকাজে বুদ্ধিবলে মন্ত্রি সাজে
সুগৃব বানর ইশ্বর॥২॥
লৈক্ষ্য লৈক্ষ্য সেনাপতি সোভে নবদণ্ড ছাতি
রাজলক্ষ্মি জিনি পুরন্দর।
দেব দানব বিক্রম জিনিতে নাহিক শ্রম
বানর দেখীতে ভয়ঙ্কর॥৩॥
সুনি রাজ সিংহনাদ রাক্ষসের পরমাদ
তোলপাড় করে লঙ্কা পুরি।
বানরবল প্রচণ্ড মেঘ করে খণ্ড খণ্ড
দরসনে ততক্ষনে মরি॥৪॥
জেহেন সাক্ষাতে জম বিক্রমেত বিসম
আসিয়া বেড়িল লঙ্কাপুরি।
অনুপাম সর্ব্বগুনে সর্ব্ব তর্ত্ত জানে সুনে
কনিষ্ঠ লক্ষন অবতরি॥ ইত্যাদি

(পৃ০ ৭।১-২)

লাচারি ধানসি রাগ॥

অঙ্গদের বাক্য সুনি বোলে রাক্ষস চুড়ামনি
কেনে বেটা কর অহঙ্কার।
না বুঝিয়া বোল বোল নহি জান বলাবল
মোর হস্তে সভান সংহার॥
ইন্দ্র আদি দেবগন সহিতে না পারে রন
কেবা তোর শ্রীরাম লক্ষন।
দেখিয়া আমার রন কম্পমান ত্রিভুবন
সুন সুন বালির নন্দন॥
ব্রহ্মা করি আরাধন জিনিলুঁ জে ত্রিভুবন
কি করিব এ নর বানরে।
কুবের বরুন জম সেহ নহে মোর সম
ডরে সব খাটে মোর দ্বারে॥

মিত্র পুত্র করি তুমি এতেক সহিএ আমি
আর যদি বোল দুরাক্ষর।
তোকে মারি নিশাচরে পাঠাইব জম ঘরে
দোস নাই আমার উপর ॥

(পৃ০ ৪৩।১)

লাচারি ॥

চারি দিগে পাত্রগন মধ্যে কান্দে দসানন
ভ্রাতি সোকে দহে কলেবর।
ইন্দ্রে জারে করে ভিত পড়ে ভাই আচম্বিত
অনাথ হইল লঙ্কেশ্বর ॥
দুরে পালায়ে অভরন শোক বাড়ে দসানন
সিরের মকুট পেলে দুর।
রত্নময়ে কলেবর অভরন সুন্দর
পড়িলেক ভু মর উপরে ॥
মিলিয়া জে পাত্রগন রাজা করে চেতন
সান্তাইয়া অনেক প্রকারে।
সুন রাজা দসানন ক্রন্দনে না কর মন
সুনিয়া হাসিব পুরন্দরে ॥
আছে জত কুমার মহাজুদ্ধে অনিবার
লঙ্কাপুরে আছে জুদ্ধাগন।
তৃভুবন জিনিবারে সে সকল বিরে পারে
কোন রাজা করহ ক্রন্দন ॥ ইত্যাদি

(পৃ° ৯৭।১)

শেষ,—

চলিলেক মকরাক্ষ্য করিবারে রন ॥
আনন্দিত হৈল তবে লঙ্কার ভুবন।
মকরাক্ষ্যের সন্যে করে গীত নাচন ॥
ভয়ে পাইয়া চন্দ্র সুর্জ্য মেঘের হৈল আড়।
সমুখ হইয়া জুঝে হেন সক্তি আছে কার ॥
ইন্দ্রে বোলেন সুন জত দেবগন।
এথাএ থাকিয়া আর কোন প্রয়োজন ॥
দেয়ান ভাঙ্গিয়া পলায়ে জত দেবগন।
রাক্ষ্যসে বানরে থানাত হৈল দরসন ॥
রাক্ষ্যসের সব্দ শুনি পাইল বানর।
ধাইল বানর সব জমের দোসর ॥
চুলে ধরি রাক্ষসেক টানেন বানর।
আউলাইয়া কারোর জে খসিল কাপড় ॥
পলায়ে রাক্ষসসেনা না সহে সমর।
রাক্ষ্যস পলায়ে কুম্ভ চলিল সত্যর ॥

৭৬। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ; আকার, ১৪ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৩-১৬,২০-১০৫,১০৮-১২৫। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১০ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

বানর বলে কবে ক্ষয়ে হবে এত বির।
কভু নাই দেখি হেন দুর্জ্জয় সরির ॥
জল স্থল দষ দিগ ছাইল বানর।
বানরের চাপ দেখি ত্রাষ লঙ্কেশ্বর ॥
দেখিয়া রামের কটক ছারিল নিস্বাষ।
লঙ্কাকাণ্ডে রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥*॥
সুন রাজা লঙ্কেশ্বর রামি ত তোমার চর
মিথ্যা বাক্য কভু নাই বলি।
দেখিলাম রামের বান কার নাই পরিত্রান
লঙ্কা লয়্যা পরিল মনলি ॥ ইত্যাদি

মধ্য,—

সকল ছারিয়া রামের চরন করিলাম সার।
দয়াল শ্রীরাম বিনে গতি নাহি আর ॥ ধুয়া ॥
অঙ্গদ বলিছে সুন পাগল রাবন।
মন দিয়া সুন রে বলির উপাক্ষন ॥

বলি নামে দৈত্যপতি থাকে পাতালপুরি।
রখিলের নাথ হরি জাহার দুয়ারি॥
তাহার সমান কেবা আছে পুন্নবান।
জাহার দুয়ারি রথিরথ ভগবান॥
তাহাকে জিনিতে জদি গেল দসানন।
দায় ছারি দিলা প্রভু দেব নারায়ন॥
বিষ্টুর মায়াতে বলি রাছেন বন্দন।
বলির বন্দন দেখে হাসিচে রাবন॥
লঙ্কাতে রামার ঘর নাম দসানন।
বলিষ জদি তোর বেটা ঘুচাই বন্দন॥
রাবনের কথা সুনি বলি দৈত্য হাসে।
তোমা হইতে রামার বন্দন নাহি খসে॥
তোমা হেন কটি রাবন কি করিতে পারি।
রখিলের নাথ হরি রামার দুয়ারি॥
রাবন বলে বলি তোর নারায়ন কোথা।
লাগি জদি পাই তার কেটে পেলি মাথা॥
রাবন বলিছে বলি তোরে কহি দর।
আমা হইতে তোর নারায়ন নহে বর॥
বিষ্টু নিন্দা বৈষ্টব কদাচ নাহি সুনে।
কোপিলেন বলি দৈত্য রাবনের বচনে॥
বিষ্টুকে জিনিতে ার এত তোর বল।
তোল দেখি এ ি লোহার সিকল॥
বলি দৈত্যম া রা া নারিল বুঝিতে।
কুড়ি হাত বাড়াইল বন্দন খসাত্যে॥
বন্দনেতে হাথ জেই ঠেকালে রাবন।
দষ গলায় কুরি হাথে পরিল বন্দন॥
দষ মুখে কি কি বলি করিছে রাবন।
রাবন বলে মোরে ভাই বান্দে কোন জন॥
রাবন পরিল বন্দি বলি দৈত্য হাসে।
আপনি পরিলি বন্দি বিষ্টু নিন্দা দোসে॥
ডাক দিলে বলি রাজা মিরাঘোরে তরে।
ঘোরা চোরা বেটাকে বেন্দ্যা থোগা ঘোরাসালে॥
এ কথা সুনিয়া তবে মিরাঘোর চলে।
চুলো ধর‍্যা রাবনে বান্দিল ঘোড়াসালে॥

(পৃ° ২২।২-২৩।১)

নাকের রক্তেতে কুম্ভুকর্ন্ন বির তিতে।
দুই পায তিতিল দুই কর্ন্নের রকতে॥
নাক কান নাহি বিরের বর হইল লাজ।
কোন মুখে ভেটিব লঙ্কার মহারাজ॥
আপনার বাহুবলে ভুবন জিনিলু।
আমি হেন বির হয়্যা নাক কান হারালু॥
জত বল বিক্রম মোর সব হইল মিছ্যা।
বানর বেটা করিলেক নাক কান বোচা॥
ফিরিয়া আইল বির সংগ্রামের স্থলে।
জতেক বানর পায় ধর‍্যা ধর‍্যা গেলে॥

(পৃ° ৫৩।২-৫৪।১)

ব্রথা কেনে জুর্দ্ধ করি লক্ষনের সনে।
রাপন মরন কথা কহিব লক্ষনে॥
রম্ভ বানে মিত্যু নাই সুনহ লক্ষন।
ব্রহ্মরস্ত্র বানে মোরে কর নিপাতন॥
রতিকার বচনে লক্ষন না করিলা রান।
তুনে হৈতে বাহির কৈল ব্রহ্মরস্ত বান॥
রতিকা দেখিল বান লক্ষনের হাথে।
রামময় রতিকা সব লাগিল দেখিতে॥
দষ দিগ নেহালে নেহালে বিক্ষ পাত।
জে দিগে রতিকা চায় সেই দিগে রঘুনাথ॥
ভয় পাইয়া রতিকা ।বর মুদিল নয়ান।
রন্তরে দেখিছে রাম দুর্ব্বাদলসাম॥
লক্ষন এরিল বান কি কহিব কথা।
বানেতে কাটিয়া পারে রতিকার মাথা॥
ঠিকরিয়া পরে মুণ্ড রামপদতলে।
পদতলে পরে মুণ্ড রাম রাম বলে॥
রতিকার মুণ্ড রাম করিলেন কোলে।
সত সত চুম দিল বদনকমলে॥

অতিকায় মোহে রামের প্রান বিকল।
চক্ষের লোহে রামের তিতিল বাকল॥

(পৃ° ৬৩।২-৬৪।১)

রামজয় সব্দ জদি সুনিলে রাবন।
সম্ভ লঙ্কা দেখি মন করে উচাটন॥
ক্ষেনেক মধুর হাস ক্ষেনে চমকিত।
মনুক্ষন কাল জম দেখে চারি ভিত॥
নিকটে বসিআ আছে পুত্র মেঘনাদ।
রাবন বলিছে বাছা দেখহ প্রমাদ॥
বিবিসন বলিলেক সিতা দিতে রামে।
তাহার বচন আমি না সুনিলাম কানে॥
তুমি রামি বই লঙ্কায় বির নাহি য়ার।
তুমি থাকিতে রামি জাব নহে ত বিচার॥
এতেক সুনিআ বির কহিছে পিতায়।
এক নিবেদন বাপা বলিএ তোমায়॥
বারে বারে মারি আমি শ্রীরামলক্ষন।
সুনিয়াছ মরিলে কে পায় ত জিবন॥
মরিলে না মরে বৈরি পায় ত নিস্তার।
হেন রাম কেমনে রামি করিব সংহার॥
বারে বারে আসি আমি রন করি জয়।
কোন বার হবে আমার জিবন সংসয়
রাম লক্ষন মরিবে না লয় মোর চিত্তে।
বাপের আজ্ঞা ইন্দ্রজিত না পারে লংঘিতে॥
রাপনার সাজ করে পিতার সাক্ষাতে।
পরিপাটি পাগরি তুলিয়া দিল মাথে॥
পাটের চালনা পরে সোনার কিনারি।
সোনার কিঙ্কিনি তায় শোভে সারি সারি॥

(পৃ° ৭৬।২)

কেন রামি রাইলাম বনবাসে।
দসেতে মরিল পিতা রাবনে রানিলে সিতা
লক্ষন ভাই হারালাম বিদেসে॥
মরিল লক্ষন ভাই রার মোর কেহ নাই
ধম্ম সরির গুননিধি।
রাবনের সক্তিসেলে বিদেসে প্রান হারাইলে
এখন করিব কোন বুদ্ধি॥
ভাএর রঙ্গের জুতি জেন সুবর্ন্নের কান্তি
তিভুবন জিনিয়া মহিমা।
সুমিত্তার প্রানধন তুমি ভাই লক্ষন
সোকে মজায়্যা গেলে রামা॥
পিত্রিবাক্যে তিন জনে প্রেবেস করিলাম বনে
বিধাতা করিল তাহে রান।
জতেক বানরগনে তারা জাবে নিজ স্থানে
তোমার সোকে না রাখিলাম প্রান॥

ইত্যাদি। (পৃ° ৯১।১)

তোমা হেন গুনমুনি রস্ত সাস্ত সব জানি
স্তির সঙ্গে গমন বিদেসে।
রাজ্যের * * হয়্যা বনেতে ভমন জেয়্যা
ধরি জটা তপস্বির বেস॥
রাম হেন গুননিধি সেবিতে না দিল বিধি
মোর সম নাহি রভাগিয়া।
এ বর সন্দেহ মনে রাম পাটাইয়্যা বনে
মোর মা কেমনে ধরে হিয়্যা॥
সিতা হেন গুনবতি পতিব্রথা সুর্দ্ধমতি
তারে দুঃখ দিলেক বিধাতা।
বিসম রাক্ষষপুরি দেখিলে তখনি জরি
কেমনে প্রান ধরিবেন সিতা॥
ভাই গেল বনবাষ বাপের হইল নাষ
মোরে সাপ দিল কোন মুনি।
রাক্ষসে হরিলে সিতা লক্ষন ভাই গেল কোথা
দুঃখ দিলে কৈকৈ দারুনি॥
কান্দে ভরথ রামমোহে বাকল ভিতিল লোহে
ভুতলে পরিল দুই ভাই।

অয়থের চরিত্র দেখি • হনুমান হইল সুখি
কিত্তিবাসে এ রহস্ত গাই ॥
(পৃ° ৯৭।২)

দেবিকে তখন বির হনুমান বলে।
করিব তোমার পুজা পিথিবিমণ্ডলে ॥
বাম কান্দে লক্ষন নিল ডান কান্দে রাম।
মাথায় পিতিমা করি হনুর পয়ান ॥
ভদ্রকালি রাম লক্ষন আর হনুমান।
তিন জন উত্তরিল জথা গুপ্তগ্রাম ॥
খিরতর বিক্ষ আছে অতি মনহর।
দেবির পিতিমা থুইল তাহার উপর ॥
রাবন বধিআ দেসে জখন করিব গমন।
সিদ্ধি পিটে মহারাজার করিব স্থাপন ॥
(পৃ° ১০৯।২)

উদ্ধৃত কয় পঙ্‌ক্তিতে ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

শেষ,—

লঙ্কা বেড়িয়া বানর বেড়ায় কুটি কুটি ॥
খেত্যে খেত্যে জায় বানর হাথে গুয়াপান।
পা দোলায়্যা পা দোলায়্যা বানর সব জান ॥
রঘুনাথের সাক্ষাতে আইল বানরগন।
বানর দেখিয়া রাম হরিষ বিধান ॥
রাম বলে সুন জত বানরগন।
কালি কেমন সুখে রেখ্যেছিল মিতা বিভিসন ॥
তোমা হেন ঠাকুর প্রভু হইব যুগে যুগে।
নিত্য নিত্য জায় জেন কালিকার সুখে ॥
ভাল রাজা করেছ ধাম্মিক বিভিসন।
এমন ক্ষেমে খাই নাই জাবত জিবন ॥
ভাল ভাল সুন্দরি রাছে বিভিসনর ঘরে।
দুই দুই নারি দিয়াছে একক বানরে ॥
জদি রঘুনাথ তোমার আজ্ঞা পাই।
সেই সব সুন্দরি লইয়া দেশকে পলাই
হাসিলেন রঘুনাথ বানরবচনে।
পাগল করেছে মিতা জত বানরগনে ॥
শ্রীরামে হাসিয়া কন মিতা বিভিসন।
আমি জে বলি কথা তাহা দিহ মন ॥
জেবা কছু বানরেরে খাওাইলে তুমি।
সেই সব দিব্য মিতা খাইআছি আমি ॥
বানরে দিয়াছ মিতা জেই অলঙ্কার।
সেই অলঙ্কার মিতা পরেছি তোমার ॥
বানর তুষ্টু হইলে আমার তুষ্টু হয় মন।

৭৭। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৫ ইঞ্চি পত্রসংখ্যা, ৩—৫২। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০—১২ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত। আরম্ভটি ৭৬ সংখ্যক পুথির অনুরূপ।

মধ্য,—

কাতর হইয়া কান্দে সিতা ত রূপসি।
সিতারে প্রবোধ দেন ত্রিজটা রাক্ষসি ॥
সিতা সুন এই রথ দেব অবতার।
অসুচি হইলে রথ না সহিত ভার ॥
স্বরূপেতে সিতা তুমি জদি হৈতে রাণ্ডি।
তোমারে ফেলিত রথ দৈবে নাই খণ্ডি ॥
ক্রন্দন তেজহ সিতা না ভাবিহ আন।
দিন কথ বই তুমি পাইবে শ্রীরাম ॥
এতেক বলিতে সিতা তেজিল কন্দন।
রথ লয়্যা গেল পুনু অসকের বন ॥
জেই মাত্র গেল সিতা অসোকের গুড়ি।
সতেকে বেরিলসিয়া রাবনের চেরি ॥
অসকের বনে কান্দে নাহিক চেতনা।
সিতাকে পেতাতে আইল রাক্ষসি সরমা ॥
বুনি বুনি বলিয়া সিতারে লয়্যা কুলি।
ঝাড়িয়া গায়ের ধুলা সিরে বান্ধে চুলি ॥

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ত্রিংশ খণ্ডের

নাম-সূচী

শ

সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাবলী

নং	গ্রন্থ	মূল্য—সদস্যের ও সাধারণের পক্ষে
*১।	কৃত্তিবাসী রামায়ণ (অযোধ্যা ও উত্তরাকাণ্ড)	।০, ১৲
*২।	পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী	
*৩।	বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত	
*৪।	ছুটীখানের মহাভারত	
৫।	বনমালী দাসের জয়দেবচরিত্র	৵০, ।০
৬।	বাসুদেব ঘোষের পদাবলী	/১০, ৶০
*৭।	জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল	
*৮।	মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল	
*৯।	ভাগবতাচার্য্যের কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী	
*১০।	গৌরপদতরঙ্গিণী	২৲, ২৲
*১১।	কাশীপরিক্রমা	
*১২।	নরোত্তমের রাধিকার মানভঙ্গ	
*১৩।	রামায়ণ-তত্ত্ব	
*১৪।	কৃষ্ণরাম দত্তের রাধিকামঙ্গল	
১৫।	বৌদ্ধধর্ম্ম	/০, ৵০
১৬।	গীতায় ঈশ্বরবাদ	১৲, ১।০
*১৭।	নরহরি চক্রবর্ত্তীর ব্রজপরিক্রমা	
১৮।	শঙ্কর ও শাক্যমুনি	/০ ৵০
১৯।	মধ্য-রসায়নী বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি	।৵০
*২০।	রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য-চরিত্র	
*২১।	রামাই পণ্ডিতের শূন্য পুরাণ	
*২২।	মিলন্দপঞ্হো	
*২৩।	নরহরি চক্রবর্ত্তীর নবদ্বীপ-পরিক্রমা	
*২৪।	বিদ্যাপতির পদাবলী	৩৲, ৪৲
২৫।	বিক্রমপুরের ইতিহাস	৩৲, ৩।০
২৬।	চাকমা জাতির ইতিহাস	২।০, ২।০
২৭।	ফরিদপুরের ইতিহাস	।৵০, ।৵০
*২৮।	শতপথ-ব্রাহ্মণ	
*২৯।	পরলোকগত চন্দ্রনাথ বসু	
*৩০।	পরলোকগত কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর	
৩১।	বিষ্ণুমূর্ত্তি-পরিচয়	৶০, ।৵০
৩২।	মায়াপুরী	৵০, ।০
৩৩।	প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা	।০, ১৲
*৩৪।	ঐতরেয় ব্রাহ্মণ	
৩৫।	কবি হেমচন্দ্র	
৩৬।	রামানুজাচার্য্যের শ্রীভাষ্য (১—৫ খণ্ড)	
৩৭।	বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা	২।৵০, ৪৵০
৩৮।	শব্দকোষ (১—৪ খণ্ড)	৩।৵০, ৫।০
*৩৯।	মহিলা ব্রতকথা	
*৪০।	রাসায়নিক পরিভাষা	
৪১।	কল্কিপুরাণ	।৵০, ১।০
৪২।	জ্যোতিষ দর্পণ	১৲, ১।০
৪৩।	প্রাচীন পুথির বিবরণ	।/০ ১৵০
৪৪।	দুর্গামঙ্গল	।০, ১৲
৪৫।	সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম	২৫৲, ৩০৲
*৪৬।	চণ্ডীদাসের পদাবলী	২৲, ৩৲
৪৭।	তীর্থ-মঙ্গল	।৵০, ।৵০
৪৮।	মৃগলুব্ধ	৶০, ।/০
৪৯।	সত্যনারায়ণের পুথি	৵০, ৶০
৫০।	পদকল্পতরু (১—৩ খণ্ড)	৩।০, ৫৲
৫১।	সয়রউল-মোতাক্ষরীণ	
৫২।	মৃগলুব্ধ সংবাদ	৶০, ।০
৫৩।	তীর্থভ্রমণ	১৲, ১।০
৫৪।	গঙ্গামঙ্গল	।০, ৸০
৫৫।	বৌদ্ধগান ও দোহা	৩৲, ৩৲
৫৬	ধর্ম্মপূজা-বিধান	।০, ৸০
৫৭।	মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা	৸০, ১৲
৫৮।	চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন	২৲, ২।০
৫৯।	জ্ঞানসাগর	।৵০, ।০
৬০।	সারদামঙ্গল	।০, ৸০
৬১।	নেপালে বাঙ্গালা নাটক	১৲, ১।০
৬২।	গৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস	।০, ।৵০
৬৩।	ন্যায়দর্শন (১—২ খণ্ড)	৩৸০, ৫।০
৬৪।	গোরক্ষবিজয়	।০, ৸০
৬৫।	শ্রীকৃষ্ণবিলাস	।৵০, ৸৵০
৬৬।	সর্ব্বসংবাদিনী	১৸০, ২।০
৬৭।	মনোবিজ্ঞান	১৲, ১।০
৬৮।	উদ্ভিদ-জ্ঞান (১ম পর্ব্ব)	১৲ ১।০
৬৯।	লেখমালানুক্রমণী	।০ ৸০

দ্রষ্টব্য ঃ—*তারকা-চিহ্নিত বইগুলি ফুরাইয়া গিয়াছে।

৬৲ টাকায় পরিষদ্-গ্রন্থাবলী

এখনও পাওয়া যায়। এই বইগুলির মূল্য সদস্যপক্ষে ১৫।০ ও সাধারণপক্ষে ২২।৵০। কিন্তু পরিষদ্গ্রন্থাবলীর বহুলপ্রচারকল্পে সদস্যপক্ষে ৬৲ ও সাধারণপক্ষে ৭৲ টাকা মূল্যে দেওয়া হইতেছে—১। মায়াপুরী, ২। রাধিকার মানভঙ্গ, ৩। তীর্থভ্রমণ, ৪। তীর্থমঙ্গল, ৫। বিষ্ণুমূর্ত্তি-পরিচয়, ৬। গঙ্গামঙ্গল, ৭। জ্যোতিষ-দর্পণ, ৮। দুর্গামঙ্গল, ৯। নেপালে বাঙ্গালা নাটক, ১০। ধর্ম্মপূজা-বিধান, ১১। সারদামঙ্গল, ১২। জ্ঞান-সাগর, ১৩। মৃগলুব্ধ, ১৪। মৃগলুব্ধ-সংবাদ, ১৫। প্রাচীন পুথির বিবরণ (২য় খণ্ড), ১৬। পদকল্পতরু (১ম ও ২য় খণ্ড), ১৭। শ্রীকৃষ্ণবিলাস, ১৮। বৌদ্ধগান ও দোহা। ১৯। ন্যায়দর্শন (১ম ও ২য় খণ্ড)।

প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির।

একত্রিংশ ভাগ] [দ্বিতীয় সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা

সূচী

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

বিশেষ দ্রষ্টব্য—সদস্যগণের ঠিকানা পরিবর্ত্তন ঘটিলে, তাঁহারা যথাসময়ে কার্য্যালয়ে সংবাদ দিবেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩৩১ বঙ্গাব্দের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ

সভাপতি

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্ত-রত্ন এম্ এ, বি এল্ এটর্ণি

সহকারী সভাপতিগণ

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, সিদ্ধান্তবারিধি

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস্

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল

মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত স্তর বিজয়চন্দ্ মহ্‌তাব বাহাদুর কে টি, জি সি এস্ আই, কে সি এস্ আই, কে সি আই ই, আই ও এম্

মহারাজ শ্রীযুক্ত স্তর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে সি আই ই

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সি আই ই, বি এল্

শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্-সি (এডিন), এফ আর এস্ ই

সম্পাদক

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

সহকারী সম্পাদকগণ

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্‌সি

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বি এল্

শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ

পত্রিকাধ্যক্ষ

অধ্যাপক ডাক্তার কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা এম্ এ, বি এল্, পি আর এস্, পি-এচ্ ডি

কোষাধ্যক্ষ

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর

চিত্রশালাধ্যক্ষ

শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই

ছাত্রাধ্যক্ষ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ

গ্রন্থাধ্যক্ষ

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত

আয়-ব্যয়-পরীক্ষকগণ

শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়

১৩৩১ বঙ্গাব্দের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্; শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ এটর্ণি; শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্; শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ; শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ; শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ; ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী; মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন এম্ এ, এল্ এম্ এস্; শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু নাট্যকলা-সুধাকর; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ, এফ জি এস্; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি-এচ্ ডি, এফ সি এস্ (লণ্ডন); ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি, এম এস্‌সি; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্বনিধি এম্ এ; শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী; রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর বি এ; বৈদ্য-মহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন সেন কাব্যতীর্থ বিদ্যানিধি; শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার এম্ এ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম্ এ; শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ; শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল্; শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায় তত্ত্বনিধি; শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৈজ্ঞানিক-পরিভাষা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে বহুদিন হইতে বিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দ-সংগ্রহের কার্য্য চলিতেছে। সম্প্রতি, পরিষদের বিজ্ঞান-শাখার কর্ত্তৃত্বে নানা সাময়িক পত্র ও পুস্তকাদিতে প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক-পরিভাষা সংগ্রহ ও সঙ্কলন করা হইতেছে। কার্য্য বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাগারে ও বিজ্ঞান-শাখার সভ্যগণের নিকট উক্ত শ্রেণীর পুস্তকাদি যাহা এ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, সে সমস্ত হইতেই সঙ্কলন-কার্য্য চলিতেছে। এ পর্য্যন্ত অনেক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। সমস্ত গ্রন্থ পরিষদের গ্রন্থাগারে আছে কি না, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। এই জন্য, এতদ্দ্বারা পরিষদের সদস্য ও সহৃদয় দেশবাসীর নিকট বিজ্ঞান-শাখার পক্ষ হইতে এই অনুরোধ জানাইতেছি যে, তাঁহাদের নিকট যদি কোন বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ থাকে, তবে পরিভাষা-সংগ্রহ কার্য্যের সৌকর্য্যার্থে পরিষৎকে তাহা দান করিলে কিংবা কিছু দিনের জন্য ধার দিলে, পরিষৎ তাঁহাদের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ থাকিবেন। বলা বাহুল্য, তাঁহাদের প্রদত্ত পুস্তক সযত্নে ব্যবহৃত হইবে ও কার্য্যান্তে ফেরত দেওয়া হইবে। এতদ্ব্যতীত, 'বৈজ্ঞানিক-পরিভাষা' প্রকাশিত হইলে গ্রন্থমধ্যে যথাস্থানে গ্রন্থদাতার এবং যাঁহারা গ্রন্থ ধার দিবেন, তাঁহাদের নাম কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লিখিত হইবে।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিজ্ঞান-শাখার আহ্বানকারী।

প্রাচীন পবিত্র তীর্থ

গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত কালীগড় গ্রামে ৺শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার মন্দির। ইহা একটি বহুপুরাতন সিদ্ধপীঠ এবং বলযোগপীঠ নামে জনশ্রুতি আছে। এখানে পঞ্চমুণ্ডি আসন আছে। দেবতা, সিদ্ধেশ্বরী,—মহাকাল—ভৈরব। ই, আই, আর, হুগলী-কাটোয়া লাইনের জীরাট ষ্টেসনের অর্দ্ধ মাইল পূর্ব্বে মন্দির।

সেবাইত
শ্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়

দুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডার

কতিপয় সহৃদয় ব্যক্তির সাহায্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে দুঃস্থ-সাহিত্যিকগণকে সাহায্য করিবার জন্য একটি ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এপর্য্যন্ত এই ভাণ্ডারে শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয় ২১০০৲ দুই হাজার এক শত টাকার কোম্পানীর কাগজ এবং নগদ ৯৲ টাকা দান করিয়াছেন। নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির বিক্রয়লব্ধ অর্থ এই ভাণ্ডারে জমা হইবে।—

'বৃন্দাবন-কথা' পরিষদের সদস্যপক্ষে মূল্য ১৸০। সাধারণ পক্ষে ২॥০। কালিদাসের 'মেঘদূত'। মূল্য সদস্য-পক্ষে ৸০, শাখা-পরিষদের সদস্য পক্ষে ৸৶০ এবং সাধারণের পক্ষে ১৲ এক টাকা। উত্তরপাড়া বিবরণ—মূল্য ।৶০ আনা। ঋতুসংহারম্—১৲ পুষ্পবাণবিলাসম্—।৶০।

১। সঙ্গীতরাগ-কল্পদ্রুম

কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব রাগসাগর-বিরচিত

এই বৃহৎ সঙ্গীতের কোষ-গ্রন্থে প্রাচীন ভারতের প্রচলিত নানাভাষায় অর্থাৎ সংস্কৃত, হিন্দি, গুজরাতী, মারাঠী, কর্ণাটী, তৈলঙ্গী, তামিল, বাঙ্গালা, উড়িয়া, আরব্য, পারস্য, পেশুয়ান, ইংরেজি ও রাজপুতানার নানা প্রাদেশিক ভাষায় প্রচলিত নানা সুরের ১০৮৯২টি প্রাচীন গান সংগৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থখানি তিন খণ্ডে প্রায় ১৭০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য সাধারণের সুবিধার জন্য ৩০৲ টাকার স্থলে ১০৲ দশ টাকা। হিন্দী প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে ৮৲ ও বাঙ্গালায় তৃতীয় খণ্ড ২৲ টাকায় দেওয়া হইতেছে।

২। লেখমালানুক্রমণী—প্রথম খণ্ড—প্রথম ভাগ।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

ভারতবর্ষের ধাতুফলকে, মূর্ত্তির পাদপীঠে ও শরীরগাত্রে, এবং প্রস্তর-ফলকে যে সকল লেখ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অশোকের লিপি ভিন্ন গুপ্ত সম্রাট্‌দের সময় পর্য্যন্ত যত লিপি পাওয়া গিয়াছে, সেই সকলের বিবরণ অর্থাৎ প্রত্যেক লিপি কবে কোথায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থিতি-স্থান, কোন্ কোন্ পুস্তক পত্রিকায় তাহাদের আলোচনা হইয়াছে এবং তাহাদের কোন্‌খানিতে কি কি তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে বা আবিষ্কারের সাহায্য হইয়াছে, এই সকল বিষয় এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। বর্ত্তমান গ্রন্থে ২৩১ খানি এইরূপ লেখের বিবরণ রহিয়াছে।

মূল্য—পরিষদের সদস্য-পক্ষে ॥০, শাখা-পরিষদের সদস্য-পক্ষে ॥৵০ ও সাধারণ-পক্ষে ৸০।

৩। সর্ব্বসংবাদিনী

শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও অনূদিত।

শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী মহোদয়কৃত ভাগবত-সন্দর্ভে তত্ত্ব, ভগবৎ, পরমাত্মা, শ্রীকৃষ্ণ, ভক্তি ও প্রীতি-সন্দর্ভ নামক যে ছয়টি সন্দর্ভ আছে, সর্ব্বসংবাদিনী তাহারই প্রথম চারিটি সন্দর্ভের অনুব্যাখ্যা। মূল ও বঙ্গানুবাদ সমেত ৩৬৬ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে মূল্য—পরিষদের সদস্য-পক্ষে ১৸০, শাখা-পরিষদের সদস্য-পক্ষে ২৲ ও সাধারণের পক্ষে ২৷০।

৪। উদ্ভিদ-জ্ঞান (প্রথম পর্ব্ব)

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু এম্ এ, এফ সি এস্ কর্ত্তৃক প্রণীত।

এই গ্রন্থে উদ্ভিদের স্থূল দেহরচনা অর্থাৎ বীজ, মূল, চারা, কাণ্ড, পত্র, শাখাবিস্তার, উদ্ভিদ-অঙ্গের রূপান্তর, পুষ্প, ফল প্রভৃতি নানা বিষয় সরল ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় উদ্ভিদবিদ্যা-বিষয়ক গ্রন্থ এই সর্ব্বপ্রথম। গ্রন্থশেষে প্রায় ৭০ পৃষ্ঠাব্যাপী পারিভাষিক শব্দগুলির একটী সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থখানি প্রায় আড়াই শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য—পরিষদের সদস্য-পক্ষে ১৲, শাখা-সভার সদস্য-পক্ষে ১৷০ ও সাধারণ-পক্ষে ১৷০।

৫। HANDBOOK TO THE SCULPTURES IN THE MUSEUM OF THE BANGIYA SAHITYA PARISHAD. (WITH TWENTY SEVEN PLATES.)

BY MANOMOHAN GANGULY, B.E., M. R. A. S., &C.

Hony. Supdt., Museum, Bangiya Sahitya Parishad.

মূল্য—পরিষদের সদস্য পক্ষে ৩৲; শাখা-পরিষদের সদস্য-পক্ষে ৩৸০; সাধারণের-পক্ষে ৬৲

৬। শ্রীশ্রীপদকল্পতরু (তৃতীয় খণ্ড)

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়, এম্ এ কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

চতুর্থ শাখা—প্রথম ভাগ, ২৬শ পল্লব পর্য্যন্ত ৩৩২ পৃষ্ঠায় সুচারুভাবে টীকা-পাঠান্তরাদি সহ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইল। মূল্য—পরিষদের সদস্য-পক্ষে ১।০, শাখা-সভার সদস্য-পক্ষে ১।৷০ ও সাধারণের পক্ষে ১৷৹০ ; এই গ্রন্থের ১ম ও ২য় খণ্ডের মূল্য যথাক্রমে পরিষদের সদস্য-পক্ষে ১৲, ১।০ ; সাধারণ-পক্ষে ১৷০, ১৷৹০।

৭। ন্যায়দর্শন (বাৎস্যায়ন ভাষ্য)

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কর্ত্তৃক অনূদিত, ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত

গৌতমসূত্র ন্যায়দর্শন ও বাৎস্যায়ন ভাষ্যের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। ১৩ প্রকরণ ও ১৩৭ সূত্রে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ হইল। ইহাতে মূল সূত্র, বাৎস্যায়ন ভাষ্য, ভাষ্যের বিস্তৃত বঙ্গানুবাদ, বিবৃতি, টিপ্পনী প্রভৃতি বহু বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৫২৬ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। মূল্য সদস্য পক্ষে ২।০, শাখা-পরিষদের সদস্য পক্ষে ২৷০, এবং সাধারণের পক্ষে ২৷৹০। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের মূল্য যথাক্রমে ১৷০, ১৷৹০ ও ২৷০।

৮। বৌদ্ধগান ও দোহা

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত

ইহাতে চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়, সরোজবজ্রের দোহাকোষ, কাহ্নপাদের দোহাকোষ এবং ডাকার্ণব, এই চারিখানি পুস্তক আছে। গ্রন্থখানি ১০০০ বৎসরেরও পূর্ব্বে রচিত। ইহাতে বাঙ্গালার প্রাচীনতম রূপ পাওয়া যায়। ভাষা-তত্ত্বের অনুশীলনে এই গ্রন্থের স্থান বোধ হয় সর্ব্বোপরি। মূল্য—সদস্য-পক্ষে ২৲, সাধারণ-পক্ষে ৩৲।

৯। বাঙ্গালা শব্দ-কোষ

রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম্ এ বাহাদুর বিরচিত

ভাষাতত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণের পরম উপাদেয় গ্রন্থ। চারি খণ্ডে সম্পূর্ণ। সদস্য-পক্ষে সমগ্র গ্রন্থের মূল্য—৩।৵০, সাধারণের পক্ষে—৫৷০।

১০। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

১৩২৪ সালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পুরাতন পত্রিকা পরিষদের সদস্যগণের এবং সাধারণের জন্য প্রতি বৎসরের মূল্য ১৲ টাকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

প্রকাশক
শ্রীরামকমল সিংহ
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির,
২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

১১। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত।

এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার কোন প্রাচীন কবিরই প্রকৃত ভাষা পাওয়া যায় নাই। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তন ইহার একমাত্র ব্যতিক্রম স্থল। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতকে প্রচলিত খাঁটি ভাষার নমুনা এই গ্রন্থে আছে। ভাষাতত্ত্বের হিসাবে কৃষ্ণকীর্ত্তনের মূল্য অত্যন্ত অধিক। আদর্শ পুথি শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত এবং তাঁহারই সম্পাদকতায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত। আচার্য্যপাদ ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় মুখবন্ধে লিখিয়াছেন—"এই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থ বাঙ্গালা-সাহিত্যের ইতিহাসে নূতন পরিচ্ছেদের যোজনা করিবে—ইতিহাসের পুরাণ পরিচ্ছেদের নূতন গড়ন দিবে।" প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়-লিখিত পুথির লিপিকাল-শীর্ষক প্রবন্ধ সহ বর্ত্তমানের উপযোগী করিয়া এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। মূল্য সদস্য পক্ষে ২৲, সাধারণ ২॥০।

শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত-বিরচিত

বৃন্দাবন-কথা

সম্বন্ধে কতিপয় মতামত ঃ—

"যেরূপ বিবরণ ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং তাহাতে গ্রন্থকারের যে পরিশ্রম হইয়াছে, তাহার তুলনায় এই মূল্য কিছুই নয়⋯ ⋯গ্রন্থকার বিবরণ সংগ্রহে কিছুই কার্পণ্য করেন নাই। ইহা একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক"—"নব্য-ভারত," চৈত্র ১৩২৬।

"ইহাতে শ্রীধাম-বৃন্দাবন সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য কথাই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে⋯ ⋯বর্ণনাকৌশল একজন প্রকৃত ভক্তের কাছে যাহা আশা করা যাইতে পারে, তাহা এই গ্রন্থে জাজ্বল্যমান।"—"ভারতবর্ষ", বৈশাখ, ১৩২৭।

"ইহা বৃন্দাবনধামের ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ একখানি অতি উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় গ্রন্থ⋯⋯ বৃন্দাবন-কাহিনী আমাদের দেশ ও জাতির গৌরবময় ইতিহাস। গ্রন্থকার ইহা প্রকাশিত করিয়া আমাদের জাতির এবং বিশেষভাবে বৈষ্ণব-সমাজের উপকার সাধন করিয়াছেন।"—"মানসী ও মর্ম্মবাণী", জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭।

"তীর্থযাত্রীর ও ভ্রমণকারীর সাহায্য ও পরিচালকের কাজে লাগিবার মতন বই"—"প্রবাসী" আষাঢ়, ১৩২৭।

"বৃন্দাবন-সম্বন্ধে এরূপ গ্রন্থ বাঙ্গালায় নাই বলিলেও চলে।"—বঙ্গবাসী, ৮ই শ্রাবণ, ১৩২৭।

"The author has patiently and industriously collected the materials for his book, which has become an intellectual feast to us and it would contribute to the addition to our literature."—The Amrita Bazar Patrika, 8th April, 1920.

"The author has spared no pains or expenses to make the book throughly servicable to those who are interested in Brindaban—its past history and present position."—The Bengalee, 9th May, 1920.

"To pilgrims on their way to holy Brindaban, it is an invaluable vademacum, to the stay-at-home-reader an informing and entertaining narrative. The author has a facile pen which makes his book such a pleasant reading."—The Hindoo Patriot, 19th May, 1920.

বৃন্দাবন-কথার মূল্য—২॥০
পরিষদের সদস্য-পক্ষে—১৸০
ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির।
২৪৩।১, আপার সার্কুলার রোড,—কলিকাতা।

বৈষ্ণব-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্

অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ সম্পাদিত

ইহাতে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বহুসংখ্যক পদকর্ত্তার ৬২৩টি উৎকৃষ্ট অপ্রকাশিত পদ, দুরূহ স্থলের পাদটীকাসহ সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে আটাইশ জন পদকর্ত্তার নাম ও পদাবলী বাঙ্গালা-সাহিত্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। পরিষৎ-পত্রিকার আকারের ৬০ পৃষ্ঠাব্যাপী সুবৃহৎ ভূমিকায় পদকর্ত্তৃগণ, পদাবলীর ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার, রস, কবিত্ব ও বিশেষত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। বিষয়-সূচী, পদ-সূচী, রস-সূচী ও অর্থপ্রয়োগ-সম্বলিত সুবৃহৎ শব্দ-সূচীতেই প্রায় ডবল-কলামে ৭০ পৃষ্ঠা পূর্ণ হইয়াছে' স্থানাভাব হেতু এ স্থলে মাত্র চারিটি অভিমতের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

বিশ্ব-বরেণ্য কবি-শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—

"বৈষ্ণব-সাহিত্য-প্রকাশ-কার্য্যে আপনার অধ্যবসায়, গবেষণা ও নৈপুণ্য বঙ্গ-সাহিত্যের প্রভূত উপকার করিয়াছে। এ সম্বন্ধে আপনার কৃতিত্ব সাহিত্যরসিক ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন।"

সুপ্রসিদ্ধ "অমৃত-বাজার পত্রিকা" লিখিয়াছেন,—

"The present work "Aprakashita Padaratnavali" is an outcome of Satis Babu's life-long labour and research in the field of Vaishnava Padavali Literature and is undoubtedly an unique collection in as much as it contains more than six hundred unpublished Vaishnava Padavalis, including poems by nearly thirty unknown 'pada-kartas' and many beautiful unknown poems by Vidyapati, Chandidas, Govindadas, &c., the master-poets of the Padavali Literature. * * * As we have not yet got any authentic Padavali-Sabda-kosha, this glossary compiled by a scholar like Satis Babu will be simply invaluable to the readers of Padavali Literature and as such we cannot but tender our sincere thanks to the learned editor for this arduous labour in bringing out this excellent collection of Padavalis."

সুপ্রসিদ্ধ "হিতবাদী" লিখিয়াছেন,—

"এই পুস্তকে যে সকল পদরত্ন সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহার আলোকে বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারের উজ্জ্বলতা যে বৃদ্ধি পাইবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। আমরা এই সংগ্রহে কেবল যে বহু অপ্রকাশিত পদ দেখিলাম, তাহা নহে, অনেক অবিদিত সুকবির রচনা-চাতুর্য্য দেখিয়াও মুগ্ধ হইয়াছি।"

সুপ্রসিদ্ধ "প্রবাসী" লিখিয়াছেন,—

"সতীশ বাবু বৈষ্ণব-সাহিত্য আলোচনা করিয়া ও সম্পাদন করিয়া বিখ্যাত। তিনি বহু জ্ঞাত পদকর্ত্তার অপ্রকাশিত পদ ও বহু অজ্ঞাতপূর্ব্ব পদকর্ত্তার পদাবলী বহু বৎসরের চেষ্টায় সংগ্রহ করিয়া এই পদরত্নাবলী প্রকাশ করিয়াছেন। * * * এই সকল অপরিচিত পদকর্ত্তাদের পদ বাস্তবিকই রত্নাবলী, অসাধারণ কবিত্ব-প্রভায় সমুজ্জ্বল। বাংলার প্রাচীন যুগের প্রকৃত কবিত্বরস-উৎস এই সব বৈষ্ণব-পদাবলী বঙ্গ-সাহিত্য রসিক মাত্রেরই সমাদর লাভ করিবে।"

প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পুস্তকালয় ও সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২৲ দুই টাকা।

সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাবলী

মূল্য—সদস্যের ও সাধারণের পক্ষে

*১।	কৃত্তিবাসী রামায়ণ (অযোধ্যা ও উত্তরাকাণ্ড)	॥৵, ১৲
*২।	পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী	
*৩।	বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত	
*৪।	ছুটীখানের মহাভারত	
৫।	বনমালী দাসের জয়দেবচরিত্র	৶০, ।০
৬।	বাসুদেব ঘোষের পদাবলী	⁄১০, ৶০
*৭।	জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল	
*৮।	মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল	
*৯।	ভাগবতাচার্য্যের কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী	
*১০।	গৌরপদতরঙ্গিণী	২৲, ২৲
*১১।	কাশীপরিক্রমা	
*১২।	নরোত্তমের রাধিকার মানভঙ্গ	
*১৩।	রামায়ণ-তত্ত্ব	
*১৪।	কৃষ্ণরাম দত্তের রাধিকামঙ্গল	
১৫।	বৌদ্ধধর্ম্ম	⁄০, ৶০
১৬।	গীতায় ঈশ্বরবাদ	১৲, ১।০
*১৭।	নরহরি চক্রবর্ত্তীর ব্রজপরিক্রমা	
১৮।	শঙ্কর ও শাক্যমুনি	⁄০ ৶০
১৯।	নব্য-রসায়নী বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি	।৵০
*২০।	রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য-চরিত্র	
*২১।	রামাই পণ্ডিতের শূন্য পুরাণ	
*২২।	মিলন্দপঞ্হো	
*২৩।	নরহরি চক্রবর্ত্তীর নবদ্বীপ-পরিক্রমা	
*২৪।	বিদ্যাপতির পদাবলী	৩, ৪৲
২৫।	বিক্রমপুরের ইতিহাস	৩, ৩।০
২৬।	চাকমা জাতির ইতিহাস	২।০, ২।০
২৭।	ফরিদপুরের ইতিহাস	।৵০, ।৵০
*২৮।	শতপথ-ব্রাহ্মণ	
*২৯।	পরলোকগত চন্দ্রনাথ বসু	
*৩০।	পরলোকগত কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর	
৩১।	বিষ্ণুমূর্ত্তি-পরিচয়	৶০, ।৵০
৩২।	মায়াপুরী	৶০, ।০
৩৩।	প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা	।০, ১৲
*৩৪।	ঐতরেয় ব্রাহ্মণ	

মূল্য—সদস্যের ও সাধারণের পক্ষে

৩৫।	কবি হেমচন্দ্র	
৩৬।	রামানুজাচার্য্যের শ্রীভাষ্য (১—৫ খণ্ড)	
৩৭।	বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা	২।৵০, ৪৵০
৩৮।	শব্দকোষ (১—৪ খণ্ড)	৩।৵০, ৫।০
*৩৯।	মহিলা ব্রতকথা	
*৪০।	রাসায়নিক পরিভাষা	
৪১।	কল্কিপুরাণ	।৵০, ১।০
৪২।	জ্যোতিষ-দর্পণ	১৲, ১।০
৪৩।	প্রাচীন পুথির বিবরণ	৷⁄০ ১৵০
৪৪।	দুর্গামঙ্গল	।০, ১৲
৪৫।	সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম	২৫৲, ৩০৲
*৪৬।	চণ্ডীদাসের পদাবলী	২৲, ৩৲
৪৭।	তীর্থ-মঙ্গল	।৵০, ।৵০
৪৮।	মৃগলুব্ধ	৶০, ৷⁄০
৪৯।	সত্যনারায়ণের পুথি	৶০, ৶০
৫০।	পদকল্পতরু (১—৩ খণ্ড)	৩।০, ৫৲
৫১।	সয়রউল-মোতাক্ষরীণ	
৫২।	মৃগলুব্ধ সংবাদ	৶০, ।০
৫৩।	তীর্থভ্রমণ	১৲, ১।০
৫৪।	গঙ্গামঙ্গল	।০, ৸০
৫৫।	বৌদ্ধগান ও দোহা	৩৲, ৩৲
৫৬।	ধর্ম্মপূজা-বিধান	।০, ৸০
৫৭।	মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা	৸০, ১৲
৫৮।	চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন	২৲, ২।০
৫৯।	জ্ঞানসাগর	।৵০, ।০
৬০।	সারদামঙ্গল	।০, ৸০
৬১।	নেপালে বাঙ্গালা নাটক	১৲, ১।০
৬২।	গৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস	।০, ।৵০
৬৩।	ন্যায়দর্শন (১—২ খণ্ড)	৩৸০, ৫।০
৬৪।	গোরক্ষবিজয়	।০, ৸০
৬৫।	শ্রীকৃষ্ণবিলাস	।৵০, ৸৵০
৬৬।	সর্ব্বসংবাদিনী	১৸০, ২।০
৬৭।	মনোবিজ্ঞান	১৲, ১।০
৬৮।	উদ্ভিদ-জ্ঞান (১ম পর্ব্ব)	১৲ ১।০
৬৯।	লেখমালানুক্রমণী	।০ ৸০

দ্রষ্টব্য ঃ—*তারকা-চিহ্নিত বইগুলি ফুরাইয়া গিয়াছে।

৬৲ টাকায় পরিষদ্‌-গ্রন্থাবলী

এখনও পাওয়া যায়। এই বইগুলির মূল্য সদস্যপক্ষে ১৫।০ ও সাধারণপক্ষে ২২।৵০। কিন্তু পরিষদ্‌গ্রন্থাবলীর বহুলপ্রচারকল্পে সদস্যপক্ষে ৬৲ ও সাধারণপক্ষে ৭৲ টাকা মূল্যে দেওয়া হইতেছে—১। মায়াপুরী, ২। রাধিকার মানভঙ্গ, ৩। তীর্থভ্রমণ, ৪। তীর্থমঙ্গল, ৫। বিষ্ণুমূর্ত্তি-পরিচয়, ৬। গঙ্গামঙ্গল, ৭। জ্যোতিষ-দর্পণ, ৮। দুর্গামঙ্গল, ৯। নেপালে বাঙ্গালা নাটক, ১০। ধর্ম্মপূজা-বিধান, ১১। সারদামঙ্গল, ১২। জ্ঞান-সাগর, ১৩। মৃগলুব্ধ, ১৪। মৃগলুব্ধ-সংবাদ, ১৫। প্রাচীন পুথির বিবরণ (২য় খণ্ড), ১৬। পদকল্পতরু (১ম ও ২য় খণ্ড), ১৭। শ্রীকৃষ্ণবিলাস, ১৮। বৌদ্ধগান ও দোহা। ১৯। ন্যায়দর্শন (১ম ও ২য় খণ্ড)।

প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌ মন্দির।

হিন্দু ও বৌদ্ধে তফাৎ *

হিন্দু, দেবতা উপাসনা করেন। বৌদ্ধ, গুরুর উপাসনা করেন। হিন্দু ও বৌদ্ধে এই প্রথম ও প্রধান তফাৎ। হিন্দু দেবতা উপাসনা করেন; তাঁহাদের উদ্দেশ্য—দেবতার সঙ্গে এক লোকে বাস করেন, সমান আকার প্রাপ্ত হন, সমান অলৌকিক শক্তি লাভ করেন, এমন কি, একদেশে দেবতার দেহের সহিত মিলিত হন। পূরা মাত্রায় দেবতা হন, এ কথা তাঁহারা মনেও ধারণা করিতে পারেন না। বৌদ্ধেরা গুরু ভজনা করেন; তাঁহাদের উদ্দেশ্য—গুরু হইবেন, বুদ্ধ হইবেন, শূন্য হইবেন। শূন্যে শূন্য মিশিয়া যাইবে।

বৌদ্ধেরা দেবতাকে অত্যন্ত ছোট বলিয়া মনে করেন। দেবতারা মানুষের চেয়ে একটু বড় হইতে পারেন, কিন্তু গুরুর চেয়ে তাঁহারা অনেক নীচে। শাক্যমুনি যখন বোধিমূলে বসিয়া বোধিলাভ করিলেন, ইন্দ্র ও ব্রহ্মা তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গের অধিপতি, ব্রহ্মা রূপলোকের অধিপতি; ইঁহারা দুজনেই বুদ্ধের কাছে জোড়হস্ত। নারায়ণপরিপৃচ্ছা নামক পুস্তকে আছে যে, নারায়ণ সাজিয়া গুজিয়া, শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারণ করিয়া, গরুড় আসনে বসিয়া বুদ্ধদেবের নিকটে আসিলেন এবং গূঢ় দার্শনিক মতের মীমাংসা করিয়া লইয়া গেলেন। শাক্যসিংহ যখন জন্মাইলেন, তখন শাক্যদের নিয়ম অনুসারে খোকাটীকে মহেশ্বরের মন্দিরে লইয়া যাওয়া হইল। মহেশ্বর নিজে উঠিয়া ছেলেটীকে কোলে করিয়া লইলেন। এই সকল দেখিয়া বেশ জানা যায় যে, আমাদের যে বড় বড় দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, সকলেই বুদ্ধ অপেক্ষা অনেক ছোট। কিন্তু বেদের সময় হইতেই আমরা ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবতার পূজা করিয়া আসিতেছি। বেদে যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ, দেবতাদের আহার, আহারের স্থান, সব তৈয়ার করিতেন; ঋগ্বেদী তাঁহাদের হব বা আহ্বান করিতেন। তাঁহারা খাইতে বসিলে সামবেদী আহারের সময় তাঁহাদের স্তব উচ্চৈঃস্বরে গান করিতেন। দেবতারা আহারে তৃপ্ত হইয়া তাঁহাদের বর দিয়া যাইতেন, যথা—পুত্র, পশু, দ্রবিণ ইত্যাদি। বেদের পর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর আমাদের উপাস্য দেবতা হইলেন। তাঁহাদের কাছেও আমরা বর চাহিতাম—ধন দাও, পুত্র দাও, পশু দাও। যাঁহারা পার্থিব সুখের জন্য ব্যগ্র নহেন, তাঁহারা সার্ষ্টি, সালোক্য, সারূপ্য ও বড় জোর সাযুজ্য প্রার্থনা করিতেন। কিন্তু বৌদ্ধদের চরম প্রার্থনা, নির্ব্বাণ ও বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি। অনুপধিশেষনির্ব্বাণ বা শূন্যে মিশিয়া যাওয়া।

আমরা ঠাকুরদের ধ্যান করি। বলি—"ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং, ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী", অথবা বলি,—"বন্দে শৈলসুতাসুতং," "ভজামি, প্রণমামি" প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করি। কিন্তু বৌদ্ধেরা যখন তাঁহাদের দেবতাদের ধ্যান করেন, তাঁহারা "আত্মানং অমুকদেবতারূপেণ বিভাব্য" পূজা করেন, আমিই বজ্রযোগিনী হইয়াছি, আমিই লোকেশ্বর হইয়াছি, আমিই প্রজ্ঞাপারমিতা

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৩১শ বার্ষিক চতুর্থ বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

হইয়াছি বলিয়া পূজা করেন। এই সকল দেবতা ইন্দ্র চন্দ্রাদি দেবতা হইতে পৃথক্। ইঁহাদের কথা পরে বলিব। আমাদের দেবতারা অনেক বৌদ্ধ দেবতার পায়ের তলে থাকেন। অনেক সময়ে আমাদের ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরেরও ঐরূপ দুর্দ্দশা বৌদ্ধেরা করিয়া থাকেন।

মহাযানের পর বৌদ্ধদের যে সব যান হইয়াছে, তাহাতে দেবতা আছে। কিন্তু সে সকল দেবতা দেব ও দেবী, আমাদের দেব ও দেবীদের মত ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ বা ডিপার্টমেণ্টের দেবতা নহেন; তাঁহারা সকলেই শূন্যের প্রতিমূর্ত্তি। আপনারা পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধের নাম শুনিয়াছেন। বৈরোচন, অক্ষোভ্য, রত্নসম্ভব, অমিতাভ ও অমোঘসিদ্ধি; তাঁহারা পাঁচটী স্কন্ধের শূন্যমূর্ত্তি। পাঁচটী স্কন্ধ কি কি? রূপস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ, বেদনাস্কন্ধ ও বিজ্ঞানস্কন্ধ, এই পাঁচটী স্কন্ধের শূন্যমূর্ত্তির নাম পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ। ইঁহাদের পাঁচটী শক্তি আছেন, রোচনা, মামকী, তারা, পাণ্ডরা, আর্য্যতারিকা। ইঁহাদের আবার পাঁচজন বোধিসত্ত্ব আছেন; গণেশ, মহাকাল, পদ্মপাণি, রত্নপাণি, বিশ্বপাণি। এই শক্তিগুলি ও এই বোধিসত্ত্বগণ সবই শূন্যমূর্ত্তি। এই পনরটী শূন্যমূর্ত্তি হইতে অসংখ্য অসংখ্য বুদ্ধ দেব দেবীর মূর্ত্তি হইয়াছে; সবই শূন্যমূর্ত্তি। বৌদ্ধেরা—আমরা সেই সেই মূর্ত্তি হইয়া গিয়াছি, এই বিভাবনা বা ধ্যান করিয়া তাঁহাদের পূজা করেন। আমরা শূন্যমূর্ত্তির ধ্যানই করি না। আমরা আমাদের সম্মুখে যে মূর্ত্তি, তাহাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া, তাঁহাকে দেবতা করিয়া লইয়া ধ্যান করি।

আমাদের শূন্য অন্ধকার তমোভূত। বৌদ্ধদের শূন্য প্রভাস্বর, স্বয়ংপ্রকাশ, স্বয়ংজ্যোতিঃ। আমাদের আদিসৃষ্টি আছে। বৌদ্ধদের মতে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ অনাদিপ্রবাহ। উহার আদিও নাই, অন্তও নাই। বুদ্ধদেবকে সৃষ্টির কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, তোমার আপনার চরকায় তেল দাও। তুমি কোথা থেকে এলে, কোথায় যাইবে, তাই ভাব। পৃথিবীর কথা ভাবায় তোমার দরকার নাই। আকাশ কোথা হইতে হইল, জিজ্ঞাসা করিলেও সেই কথাই বলিতেন। সুতরাং তাঁহার কাছে সৃষ্টিকথা শুনিবার আশা নাই। যখন বৌদ্ধদের মধ্যে যুবা বৃদ্ধে দলাদলি হইল, তখন যুবকেরা প্রথম যে বই লেখে, সেই মহাবস্তু অবদানে লেখা আছে, আগে বহু দিন পূর্ব্বে—কত কল্পকোটি বৎসর পূর্ব্বে, তাহার ঠিকানা নাই, জীব ছিলেন তাঁহারা স্বয়ংপ্রকাশ, তাঁহাদের শরীরে ভার ছিল না, তাঁহারা দিক্, কাল, আকাশে ইচ্ছামত ঘুরিয়া বেড়াইতেন, তাঁহাদের দুঃখ ছিল না, নিরন্তর প্রীতি সুখে বিচরণ করিতেন। কিছু কাল পরে একটা হ্রদের মত দেখা দিল। উহাতে অতি পাতলা অথচ অতি সুমিষ্ট জলের মত একটা পদার্থ ছিল; তাই অনেকে খাইতে লাগিলেন, খাইতে খাইতে তাঁহাদের শরীরে একটু একটু ভার বোধ হইতে লাগিল। আবার বহুকাল পরে আর একটা কি [illegible] হইল, তাহা খাইতে খাইতে তাঁহাদের শরীরে তেজ বা আলো ক্রমে কমিতে লাগিল। ক্রমে গাছ দেখা দিল, সমস্ত গাছই ফলভরে অবনত, সেই ফল তাঁহারা খুব খাইতে লাগিলেন, শরীরের ভারও একটু বাড়িল, আলোও কমিয়া গেল। তাহার পর শস্যক্ষেত্র দেখা দিল, তাঁহারা তাহাও খাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের স্ত্রীচিহ্ন ও পুংচিহ্ন আবির্ভূত হইল, ক্রমে তাঁহাদের সন্তান সন্ততি হইতে লাগিল এবং ফসল তৈয়ারি করা দরকার হইল। যখন আমার খেতের ফসল

ভুমি খাইতে লাগিলে, তখন সকলে একত্র হইয়া একজন মহাকায় পুরুষকে নিয়োগ করা হইল। তাঁহার বেতন নির্দ্ধারণ করা হইল, উৎপন্নের ৬ ভাগের একভাগ। তাঁহার নাম হইল মহাসম্মত। এই সব পড়িয়া আমরা দেখিতে পাই যে, হিন্দুরা যে অন্ধকার হইতে সৃষ্টি বলিয়াছেন, ইঁহারা তাহা বলেন না। ইঁহারা বলেন, আলো হইতেই অন্ধকার হইয়াছে। আর হিন্দুরা যে বলেন,— "অষ্টাভির্লোকপালানাং মাত্রাভির্নির্ম্মিতো নৃপঃ" অর্থাৎ রাজা দেবাংশ, ইঁহারা তাহাও বলেন না। ইঁহাদের রাজা গণদাস ; লোকে তাঁহাকে বাছিয়া লইয়া বেতন দিয়া রাখিয়াছে। উত্তর অঞ্চলের বৌদ্ধেরা রাজাকে কখনই বড় বলিয়া মানিত না। সেই জন্য ভারতবর্ষে ও চীনে রাজাদের হাতে তাহাদের অনেক নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছিল। সময়ে সময়ে সমস্ত বৌদ্ধ সংঘ বিনাশ করিয়া ফেলা হইত। রাজাদের হাতে হিন্দুদের এ দুর্ভোগ বড় ভুগিতে হয় নাই।

বৌদ্ধধর্ম্ম নগরের পক্ষেই সুবিধা। হিন্দুধর্ম্ম নগর ও গ্রাম, সর্ব্বত্রই সমান ভাবে আদর পাইত। কৌটিল্য বৌদ্ধদের বড় ভাল চক্ষে দেখিতেন না। তিনি এক জায়গায় বলিয়াছেন, উহাদিগকে পাড়াগাঁয়ে, যেখানে লোক চাষবাস করিয়া খায়, সেখানে যাইতেই দিবে না। নূতন গাঁয়ে উহাদের প্রবেশ নিষেধ। উহারা সেখানে গেলে, লোককে ভিক্ষু করিতে চেষ্টা করিবে, চাষবাস বন্ধ হইয়া যাইবে। হিন্দুরা গৃহস্থ, তাঁহারা সংসারের উন্নতি চান, বৌদ্ধদের সে দিকে দৃষ্টিই নাই। সে জন্য হিন্দু ও বৌদ্ধে কখনই ঠিক বনিবনাও হইত না। অথচ হিন্দুরা ভিক্ষা না দিলে বৌদ্ধদের ভিক্ষু হওয়াই চলিত না।

হিন্দুরা বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম মানিতেন, তাঁহাদের শেষ আশ্রম যতি বা ভিক্ষু। যে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ না হইয়া যতি হইত, হিন্দুরা তাহাকে ভাল চক্ষে ত দেখিতই না, বরং তাহাকে শাস্তিও দিত। কিন্তু বৌদ্ধেরা বর্ণ ও আশ্রম না দেখিয়াই সকলকে ভিক্ষু করিত। বুদ্ধদেবের সময়েই এই ব্যাপার লইয়া মহা গোলযোগ উঠে। তিনি যখন কপিলবাস্তুতে ধর্ম্ম প্রচারে ব্যস্ত ছিলেন, তখন দলে দলে শাক্যেরা বাল যুবা বৃদ্ধ স্ত্রীপুরুষ ভিক্ষু হইতে লাগিল। শুদ্ধোদন দেখিলেন, ক্রমে শাক্যদের জাতি ও নাম লোপ হইতে চলিল। তখন তিনি বুদ্ধকে বলিলেন, তুমি ২১ বৎসরের আগে যদি কাহাকেও ভিক্ষু কর, তাহা হইলে তোমাকে তাহার পিতা মাতার সম্মতি লইতে হইবে। তাই নিয়ম হইল, ২১ বৎসর বয়সের আগে কাহাকেও ভিক্ষু করা হইবে না। সে নিয়ম আজও আছে। বৌদ্ধদের যে কর্ম্মবাচা আছে, তাহাতে কেহ ভিক্ষু হইতে আসিলে তাহাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করা হয়, "তোমার বয়স ২১ বৎসর হইয়াছে ত ?" এইরূপে শুদ্ধোদন নাবালকদিগকে ভিক্ষু হওয়ার দায় হইতে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

হিন্দুদের মতে যে সন্ন্যাস গ্রহণ করিল, সে চতুর্ব্বর্ণ-সমাজ হইতে বাহির হইয়া গেল। তাহার দেহ অশুচি। তাহার সম্পত্তি উত্তরাধিকারীরা ভাগ করিয়া লইবে। সে যদি আবার ফিরিয়া আসে, তাহাকে আর বর্ণাশ্রমের মধ্যে গ্রহণ করা হইবে না। সে ভ্রষ্ট যোগী হইয়া থাকিবে। সংসারে প্রবেশ করিলে সে আর আপনার পূর্ব্বপদ পাইবে না। বৌদ্ধেরা কিন্তু অনেককে সংঘ ত্যাগ করিয়া আবার সংসারে প্রবেশ করিতে দেয়। উহারা কয়েক বৎসরের জন্যও ভিক্ষু করিতে রাজী।

অশোক রাজা একবার এক বৎসরের জন্ত সংঘে প্রবেশ করিয়াছিলেন। যে সংঘে যায়, সে আপনার সমস্ত সম্পত্তি স্বত্ব লইয়া সংঘে যায়। তাহার সম্পত্তি তাহার থাকে না, উহা সংঘের হইয়া যায়। বৌদ্ধেরা হিন্দুদের ঠাট্টা করিত, হিন্দুদের ত সন্ন্যাস করা নয়, পুত্র পৌত্রদের সম্পত্তি বাঁটিয়া দিবার একটা ফন্দী। আমাদের সংঘে আশা মানে, আপনার সমস্ত সম্পত্তি সাধারণীকরণ বা ছনিয়াকে দান করা। হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে এই ব্যাপার লইয়া সর্ব্বদা বিবাদবিসম্বাদ হইত। মনে কর, একজন বড় ধনী আছেন; তাঁহার একটী ছেলেকে উহারা ভিক্ষু করিল। তাহার পিতা মরিলে তাহার অংশ সংঘের হইয়া যাইবে। অন্য ভাইএরা তাহাতে রাজী হইত না। সর্ব্বদা ঝগড়া বিবাদ হইত। আমার মনে হয়, ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্ম্মের পতনে এও একটা প্রধান কারণ। ভিক্ষুদের দেখিলেই সম্পন্ন গৃহস্থেরা ভয় পাইত—ছেলে ধরিতে আসিয়াছে।

হিন্দুদের ভূসম্পত্তি সবই সপিণ্ডদের হইত। ছেলে জন্মাইলেই সে সম্পত্তির অংশাধিকারী হইত। বাপ আর সে সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারিতেন না। মিতাক্ষরা প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রে লেখা যে, জন্মমাত্রেই স্থাবর সম্পত্তিতে তাহার স্বত্ব হয়। কিন্তু বাঙ্গালায় এ মত চলে না। এখানে বাপ মরার সময় যে যে ছেলে, পৌত্র বা প্রপৌত্র বাঁচিয়া থাকিবে, তাহারা উত্তরাধিকারের স্বত্ব পাইবে। এটা অনেকে মনে করেন, বাঙ্গালায় বৌদ্ধ প্রাধান্য ছিল বলিয়া হইয়াছে। হিন্দুরা communal interest দেখিত, বৌদ্ধেরা personal interest দেখিত।

বুদ্ধদেব নিজে যে সকল আইন করিয়া গিয়াছিলেন, সবই সংঘের জন্য। তাঁহার বিনয় সংঘের মধ্যেই চলিত। গৃহস্থ বৌদ্ধ উপাসক উপাসিকাদের জন্য তিনি যে সকল নিয়ম করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাও সংঘ ও উপাসক উপাসিকার মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল, তাহারই উপর স্থাপিত। এই সকল নিয়মের বাহিরে উপাসক উপাসিকাদিগকে অর্থাৎ গৃহস্থ বৌদ্ধদিগকে রাজার আইন মানিয়া চলিতে হইত। দেওয়ানী ও ফৌজদারী অথবা ধর্ম্মস্থীয় ও কণ্টকশোধন রাজার হাতে ছিল। এ সকল বিষয়ে বৌদ্ধেরা কোন আইন কানুন ভারতবর্ষে করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং ভারতবর্ষের বৌদ্ধদিগকে চিরদিনই রাজার অধীন হইয়া চলিতে হইত। ইৎসিং এক জায়গায় বলিয়া গিয়াছেন, কেমন করিয়া সংঘ রাজার সঙ্গে যাহাতে বিবাদ না হয়, তাহার চেষ্টা করিতেন। একজন ভিক্ষুকে কোন কারণে সংঘ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হয়, সংঘাধিপ তাহার যাহা কিছু ভিক্ষু-সম্পত্তি ছিল, তাহার কাপড় চোপড় বিছানা প্রভৃতি তাহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সে আর সেই জিনিষ লইবার জন্ত সরকারের সাহায্য লইবার সুবিধা পাইল না। অনেক রাজা বৌদ্ধ সংঘকে গ্রাম দান করিতেন। নালন্দার মঠগুলির ২০০ খানা গ্রাম ছিল। গ্রামণীর যে কাজ, তাহা সংঘেরাই করিতেন। সুতরাং সংঘ যে একেবারে রাজার কথা মানিব না, তাহা বলিতে পারিতেন না। অনেক রাজা আবার এই সকল গ্রাম বাজেয়াপ্ত করিবার চেষ্টা করিতেন। অনেক জায়গায় দেখিতে পাওয়া যায়, এক সংঘের গ্রাম অন্ত সংঘকে দেওয়া হইত। সংঘে আবার ব্যবসা ও বাণিজ্য চলিত। সুতরাং রাজার সঙ্গে তাঁহাদিগকে ভাব রাখিয়া চলিতে হইত। রাজা বৌদ্ধবিরোধী হইলে এবং তাঁহার সভায় ব্রাহ্মণ প্রবল হইলে সংঘকে অনেক সময় বিপদে পড়িতে হইত। কিন্তু তথাপি

সংঘের যথেষ্ট প্রতাপ ছিল। লোকে যখন সংঘের অনুরাগী থাকিত, রাজা সহজে তাহাদের উপর হুকুম চালাইতে বা তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিতে যাইতেন না।

রাজনীতি, সমাজ শাসন ইত্যাদি বিষয়ে হিন্দু ও বৌদ্ধে যে তফাৎ ছিল, তাহা কতক কতক দেখান হইল। কিন্তু দার্শনিক মত বিষয়ে উঁহাদের তফাৎ বড়ই বেশী ছিল। হিন্দুরা এখন বলেন, তাঁহাদের ছয়খানি দর্শন,—মীমাংসা, বেদান্ত, সাংখ্য, যোগ, ন্যায় ও বৈশেষিক। মীমাংসা বৌদ্ধদের থাকিতেই পারে না। কারণ, উহা বেদের ব্যাখ্যা লইয়া ব্যস্ত। এই শাস্ত্রকে দর্শন বলিতেও পারা যায়, নাও বলিতে পারা যায়। যখন উহা বেদের ব্যাখ্যা লইয়া নিয়ম করে, তখন উহা দর্শন নহে। কিন্তু যখন যজ্ঞ করিলে অপূর্ব্ব হয় বলে, অপূর্ব্বে বা অদৃষ্টের বলে স্বর্গ ও নরক হয় বলে, স্বর্গের লক্ষণ করে, প্রমাণ কয়টা ও তাহার লক্ষণ কি বলে, তখন উহা দর্শন। বেদান্ত, বেদের উপনিষৎগুলি প্রমাণ মনে করিয়া, তাহার উপর ব্রহ্ম, অপবর্গ প্রভৃতি কথার বিচার করে, তখন উহা নিশ্চয়ই দর্শন। যখন এ দুখানি দর্শন বেদকে ভিত্তি করিয়া তৈয়ারি হইয়াছে, তখন ইহার সহিত বৌদ্ধদের কোনও সম্পর্ক নাই।

পাতঞ্জল দর্শন যোগের কথা। যোগ সবাই করে—বৌদ্ধেরাও করে, জৈনেরাও করে, হিন্দুরাও করে; সুতরাং উহাকে দর্শন না বলিলেও চলে। একজন দর্শনসমূহের ইতিহাস-লেখক জৈন পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন, যোগ দর্শন নয়, উহা কতকগুলি নিয়ম মাত্র; সকল যোগীই উহা মানিয়া চলেন। পতঞ্জলির যোগসূত্রে আমাদের বা বৌদ্ধদের কোনই আপত্তি নাই।

সাংখ্য লইয়া মহাগোল। সকল দর্শনের চেয়ে সাংখ্য পুরাণ। জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি সম্প্রদায় উঠিবার অনেক আগে সাংখ্যদর্শন হইয়াছিল। সকলেই উহা হইতে আপন আপন মতের মালমশলা সংগ্রহ করিয়াছেন। অশ্বঘোষ বুদ্ধচরিতে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, বুদ্ধ দেবের যে দুজন গুরু ছিলেন, দুজনেই সাংখ্যমতাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদেব যে কৈবল্য, তাহা বুদ্ধদেবের পছন্দ হয় নাই। তাই তিনি উঁহাদিগকে ছাড়িয়া ছয় বৎসর ধ্যান ধারণার পর পরমার্থ জ্ঞান প্রাপ্ত হন। সে পরমার্থ-জ্ঞান কিন্তু ঐ সাংখ্য মতের উপরই দাঁড়াইয়া আছে। তবে সাংখ্যদের মূল কথা যে সৎকার্য্যবাদ, তাহা উনি ত্যাগ করিয়াছেন। কারণ সৎ, তাহা হইতে সৎ কার্য্যের উৎপত্তি অর্থাৎ কার্য্য কারণের পরিণাম মাত্র। বুদ্ধদেব সৎকার্য্যবাদটিকে ঘুচাইয়া বলিলেন, "সর্ব্বং ক্ষণিকং ক্ষণিকম্।" গোড়ায় যদি সৎকার্য্যবাদ বন্ধ করিয়া ক্ষণিকবাদ হইল, আগায়ও তাহা হইলে কেবলবাদ ভাঙ্গিয়া গিয়া শূন্যবাদ হইল। বুদ্ধদেব বলিলেন, "সর্ব্বং শূন্যং শূন্যম্।" সাংখ্য ও সব জিনিষের সংখ্যা করিয়া থাকে বলিয়া সাংখ্য নাম পাইয়াছে। বৌদ্ধেরাও তেমনি সকল বিষয়েরই সংখ্যা করিয়া গিয়াছেন। মূল সাংখ্য ২২টী সূত্র মাত্র। প্রত্যেকটিরই একটি করিয়া সংখ্যা আছে। যথা—১। অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ। ২। ষোড়শ বিকারাঃ। ৩। পুরুষ ইত্যাদি। বৌদ্ধেরাও তেমনি বলেন, চতুরার্য্যসত্য, ষট্‌পারমিতা, দশভূমি ইত্যাদি। যদিও বৌদ্ধদের সাংখ্যদের মত সূত্রাবলী নাই, কিন্তু দার্শনিক পদার্থগুলির সংখ্যা করা সম্বন্ধে দুজনই একপন্থী।

কপিলসূত্রগুলিতে বেদ যে প্রমাণ, সে কথা নাই। তাই হিন্দুরাও বইখানাকে নাকচ করিয়া দিয়াছিলেন। সাংখ্য বলিতে তাঁহাদের কাছে ষষ্টিতন্ত্র বুঝাইত। ষষ্টিতন্ত্রের পুথি এখনও পাওয়া যায় নাই। কিন্তু উহার এক সূচি অহির্বুধ্ন্য পঞ্চরাত্রে পাওয়া গিয়াছে। আর ঐ ষষ্টিতন্ত্র সংক্ষেপ করিয়াই ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁহার কারিকা লিখিয়াছেন। ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকাই হিন্দু সাংখ্যের প্রাচীনতম পুথি। উহাতে বেদ যে প্রমাণ, সে কথা আছে। কিন্তু সে বেদ সাংখ্যজ্ঞান হইতে অনেক নীচে। "দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ"—দৃষ্ট পদার্থ হইতে যেমন একান্ত ও অত্যন্ত দুঃখ নিবৃত্তি হয় নাই, আনুশ্রবিক অর্থাৎ বেদোদিত ক্রিয়াকলাপ হইতেও সেইরূপ অত্যন্ত ও একান্ত দুঃখনিবৃত্তি হয় না। নাই হউক, তথাপি উহা বেদ মানে, উহাকে গ্রহণ করা যায়। কিন্তু কপিলকে গ্রহণ করা যায় না, সে বেদ মানে না। কপিলের উপর হিন্দুদের এত ঘৃণা যে, শ্রাদ্ধ-সভায় যদি কাপিল বা লোকায়ত উপস্থিত হয়, উহাদিগকে শিয়াল কুকুরের মত তাড়াইয়া দিতে হইবে। সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যও সাংখ্যের একখানি নূতন পুথি। এখানিও হিন্দুরা গ্রহণ করিয়াছেন, যে হেতু ইহাতে বেদকে প্রমাণ বলিয়া মানে। সুতরাং দুরকম সাংখ্য আছে;—এক রকম হিন্দুদের ও আর একরকম বৌদ্ধদের। বৌদ্ধেরা কাপিল সূত্রের প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন এবং ঈশ্বরকৃষ্ণকারিকা চীন দেশের ত্রিপিটকে পাওয়া যায়।

বৈশেষিক লইয়া আরও গোল। প্রবাদ আছে, বৈশেষিক আঠার রকম। আমরা ত অত পাই নাই। এক রকম সকলেই জানে, কণাদের ষট্‌পদার্থী—উহাতে বেদের কথা আছে,—"বুদ্ধিপূর্ব্বো বাক্যকৃতির্বেদে"; সুতরাং হিন্দুরা উহা গ্রহণ করিয়াছেন। আর এক রকম দশপদার্থী বৈশেষিক চীন দেশ হইতে পাওয়া গিয়াছে, উহাতে বেদের উল্লেখ একেবারে নাই, হিন্দুরা উহা গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু বৌদ্ধেরা উহা রাখিয়াছে। বৈশেষিক এক রকম "ফিসিকাল সাএন্স"; সুতরাং উহাতে সকলেরই দরকার। লইতে সকলেরই হইবে, সকলেই আপন আপন মত করিয়া লইয়াছেন।

আরও বেশী গোল ন্যায়শাস্ত্র বা লজিক লইয়া। দুপক্ষেই বলেন, উহা অক্ষপাদের লেখা। অক্ষপাদ দুজনেরই ভরসা। কিন্তু টীকায় দুরকম হইয়া গিয়াছে। আমি অনেকগুলি প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, অক্ষপাদের সূত্রগুলি শুদ্ধ মাত্র তর্কশাস্ত্র। আমরা উহাতে কিছু কিছু প্রক্ষেপ করিয়া উহাকে দর্শনশাস্ত্র করিয়া তুলিয়াছি। সে সকল কথা এখানে আর পুনরুক্তি করিব না। উহাতে চারিটি প্রমাণের কথা আছে, সে কথাও পরে বলিব। এখানে এই মাত্র বলি যে, বাৎস্যায়ন ঐ সূত্রের টীকা লিখিলে দিঙ্‌নাগ উহার ঘোর প্রতিবাদ করেন। আবার উদ্দ্যোতকর ঐ ভাষ্যের বার্ত্তিক লিখিয়া দিঙ্‌নাগের মত খণ্ডন করেন। আবার বৌদ্ধেরা ঐ মত খণ্ডন করেন। আবার বাচস্পতি মিশ্র তাহার খণ্ডন করেন। এইরূপে বহুবার খণ্ডন মণ্ডনের পর দুই সম্প্রদায়ের মত দুই রকম হইয়া গিয়াছে। দিঙ্‌নাগের মত চীন ও জাপানে খুব চলিতেছে। ভারতবর্ষে বাৎস্যায়নের মতই প্রবল।

তর্কশাস্ত্রের ইতিহাস অতি বিচিত্র। চাণক্যের সময় বোধ হয়, গোতমের সূত্র চলিত ছিল না। কারণ, আমরা অনুমান বলি ও অনুমান শব্দ প্রয়োগ করি। তিনিও অনুমান শব্দ প্রয়োগ করেন

ঘটে, কিন্তু আমরা যাহাকে অনুমান বলি এবং যাহার জন্য অনুমান শব্দ প্রয়োগ করি, তাঁহার মতে তাহা সাদৃশ্যজন্যজ্ঞানজন্য জ্ঞান। গোতমসূত্র চলিত থাকিলে উনি এরূপ করিতে পারিতেন না। অশোকের সময় কথাবত্থ নামে একখানি বৌদ্ধদের বিচারগ্রন্থ লেখা হয়। উহাতে বিচার করিয়া বৌদ্ধদের সমস্ত মত স্থাপন করা হয়। উহা উঁহাদের তৃতীয় সঙ্গীতির সময় রচিত হয় এবং সমস্ত স্থবিরবাদের আচার্য্যগণ উহাতে সম্মতি দিয়াছিলেন। উহার বিচার-প্রণালী বিচিত্র। মুসলমান আমলে আদালতে যেমন জবাব, হৃদজবাব, রদ্দজবাব চলিত ছিল, উহা কতকটা সেইরূপ। একটা কথা উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে অনেক ফেকড়ি উঠিল, সব ফেকড়ি উদ্ধার করিয়া তবে মূলকথার বিচার হইল। মীমাংসকদের বিচার-প্রণালী আর একরকম। ১। সন্দেহ। ২। বিষয়। তাহার পর পূর্ব্বপক্ষ, তাহার পর উত্তর। তাহার পর নির্ণয়। এই পাঁচটির নাম অধিকরণ। কিন্তু মহাযানীরা ঠিক ইংরাজী সিলগিসম (syllogism) মত কথা কহিত, উহাকে তাহারা প্রয়োগ কহিত, উহাতে বিচারটা বেশ পরিষ্কার হইয়া যাইত।

বিচারপ্রণালী হইতেই প্রমাণের কথা উঠে—উভয় সম্প্রদায়ের প্রমাণাবলী বড় বিচিত্র। বুদ্ধদেব সাত রকম প্রমাণ মানিতেন। পৌরাণিকেরা আট রকম, কেহ কেহ প্রতিভা বলিয়া আর একটা প্রমাণও মানিতেন। মীমাংসকেরা ছয়টি মানিতেন। গোতম একদিকে আর নাগার্জ্জুন আর একদিকে; দুজনেই প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শাব্দ, এই চাররূপ প্রমাণ মানিতেন। বৈশেষিকেরা দুইটি মাত্র প্রমাণ মানেন বলিয়া কথা আছে। কিন্তু কণাদের পুঁথিতে আগাগোড়াই আগমের কথা আছে। কণাদ, প্রত্যক্ষ ও অনুমানের দ্বারা বায়ু প্রমাণ করিতে অক্ষম হইয়া, আগমের উপর নির্ভর করিয়া বায়ু নামক পদার্থ স্থাপিত করিয়াছেন। আকাশের স্থাপনা সেইরূপে। সুতরাং বলিতেই হইবে, তিনি আগমও মানিতেন। ঈশ্বরকৃষ্ণও এই তিনটী প্রমাণই মানিয়া গিয়াছেন। চার্ব্বাকেরাই কেবল প্রত্যক্ষ ভিন্ন প্রমাণ মানিতেন না।

নাগার্জ্জুনের ও বর্ত্তমান আকারে গোতমসূত্রের পর চারিটি প্রমাণই পণ্ডিতসমাজে আদর পায়। কিন্তু ইহার এক শত বৎসর পরে মৈত্রেয় নামে একজন বৌদ্ধ নৈয়ায়িক উপমান প্রমাণ স্বীকারের প্রয়োজন দেখেন না। তিনি তিনটি প্রমাণই যথেষ্ট মনে করিতেন। তাঁহারও এক শত বৎসর পরে দিঙ্নাগ নামে একজন বড় পণ্ডিত প্রাদুর্ভূত হইয়া বলিলেন, শব্দও প্রমাণ হইতে পারে না। প্রমাণ দুই বই নয়—প্রত্যক্ষ আর অনুমান। একেবারে বর্ত্তমান ইউরোপীয় লজিকের মত হইয়া গেল preception and inference. অনুমান প্রমাণ হইলেই কিরূপে অনুমান করিতে হয়, তাহাতে কয়বার বাক্য প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা লইয়া বিবাদ হয়। এই বাক্য-প্রয়োগের নাম "অবয়ব"। গোতমের পূর্ব্বে দশ রকম অবয়ব ছিল। বাৎস্যায়ন বলেন, গোতম প্রথম পাঁচটি অবয়ব উড়াইয়া দিয়া, পাঁচটি অবয়বের অনুমান সাজাইয়া গিয়াছেন। নৈয়ায়িকেরা এখনও পাঁচ অবয়বেই অনুমান সাজান। দিঙ্নাগ কিন্তু আর দুইটি তুলিয়া দিলেন। বলিলেন, তিনেই যথেষ্ট। প্রতিজ্ঞা, হেতু আর উদাহরণ। প্রথমটিতে পক্ষ ও সাধ্য নির্দ্দেশ, দ্বিতীয়টিতে হেতু নির্দ্দেশ ও তৃতীয়টিতে সাধ্য ও হেতুর মধ্যে ব্যাপ্তি দেখান। অবয়ব কম হওয়ায় বৌদ্ধদের

বিচারপ্রণালী পরিষ্কার ও সংক্ষেপ হইয়া উঠিল। উহাদের সঙ্গে আঁটিয়া উঠা ভার হইয়া উঠিল। দিঙ্‌নাগের সংস্কৃত বই এতদিনের পর পাওয়া গিয়াছে ও ছাপা হইতেছে। বইখানি ছাপা হইলে উহাতে আমাদের ও বৌদ্ধদের ন্যায়শাস্ত্র বুঝিবার খুব সুবিধা হইবে।

বৌদ্ধদের মেটাফিজিক্‌সের ইতিহাস আছে। বুদ্ধদেবকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিত, নির্ব্বাণের পর কি থাকিবে? তিনি তাহার জবাব দিতেন না। যদি বা কিছু বলিতেন ত বলিতেন, সে কথায় তোমার কি? তুমি ত জন্মজরামরণের হাত হইতে এড়াইয়া গেলে, তোমার ত ত্রিতাপ নাশ হইল, সেই যথেষ্ট। শূন্য জিজ্ঞাসা করিলেও তিনি তাহাই বলিতেন। ৫০০ বৎসর পরে অশ্বঘোষও তাহাই করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রধান উক্তি,—

দীপো যথা নির্বৃতিমভ্যুপেতো
নৈবাবনিং গচ্ছতি নান্তরিক্ষম্।
দিশং ন কাঞ্চিৎ বিদিশং ন কাঞ্চিৎ
স্নেহক্ষয়াৎ কেবলমেতি শান্তিম্॥
কৃতী তথা নির্বৃতিমভ্যুপেতো
নৈবাবনিং গচ্ছতি নান্তরিক্ষম্।
দিশং ন কাঞ্চিৎ বিদিশং ন কাঞ্চিৎ
ক্লেশক্ষয়াৎ কেবলমেতি শান্তিম্॥

কিন্তু তাঁহার পর এক শত বা দেড় শত বৎসরের পর নাগার্জ্জুন সাহস করিয়া নির্ব্বাণ বা শূন্যের লক্ষণ করিলেন,—"সদসৎ তদুভয়ানুভয়চতুষ্কোটিবিনির্ম্মুক্তং শূন্যম্।" উহা সৎও নয়, অসৎও নয়। দুএ জড়াইয়াও নয়, দুই ছাড়াও নয় অর্থাৎ উহা অনির্ব্বচনীয়। শূন্যই পরমার্থ, শূন্যই সত্য, শূন্যই বজ্র। শূন্যবাদ ক্রমে দুই ভাগ হইয়া গেল।

দৃঢ়ং সারমসৌশীর্য্যমচ্ছেদ্যাভেদ্যলক্ষণম্।
অদাহি অবিনাশি চ শূন্যতা বজ্রমুচ্যতে॥

এই একদল বলিল, শূন্য ছাড়া আর কিছুই নাই। উহার নাম অপ্রতিষ্ঠিতসর্ব্বধর্ম্ম। আর এক দল মায়োপমাদ্বৈতবাদ। শূন্য ছাড়া সব বস্তু মায়ার মত। শঙ্করাচার্য্য ইহার সাত শত বৎসর পরে মায়াবাদ প্রচার করেন। সে মত বৈষ্ণবেরা প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ বলিয়া ত্যাগ করিয়া নানাবিধ ভক্তিমত প্রচার করিলেন। বিষ্ণুস্বামী বৈদিক ক্রিয়া-কলাপের সঙ্গে বৈষ্ণব মত প্রচার করেন। রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈত মত, মধ্বাচার্য্য দ্বৈতাদ্বৈত মত প্রচার করেন। শঙ্করের উপর কিন্তু সকলেরই রাগ—তিনি প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ। শঙ্করের দুই তিন শত বৎসর পরে উদয়নাচার্য্য সমস্ত বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়া, আমাদের দেশের ন্যায়-মত দৃঢ়ভাবে স্থাপিত করিয়া যান। তিনি শূন্যবাদ খণ্ডন করেন, ক্ষণিকবাদ খণ্ডন করেন ও অদৃষ্ট-সহকৃত ঈশ্বরের জগৎকর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিয়া যান।

দর্শনশাস্ত্র অতি কঠিন, সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় না। আমার এতক্ষণ ধরিয়া দর্শনের চর্চ্চাটা ভাল

হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না, উহা শেষ করিয়া উঠা কঠিন। তবে কালচারের কথা বলিতে গেলে দর্শনশাস্ত্রের কথাটা না বলা ভাল নয়।

বৌদ্ধেরা গোড়ায় দেশীয় ভাষায়ই বই লিখিতেন। আমরা এখন যাহাকে পালি বলি, উহাতে কত ভাষা আছে, তাহা বলা যায় না। প্রাচীন পুঁথিগুলির ভাষা প্রায়ই পৃথক্ পৃথক্। বৌদ্ধেরা আর এক ভাষায় পুঁথি লিখিতেন, তাহার নাম মিশ্রভাষা; উহার কতক সংস্কৃত, কতক প্রাকৃত। এই ভাষায় অনেক বই আছে। গদ্যে এই লেখা, মাঝে মাঝে প্রমাণস্বরূপ পদ্য, পদ্য ও গদ্যের ভাষা একরূপ নহে, পদ্যের ভাষা পুরাণ। ক্রমে গদ্য অংশ সংস্কৃত হইতে আরম্ভ হইল। সে সংস্কৃত পড়িলেই মনে হইবে, এ মহাভাষ্যের ভাষা নয়, কোন প্রাকৃতের তর্জ্জমা মাত্র। এ সব কথা আগে কেহ বিশ্বাস করিত না। কিন্তু সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক নামে একখানি বই আছে, উহার গদ্যটা ঐ রকম সংস্কৃত, আর পদ্যটা মিশ্র। নেপাল হইতে যে কয়খানি পুঁথি পাইয়াছি, সব ঐ রকম। কিন্তু তকলা মাকান মরু খুঁড়িয়া যে সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীকের প্রাচীন পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহার সবটাই ঐ মিশ্র ভাষায় লেখা।

শেষ অবস্থায় বৌদ্ধেরা অনেকেই সংস্কৃত লিখিতেন। দার্শনিকেরা ভাল সংস্কৃতই লিখিতেন। তথাপি কুমারিল তাঁহাদের অব্যুৎপন্ন শব্দ, অশুদ্ধ শব্দ লইয়া বিশেষ বিদ্রূপ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা দার্শনিক ছিলেন না, তাঁহাদের সংস্কৃত বুঝাই যায় না। তাঁহারা বলিতেন, আমরা ব্রাহ্মণদের মত সুশব্দবাদী নই, আমাদের অর্থ বোধ হইলেই হইল। আমরা পুংলিঙ্গ স্থানে স্ত্রীলিঙ্গ লিখিব, প্রথমা স্থানে সপ্তমী লিখিব, আত্মনেপদের স্থানে পরস্মৈপদ লিখিব, একবচন স্থানে বহুবচন লিখিব, যাহা খুশী করিব, অর্থ বোধ হইলেই হইবে।

বৌদ্ধদের ভিতর একদল পাণিনির টীকা লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা সমস্ত বাঙ্ময় পাণিনির সূত্র হইতেই বাহির করিতে চান, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলিকে একেবারে নস্যাৎ করিয়া দেন। পাণিনির সূত্র ভাল করিয়া বুঝিতে গেলে ইঁহারাই আমাদের একমাত্র অবলম্বন। কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি পাণিনির সমালোচনা করিয়াছেন, অব্যাপ্তি অতিব্যাপ্তি দেখাইয়াছেন। ইঁহারা তাহা করেন না। লক্ষ্মণসেন বৈদিক সূত্রগুলি বাদ দিয়া একখানি ব্যাকরণ করিতে চান। তিনি সে ব্যাকরণের ভার দিয়াছিলেন, একজন বৌদ্ধ পণ্ডিতের উপর। তাঁহার নাম পুরুষোত্তম।

ভাস্করাচার্য্য বলিয়াছেন, বৌদ্ধদের জ্যোতিষ বিচিত্র। তাঁহারা মনে করেন, চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহ তারা দুই প্রস্থ, জোড়াজোড়া আছে। আজ যাহারা উদয় হয়, কাল তাহারা আসে না, পরশু দিন তাহারা আবার আসিবে। হিন্দুদের কিন্তু এরূপ নাই। সেই গ্রহনক্ষত্রই রোজ উদয় হয়।

ধর্ম্ম ও বিশ্বাস সম্বন্ধে বৌদ্ধ ও হিন্দুর ভিতর যে ভেদ আছে, তাহার কিছু কিছু বলিলাম। এখন আহার বিহার, আচার ব্যবহারে তাঁহাদের যে ভেদ আছে, তাহাই বলিতে চেষ্টা করিব। হিন্দুদের আহারের ব্যবস্থা চারায়ণ ঋষি করিয়া গিয়াছেন। লোকে পূর্ব্বাহ্ণে ও অপরাহ্ণে ভোজন করিবে। কেহ কেহ বলেন, অপরাহ্ণে না হইয়া সন্ধ্যার পর ভোজন করিবে। ইহা ছাড়াও সংস্কৃত পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রাতঃকালে অনেকে একটা প্রাতরাশ করিয়া থাকিতেন।

তাহার আর একটা নাম ছিল কল্যবর্ত্ত। ক্রমে এতবার খাওয়া উঠিয়া গিয়া একবার দিনে ও একবার রাত্রে খাওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। আমরা বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি, এক সূর্য্যস্তে দুইবার খাইতে নাই। এ খাওয়ার মানে আচমনীয় দ্রব্য অর্থাৎ যাহা খাইয়া আচমন করিতে হয় অর্থাৎ মুখ ধুইতে হয়; কিন্তু ফলাহার যখন তখন করা যায়; ফলাহার শব্দের অর্থ ফল খাওয়া, কিন্তু উহার এখন একটা পারিভাষিক অর্থ হইয়াছে। পানিফলের জিলিপি, পানিফলের কচুরি, এগুলিও ফলাহারের মধ্যে গণ্য হইয়াছে; যখন তখন খাওয়া যায়। খাইয়া মুখ না ধুইলেও চলে।

বৌদ্ধদের খাওয়ার ব্যবস্থা কিন্তু আর একরকম। তাঁহারা একবার খাইবেন; বারটার আগে সে খাওয়াটি হইয়া যাওয়া চাই। খাইতে খাইতে যদি বারটা বাজে, অমনি উঠিয়া যাইতে হইবে। ছায়াটা দু আঙ্গুল পূর্ব্বে হেলা পর্য্যন্ত সময়ে খাইতে চাহিয়াছিল বলিয়া বৌদ্ধদের ভিতর ঘোর দলাদলি হইয়া যায়। অনেকে বারটার পূর্ব্বেও একটু আধটু জলযোগ করিতেন। বারটার পর কিন্তু তরল পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই খাইবার নিয়ম ছিল না। তরল পদার্থ যথা—নারিকেলের জল, ফলের রস, ইত্যাদি। দক্ষিণ দেশের বৌদ্ধেরা অর্থাৎ সিংহল, বর্ম্মা, শ্যাম প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধেরা এখনও এই নিয়ম পালন করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু উত্তরের বৌদ্ধেরা, গোড়াগুড়িই খাওয়া দাওয়ার বিষয়ে একটু শিথিল ছিলেন। তাই নিয়ে উত্তর ও দক্ষিণ-বৌদ্ধদের ভিতর ঝগড়া, তাই নিয়েই দলাদলি। ক্রমে যখন মহাযান মত প্রবল হইল, তখন খাওয়া দাওয়ার বাঁধাবাঁধিটা একেবারে উঠিয়া গেল। এখনকার নেপালী ও তিব্বতী বৌদ্ধদের সম্বন্ধে একজন ইংরাজ বলিয়াছেন, সকল ধর্ম্মেই আছে, Fast and worship—এদের দেশে কিন্তু Feast and worship; না খাইয়া তাহারা কিছু করে না। আর আমাদের বাঙ্গালার ব্রাহ্মণদের 'ভুক্ত্বা কিঞ্চিন্ন চাচরেৎ'—আহার করিয়া কোনরূপ ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবে না; ভিক্ষুককে ভিক্ষামুঠাও দিবে না।

উপবাস

উপবাস শব্দের অর্থ কি? উপ উপসর্গ ও বস্ ধাতু। এ থেকে 'না খাওয়া' হল কেমন করে? এ সম্বন্ধে শতপথ-ব্রাহ্মণে লেখা আছে যে, যজমান যেমন যজ্ঞ করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিলেন অর্থাৎ যজ্ঞশালা বাঁধিলেন, দেবতারা অমনি রাত্রে আসিয়া সে যজ্ঞশালার নিকটে ঘুরিতে লাগিলেন। যজ্ঞশালার নিকটে দেবতারা বাস করেন বলিয়া তাহার নাম হইল উপবাস। তার পর দিন এই সকল দেবতা অতিথিকে না খাওয়াইয়া যজমান খাইতে পারে কি না, ইহা লইয়া বিচার উঠিল। একদল বলিলেন—"অনশন", আর একদল বলিলেন,—না, কিছু খাইতে হইবে। শেষের মত প্রবল হইল, অল্প বিস্তর বৃক্ষের ফল খাইতে পারিবে, কিন্তু সে পেট ভরিয়া খাইলে হইবে না। পিতৃকৃত্য করিতে গেলে কিন্তু একেবারেই খাইতে পারিবে না। আমাদের দেশে কিন্তু এ বিষয়ে বড়ই কড়াকড়ি। ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা সর্ব্বদাই বলেন,—"ভুক্ত্বা কিঞ্চিন্ন চাচরেৎ।" বৈষ্ণবেরা কিন্তু কিছু আহার না করিয়া সন্ধ্যা আহ্নিক করেন না। তান্ত্রিকেরাও তাই করেন। স্মার্ত্ত পঞ্চোপাসক কিন্তু কড়াকড়ি করিয়া "ভুক্ত্বা কিঞ্চিন্ন চাচরেৎ" করেন।

বৌদ্ধেরা অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় উপবাস করেন। প্রথম প্রথম উহার নাম ছিল—উপোসথ, পোসধ। জৈনেরা কিন্তু তাহাও ছাড়িয়া দিয়া শুধু 'পো' করিয়াছেন। ঐ দিন তাঁহারা না খাইয়া বিহারে যাইতেন ও বৈকাল বেলাটা ধর্ম্মকথা শুনিয়া কাটাইতেন। বারব্রত ইত্যাদিতে উত্তরের বৌদ্ধেরা বড় উপবাস করেন না। খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন নিয়ম নাই। আমরা যেমন অনেক বাছিয়া গুছিয়া খাই, তাঁহারা তেমন করেন না। যে বুদ্ধের অহিংসা প্রধান কথা, তাঁহার শিষ্যেরা এখন মাংস খাইতে কোনরূপ দ্বিধাই করেন না। তবে অনেকে নিরামিষ-ব্রত করিয়া থাকেন। চীনেরা আমিষ বলিয়া দুধ ঘিও খায় না। তাহারা উহাকে animal food বলে। পেঁয়াজ রসুনে বৌদ্ধদের কিছুমাত্র দ্বিধা নাই। মদেও তাহাদের আপত্তি নাই। আমার বন্ধু ইন্দ্রানন্দ বলিতেন, যে যত বড় পণ্ডিত হইবে, সে তত বেশী মদ খাইবে।

ক্ষৌরকার্য্য

প্রাচীন কালে হিন্দুরা কামাইতে হইলে দুজন নাপিত রাখিতেন;—একজন নাভির উর্দ্ধটা কামাইত—আর একজন অধঃটা কামাইত। যে উপরের দিক্‌টা কামাইত, সে আচরণীয় হইত, যে নীচের দিক্‌টা কামাইত, সে অনাচরণীয় হইত। বাৎস্যায়ন কামসূত্রে বলেন, দাড়ী ও গোঁপ কামান চতুর্থ দিনে করিতে হয়, নখ কাটাও তাই। অধোদেশ উৎপাটন করিয়া কামাইলে দশ দিন, না হলে পাঁচ দিন। উরত কামাইতে হইলে ফেনা ব্যবহার করিতে হইত। সন্ন্যাসীদের ও স্ত্রীলোকদের বগল কামাইতে নাই। সন্ন্যাসীদের অধোলোম কামাইতে নাই। মাথার সব চুল রাখা সে কালে পুরুষের মধ্যেও চলিয়াছিল। এখনও দক্ষিণ দেশে পুরুষেরা সব চুল রাখে ও বিনুনী করিয়া খোঁপা কাটে। মাথাটি ওল করিয়া কামাইয়া মধ্যে খুব বড় রকমের টিকি রাখা আর্য্যাবর্ত্তে চলিয়াছিল—সন্ন্যাসীরাই কেবল সমস্ত মাথাটা কামাইতেন, শিখা পর্য্যন্তও রাখিতেন না।

বৌদ্ধ ভিক্ষুরা মাথাটা তল করিয়া কামাইতেন, তাঁহারা মাথার চুল পনের দিনের বেশী রাখিতে পারিতেন না। নয় দিনের মধ্যেই কামাইতে হইত। যেখানে যেখানে বৌদ্ধ মঠের ঢিপি পাওয়া গিয়াছে, সেখানে সেখানেই অনেক ক্ষুর পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে অনেকে অনুমান করেন যে, বৌদ্ধেরা নিজে নিজেই কামাইতেন। অনেকেই শরীরের সমস্ত লোম কামাইয়া ফেলিতেন। গৃহস্থ বৌদ্ধদের গ্রাম্য নাপিতেরাই কামাইত। হয় ত ভিক্ষুদেরও কামাইত। কিন্তু বিহারে মেলা ক্ষুর পাওয়ায় সে বিষয়েও একটু সন্দেহ হইয়াছে। নাপিতেরা পাটনী, চণ্ডাল, মুচি, হাড়ী প্রভৃতি অনেক জাতিকেই কামাইত না। এই সব জাতির নিজের জাতির মধ্যেই নাপিত থাকিত। তাহারাই আপনাদের জাতিদের মধ্যে কামাইত। গ্রাম্য নাপিতেরা মুসলমানদের কামাইত; এমন কি, তাহাদের পায়ের নখ কাটিতেও আপত্তি করিত না। কিন্তু এই সকল জাতিকে তাহারা কখনই কামাইতে যায় না। অনেক সময় মজা হয়। একজন মুচি যদি মুসলমান হয়, গ্রাম্য নাপিতেরা তাহাকে কামাইবে; কিন্তু যদি সেই মুচি ভেক লইয়া বৈষ্ণব হয় ত তাহাকে কামাইবে না। হাড়ীদের নাপিত নাই। তাহারা নিজে নিজেই কামায়। সেজন্য

আমাদের দেশে একটা কথা আছে, হাড়ীর ক্ষুরে তোকে কামাইয়া দিব, অর্থাৎ তোকে একেবারে অনাচরণীয়, অব্যবহার্য্য করিয়া দিব অর্থাৎ কোন নাপিত তোকে কামাইবে না

বিছানা

হিন্দুরা অতি প্রাচীন কাল হইতে চার-পাই ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। চার-পাইয়ের নাম আসন্দী। দড়ির ছাওয়া, বাঁশের বা কাঠের চার-পা। ক্রমে খাট-পালং, তক্তপোষ প্রভৃতি নানারূপ শয্যাধার চলিতে লাগিল। এমন কি, আমরা এখন শ্রাদ্ধের দানেও একখানা খাট, একখানা তক্তপোষ, অন্ততঃ একখানা পিঁড়িও দিয়া থাকি। বৌদ্ধেরা কিন্তু উচ্চাসন এবং মহাসন একেবারেই বর্জ্জন করেন। উচ্চাসন বর্জ্জন করিলে তাঁহার খাট, পালং ও চৌকী, চার-পাই চলে না মাটিতে মাদুর বিছাইয়া শুইতে হয়। মহাসন ত্যাগ করায় গদী, তোষক, বিছানার চাদর, তাকিয়া, গিদ্দে, বালিশ, পাশ-বালিশ, গাল বালিশ, পা-বালিশ, সব ত্যাগ করিতে হয়। বড্ড বড়মানুষী কর, একখানি কার্পেটের উপর শুইয়া থাক, না হয় গালিচা কাঁথাই তাঁহাদের বেশী সম্বল। বিচিত্র বিচিত্র কারিকরী করা কাঁথা, ফুল-তোলা কাঁথা বৌদ্ধদের জন্য হইয়াছিল বোধ হয়। এখনও অনেক জাতীয় সন্ন্যাসীর কাঁথাই সম্বল।

পোষাক

বেদের সময় ব্রাহ্মণরা মাথায় একটা পাগড়ী দিতেন। এখনও কোন বৈদিক কার্য্য করিতে গেলে একটা উষ্ণীষ লইতে হয় তাঁহারা জুতাও ব্যবহার করিতেন। উপানহ না হইলে তাঁহাদের চলিত না। একখানা ধুতি ও একখানা চাদর থাকিত। তাহার উপর উপবীতও থাকিত। এখন ত উপবীত, কয়েক খেই কাপাশের সূতা হইয়াছে, কিন্তু পৈতার সময় চামড়ার পৈতা ব্যবহার করিবার কথা আছে। চামড়া পাওয়া যায় না বলিয়া অন্ততঃ একটুকরাও কালসারের চামড়া বাঁধিয়া দিতে হয়। আগে বোধ হয়, একখান চামড়া দিয়া গাটা ঢাকিয়া রাখিতেন। জামা বোধ হয় থাকিত না। কারণ, সেলাই-করা কাপড় লইয়া কোন ধর্ম্মকর্ম্ম করিবার বিধি নাই।

বৌদ্ধদের কিন্তু এক ধুতি আর এক চাদর। এ ছাড়া আর কোন পোষাকের কথা শোনা যায় না। চাদরখানা এক কাঁধে ফেলিয়া আর কাঁধ হইতে খুলিয়া রাখা হইত। সে কাপড় ও উত্তরীয় আবার খুব সেলাই-করা হইত। সেলাইয়ে তাঁহাদের আপত্তি ছিল না। সে কাপড়ও তাঁহারা সর্ব্বদা যে পরিষ্কার রাখিতেন, এমন নহে, কিন্তু ছোপাইয়া পরিতেন। কি দিয়া ছোপান হইত, ঠিক জানা যায় না। কখনও কখনও বলে কাষায় বস্ত্র, কখনও বলে রক্ত বস্ত্র। রাঙ্গা রঙ দিয়া ছোপাইতেন, কি কাষায় রঙ দিয়া ছোপাইতেন, অথবা হয় ত দুই রঙকেই তাঁহারা রক্ত বলিতেন। তবে দেশের নিয়মানুসারে তাঁহারা যে জামা বা চৌবন্দী ব্যবহার করিতেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। নেপালী বৌদ্ধেরা নেপালী গৃহস্থের মতই কাপড় পরেন। তবে নেপালে এখন বিহারও নাই, মঠও নাই। যাঁহারা বিহারে বাস করেন, তাঁহারা যদিও আপনাদিগকে ভিক্ষু বলেন, তথাপি বিবাহ করেন ও ছেলেপিলে লইয়া সংসার করেন।

স্নান

ব্রাহ্মণদের অতি প্রাচীন কাল হইতেই নানা রকম স্নানের ব্যবস্থা আছে,—ভস্মস্নান, গোময়-স্নান, ঘৃতস্নান, দুগ্ধস্নান, দধিস্নান, অবগাহন স্নান; শিখামজ্জন স্নান, উষ্ণজলে স্নান, তোলাজলে স্নান। বৌদ্ধদের ভিতর এতদ্রূপ স্নান ছিল না হিন্দুরাও যে এত রকম স্নান সর্ব্বদাই করিতেন, তা নয়, যজ্ঞে ব্রতী হইবার পূর্ব্বে যজমানকে এরূপ স্নান করাইতেন, অভিষেকের পূর্ব্বে রাজাকে এরূপ স্নান করাইতেন, অন্য সময় অবগাহন স্নানই প্রায় করিতেন। না পারিলে মাথা ধুইয়া ফেলিতেন অথবা গা ধুইয়া ফেলিতেন। বিবাহের সময় বরকন্যাকে তোলাজলে স্নান করাইতেন। বৌদ্ধদের স্নান জলে জলেই হইত, ভস্মাদির স্নান সম্বন্ধে বড় শুনা যায় না। কিন্তু স্নানের সময় তাঁহারা মন্ত্র পড়িতেন,—"যথা হি জাতমাত্রেণ স্নাপিতাঃ সর্ব্বতথাগতাঃ। তথাহং স্নাপয়িষ্যামি শুদ্ধং দিব্যেন বারিণা॥ ওঁ সর্ব্বতথাগতাভিষেকসময়শ্রিয়ে হূং হূং।"

মুখ ধোওয়া

ব্রাহ্মণেরা অধিকাংশ স্থানেই দাঁতন করিতেন। দাঁতনের কাঠি হয় আট আঙ্গুল, না হয় বার আঙ্গুল থাকিত। কিন্তু শ্রাদ্ধাদির সময় তাঁহারা দাঁতন করিতেন না, পাছে দাঁত দিয়া রক্ত পড়িয়া ক্ষতাশৌচ হয়। ক্ষতাশৌচ হইলে শ্রাদ্ধাদিতে অধিকার থাকে না, সে জন্য শ্রাদ্ধের দিন ১২টা কুলকোচা করিয়া মুখ ধোওয়া ব্যবস্থা করা আছে। মাজনে তাঁহাদের আপত্তি ছিল না। অনেক জিনিষ দিয়া তাঁহারা মাজন তৈরী করিতেন। কিন্তু তর্জ্জনী অঙ্গুলী দিয়া দাঁত মাজা অত্যন্ত নিষেধ; মধ্যমা অঙ্গুলী দিয়া দাঁত মাজাই খুব প্রশস্ত। কারণ, অঙ্গুলীর মধ্যে উহাই সর্ব্বাপেক্ষা কমজোর। উহা দিয়া ঘষিলে দাঁতে চাড় লাগে না। তর্জ্জনী দিয়া ঘষিলে চাড় লাগে ও উহাতে বিলক্ষণ ক্ষতি হয়। দাঁতন সম্বন্ধে ব্রাহ্মণেরা অনেক গাছ পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং সকল স্মৃতির পুস্তকেই কোন্ কোন্ কাঠে দাঁতন করিতে হয় এবং কোন্ কোন্ কাঠে দাঁতন করিতে নাই, তাহার লম্বা ফর্দ্দ আছে। যে কাঠ নরম, অনায়াসে চিবাইয়া তুলি করা যায়, তাহাই প্রশস্ত। বেশী বয়সে দাঁত পড়িয়া গেলে দাঁতন ছেঁচিয়া দাঁত পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়। যে সব গাছে কষ আছে, সেই গাছের ডালেই ভাল দাঁতন হয়, তাহাতে দাঁতের গোড়াও শক্ত হয়।

বৌদ্ধেরা দাঁতনী করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের দাঁতন প্রায়ই বার আঙ্গুল হইত। আট আঙ্গুল দাঁতন তাঁহারা বড় ব্যবহার করিতেন না। দাঁতন বার আঙ্গুল হইলে উহা দ্বারা জিব-ছোলারও কাজ করিতে পারা যায়। বৌদ্ধেরা ধাতুদ্রব্য ব্যবহার করিতেন না। কাজেই তাঁহাদের ধাতুনির্ম্মিত জিবছোলা থাকিত না। সুতরাং তাঁহারা বার আঙ্গুল দাঁতনই পছন্দ করিতেন। আট আঙ্গুল দাঁতন দিয়া জিব ছুলিতে গেলে দাঁতে আঙ্গুল লাগিত এবং কাটিয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল। মাজন দিয়া দাঁতন করিলে প্রায় দাঁতে পাথুরি হয়। মাড়ী ও দাঁতের মধ্যে একটা পাথরের মতন শক্ত জিনিষ জন্মিয়া মাড়ীকে আলগা করিয়া দেয়। সে জন্য মাজনটা সে কালে দন্তরোগ ব্যক্তিরেকে বৌদ্ধ

বা ব্রাহ্মণ, কেহই ব্যবহার করিতে চাহিতেন না। দাঁতন করিতে গেলে দাঁতনটী বার বার ধুইতে হইত। একবার মুখ হইতে বাহির করিলেই তাহা ধুইয়া আবার ব্যবহার করিতে হইত। ইৎসিংএর পুস্তকে আমরা পাই যে, চীনেরা আমাদের কাছ থেকে দাঁতন করা শিখিয়াছিল। কিন্তু আমরা এখন দাঁতন করাটা অসভ্যতা বলিয়া মনে করি। দাঁতন নিত্য নূতন হওয়ার কথা ছিল। না পাইলে একদিন কাটিয়া পাঁচ দিন ব্যবহারও চলিত।

মুখ ধোওয়ার সংস্কৃত নাম আচমন। আচমনে তিনবার জল মুখের মধ্যে দিতে হয়। তারপর দুইবার ওষ্ঠ ও অধর স্পর্শ করিতে হয়। তাহার পর চক্ষু কর্ণ নাসিকা স্পর্শ করিতে হয় অর্থাৎ ঐগুলি ধুইতে হয়। তত্ত্বকরগুপ্ত বলেন, দাঁতন করিবার সময় মন্ত্র পড়িতে হয়,—"ওঁ নমো রত্নত্রয়ায়, নমো হারিত্যৈ, মহাযক্ষিণ্যৈ, অন্নে পানে ফুঃ স্বাহা।"

কাপড় কাচা ও তেলমাখা

ধোবা বা রজকে ব্রাহ্মণের কাপড় কাচিত। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা নিজ হাতে রোজই কাপড় ধুইয়া ফেলিতেন। ছেঁড়া কাপড় অথবা ময়লা কাপড় পরা তাঁহাদের নিষেধ ছিল। কয়দিন অন্তর তাঁহারা কাপড় ধোবাবাড়ী দিতেন, তাহা জানা যায় না। তবে রোজ কাপড় কাচায় তাঁহাদের কাপড় শীঘ্র ময়লা হইত না। বৌদ্ধেরা কিন্তু তাঁহাদের কাপড় ধোবাবাড়ী দিতেন, এ কথা শুনা যায় না। কিন্তু স্নানের পর যে রোজ তাঁহারা কাপড় কাচিতেন, সেটা ঠিক। নিজের হাতে কাপড়খানি নিঙড়াইয়া শুকাইয়া লইতেন। ব্রাহ্মণেরা গামছা ব্যবহার করিতেন এবং তেলও মাখিতেন। বৌদ্ধেরা তেল মাখিতেন ও গামছা ব্যবহার করিতেন কি না, কোন পুস্তকে দেখিতে পাই না। ব্রাহ্মণদের অভ্যঞ্জন অর্থাৎ স্নানের পূর্ব্বে মাখিবার অনেক জিনিষ ছিল। আমলকীবাটা তাহাদের মধ্যে একটা। তাঁহারা ঐ দ্রব্য একদিন তৈরী করিয়া দুই তিন দিন ব্যবহার করিতেন। কিন্তু অনেক ধর্ম্ম কর্ম্মের সময় তাঁহারা অভ্যঞ্জন স্নান করিতেন না। স্বামী বিদেশে গেলে স্ত্রীলোকেরা রুক্ষস্নান করিতেন।

বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মঠে পাইখানা থাকিত। পাইখানার ভিতর কলসী-ভরা জল থাকিত ও একটা ছোট পাত্র (কুণ্ডি) থাকিত। পাইখানার ভিতর দেয়ালে একটা ডাণ্ডা গোঁজা থাকিত। ভিক্ষুরা সেইখানে কাপড় রাখিতেন। তাঁহারা সেখানে তিনটী মাটির গুলি লইয়া যাইতেন। কার্য্য শেষ হইলে দুইটী গুলির দ্বারা দুই বার শৌচ করিতেন। আর তৃতীয়টী দ্বারা বাঁ হাতটী ধুইয়া ফেলিতেন। তাহার পর বাহিরে আসিয়া সেখানে একখানা ইটের উপর পনেরটী গুলি সাজান থাকিত। সাতটি দ্বারা সাতবার বাঁ হাত ধুইতেন আর সাতটী দ্বারা সাতবার দুই হাত ধুইতেন। অবশিষ্টটির দ্বারা জলপাত্র, বাহু, তলপেট এবং পা ধুইয়া ফেলিতেন। তাহার পর তথা হইতে বাহির হইয়া আসিতেন। তত্ত্বকরগুপ্ত তাঁহার 'আদিকর্ম্মরচনায়' বলিয়াছেন,—

"রত্নত্রয়শরণগতানাং বৌদ্ধানাং প্রত্যূষমাদায় বর্চ্চোমূত্রকরণাদি যা যা শিক্ষোক্তা ভগবতা বিনয়াদিষু সামাজেন সা সর্ব্বা উচ্যতে। তথা চ—

কুর্য্যাৎ কৃত্যাং গুহ্যাং প্রাতঃ বর্চ্চপ্রস্রাবকর্ম্মকম্ ।
ততোঽপি বহুভির্ভিশ্চৈব মৃদ্ভিঃ প্রক্ষালয়েৎ গুদম্ ॥
বামে পাণৌ ততঃ সপ্ত বিহিতা শুদ্ধয়ে মৃদঃ ।
উভয়োরপি সপ্তৈব পৃথক্ পৃথগবস্থিতাঃ ॥
ইতি হস্তাদি যত্নেন ক্ষালয়েৎ বহুনাম্বুনা ।
শারীপুত্রাদিয়ং শিক্ষা দুষ্কৃতাবন্যথা ভবেৎ ॥”

তাহা হইলে বোধ হইতেছে যে, শারীপুত্রের সময় হইতেই ইৎসিং ও তত্তকর্গুপ্তের সময় পর্য্যন্ত একই শিক্ষা চলিয়া আসিতেছিল। হিন্দুদের কিন্তু ব্যাপার অন্যরূপ। তাঁহাদের পাইখানার ব্যবস্থা ছিল না। নগরের প্রান্তে উপস্থিত হইয়া, সেখান হইতে তীর ছুঁড়িলে যেখানে গিয়া পড়ে, সেখানে তাঁহারা শৌচ করিতে যাইতেন। শৌচ কার্য্যটা জলের দ্বারা সাধিত হইত। তাঁহারা দুই হাতেই হাতমাটি করিতেন। কিন্তু যতক্ষণ তৈল ও গন্ধ দূর না হইত, ততক্ষণ হাতে মাটি করিতে ছাড়িতেন না। অন্ততঃ বারো বার হাতে মাটি করিতেন। এখনকার লোকের মতন মাটিতে বাঁহাত ঘষিয়াই কাজ সারিতেন না। স্মৃতিতে যদিও পাইখানার নাম পাওয়া যায় না, অশোক রাজার পাইখানা ছিল। তিনি সেখানেও রাজকার্য্য করিতেন। বল্লালসেনেরও পায়ুক্ষালন-মন্দির ও স্বেদাগার ছিল। প্রস্রাব করিয়া জল নেওয়া উভয় পক্ষেরই বিধি ছিল।

ব্রাহ্মণেরা ঘুম ভাঙ্গিলেই ঠাকুর দেবতার নাম করিয়া উঠেন, অনেকগুলি সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করেন,—

লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব
শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং
সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে।

বৌদ্ধেরা প্রাতঃকালে উঠিয়াই “বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি” ও এই সম্বন্ধীয় অনেকগুলি গাথা পাঠ করেন।

দিনের কাজে বৌদ্ধ ও হিন্দুদের যে ভেদ, তাহা দেখাইলাম। এখন উভয়ের সংস্কারগুলি দেখাইব। হিন্দুদের দশবিধ সংস্কার,—গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রামণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন ও বিবাহ। এখনকার নেপালী বৌদ্ধদের দুইটী মাত্র সংস্কার। একটী পাঁচ বছরে, তাহার নাম ভিক্ষু হওয়া। আর একটী ১৭ বৎসরে—তাহার নাম বজ্রাচার্য্য বা গুভাজু হওয়া। আমাদের সংস্কারের মানে যে, আমরা প্রথম যে কার্য্যটি করিব, সেটি মন্ত্রপূত করিয়া করিব। কোন সংস্কার করিতে হইলে গণপতি পূজন, গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকা পূজা, বসুধারা, অযুষ্য-মন্ত্র জপ ও নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করিয়া, কুশণ্ডিকা বা বহ্নিস্থাপন করিতে হয়। সেই মন্ত্রপূত বহ্নিকে সাক্ষী করিয়া তাঁহারা প্রথম কার্য্যটী করিয়া থাকেন। গর্ভাধানও তাই, পুংসবনও তাই, সীমন্তোন্নয়নও তাই, বরাবরই তাই। কার্য্যটী যখন করি, তখন মন্ত্র পাঠ করি।

গর্ভাধানের অর্থ বলিয়া দিতে হইবে না। পুংসবনের অর্থ এই যে, সাত মাস গর্ভের সময়—যখন গর্ভস্থ শিশুর পুরুষ বা স্ত্রীচিহ্ন প্রকট হইবার সময় হয়, সেই সময় স্বামী গৌর্য্যাদি পূজা করিয়া, প্রাতঃকালে গ্রামের ঈশান কোণে যে বটগাছ থাকে, তাহারই ঈশান কোণে কোন সুঁয়ার ঠিক নীচে দুটী ফল ধরিয়াছে দেখিয়া, ফলশুদ্ধ সেই সুঁয়াটি কাটিয়া, মাটিতে না ছোঁয়াইয়া, সেইটী বাড়ীতে আনেন,—আনিয়া এমন উঁচু জায়গায় রাখিয়া দেন, যেন মাটি না স্পর্শ করিতে পারে। তাহার পর কোন কোন জিঁয়াচ পোয়াতী আসিয়া সেটি বাঁটিয়া দিলে স্বামী, অগ্নির সমীপে স্ত্রীর পিছনে দাঁড়াইয়া, সেই বাটা বটের সুঁয়া প্রথমে তাহার ডান নাকে ও তৎপর তাহার বাঁ নাকে শোঁকান। সংস্কার, এই কাজ করিলেই পুত্রসন্তান হইবে। জাতকর্ম্মেও এইরূপ নাড়ীচ্ছেদের পূর্ব্বে বহ্নিস্থাপনান্ত সমস্ত কার্য্য করিতে হয়। তাহার পর নাড়ীচ্ছেদ। কিন্তু ইহাতে প্রায়ই বিলম্ব হওয়া প্রযুক্ত নাড়ী মোটা হইয়া যায়, ছেদেও কষ্ট হয়—বালকেরও প্রাণনাশ হয়। তাই নাড়ীচ্ছেদের পর এ সব কার্য্য হয়। যখন ব্রাহ্মণেরা অগ্নিহোত্রী ছিলেন, অর্থাৎ বাড়ীতে অগ্নিশালা থাকিত এবং সেখানে গার্হপত্য, দক্ষিণ ও আহবনীয়, এই তিন প্রকার আগুন থাকিত, তখন এ সকল দুর্ভোগ ভুগিতে হইত না। গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকার পূজা হইতে আরম্ভ করিয়া বহ্নিস্থাপন পর্য্যন্ত তাঁহাদের করাই থাকিত। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র বাঁশের চেঁচাড়ী মন্ত্রপূত করিয়া, সেই অগ্নিতে তাতাইয়া অবিলম্বেই নাড়ীচ্ছেদ করা হইত। যতদিন ব্রাহ্মণেরা সাগ্নিক ছিলেন অর্থাৎ এক অগ্নি রক্ষা করিতেন, তাঁহাদেরও এ দুর্ভোগ ভুগিতে হইত না। এ সকল দুর্ভোগ শুধু নিরগ্নিক হইয়াছি বলিয়াই ভুগিতে হয়। নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণও ঠিক ঐরূপ সংস্কার। বহ্নিস্থাপন পর্য্যন্ত করিয়া, সেই বহ্নির সম্মুখে বসিয়া, মন্ত্র পড়িয়া করিতে হয়। এক উপনয়নের মধ্যে আমরা চারিটা সংস্কার সারিয়া লই। উপনয়ন মানে ছেলেকে গুরুর কাছে লইয়া যাওয়া। গুরু তাহাকে প্রথমে সাবিত্রী উপদেশ দেন—দিন কতক পরে তাহার বেদারম্ভ হয়। বহুকাল পরে তাহার বেদপাঠ সমাপ্ত হইলে তাহার সমাবর্ত্তন হয় অর্থাৎ সে আবার ঘরে ফিরিয়া আসে। আমরা কিন্তু এই চারিটি সংস্কারকেই এক উপনয়ন নাম দিয়া ঘণ্টা দুএকের মধ্যে সারিয়া দিই। বিবাহও এইরূপই সংস্কার। বিবাহ শব্দের আসল মানে—বৌটীকে পিতৃগৃহ হইতে পতিগৃহে বহিয়া লইয়া যাওয়া। কন্যাদান, স্ত্রী আচার, কুশণ্ডিকা, লাজাহোম, অরুন্ধতী দর্শন—এ সকলগুলিই বিবাহটীকে সংস্কার করিবার জন্য, উহাকে মন্ত্রপূত করিয়া পবিত্র ভাবে গ্রহণ করিবার জন্য। নেপালী বৌদ্ধদের মধ্যে এত সব সংস্কার কিছুই নাই। উহাদের একটা সংস্কার আছে গর্ভপরিহার, অর্থাৎ সুপ্রসব হইবে, তাহার জন্য প্রার্থনা। তাহার পর ছেলে ৫।৬ বৎসরের হইলে, সে যে বিহারের ছেলে, সেই বিহারের যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বয়সে বড় ভিক্ষু, তাঁহার কাছে লইয়া যাইতে হয়। সে বলে, আমি ভিক্ষু হইব। বুড়াটী বলেন, তুমি হইও না, বড় কষ্ট করিতে হয়—বড় বিধি নিষেধ মানিয়া চলিতে হয়, তুমি ও কাজ পারিবে না, তুমি ছেলে মানুষ। সে বলে, আমি নিশ্চয়ই করিব, নিশ্চয়ই পারিব, আমি শাক্যপুত্র—আমি পারিব না কেন? বুড়াটী তখন একখানি রূপার ক্ষুর বাহির করিয়া, তাহার মাথাটি মুড়াইয়া দেন, আপনার কাছে

রাখেন ও হবিষ্য খাওয়ান। পাঁচ সাত দিন হবিষ্য খাইবার পর সে বলে,—মহাশয়, আমি আর পারি না, আমি মার কাছে যাব। বুড়া তাহাকে আবার বুঝান, তোমার যাওয়া উচিত নয়; কিন্তু সে কিছুতেই মানে না। তখন তাহাকে একটু মদ ও শূকরের মাংস খাওয়াইয়া মায়ের কাছে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। এখান থেকেই সে ভিক্ষু হয়, ঠাকুর-ঘরে যেতে পারে, ঠাকুর ছুঁতে পারে, পুষ্পপাত্রে ফুল সাজাইতে পারে ও পূজার আয়োজন করিয়া দিতে পারে। ইহার পর তাহার আর এক সংস্কার আছে—সেটা সতের বছরের সময়। যদি সে সতর বছরের মধ্যে একেবারে স্ত্রী-সংসর্গ না করে, তাহা হইলে তাহাকে আবার মাথা মুড়াইয়া কতগুলি মন্ত্র পড়িতে হয়, তাহা হইলে সে বজ্রাচার্য্য বা গুভাজু হয়। সে তখন ঠাকুর-ঘরে পূজার অধিকারী হয়, তাহার পাঁচটী অভিষেক হয়,—মুকুটাভিষেক, ঘণ্টাভিষেক, মন্ত্রাভিষেক, সুরাভিষেক, পট্টাভিষেক। তখন সে পুরা বজ্রাচার্য্য হয় এবং সকল প্রকার ধর্ম্মকার্য্যেই তাহার অধিকার হয়। কিন্তু যদি সতের বছরের আগে স্ত্রীসংসর্গ করে, তাহা হইলে সে কখনও বজ্রাচার্য্য হইতে পারে না, তাহার বংশও ভিক্ষু থাকিয়া যায়। উঁহাদের বিবাহ সংস্কার নহে। বিবাহ মানে শক্তিগ্রহণ অর্থাৎ যোগমার্গে ও জ্ঞানমার্গে যাইবার জন্য শক্তি সঞ্চয় করা। মোটামুটি ভিক্ষুদের বিবাহ আগে একটা গাছের সঙ্গে হয় অথবা ফলের সঙ্গে হয়। তাহার পর সে যাহাকে শক্তি বলিয়া গ্রহণ করে, তাহারই সঙ্গে থাকে, স্ত্রীপুরুষের ন্যায় থাকে; ছেলেপুলে হয়, গৃহস্থালী করে। দুই প্রকার বিবাহের বা শক্তি-গ্রহণের প্রণালী আমি পাইয়াছি,—একটী ত ভদ্রসমাজে প্রকাশ করিবার মত নহে। বৌদ্ধেরা কিন্তু বলে—এ সব কেতাবী কথা, কাজের নয়; আমাদের আসল শক্তিগ্রহণ ওরূপ নয়।

এই ত গেল নেপালী ভিক্ষুদের কথা—ইহারা সব গৃহস্থ হইয়া গিয়াছে, একটীও আসল সন্ন্যাসী নাই। শেষ আসল ভিক্ষু একশত বৎসরের উপর হইল মরিয়া গিয়াছেন—তাঁহার পর সবই এক হইয়া গিয়াছে। ভিক্ষুর ছেলে ভিক্ষু হয়—বজ্রাচার্য্যের ছেলে বজ্রাচার্য্য হয়, কিন্তু বৌদ্ধদের আসল বজ্রাচার্য্য অনেক উচ্চে। যে কেহ বৌদ্ধ হইবে,—গৃহস্থই হউক, ভিক্ষুই হউক, তাহাকে প্রথম পঞ্চ শীল গ্রহণ করিতে হইত। আমি প্রাণিহিংসা করিব না, না দিলে পরের জিনিষ লইব না, ব্রহ্মচর্য্য খণ্ডন করিব না, মিথ্যাকথা বলিব না, সুরা, মৈরেয় ও মদ্য পান করিব না। যাহারা এই সকল শীল গ্রহণ করিয়া অভ্যস্ত হইয়া যাইত, তাহাদিগকে আরও তিনটী শীল দেওয়া হইত,—কটুবাক্য বলিব না, গান বাজনা করিব না, স্রক্‌চন্দনাদি ব্যবহার করিব না। গৃহস্থেরা কিন্তু ইহার অধিক শীল লইতে পারিবে না। ইহার অধিক আর দুইটী শীল শুধু ভিক্ষুদের জন্য—একটী উচ্চাসন ও মহাসন ত্যাগ ও একটী রজতকাঞ্চন ত্যাগ, স্থবিরবাদে অর্থাৎ দক্ষিণী বৌদ্ধদের শেষ ও চরম; কিন্তু উত্তর দেশের বৌদ্ধদের ইহার উপরও কিছু আছে। তাঁহারা শীলকে সম্বর বলেন—এই দশটা শীল তাঁহারা অষ্ট সম্বর করিয়া তুলিয়াছেন; নবম সম্বরের নাম বোধিসত্ত্বসম্বর।

অদ্বয়বজ্র রত্নত্রয় শরণের কথা বলিয়া বলিতেছেন,—"অনেনৈব রত্নত্রয়শরণেন বৌদ্ধ ইতি গীয়তে। ইদঞ্চৈতৎ রত্নত্রয়শরণং বৌদ্ধদর্শনস্য উপাসকাদিসর্ব্বসম্বরাণাং বীজভূতম্। সম্বরা-

শৈক্ষতানি (?) কন্তিসংখ্যাস্তে সম্বরা উচ্যন্তে বিভাষারাম্। উপাসকাদিপোষধান্তা অষ্টৌ। বোধিসত্ত্বমহাযানে পূর্ব্বোক্তা এব অষ্টৌ বোধিসত্ত্বসম্বরো নবমঃ অগ্রনয়মহাযানে পূর্ব্বোক্তা এবং নব বজ্রব্রতসম্বরো দশমঃ তত্র উপাসক উপাসিকা শ্রামণের ভিক্ষু শ্রামণেরী শিক্ষমাণা ভিক্ষুণী ত্রিসংস্থানাং স্ত্রীপুরুষাশ্রয়ভেদাৎ সপ্তসম্বরাঃ।"

তাহা হইলে বুঝা গেল, হীনযানী বৌদ্ধ অপেক্ষা মহাযানীদের আরও দুইটা সম্বর আছে। একটা বোধিসত্ত্বসম্বর, আর একটা বজ্রব্রতসম্বর। বোধিসত্ত্বসম্বর বলিতে গেলে নিশ্চয়ই বুদ্ধত্ব লাভ করিব, এরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। বজ্রব্রতসম্বর অর্থাৎ আমি শূন্য হইয়া গিয়াছি, এই ধারণা। বজ্র বলিতে গেলে শূন্যতাকেই বুঝায়।

বৌদ্ধ ও হিন্দুদের সংস্কারের কথা সব বলা হইল। এখন উহাঁদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কথা। অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণেরা উহাকে ইষ্টি বলিতেন। অগ্নিত্রয়সাধ্য যাগের নাম ইষ্টি। সাগ্নিকেরাও ইষ্টি করিতেন, কিন্তু তাঁহারা একাগ্নিতেই কার্য্য করিতেন। আমাদের এখন বহ্নি স্থাপন করিয়া, উহাকে মন্ত্রপূত করিয়া দাহ করিতে হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত শবদাহ না হয়, ততক্ষণ সেই শব আত্মীয় স্বজন ভিন্ন কেহ স্পর্শ করিতে পারে না, অন্ততঃ আপনার জাতির লোক ভিন্ন অন্য কেহ স্পর্শ করিতে পারে না। শব স্পর্শ করিলেই অশৌচ হয়, যাহারা দহন বহন করে, তাহাদেরও অশৌচ হয়। চুল্লীটী ভাল করিয়া পরিষ্কার করা, যাহারা শবদাহ করে, তাহাদের প্রধান কর্ত্তব্য। যদি একখানি কয়লা চুল্লীতে পড়িয়া থাকে, তাহা হইলেও তাহাদের প্রত্যবায় হয়। সাধারণ লোকের সংস্কার, চুল্লীটি পরিষ্কার করিলে আর জন্মে লোকটী ফর্সা হয়, আর যদি একখানিও কয়লা পড়িয়া থাকে, তবে তাহার গায়ে তিল হয়। চুল্লী অপরিষ্কার রাখিলে সে লোকটা কাল হয়। দাহকারীদের আর একটা প্রধান কর্ত্তব্য, শবের যে অংশ পোড়ে না, সে অংশ গভীর জলে ফেলিয়া দেওয়া ও অস্থি সঞ্চয় করিয়া দূর জলে ফেলিয়া দেওয়া।

আমরা শবকে অশুচি মনে করি, অস্থিকেও অশুচি মনে করি। তাই হাড় ছুঁইলেই আমাদের স্নান করিতে হয়। বৌদ্ধেরা কিন্তু সেরূপ করেন না। শুধু হাড় নয়—আমরা নখ, চুল কাটা হইয়া গেলে তাহাকে অস্পৃশ্য মনে করি—তাহা ছুঁইলেও আমাদের অশৌচ হয়। বৌদ্ধেরা কিন্তু এই নখ, চুল ও হাড়কে পরম পবিত্র বলিয়া মনে করেন; তাহাকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য পাথরের বাক্স বা কৌটায় পুরিয়া রাখেন এবং তাহার উপরে বড় বড় স্তূপ নির্ম্মাণ করেন, স্তূপের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করেন, স্তূপের পূজা করেন, স্তূপের চারিদিকে দীপমালা দেন। এই জায়গায় বৌদ্ধ হিন্দুতে বড়ই তফাৎ। বৌদ্ধদের শব অনেক সময় ফেলিয়া দেয়, অনেক সময়ে শ্মশান-রক্ষকের নিকট পোড়াইবার জন্য কিছু পয়সা দিয়া আসে। কিন্তু বড়লোক মরিলে খুব জাঁক করিয়া, সে দেহ তৈলদ্রোণীতে পুরিয়া দাহ করে এবং হাড়গুলি পুঁতিয়া, তাহার উপর স্তূপ নির্ম্মাণ করে। বুদ্ধদেবের হাড়গুলি প্রথম আট ভাগ হইয়া যায় ও আট জায়গায় স্তূপ হয়। রাজা অশোক তাহাদের মধ্যে সাতটির 'সলিলনিধান' উঠাইয়া, তাহার চৌরাশী হাজার ভাগ করেন এবং তাহার উপর চৌরাশী হাজার স্তূপ নির্ম্মাণ করেন। নেপালে এখনও অনেকগুলি স্তূপ অশোক-

স্তূপ বলিয়া পরিচিত। সাহেবেরা বলেন,—ওগুলিকে অশোকের বলিতে দ্বিধা করা উচিত নয়। কারণ, উহাদের পরিমাণ অশোক-স্তূপের মত ও উহাদের মাল-মসল্লাও অশোক-স্তূপের মত। তাহার পর শ্রাদ্ধ। অগ্নিহোত্রীরা পিতৃপিণ্ড নামে যজ্ঞ করিতেন। উহা অগ্নিত্রয়সাধ্য। সাগ্নিক ও নিরগ্নিকেরা শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। শ্রাদ্ধ মানে—মৃতের উদ্দেশে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অন্ন, বস্ত্র ও পিণ্ডদান। ইহা সমস্তই বেদমন্ত্রে হইয়া থাকে। শ্রাদ্ধ নানা রকম আছে—প্রেতশ্রাদ্ধ, মাসিক শ্রাদ্ধ, সপিণ্ডীকরণ, পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ, অমাবস্যা শ্রাদ্ধ, নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ, একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ ইত্যাদি। ভূতের ভয়ে অনেকরূপ শ্রাদ্ধ করিতে হয়। সে শ্রাদ্ধ যে কেহ করিতে পারে—তাহার অধিকারী, অনধিকারী নাই। ইহার মধ্যে প্রধান ত্রিপিণ্ড শ্রাদ্ধ। যব, মাষ ও তিল,—এই তিনের ত্রিপিণ্ড করিতে হয়। ভতকরগুপ্তের মতে বৌদ্ধেরাও নানারূপ শ্রাদ্ধ করে। তিনি বলেন, ভগবান্‌ গৃহস্থাশ্রমীদের জন্য শ্রাদ্ধেরও ব্যবস্থা করিয়াছেন। অতএব তাহার বিধি বলিতেছি। নিত্যশ্রাদ্ধের সময় বলিতে হয়। বোধিসত্ত্বচর্য্যা গ্রহণ করিয়া বুদ্ধেরা যেমন পূর্ব্বে শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ করিব—"ওঁ অদ্য অমুক মাসে, অমুক তিথিতে অমুক গোত্রে পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, তাঁহাদের পত্নীদের ও অতিথিদের জন্য বজ্রতণ্ডুল হইতে উৎপন্ন সঘৃত অন্ন আঃ হুং স্বাহা," এইটী তিনবার পাঠ করিয়া দিবেন। তাহার পর সেই বুদ্ধেরা যেমন সকল পুণ্য কর্ম্মের পরিণামস্বরূপ সম্যক্‌ সম্বোধি লাভ করিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ করিব। আমার এই পুণ্য মোক্ষের হেতু হইবে। পার্ব্বণশ্রাদ্ধ ও অপরপক্ষের শ্রাদ্ধেও এই বিধান। একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে যাহার শ্রাদ্ধ, কেবল তাহারই নাম গোত্র উচ্চারণ করিবে, আর সকলই পূর্ব্বের মত। নান্দীমুখ শ্রাদ্ধও এইরূপে করা যায়। কোথায় হাঁটু পাতিতে হইবে, কোথায় হাত মুখ রাখিতে হইবে, কোথায় তিল কুশ গ্রহণ করিতে হইবে—এই সব নিজেই বিচার করিয়া লইতে হইবে।

ব্রাহ্মণভোজন ও সঙ্ঘভোজন

ব্রাহ্মণেরা ছোঁয়া লেপাটা বড়ই দোষ মনে করেন। পৈতা হওয়ার দিন হইতে ব্রাহ্মণের ছেলেরা ব্রাহ্মণ হয়। সেই দিন থেকে তাহারা কাহারও এঁটো খায় না এবং কেউ ছুঁলেও খায় না। সুতরাং ব্রাহ্মণভোজনে প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আসন দিতে হয় ও মাঝখানে একটু ফাঁকও রাখিতে হয়। জলপাত্র ডান দিকে দিতে হয়। যাতে ছোঁয়া লেপা না হয়, সে জন্য বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়।

ইৎসিং বলেন, সে কালে ভারতবর্ষে সঙ্ঘভোজনেও এরূপ করা হইত। সাত ইঞ্চি উঁচু পিঁড়ীর উপর বসিয়া, উবু হইয়া (আসনপীড়ি হইয়া বসা দোষ) বসিয়া তাঁহারা খাইতেন। দুখানা পিঁড়ীর মধ্যে অন্ততঃ এক ফুট জায়গা খালি থাকিত। ব্রাহ্মণভোজনে সকলের পাতে পরিবেষণ না হইলে ব্রাহ্মণেরা খাইতে পারিতেন না। এবং খাইতে বসিয়া মাঝে কেউ উঠিয়া যাইতেন না। কিন্তু সঙ্ঘের লোকেরা যাঁর পাতে যখন পরিবেষণ হইত, অমনি খাইতে পারিতেন, অন্য লোকের জন্য অপেক্ষা করিতে হইত না। ব্রাহ্মণেরা খাইতে বসিয়া জল খাইতে হইলে

ধর্ম্ম বাঁ হাতে ধরিয়া আলগোছে জল খান, অথবা ডান হাতে ধরিয়া চুমুক দিয়া খান। বৌদ্ধেরা বাঁ হাতে চুমুক দিয়া জল খাইতেন। ইৎসিং বলেন, তিনি বৌদ্ধদের সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন, সমস্তই বুদ্ধদেবের বহি হইতে বলিতেছেন। তা'হলে সজ্যভোজনেও ব্রাহ্মণদের মত এত ছোঁয়া লেপা ছিল না। কিন্তু আমি ১৮৯৮ সালে এক সম্যক্ সম্ভোজনে উপস্থিত ছিলাম। নেপালের সমস্ত বিহারে যত লোক ছিল, সব সেখানে উপস্থিত ছিল—প্রায় ১৩ হাজার ভিক্ষু একত্র খাইতেছিলেন। তাঁহাদের কিন্তু সব ছোঁয়া লেপা। সারি সারি চাদর বিছাইয়া বসিয়াছেন। একের চাদরের উপর আর একজনের চাদর পড়িয়াছে। যত বড় মানুষের সারি, চাদরও তত বড়। চাদরে যা পড়িতেছে, খাওয়ার হইলে ভিক্ষুরা তাহা তখনই খাইতেছেন, ভাত, ব্যঞ্জন, লুচি, পরটা, মুলো সিদ্ধ, ডাল—সব সেখানে বসিয়াই খাইতেছেন,—কড়ি, পয়সা, চাল, সুপারি, এলাচ, লবঙ্গ প্রভৃতি যাহা বসিয়া খাবার জিনিষ নয়, সেগুলি পাতে রহিতেছে,—যাবার সময় সঙ্গে লইয়া যাইবেন। তাহা হইলে আর ছোঁয়া লেপার বাকি কি রহিল? আমাদের দেশে পালি পার্ব্বণে গঙ্গাতীরে দেখিয়াছি—ভিখারী বৈষ্ণবেরা ওরূপ করিয়া চাদর বিছাইয়া বসে, তাহাদের কিন্তু রান্না খাবার কেউ দেয় না; দেয়—চাল, ডাল, কড়ি, পয়সা, ফল। ইহাদিগকে যেমন সকলেই কিছু কিছু দেয়, সম্যক্ সম্ভোজনে কিন্তু ঠিক সেরূপ নহে। দানপতি (আমরা ইহাঁকে কৃতী বলি) সকলকেই পরিতোষ করিয়া দিবেন, একজনকেও ফাঁক্ রাখিতে পারিবেন না। অন্যান্য বৌদ্ধেরা—তাঁহারা গৃহস্থই হউন, ভিক্ষুই হউন বা গুভাজুই হউন, সকলেই দান করিবার জন্য কিছু কিছু লইয়া আসিবেন। একজনে হয় ত এক মণ চাউল লইয়া আসিয়াছেন; তাহাতে যত জনকে দেওয়া হয়, দেওয়া হইল। তার পর তিনি চলিয়া গেলেন। একজন হয় ত সুপারি লইয়া আসিয়াছেন। পাঁচ হাজারটী সুপারি পাঁচ হাজার লোককে দিলেন। বাকি ৭ হাজারকে দিতে পারিলেন না—তিনি চলিয়া গেলেন। সম্যক্ সম্ভোজনের অধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এক একজন লোক কি পাইল? তিনি বলিলেন, রান্না জিনিষ ত তাহারা খাইয়া ফেলিয়াছে। তাহার উপর নগদে ও জিনিষে প্রত্যেকে সাড়ে দশ আনা করিয়া পাইয়াছে।

আমি এ পর্য্যন্ত হিন্দু ও বৌদ্ধদের যে তুলনামূলক সমালোচনা করিলাম, ইহার উদ্দেশ্য, এ দুয়ে কতটুকু তফাৎ, তাহার কিছু সন্ধান দেওয়া। পূর্ণ সমালোচনা অত্যন্ত দুঃসাধ্য। কারণ, আচার-ব্যবহার সব দেশে সমান নয়—এই আড়াই হাজার বৎসরের মধ্যে কত জায়গায় যে কত বদল হইয়াছে, তাহার ঠিকানা নাই। হিন্দু বলিতে গেলেও অসংখ্য জাতি, অসংখ্য ধর্ম্ম বুঝায়। বৌদ্ধ বলিতে গেলেও তাই। তবে মোটামুটি কথা এই, বৌদ্ধেরা গুরু মানে, গুরুকে দেবতার চেয়ে বড় ব'লে মানে, গুরুপদ পরমপদ ব'লে মনে করে। গুরুকে তন্-মন-ধন কিছুই দিতে দ্বিধা করে না, আর সম্পূর্ণরূপে গুরুর মত হইতে চায়, গুরুই শূন্য, গুরুই পরমার্থ। শূন্য যেমন শূন্যে মিশাইয়া যায়, গুরুও তেমনি শূন্যে মিশাইয়া গিয়াছেন। আমরাও তেমনি গুরুতে—শূন্যে মিশাইয়া যাইব। এরূপ মত—আমরা এখন যাঁহাদিগকে হিন্দু বলি, তাঁহাদের মধ্যেও অনেক আছে।

তৃতকরগুপ্ত বলিয়াছেন,—"গুরুর্ব্বুদ্ধো গুরুর্ধর্ম্মো গুরুঃ সংঘঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। স্বয়ং তথাগতির্যস্মাৎ গুরুরেবাত্র কারণম্॥ সংবুদ্ধেভ্যো যথাদত্তে ফলং তথা। তেনৈব সূত্রতন্ত্রেষু গুরুপূজা প্রকাশ্যতে। প্রদত্তে পুনরন্যেভ্যঃ ফলং পাত্রানুরূপকম্। বিনয়েষ্বপি সূত্রেষু তন্ত্রেষ্বপি জগৌ মুনিঃ॥"

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

প্রাণিবিজ্ঞান-বিষয়ক পরিভাষা*

(১) কোষবিজ্ঞান (Cytology)

Achromatic spindle, Achromatic figure—ভাজনতুরী, তুরীমণ্ডল, তুর্য্যাবস্থা।

Achromatin, linin—ধারণ পদার্থ।

Acrosome—মুকুট।

Amitosis—সরল ভাজন।

Amphiaster, diaster—দ্বিতারকাবস্থা।

Amphinucleolus—মিশ্রগুলিকা, মিশ্রবিন্দু।

Anaphase—তন্তুচলনাবস্থা।

Archoplasm—তুরীতন্তু পদার্থ।

Aster—অংশুখণ্ড, অংশুমণ্ডল।

Bivalent chromosome—যুগ্মজ রঞ্জনতন্তু।

Bud variation—মৌকুর ভাবান্তর।

Cell—কোষ।

Cell membrane, cell wall—কোষাবরণ।

Central fusion nucleus—মধ্যস্থ মিলিত কোষসার।

Central spindle fibres—মধ্য তুরীতন্তু।

Centriole—আকর্ষণ কেন্দ্র।

Centrosome—আকর্ষণ গোলক।

Centrosphere, attraction sphere—আকর্ষণীবেষ্ট।

Chondriocont, plastocont—দৃঢ় তন্তু।

Chondriomite—দৃঢ় মালিকা।

Chondriosome, plastosome—দৃঢ়বস্তু।

Chromatin—রঞ্জনবস্তু।

Chromidia—রঞ্জন কণিকা, সার কণিকা।

Chromidiogamy—কণিকাসঙ্গম।

Chromomere—তন্তুপর্ব্ব।

Chromosome—রঞ্জনতন্তু।

Cytaster—ভেদন কেন্দ্র।

Cytoplasm—কোষবস্তু।

Daughter plate—ভেদজ পট্ট।

Diarinesis—ভিন্নতন্ত্বস্থা।

Diplotene stage—দ্বিতন্ত্বস্থা।

Equatorial plate—বিদার পট্ট।

Gametogenesis—জনন-কোষোৎপাদন।

Germinal vesicle—ডিম্বকোষসার।

Idiochromatin—জননরঞ্জনবস্তু।

Idioplasm—কুলবহ বস্তু, তেজঃ বস্তু।

Idiosome—স্বতন্ত্র গুলিকা।

Karyogamy—কোষসার সঙ্গম।

Karyolymph—সাররস।

Karyomere—সারখণ্ড।

Karyosome—রঞ্জন পিণ্ড, রঞ্জন গুলিকা।

Kinetonucleus—চালন কোষসার।

Leptotene stage—সূক্ষ্মতন্ত্বস্থা।

Macrogomete—ডিম্বকোষ।

Macronucleus—বৃহৎ কোষসার।

Mantle fibres—আকর্ষণ তন্তু।

Meiosis—সংখ্যার্দ্ধীভবন।

Metaphase—তন্তুভেদাবস্থা।

Metaplastic bodies—জাতবস্তু।

Microgamete, spermatozoon—শুক্রকোষ, পুংবীজাণু।

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ত্রিংশ বার্ষিক দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

Micronucleus—ক্ষুদ্রকোষসার।

Mitochondria, Plastachrondria—সূত্রকণা।

Mitosis, Katyokinesis—জটিল কোষভেদ, জটিল কোষভাজন।

Monaster—এক তারকাবস্থা।

Multipolar mitosis—বহুমেরুক কোষ-ভাজন।

Nuclear membrane—কোষসারাবরণ।

Nucleolus—সারচিহ্ন, সারগুলিকা।

Oogonia—আদ্যডিম্বকোষ।

Nucleus—কোষসার।

Oocyte—আর্ত্তবকোষ। Ovum, macro-gamete—ডিম্বকোষ।

Pachytene stage,—স্থূলতন্ত্বস্থা।

Parasynclesis, parasynapsis—পার্শ্ব-মিলন।

Parthenogenesis—অসঙ্গমোৎপত্তি।

Plasmosome—রসগুলিকা।

Plastin—যোজন বস্তু।

Plastochondria = mitochondria.

Plastocont = chondriocont.

Plastosome = chondriosome.

Polar body—মেরুকণা।

Prochromosome—আদ্যতন্তু।

Pronucleus—পুরঃকোষসার।

Prophase—তন্তুগঠনাবস্থা।

Protoplasm—জীববস্তু।

Segregation—পৃথগ্‌ভবন।

Spermatid—আদ্যশুক্র-কোষ।

Spermatocyte—শুক্রকোষ।

Spermatogonium—আদ্যজননশুক্রকোষ।

Spindle fibres তুরীতন্তু।

Spireme—তন্তুজাল।

Strepsitene stage—জড়িততন্ত্বস্থা।

Structure, reticular—জাল গঠন।

" fibrillar তন্তুময় গঠন।

" granular—কণাময় গঠন।

" alveolar—কোষ্ঠময় গঠন।

Syndesis—ক্ষণিক বা সাময়িক মিলন।

Syngamy—সঙ্গম।

Synizesis—রঞ্জনসঙ্কোচ, একত্রীভবন।

Telophase—পুনর্গঠনাবস্থা।

Trophochromatin পোষণ রঞ্জনবস্তু।

Trophonucleus—পোষণ কোষসার।

Zygotene stage—তন্তুমিলনাবস্থা।

শ্রীএকেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ

——০——

হিন্দু রাজনীতি-শাস্ত্রে মণ্ডলের সংস্থান ও গুরুত্ব*

প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রনীতিবিষয়ক নিবন্ধ-লেখকগণ পরস্পর সন্নিহিত কতকগুলি রাজ্যের সমষ্টিকে মণ্ডল নামে অভিহিত করিয়াছেন। আমরা এই প্রবন্ধে প্রধানতঃ অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত মণ্ডলের স্বরূপ ও গুরুত্বের বিষয় আলোচনা করিয়া, প্রসঙ্গক্রমে প্রচলিত কয়েকটী মতের অযৌক্তিকতা প্রতিপাদন করিব। পুরাণ, মহাভারত, মনুসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে মণ্ডলের বিবরণ থাকিলেও তাহা এতই সংক্ষিপ্ত যে, তদ্দ্বারা এত দিন উহার প্রকৃত গুরুত্ব বুঝা যাইত না। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র প্রকাশের পর এখন আমরা বুঝিতে পারিতেছি, এই মণ্ডলের কল্পনা প্রাচীন যুগের রাজা ও রাজনৈতিকগণের পক্ষে কত দূর উপকারী হইয়াছিল।

মণ্ডলের উদ্দেশ্য।

প্রত্যেক রাজ্যেরই পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যগুলির সহিত মৈত্রী বা শত্রুতা, কোনরূপ সম্বন্ধ থাকা স্বাভাবিক। সান্নিধ্যবশতঃ নানা কারণে রাজ্যগুলির একটিকে অপরটির সম্পর্কে আসিতে হয় এবং অবস্থা বুঝিয়া বিভিন্ন রাজ্য সম্বন্ধে বিভিন্নরূপ নীতির আশ্রয় লওয়া আবশ্যক হইয়া পড়ে। কি অবস্থায় কোন্ রাজ্য সম্বন্ধে কিরূপ নীতি অবলম্বিত হইতে পারে, তাহা বিচার করিবার সুবিধার জন্য অতি প্রাচীন কাল হইতেই হিন্দু রাজনীতিবিশারদগণ মণ্ডলের কল্পনা করিয়াছেন।

তাঁহারা অভিজ্ঞতার ফলে বুঝিয়াছিলেন, প্রতিবেশী রাজ্যগুলির মধ্যে যে সকল রাজনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হওয়ার সম্ভাবনা, তাহা সমাধানের জন্য সাধারণতঃ ১২টী রাজ্যের কথা চিন্তা করিলেই পর্য্যাপ্ত হইতে পারে। এই জন্য প্রচলিত মতে নিকটবর্ত্তী ১২টী রাজ্যের সমষ্টিকে একটী মণ্ডল বলিয়া গণ্য করা হয়। এই স্থলে মনে রাখা আবশ্যক যে, মণ্ডল একটি কল্পিত বস্তু মাত্র। অবস্থার বৈচিত্র্য অনুসারে বার অপেক্ষা ন্যূন বা অধিকসংখ্যক রাজ্য লইয়াও মণ্ডল সৃষ্ট হইতে পারিত। এই জন্যই কামন্দকীয় নীতিসারে (৮, ২০-২৮) এ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

মণ্ডল কল্পনা।

অর্থশাস্ত্রকর্ত্তারা মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলির সংস্থান অনুসারে এক একটি নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুবিধার জন্য একজন রাজাকে কেন্দ্রস্বরূপ ধরিয়া লইয়া, তাহার নামকরণ করা হইয়াছে 'বিজিগীষু'। এই বিজিগীষুর সম্মুখ দিকে অবস্থিত পর পর পাঁচজন রাজার নাম 'অরি', 'মিত্র', 'অরিমিত্র', 'মিত্রমিত্র', ও 'মিত্রারিমিত্র' এবং পশ্চাৎদিকে অবস্থিত চারিজন রাজার নাম যথাক্রমে 'পার্ষ্ণিগ্রাহ', 'আক্রন্দ', 'পার্ষ্ণিগ্রাহাসার' ও 'আক্রন্দাসার'। ইহা ছাড়া 'বিজিগীষু'র পার্শ্ববর্ত্তী আরও দুইজন বলবান্ রাজাকে যথাক্রমে 'মধ্যম' ও 'উদাসীন' সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়। সর্ব্বসমেত এই বারজন রাজার রাজ্য লইয়া একটি মণ্ডল পরিকল্পিত হইয়াছে।

---

* রাধানগরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের পঞ্চদশ অধিবেশনের ইতিহাস-শাখায় পঠিত।

'বিজিগীষু' এই নামটির ব্যুৎপত্তির দিকে অত্যধিক দৃষ্টি রাখিলে ইহার প্রকৃত অর্থ বুঝিবার সুবিধা হয় না। যে রাজা যুদ্ধে 'জয় ইচ্ছা করেন', তিনিই 'বিজিগীষু'—এইরূপ ভাবিলে নিতান্ত ভুল করা হইবে। প্রকৃতপক্ষে যে রাজাকে কেন্দ্র করিয়া মণ্ডলের কল্পনা করা হয়, রাজনীতিশাস্ত্রে তাহারই নাম দেওয়া হইয়াছে 'বিজিগীষু'। এইরূপ না হইলে যুদ্ধের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে আর মণ্ডলের অস্তিত্ব স্বীকার করা যাইত না; অথচ শাস্ত্রে দেখা যায়, শান্তির সময়েও মণ্ডলের শক্তি বিচার করিয়া কার্য্য করাইতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। সাধারণতঃ দুইটী অব্যবহিত প্রদেশের অধিপতির মধ্যে নানা কারণে প্রায়ই বাদ-বিসম্বাদ ঘটিয়া থাকে। এই হেতু অব্যবহিত সান্নিধ্যকেই একের প্রতি অন্যের শত্রুতার কারণরূপে ধরিয়া লইয়া, বিজিগীষুর ঠিক পরবর্ত্তী রাজাকে 'অরি' নাম দেওয়া হইয়াছে। এই নিয়মে 'অরির' পরবর্ত্তী রাজা সান্নিধ্যহেতু তাহার অরি হওয়ার কথা, সুতরাং তাহাকে বিজিগীষুর 'মিত্র' বলা হয়। এইরূপে মিত্রের পরবর্ত্তী রাজা 'অরিমিত্র', তৎপরবর্ত্তী 'মিত্রমিত্র' এবং তাহার পরে 'মিত্রারি-মিত্রের' স্থান কল্পিত হইয়া থাকে। এই পাঁচজন রাজার রাজ্য বিজিগীষুর সম্মুখভাগে অবস্থিত। পশ্চাৎদিকেও চারিটী রাজ্যের স্থান ধরিয়া লওয়া হয়। প্রথম রাজা 'বিজিগীষু'র সন্নিহিত, সুতরাং শত্রু; কিন্তু সম্মুখে অবস্থিত অরির সহিত পার্থক্য রাখিবার জন্য ইহার নাম করা হইয়াছে 'পার্ষ্ণিগ্রাহ'। পার্ষ্ণি অর্থাৎ পশ্চাৎদিক্ হইতে আক্রমণ করার সম্ভাবনা আছে বলিয়াই ইহার এইরূপ নাম। পূর্ব্বোক্ত নিয়মে পার্ষ্ণি-গ্রাহের পরবর্ত্তী রাজা অবশ্যই তাহার শত্রু, সুতরাং 'বিজিগীষু'র মিত্র। পার্ষ্ণিগ্রাহের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিজিগীষু ইহাকে 'আক্রন্দন' অর্থাৎ আহ্বান করেন, অতএব ইহার নাম 'আক্রন্দ'। ইহার পরবর্ত্তী রাজা পার্ষ্ণিগ্রাহের মিত্র এবং তৎপরবর্ত্তী আক্রন্দের মিত্র। ইহারা বিপদের সময় নিজ নিজ বন্ধুর প্রতি 'আসার' অর্থাৎ সাহায্য প্রদানের জন্য দ্রুত গমন করে বলিয়া ইহাদের নাম যথাক্রমে 'পার্ষ্ণিগ্রাহাসার' এবং 'আক্রন্দাসার'। এই সকল স্থলে সমীপবর্ত্তিতাকেই শত্রুতার কারণ ধরিয়া, অব্যবহিত প্রদেশের অধিপতিকে অরি এবং তৎপরবর্ত্তীকে মিত্র স্থির করা হইয়াছে; কিন্তু ইহা স্বাভাবিক হইলেও অব্যভিচারী নিয়ম নহে। সোমদেব সূরি তাঁহার নীতিবাক্যামৃতে ষাড়্গুণ্যসমুদ্দেশ প্রকরণে বলিয়াছেন,—"কার্য্যং হি মিত্রত্বামিত্রত্বয়োঃ কারণং, ন পুনর্বিপ্রকর্ষসন্নিকর্ষৌ।" অনেক সময়ে কার্য্যনিবন্ধন শত্রুতা বা মিত্রতা জন্মে। দূরত্ব বা সান্নিধ্য উহার কারণ হইতে পারে না। কৌটিল্যের মতানুসারেও সান্নিধ্য ব্যতীত অন্য কারণে শত্রুতা জন্মিতে পারে (৭ অধিকরণ)। কামন্দকীয় নীতিসারেও (৮, ১৪) একই বস্তু প্রাপ্তির জন্য আগ্রহশীল ব্যক্তিগণকে পরস্পরের শত্রু বলা হইয়াছে। সুতরাং সকল সময়ে সান্নিধ্যই শত্রুতার কারণ হয় না। এই স্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, বিজিগীষুর সম্মুখভাগ বা পশ্চাদ্‌ভাগ একটা কল্পনা মাত্র। ইহা দ্বারা এই মাত্র বুঝা যায় যে,—যে দিকে অরির অবস্থিতিস্থান থাকিবে, সেইটাকেই সম্মুখ বলিয়া ধরিতে হইবে, এবং তাহার বিপরীত দিক্ হইবে পশ্চাদ্‌ভাগ।

'অরি', 'বিজিগীষু' প্রভৃতির স্থান ও নাম নির্দ্দেশ।

এখন মণ্ডলের মধ্যে 'অরি' ও 'বিজিগীষু' এই দুইজন প্রধান প্রতিপক্ষ এবং তাহাদের প্রত্যেকের চারিজন করিয়া সহায়, এই দশজন রাজার পরিচয় পাওয়া গেল। অবশিষ্ট দুই জন—'মধ্যম' ও 'উদাসীন' ভিন্ন-লক্ষণাক্রান্ত। ইহাদের সম্বন্ধে বড় একটা ভ্রান্ত ধারণা চলিয়া আসিতেছে। এই নাম দুইটি এমন ভ্রান্তিজনক যে, প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদিগের গ্রন্থেও ইহাদের ঠিক স্বরূপ নির্ণীত হয় নাই। তাঁহারা 'মধ্যম'কে বিবাদের মীমাংসাকারী মধ্যস্থরূপে বর্ণনা করিয়াছেন এবং "উদাসীন"কে নিরপেক্ষ রাজা বলিয়া ভাবিয়াছেন। বাস্তবিক তাহা নহে। মণ্ডলস্থিত অপর রাজারা সকলেই সময়বিশেষে বিবাদের মীমাংসা করিয়া দিতে পারে অথবা নিরপেক্ষ থাকিতে পারে। প্রকৃতপক্ষে যে রাজা 'অরি' ও 'বিজিগীষু' অপেক্ষা অধিক বলশালী, কিন্তু উভয়ের মিলিত বল অপেক্ষা অল্পশক্তিসম্পন্ন, তাহাকেই শাস্ত্রকারগণ 'মধ্যম' আখ্যা দিয়াছেন (অর্থশাস্ত্র ৬, ২, কামন্দক ৮, ২১ মূল এবং শঙ্করাচার্য্যকৃত টীকা)। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, মণ্ডলের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বলবান্ রাজার নাম 'মধ্যম'। 'উদাসীন' আবার তদপেক্ষাও বলবান্। যে রাজা 'অরি', 'বিজিগীষু' ও 'মধ্যম' অপেক্ষা অধিক সামর্থ্য ধারণ করে, কিন্তু উহারা তিনজন মিলিত হইলে সমকক্ষ হইতে পারে না, তাহার নাম 'উদাসীন'। 'মধ্যম' মণ্ডলের মধ্যে মধ্যম শক্তিসম্পন্ন; 'উদাসীন' ঊর্দ্ধে আসীন। অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা বলশালী। 'মধ্যম' বা 'উদাসীন' কারণবশতঃ 'বিজিগীষু'র শত্রু বা মিত্র হইতে পারে। অথবা যুদ্ধকালে নিরপেক্ষও থাকিতে পারে। ইহাদের স্বরূপ নির্ণয়ে শত্রুতা, মিত্রতা বা নিরপেক্ষতা ঠিক বিচার্য্য বিষয় নহে; বলবত্তাই ইহাদের লক্ষণ। অর্থশাস্ত্রের 'বিজিগীষু'র অতি নিকটেই কোন এক দিকে 'মধ্যমে'র স্থান এবং 'অরি', 'বিজিগীষু' ও 'মধ্যমে'র পার্শ্বে 'উদাসীনে'র স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। 'মধ্যম', 'উদাসীন,' 'অরি' এবং 'বিজিগীষু' এই চারি জন মণ্ডলের প্রধান অবয়ব। অপর রাজাদিগকে আবশ্যকমত 'অরি' বা 'বিজিগীষু' কোন এক জনের পক্ষভুক্ত বলিয়া ধরা হয়।

মধ্যম ও উদাসীন সম্বন্ধে প্রচলিত মতের খণ্ডন।

পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে, প্রতিবেশী রাজ্যগুলির মধ্যে যে সকল রাজনৈতিক সম্পর্ক উদ্ভূত হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে কর্ত্তব্য নিরূপণই মণ্ডল কল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য। রাজ্যের সাতটি অবয়ব,—রাজা, মন্ত্রী, দেশ ও তাহার অধিবাসী, দুর্গ, কোশ, সৈন্য এবং সহায়। এই সপ্তাঙ্গের শক্তির উপর প্রত্যেক রাজ্যের সুখ-সমৃদ্ধি নির্ভর করে। মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক রাজাকে স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র সম্বন্ধীয় সপ্তাঙ্গের বলাবল নির্দ্ধারণ করিয়া, অবস্থাবিশেষে সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধীভাব ও সংশ্রয়, এই ষড়্‌গুণের মধ্যে কোন একটির অথবা দুইটি গুণের মিশ্রণে উৎপন্ন উপায়গুলির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এইগুলিই রাজ্যের রক্ষণ ও পরিবর্দ্ধনের উপায়স্বরূপ। সকল কয়টির গুণাগুণ বিচার করিয়া, যেটি দ্বারা অধিক পরিমাণে অনিষ্ট নিবৃত্তি বা ইষ্টলাভ হইতে পারে, বিবেচনাপূর্ব্বক সেটি অবলম্বন করাই রাজনীতি।

সপ্তাঙ্গ ও ষড়্‌গুণ।

যুদ্ধাবসানে শত্রুর সহিত অথবা শান্তিপূর্ণ সময়েও কোন ব্যক্তির সহিত পণে আবদ্ধ হইয়া

মৈত্রী-স্থাপনের নাম সন্ধি। "অপকারো বিগ্রহঃ" অর্থাৎ কোনরূপ অনিষ্টাচরণ করিয়া বৈরভাব প্রকাশ করাকে বিগ্রহ বলে। কৌটিল্য (৭, ২) বিগ্রহের অনেকগুলি দোষ দেখাইয়াছেন এবং সন্ধি দ্বারা কাজ চলিলে বিগ্রহ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। বিশেষভাবে শক্তিসঞ্চয়ের পর উপযুক্ত কালে সৈন্য সামন্ত লইয়া যুদ্ধযাত্রার নাম "যান"।

উপযুক্ত সামর্থ্যের অভাব বুঝিলে যুদ্ধযাত্রা না করিয়া, নিজ রাজ্যের আভ্যন্তরীণ উন্নতি সাধন এবং কোন উপায়ে শত্রুর অনিষ্ট সাধনের নাম 'আসন'। 'আসনে' অবস্থিত রাজা শত্রুর বাণিজ্যাদি বিষয়ে বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া, তাহাকে দুর্ব্বল করিয়া, নিজে শত্রু অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হইতে চেষ্টা করিয়া থাকে। এই যান ও আসন, উভয়ই বিগ্রহের একটা প্রকার মাত্র। কামন্দক (১১, ৩৫, ৩৬) বলিয়াছেন,—"যেহেতু যান ও আসন দ্বারা শত্রুর অপকারই করা হয়, অতএব এই দুইটি বিগ্রহেরই রূপ।" একের সহিত সন্ধি করিয়া অপরের সহিত যুদ্ধ করার নাম 'দ্বৈধীভাব'। শত্রু সংহারে অপরের সাহায্য গ্রহণ আবশ্যক হইলে এই দ্বৈধীভাবের আশ্রয় লইতে হয়। যখন যান, আসন, বিগ্রহ বা দ্বৈধীভাব, কোনটিই অবলম্বনের সামর্থ্য থাকে না এবং শত্রুও যখন সন্ধি করিতে প্রস্তুত না হয়, তখন অপর একজন বলবান্ রাজার শরণাপন্ন হইতে হয়; ইহাকেই বলে 'সংশ্রয়'। বিভিন্নাবস্থায় অবলম্বনীয় এই মূল নীতি কয়টি ছাড়া বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন মত "বিগৃহ্যযান," 'সন্ধায়যান', 'বিগৃহ্যাসন" ও 'সন্ধায়াসন' প্রভৃতি মিশ্রিত উপায়গুলি অবলম্বন করা আবশ্যক হইতে পারে।

অর্থশাস্ত্রে মণ্ডলের স্বরূপ ও মণ্ডলস্থ রাজাদের অবলম্বনীয় ষড়্গুণ সম্বন্ধে বিশদভাবে উপদেশ আছে। কেহ কেহ এ সম্বন্ধে কৌটিল্যের উক্তিগুলির আপাতসুলভ অর্থ গ্রহণ করায় প্রাচীন হিন্দু-রাজনীতি সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত ধারণার উৎপত্তি হইয়াছে। প্রথমতঃ কৌটিল্য ১২টি রাজ্যের সমবায়ে মণ্ডলের কল্পনা করিয়াছেন দেখিয়াই ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথ তাঁহার "প্রাচীন ভারতে" (১৩৮ পৃঃ) লিখিয়াছেন যে, অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য সম্বন্ধেই কৌটিল্যের মণ্ডল-ব্যবস্থা প্রযুক্ত হইতে পারে। সুতরাং এ দেশে মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের ন্যায় কোন বৃহৎ রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে অর্থশাস্ত্র রচিত হইয়াছিল; কারণ, তাহা না হইলে, ঐ পুস্তকে এতগুলি রাজ্যের একত্র সমাবেশের কল্পনা থাকিতে পারিত না। অতএব তাঁহার মতে অর্থশাস্ত্র রচনার সময়ে ভারতবর্ষ অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। অধ্যাপক ভিণ্টারনিট্‌স্‌ও কলিকাতা রিভিউ পত্রে (১৯২৪, এপ্রিল; পৃঃ ২৭) এই মতেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। কিন্তু মণ্ডলান্তর্গত রাজ্যগুলির সংখ্যা দেখিয়াই ঐরূপ মনে করা সঙ্গত নহে। একটি মণ্ডল কতখানি স্থান লইয়া বিস্তৃত থাকিতে পারে, কৌটিল্য তাহার পরিমাণ নির্দ্দেশ করেন নাই। তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে ফ্রান্স, জার্ম্মাণ ও রুসিয়ার মত বড় বড় রাজ্যকেও একই মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত ধরা যাইতে পারে। বিশেষতঃ বার (১২) এই সংখ্যাটি এই স্থলে সম্ভাবিত সংখ্যা মাত্র। প্রকৃতপক্ষে কার্য্যকালে 'বিজিগীষু'র সহিত যে কয় জন রাজার শত্রুতা বা মিত্রতা ঘটিয়া থাকে, কেবল সেই কয়জনই

মণ্ডল সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা।

সেই সময়ে আলোচনার বিষয়ীভূত হয়। অতএব অনেকগুলি রাজার নাম দেখিয়াই মণ্ডলস্থ রাজ্যগুলির ক্ষুদ্রত্ব নির্দ্ধারণ করা অযৌক্তিক।

ঐ পুস্তকেই আর এক স্থলে (১৩৯ পৃঃ) ভিন্সেণ্ট স্মিথ লিখিয়াছেন,—"ভারতবর্ষের প্রতিবেশী রাজ্যগুলির পক্ষে যুদ্ধবিগ্রহ ভিন্ন কখনই শান্তিতে বাস করা সম্ভবপর ছিল না। কারণ, 'বলশালী হইলে যুদ্ধ করিবে', 'সামর্থ্য থাকিলেই সন্ধির নিয়ম ভঙ্গ করিবে' এবং 'কোন রাজ্য অব্যবহিত হইলেই তাহার অধিপতিকে শত্রুরূপে গ্রহণ করিতে হইবে'—ইহাই হইল ভারতীয় রাজনীতি-শাস্ত্রের উপদেশ।" কিন্তু এই উক্তিগুলি একে একে মূলের সহিত মিলাইয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, অর্থশাস্ত্রের বিভিন্ন অংশ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে গৃহীত বাক্যগুলির পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্যহীন অনুবাদের দ্বারা ঐতিহাসিকপ্রবর এইরূপ ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। প্রথমতঃ—'অভ্যুচ্চীয়মানো বিগৃহ্ণীয়াৎ' (৭, ১), 'হীনেন বিগৃহ্ণীয়াৎ' (৭, ৩) এই সকল বাক্যের দ্বারা কৌটিল্য বল সঞ্চয় হইলেই যুদ্ধ করিতে উপদেশ দেন নাই কিংবা নিজের অপেক্ষা দুর্ব্বল রাজা পাইলেই তাহার অনিষ্ট করিতে বলেন নাই। যখন অন্যান্য কারণে যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে, তখন উপযুক্ত বল সঞ্চয় করিয়া, অপেক্ষাকৃত অল্পশক্তিসম্পন্ন রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, ইহাই কৌটিল্যের উপরিউক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য। কারণ, তিনি অন্যত্র (৭, ২) বিগ্রহকে ক্ষয়, ব্যয়, প্রবাস ও প্রত্যবায়ের কারণরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এবং সন্ধি ও বিগ্রহের মধ্যে বিগ্রহকে পরিত্যাজ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কামন্দকীয় নীতিসারে (১০, ৩—৫) বিগ্রহের কুড়িটি কারণ নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহা হইতেও বুঝা যায় যে, কেবল বল সঞ্চয় হইলেই যুদ্ধ করাটা নীতিশাস্ত্রকারের অভিপ্রেত নহে। উপায়ান্তর থাকা সত্ত্বেও যিনি যুদ্ধ করিবার মন্ত্রণা দেন, তাঁহাকে নীতিবাক্যামৃতে (যুদ্ধোদ্দেশ প্রকরণে) নিন্দা করা হইয়াছে। সুতরাং বিনা কারণে যুদ্ধায়োজন ভারতীয় রাজনীতি-শাস্ত্রের অনুমোদিত, এমন কথা কিছুতেই বলা যায় না। দ্বিতীয়তঃ প্রবল ব্যক্তির পক্ষে দুর্ব্বলের সহিত সন্ধির নিয়ম প্রতিপালনে অনিচ্ছা থাকা সম্ভব হইলেও, ভারতবর্ষে সচরাচর এমন ঘটনা ঘটিত বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সন্ধিমোক্ষপ্রকরণের প্রথমেই (৭, ১৭) কৌটিল্য বলিয়াছেন,—"সত্যং বা শপথো-বা পরত্রেহ চ স্থাবরঃ সন্ধিঃ" অর্থাৎ সাধুতা বা শপথের উপর প্রতিষ্ঠিত সন্ধি কখনই ভগ্ন করা চলে না। এইরূপে সন্ধিভঙ্গ সম্বন্ধে কৌটিল্য নিজের অভিমত প্রকাশের পর আশঙ্কা করিয়াছেন যে, প্রবল ব্যক্তিরা বলগর্ব্বে সন্ধির নিয়ম নাও মানিতে পারে। কিন্তু ইহা বড়ই ক্ষোভের বিষয় যে, এই উক্তিটিকেই স্মিথ সাহেব ভারতবর্ষে সন্ধি-ভঙ্গ ঘটনার প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ সমীপবর্ত্তিতাই শত্রুতার স্বাভাবিক কারণরূপে বর্ণিত হওয়ায় পরস্পরের মধ্যে সর্ব্বদা যুদ্ধ-বিগ্রহের অস্তিত্ব অনুমান করা হইয়াছে। কিন্তু এরূপ অনুমান আদৌ যুক্তিযুক্ত নহে। পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি যে, প্রতিবেশী রাজ্যগুলির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। আধুনিক কালেও আমরা সে বিষয়ে প্রমাণ পাইতেছি। কিন্তু তাহা হইতে এমন সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, ঐ রাজ্যগুলি পরস্পর সর্ব্বদা যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকিবে। বিশেষতঃ উচ্ছৃঙ্খলভাবে

ষাড়্গুণ্য সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা।

যুদ্ধ করার পক্ষে সে কালেও অনেক বাধা ছিল। মণ্ডলস্থ অপর রাজগণের বিরাগভাজন হওয়ার ভয়ে প্রত্যেক রাজাকেই কথঞ্চিৎ নিয়ন্ত্রিতভাবে চলিতে হইত। কেবল শক্তি থাকিলেই কাহাকে উৎপীড়ন করা চলিত না। কৌটিল্য বলিয়াছেন (৭, ১৩), যে ব্যক্তি ধার্ম্মিককে পীড়া দেয়, সে মিত্রগণেরও অপ্রিয় হইয়া থাকে এবং (৭, ১৬) যে ব্যক্তি যুদ্ধে বিপন্ন আশ্রয়প্রার্থীর প্রতি অত্যাচার করে, অসন্তুষ্ট মণ্ডল তাহার উচ্ছেদের জন্ম চেষ্টিত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, কোন রাজা অন্যায় আচরণ করিলে মণ্ডলস্থিত অপর রাজগণ তাহাতে বাধা দিত এবং ঐ ভয়েই তাহাকে তাদৃশ আচরণ হইতে বিরত থাকিতে হইত। এরূপ অবস্থায় মণ্ডলের গঠন-প্রণালী হইতেই সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, মণ্ডলস্থ রাজ্যগুলি সর্ব্বদা যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিত।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা

খুলনা জেলার মাঝির ভাষা*

নিম্নে খুলনা জেলার মাঝিদিগের ব্যবহৃত কথাগুলি দেওয়া গেল। বাঙ্গলার মাঝিমাল্লারা যে ভাষায় কথা বলে,—যে সকল পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করে, তাহাদিগকেও ভাষায় স্থায়ী আসন দান না করিলে আমাদের মাতৃভাষা কিছুতেই পূর্ণাঙ্গ লাভ করিতে পারিবে না।

এ স্থলে ইহাও বলা উচিত যে, খুলনা জেলার মাঝিমাল্লারা অনেকেই ফরিদপুর বা তৎসন্নিহিত স্থান হইতে আগত। উচ্চারণের পার্থক্য ব্যতীত স্থানীয় মাল্লাদিগের সহিত সামান্য একটু ভাষাগত পার্থক্যও তাহাদের আছে। কিন্তু সে পার্থক্য বড় বেশী নহে। স্থানীয় হিন্দু ও মুসলমান মাঝিদিগের ভিতরও একটু ভাষাগত স্বাতন্ত্র্য আছে। কিন্তু ইহাও সামান্য মাত্র।

মাঝিদের ভাষার উচ্চারণও যথাসম্ভব তাহারা যেরূপ ভাবে উচ্চারণ করিয়া থাকে, সেইরূপ ভাবেই লিখিত হইল। পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যস্থলে অবস্থিত খুলনার উচ্চারণ কতকটা পূর্ব্ববঙ্গের মত, আবার কতকটা পশ্চিমবঙ্গের মত। আবার অনেক স্থলে তাহার উচ্চারণে একটা স্বাতন্ত্র্যও আছে। যথা,—কেডা (কে), যা'বানে (যা'বখন), ধানডুন, চালডুন্ (এগুলি পূর্ব্ববঙ্গের অনুরূপ; 'ডুন্' ত সম্পূর্ণ পূর্ব্ববঙ্গীয়); কিন্তু খা'চ্ছিল, যা'চ্ছিল, সকল সময় ঠিক পশ্চিমবঙ্গের মতন, যদিও 'টান্'টা ভিন্ন। আবার 'ভাত'কে খুলনাবাসী ঠিক পূর্ব্ববঙ্গীয়ের মত 'বাত'ও বলে না বা পশ্চিমবঙ্গের মত 'ভাত'ও বলে না। তাহার 'ভ'এর উচ্চারণ অনেকটা 'ব' ও 'ভ'এর মাঝামাঝি। এরূপ দৃষ্টান্ত আরও আছে।

শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের উচ্চারণ অনেকটা অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের অনুরূপ; কিন্তু তাহা কৃত্রিম,—অনুকরণজাত। চন্দ্রবিন্দুর উচ্চারণ করিতে তাঁহারাও এখন অভ্যস্ত হন নাই।

শব্দ — প্রতিশব্দ

নাও বা লাও—নৌকা। যথা :—এ নাওখান কা'র?

দাড়্—দাঁড়।

বোঠে—বৈঠা। যথা :—বোঠে না বাতি পারিস্ ত হাটুরে নায় আসিস্ কেন?

হাল—হাল।

চোড়্ বা লগি—একটা লম্বা ও সরু বংশদণ্ড। তীরের নিকট অল্প জলে নৌকা চালাইতে হইলে ইহার সাহায্য লওয়া হয়। যথা :—তাড়াতাড়ি যা'তি চাও ত লগি খোচাও (বা লগি ঠেল।)

বাদাম—পাল। যথা :—এমন বাতাসে বাদাম না খাটাবি ত কবে খাটাবি?

মস্তল—মাস্তল।

ছৈ বা ছাপ্পড়—নৌকার উপরের ছাউনি। যথা :—আমার এ নতুন ছৈ, বাবু, এক ফুটও জল পড়্‌বে না।

ফুকোর—জানালা।

পাটাতন—নৌকার ভিতরকার তক্তার আচ্ছাদন।

খোল—নৌকার 'ফ্রেম' ও তক্তার আচ্ছাদনের মধ্যের শূন্য জায়গা।

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ত্রিংশ বার্ষিক, দশম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

শব্দ	প্রতিশব্দ	শব্দ	প্রতিশব্দ

ভরা খোল—নৌকার খোলের ঠিক মাঝ-খানটা, অর্থাৎ ফ্রেমের ভিতর দিকের মধ্যস্থল।

গোলোই—নৌকার ঠিক অগ্রভাগের ত্রিভুজাকৃতি কাষ্ঠখণ্ড। যথা:—গোলোইত্তি পা দিয়ে ওঠ্‌বেন (উঠিবেন) না, বাবু।

শড়া—দাঁড় নৌকার সহিত বাঁধিয়া রাখিবার জন্য তাহার মধ্যস্থলে যে মোটা দড়িটার বাঁধন দেওয়া হয়, সেই দড়িটা।

দাড়ের পাতা—জলের ভিতরে দাঁড়ের যে চেপ্টা তক্তাখানি থাকে। যথা,—পাতায় জল পায় না, কেমন দাড় বা'স ?

টাবুরে নাও—ছোট নৌকা, সাধারণতঃ একজন মাঝিতেই চালায়।

ডিঙ্গি নাও—আরও ছোট নৌকা; সাধারণতঃ মৎস্যব্যবসায়ীরা ইহাতে করিয়া মাছ লইয়া হাটে হাটে বিক্রয় করিয়া বেড়ায়।

ডোঙ্গা—সাধারণতঃ তালগাছের কাণ্ডে নির্ম্মিত হয়। আকারও নৌকার মত নহে।

পাতাম নাও—যে নৌকার তক্তাগুলি পাশাপাশি রাখিয়া, এক প্রকার চেপ্টা পেরেক দ্বারা আবদ্ধ।

খিলেম নাও—ইহার একখানা তক্তার মুখের এক পাশের খানিকটা চাঁচিয়া ফেলিয়া, অন্য তক্তাটীও সেইরূপ করিয়া, কাঠের খিল দিয়া আবদ্ধ।

তেকা'ঠে নাও, পাচকা'ঠে নাও—গঠনের বিশেষত্ব অনুযায়ী।

ছ্যাওট—জল সেচনের পাত্র।

(নৌকা) ভিড়োনো—নৌকা তীরে লাগান। যথা—এই ঘাটে নাও ভিড়োও, মাঝি।

গুণ—গুণের দড়ি। যথা:—গুণ টানার সময় দেখ্‌ত্তি (দেখ্‌তে) হয় যে, গাছে বাধে, কি কিসি (কিসে) বাধে ?

পান্‌সী—বড় নৌকা।

ছিপ্ বা হাটুরে নাও—সরু অথচ খুব লম্বা নৌকা; খুব দ্রুতগামী। ইহাতে চড়িয়া ব্যবসায়ীরা হাট করিয়া থাকে।

খেয়া—খেয়া নৌকা।

ভাওয়ালে বা বোট—ধনীদিগের ব্যবহারোপ-যোগী নৌকা।

বজরা—প্রকাণ্ড বড় নৌকা; ইহাতে করিয়া ব্যবসায়ীরা মাল-পত্র চালান করিয়া থাকে।

পাড়ি দেয়া—এড়োএড়ি ভাবে নদী পার হওয়া।

চল্‌ত্তি নাও—চলন্ত নৌকা।

গাঙ—নদী।

জোয়ার—জোয়ার।

ভাটি—ভাঁটা।

উজোন—উজান।

গোণ—অনুকূল স্রোত।

উজোনো—স্রোতের প্রতিকূলে যাওয়া।

ভাটোনো—ভাঁটার টানে ভাসিয়া যাওয়া। যথা,—নাও ভাটোলো যে।

বান—বন্যা। যথা,—এবার গাঙে বান ডাহিছে।

একটানা—বর্ষাকালে নদীর স্রোত একমুখেই বহিয়া থাকে, তাহাকেই একটানা কহে। যথা:—সমস্ত বর্ষাডা গাঙে একটানা থাকে।

তোড়—স্রোতের প্রাবল্য।

কূল বা কেনারা—নদীর তীর।

ভাঙ্গন—কূল নদীতে ভাঙ্গিয়া যাওয়া। যথা:—এবার পশ্চিম দিকে ভাঙ্গন ধরিছে।

শব্দ	প্রতিশব্দ

কানাল—গভীর স্রোত; সাধারণতঃ ভাটার দিকে।

বাঁক—নদীর বাঁক।

তিরমুনি—ত্রিমোহানা।

গোলা—ঘূর্ণাবর্ত্ত।

ভ্যাম্‌তা—নদীর মোড়।

খোচ—ছোট ছোট বাঁক।

ঠোটা—অনেকটা অন্তরীপের মত; যে স্থানের তীরভূমি অনেকটা ত্রিভুজের আকৃতিতে নদীর ভিতর দিকে আসিয়া পড়িয়াছে।

চর—নদীগর্ভোত্থিত তীরভূমি।

লোণা—লবণাক্ত।

স্নায়ভাটি বা সারভাটি—শেষ ভাঁটা; যখন স্রোতের বেগ অত্যন্ত অধিক হয়।

ভা'ল ফিরোনো—নৌকার মুখ ফিরাইয়া গতি পরিবর্ত্তন করা।

ভক্—বৃষ্টি (সাধারণতঃ মুসলমানদিগের ভাষা)।

তুভোন্—তুফান।

ম্যাঘ—মেঘ।

ঝড়—ঝড়।

শব্দ	প্রতিশব্দ

ভাড়া—ভাড়া। [ভাড়া পাওয়াকে মাঝিরা সাধারণতঃ ভাড়া বাঁধা কহে। যথা,—ভাড়া বাঁধ্‌তে পারিছিস্‌ ভাই ?]

মুহোড় বাতাস—প্রতিকূল বাতাস।

পিঠেম বাতাস—অনুকূল বাতাস।

মাঝি—যে হাল ধরে।

মাল্লা—দাঁড়ি বা অন্যান্য সকলে।

চড়নদার—পুরুষ যাত্রী।

শোয়ারি—স্ত্রী-যাত্রী।

বাঁধ্‌লা—খালের বা নদীর মুখের বাঁধ।

পয়ান—খালের মুখে যে বাঁধ থাকে, তাহার স্থানে স্থানে বর্ষাকালে খালের ভিতর ঢুকিবার পথ থাকে। তাহার নাম পয়ান।

কাচি চর—নূতন মাটি পড়িয়া সম্প্রতি যে চর গঠিত হইয়াছে বা হইতেছে; কাঁচা চর।

ঘোলা—পলি। যথা,—এবার বানে প্রায় এক হাত ঘোলা ফেলিছে।

মোট মাটারি—যাত্রীর জিনিষ পত্র।

বা'র দেওয়া—নৌকাকে নদীর ভিতর (কূল হইতে) বাহির করিয়া আনা।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

নাথধর্ম্মে সৃষ্টিতত্ত্ব *

নাথধর্ম্মের বহু তথ্যপূর্ণ 'অনাদিপুরাণ' বা অনাদিচরিত্র, 'হাড়মালা গ্রন্থ', 'যোগিতন্ত্রকলা' প্রভৃতি কয়েকখানি 'কলমীপুথি' আমাদের হস্তগত হইয়াছে। প্রথম দুইখানি বহি 'খাইবায়', 'তজিনু', 'ব্রন্ম', 'হৈআ' প্রভৃতি শিশু বাঙ্গালা ভাষার অলঙ্কারে ভূষিত। 'যোগিতন্ত্রকলা'র ভাষা সংস্কৃত, তবে এ সংস্কৃতের ব্যাকরণ রচনা করিতে পাণিনিও একটু প্রমাদে পড়িবেন। বহিগুলি কখন্ ও কাহার দ্বারা লিখিত, বলা যায় না; তবে প্রত্যেক বহির শেষে লেখা আছে, ঐগুলি অন্য বহির নকল এবং পুথিলেখক "যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং" বলিয়া রচনাতে কোনও ভুল ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন। 'যোগিতন্ত্রকলা' নিতান্ত আধুনিক বলিয়া মনে হয়। উহাতে নাথযোগি-গণের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে বহু কথা লিখিত আছে।

সৃষ্টির পূর্ব্বে কি ছিল, এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রুতি ও বাইবেলে যাহা লিখিত আছে, নাথধর্ম্ম ইহার চেয়ে বিশেষ অধিক কিছু বলে নাই। প্রথমে শুধু 'নৈরাকার রাত্রি' ভিন্ন আর কিছুই ছিল না।

তখন— "নাই আদ্য অনাদ্য না ছিল ধর্ম্মেশ্বর।
না ছিল বর্ম্মা বিষ্ণু শিব গজেশ্বর॥
না ছিল চন্দ্র সূর্য্য শর্গে ইন্দ্রশর।
না ছিল আকাশ পাতাল ধরণী পবন॥
না ছিল অগ্নি পানি না ছিল হুর্ত্তাসন।
না ছিল দরিয়া সাগর কুলাকুল॥ †

কিন্তু সেই 'নৈরাকারে'র মধ্যে একজন ছিলেন, তাঁর আদি অন্ত, 'রূপ রেখ' নাই, তিনি "উদয় না হইছে না জাইব অস্ত।" কিন্তু তিনি সমস্ত স্থান ব্যাপিয়া আছেন, তিনি পরম গুণবান্, তিনি সকলের কর্ত্তা, সকলের দাতা এবং 'সমাই'কের পালক। তিনি 'সর্ব্বসৃষ্টিকর্ত্তা' ও 'সর্ব্ব-সংহারক'। কিন্তু তিনি কে? তাঁর নাম কি? "শেই অলেকনাথ আছয়ে শুশ্বর।"

শ্রুতিতে ঈশ্বর ইচ্ছা করিলেন,—সৃষ্টি হউক, আর সৃষ্টি হইয়া গেল। বাইবেলে পরমপিতা বলিলেন,—আলো হউক, আর আলো হইয়া গেল। অনাদিপুরাণেও—

"হেনকালে অলেকনাথ করিলেক মন।
সত্যজুগ শৃজিতে মনে হইল য়েইখন॥"

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৩১শ বার্ষিক, ১ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

† আমার প্রথম ইচ্ছা ছিল, বানানগুলি যত দূর সম্ভব, সংশোধিত করিয়া দিব। কিন্তু তাহাতে আমার অনেক সাহিত্যিক বন্ধু আপত্তি করেন। তাঁহারা বলেন, মূলে যেরূপ লেখা আছে, তাহাই যথাযথভাবে প্রকাশ করা উচিত।—লেখক।

শ্রুতিতে 'নৈরাকার রাত্রি'র গভীর অন্ধকার দূরীকরণার্থ প্রথমে আলো, আর বাইবেলে প্রথম জল এবং পরে আলো সৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু নাথধর্ম্মে প্রথমে সত্যযুগ সৃজন করিয়া অলেকনাথের সৃষ্টি করার পক্ষে কি সুবিধা হইল, অনাদিপুরাণ সে বিষয়ে কিছু বলেন নাই। তারপর অলেকনাথ "ইচ্ছা হনে 'অনাদ্য' সৃজিলা আচম্বিতে।" তাঁহার ইচ্ছা, 'অনাদ্যে'র উপর সৃষ্টি নির্ম্মাণের ভার অর্পণ করিবেন। অনাদ্যকে সৃজন করিয়া অলেকনাথ "নৈরাকার রাত্রি হনে দিবস নিকাশিলা" ও "সাত দিবসের নাম নির্ণয় করিলা।" প্রথম বারের নাম সোমবার, সেই দিন অনাদ্যির জন্ম হইয়াছিল। 'অনাদ্য' বা 'অনাদিধর্ম্মনাথ' সৃষ্ট হইয়াই 'বলে মুই মুই।' ইহাতে অলেকনাথ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন,—

"মুই মুই করি কর বড় দাপ।
অখনে সৃজিছি তরে আমি তর বাপ॥"

এই অভিযোগের বিরুদ্ধে অনাদিরও বলিবার অনেক ছিল,—

"অনাদি বলয়ে প্রভু সৃজিলা আমারে।
কিরূপে আছয়ে কথা না দেখি তুমারে॥
হেটে চাইলু স্থল নাই উপরে নাই কেঅ।
ধরিবারে লক্ষ নাই পুজিবারে দেয়॥"

'হাড়মালা' গ্রন্থেও ঠিক একইরূপ কথা আছে। তবে সেখানে 'অলেকনাথ' নয়, তিনি 'নিরঞ্জন গোঁসাই'। তিনি প্রথমে সত্যযুগ সৃজন করিবার প্রয়োজন দেখেন নাই। তিনি প্রথমেই—

"মনেতে ভাবিয়া দেব চাহে চারিভিতে।
হেনকালে অনাদি জন্মিলা আচম্বিতে॥" *

সে যাহা হউক, অনাদির উত্তরে অলেকনাথ বা নিরঞ্জন গোঁসাই সন্তুষ্ট হন নাই। তিনি কোথায় থাকেন, বলিয়া দিলেন—"শূন্যরূপে থাকি আমি শূন্যে অধিষ্ঠান।" (হাড়মালা)। কিন্তু কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া অহঙ্কার করার সমর্থন তিনি করিতে পারিলেন না। তিনি যারপর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া গিয়াছেন। অহঙ্কারের ক্ষমা নাই, তিনি অনাদিকে শাপ দিয়া ফেলিলেন;—

"শিদ্ধি না হইল পিণ্ড পড়িব তুমার॥
সৃষ্টি সৃজিবাঅ তুমি বড় দুক্ষ পাইআ।
তাকে সংহারিব আমি শিবরূপ সৃজিআ॥
শিবরূপে য়েকজন করিমু সৃজন।
আদ্যিরূপ শক্তি দিআ করিমু সংহারণ॥"

---

* হিন্দুস্থানী নাথ যোগিগণের নিকট নিম্নলিখিতরূপ সৃষ্টির ইতিহাস শুনিতে পাওয়া যায়,—'জলাময় রহে সব মহী এসংসারা, স্থাবর জঙ্গম মহী একাকারা, আদি মহাপুরুষকো জন্ম, মহাজন্ম ভবগোস্বামী আপে নিরঞ্জন। মহাকায় শরীর জলমে ভাসে, ফিরে গোস্বামী তিন অর্বুত বৎসর, এসা সময়মে প্রভুকো মুখমে উঠে হাইতি, তিস্‌মে জনম লিয়ে উলুপক্ষী মোহ ভাই। ধ্যান ভাঙ্গনেছে নিরঞ্জন আঁখ খেলকো চাঁহিয়ে, সম্মুখমে উলুপক্ষী দেখনেকো পাইয়ে।' ইত্যাদি।

হাকন্দাশ গ্রন্থে নিরঞ্জন গোঁসাই 'শিবরূপ শৃজিআ' সংহার করেন নাই, সংহার করিবার জন্ত তিনি 'কাল' সৃজন করিয়াছেন। অলেকনাথ শাপ দিয়া অনাদিকে "আপে জুগ আপে জোগি আপে শাপ ধ্যাই" প্রভৃতি তত্ত্বকথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলে, অনাদি তপ আরম্ভ করিলেন এবং কি দিয়া তিনি সৃষ্ট হইয়াছেন, জানিবার জন্ত অলেকনাথকে অনুনয় করিতে লাগিলেন। অলেকনাথ পুনর্ব্বার আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে 'ব্রহ্মনাম ব্রহ্মতত্ত্ব'ও শুনাইয়াছিলেন। অনাদিনাথ—

"য়েতেক শুনিয়া বলইন নাথের চরণে।
শূণ্যেতে রহিল বলিয়ে তোমারো স্থানে॥
শূণ্যে শৃজিলায় প্রভু তুমার গোচর।"

এই কথা শুনিয়া অলেকনাথ মুখ হইতে অমৃত ছাড়িলেন আর সেই অমৃত হইতে স্থল সৃষ্ট হইল। অনাদিনাথ সেই স্থলের উপর আসন করিয়া বসিলেন। তারপর অলেকনাথ নিজের দেহের শক্তি হইতে 'কাকেতুকা' দেবীকে সৃজন করিলেন। কাকেতুকা দেবী অনাদির 'পদান্তর' সহ্য করিতে না পারিয়া মরিয়া গেলেন। তখন অলেকনাথ এই অবস্থা দেখিয়া, মনে মনে কল্পনা করিয়া 'অজেরোধ্বল (?) হনে' গঙ্গার সৃষ্টি করিলেন ও অনাদির জটার মধ্যে তাঁহাকে স্থাপন করিয়া, অন্তরীক্ষ হইতে ডাকিয়া অনাদিকে বলিলেন,—

"আদি দেবি শৃজিছি তুমার লাগি শক্তি।
গঙ্গা দেবি শৃজিছি আদির অঙ্গে গতি॥
আদিয়ে অনাদ্যিয়ের শৃষ্টি নির্ম্মিছি।
দুইয়ে মিলি শৃষ্টি কর আপনার ইছি॥"

সৃষ্টি করার ভার অনাদির উপর অর্পণ করিয়া অলেকনাথ চলিয়া গেলেন। আমরা আরও দেখিতে পাইব, সৃষ্টিকার্য্যে অনাদি যখন একটু গণ্ডগোলে পড়িয়াছেন, তখনই অলেকনাথ আসিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছেন। এরূপ সৃষ্টিকার্য্য আপাততঃ নষ্টিক (Gnostic) দর্শনের মতানুযায়ী বোধ হইতেছে। *

অলেকনাথের কৃপায় কাকেতুকাদেবী ওরফে আদিদেবী জীবিতা হইলেন, এবং আদি অনাদি মিলিয়া সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমে আকাশ সৃষ্ট হইল, আকাশে ইন্দ্র রাজা হইলেন। তারপর চন্দ্র সূর্য্য সৃষ্ট হইল, সূর্য্যে লালবর্ণ দেওয়া হইল। তারপর বাসুকি-ও পাতাল সৃজন করা হইল, বাসুকিকে পাতালে স্থান দেওয়া হইল এবং তাহার 'কটের উপর

* "—Some lesser God had made the world,
But had not force to shape it as he would,
Till the High God behold it from beyond
And enter it and make it beautiful"—Tennyson

তিন কুল (ত্রিকোণ ?)' পৃথিবী স্থাপন করা হইল। বিভিন্ন উপাদানে শ্বেতবর্ণ ও রক্তবর্ণ দুই প্রকার তারা সৃজন করা হইল।

"তবে ধর্ম্মে মুষ্টি কশাইআ চাইলা।
মুষ্টিতে ব্রহ্মা বিষ্ণু দুই মূর্ত্তি দেখিলা॥
তবে অনাদ্যে হস্তের মুষ্টি ফিরাইলা।
উর্দ্ধমুখ মহাদ্যেব তথায় দেখিলা॥
হস্ত হনে তিন পুত্র থইলা তিন স্থানে।"

"হাড়মালা"য় কিন্তু নিরঞ্জন গোঁসাই অনাদিকে শাপ দিয়া অন্তর্হিত হইলেই "শিবশক্তি বিদ্যমান" হইলেন ও হরি ব্রহ্মা তারপর সৃষ্ট হইলেন।

শ্রীযুক্ত তমোনাশ বাবু নাথধর্ম্মের শিবকে বৈদিক যুগের রুদ্র বা পৌরাণিক যুগের মহাযোগী শিব হইতে পৃথক্ ও কম ক্ষমতাশালী দেখিয়াছেন। আমরা কিন্তু নাথধর্ম্মের শিবকে বৈদিক বা পৌরাণিক যুগের শিব অপেক্ষা পৃথক্ দেখিলেও কম ক্ষমতাশালী দেখিতেছি না। অলেকনাথ অনাদিকে বলিতেছেন,—

"আমার অং (অঙ্গ ?) শিব অং জানিয় আপনে।
*　　*　　*　　*
শিব অং সিদ্ধি অং যেই অং তুমি।
তুমার নাম রাখিলাম অনাদ্যি ধর্ম্মনাথ।
শিবর নাম রাখিলাম ঈশ্বর আদিনাথ॥"

আমরা আরও দেখিতে পাইব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের মধ্যে শিবই খুব চালাক চতুর, বুদ্ধিমান্ ও ক্ষমতাশালী। তিনিই পিতার প্রিয়পুত্র ও পিতার আশীর্ব্বাদে তিনি ব্রহ্মা বিষ্ণুর গুরু হইয়াছিলেন।

অনাদিনাথ তিন পুত্রকে তিন স্থানে রাখিয়াছেন, আর তাহাদের খোঁজ নেন নাই। তাহারা তিনজন "চক্ষে না দেখে, কর্ণে না শুনে," এমতাবস্থায় "অম্বলভিতর" পড়িয়া রহিয়াছে। অনাদিনাথ আদিদেবীর সহিত পুত্রগণকে পরীক্ষা করিবার জন্য তাহাদের প্রত্যেকের কাছে গমন করিলেন। প্রথমে ব্রহ্মচারীর বেশে ব্রহ্মার কাছে গিয়া বলিলেন, তিনি পাঁচ দিনের উপবাসী, এবং 'অপুড়া পৃথিবী (?) দেয় ভুঞ্জনের ঠাই।" ব্রহ্মা ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, তিনি চক্ষেও দেখেন না, কর্ণেও শুনেন না, তিনি "অপুড়া পৃথিবী" কোথায় পাইবেন ? তাঁহার যদি চক্ষু কর্ণ থাকিত, তবে তিনি ব্রহ্মাগ্নি দিয়া ব্রহ্মচারীকে ভস্ম করিয়া ফেলিতেন। বৈষ্ণব-বেশে বিষ্ণুর কাছে গিয়া অনাদিনাথ একই প্রার্থনা করেন এবং প্রায় একইরূপ উত্তর পান। অতঃপর "মহাযুগেশ্বর"-বেশে শিবের নিকট গিয়া প্রার্থনা করিতেই,—

"রেত শুনিআ শিব যুক্তি করে মনে।
পিতা পরে কেহ নাই লয়ে মোর মনে॥"

এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি পিতাকে যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদন করিলেন,—

"তিন জটা আছে আমার শিরের উপর।
বন্দন ভুজন তথা করহ শর্ত্তর॥"

পুত্রের ব্যবহারে অনাদিনাথ সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে দৃষ্টিশক্তি লাভ করিবার গুপ্ত মন্ত্র ও কৌশল শিখাইয়া দিয়া গেলেন। শিব দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণ-শক্তি লাভ করিয়া, বিষ্ণু ও ব্রহ্মাকে ঐ সকল কৌশল শিখাইয়া দিলেন। তাঁহারা শিবকে গুরু ভজিয়া, অনাদি ধর্ম্মনাথের কৃপায় দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণ-শক্তি লাভ করিলেন, এবং অনাদি ধর্ম্মনাথকে 'আদেশ'* জানাইলেন।

তারপর অনাদিধর্ম্ম আদিদেবীর 'তনু' হইতে লক্ষ্মী, সাবিত্রী ও গৌরীদেবীকে সৃজন করিলেন এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবকে লইয়া "কুটেশ্বরে" গমন করিলেন। সেখানে অনাদিনাথের আদেশে শিব, আদিদেবীর মড়া তনুর কেশে কাঠ, মাথার খুলিতে ভাণ্ড ও দেহরস জলরূপে ব্যবহার করিয়া, নিজের শরীর হইতে "অগ্নি পানি নিকালিয়া", "চন্দ্রের গোলিতে" অন্ন পাক করেন এবং সমস্ত দেবগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করান। সমস্ত দেবগণের মধ্যে যিনি প্রধান, তাঁহাকে "শ্রীপত্রে" অন্ন দেওয়া হইল। শ্রীপত্রের অধিকারী নিজে অনাদিধর্ম্মনাথ। ভোজনান্তে শিব বলিলেন,—এখন অন্ন ভোজনান্তে সমস্ত দেবগণ সন্তুষ্ট হইয়াছেন, কিন্তু "পুনি কিরূপে হৈব অন্নের শ্রীজন।" তখন "অনাহেতু ভীমনাথে মারিলেক ছিটা," আর অন্ন সৃষ্ট হইয়া, পৃথিবীতে পড়িয়া, গাছ হইয়া উঠিল এবং তাহাতে ধান ধরিল। কিন্তু সে ধানে চাউল নাই, তখন—

"ধর্ম্মের আজ্ঞায়ে দেবি দুগ্ধ ছিটি দিলা।
চুচার মধ্যে দুগ্ধ ক্ষির বসিলা॥"

এখন অনাদিধর্ম্মনাথ, ব্রহ্মা বিষ্ণুকে একে একে গঙ্গা গৌরী বিবাহ করিতে আদেশ করিলেন, এবং তাঁহাদিগকে সৃষ্টির ঈশ্বর করিবেন ও ব্রহ্মজ্ঞান দিয়া অমর করিবেন বলিলেন। কিন্তু তাঁহারা সে আদেশ মানিলেন না। কারণ, গঙ্গা গৌরী তাঁহাদের "শাতমায়"। অতঃপর শিবকে গঙ্গা গৌরী বিবাহ করিতে আদেশ করা হইল। শিব 'ধর্ম্মের আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারি,' 'শাধি ব্রহ্মজ্ঞান' গৌরীকে 'কোলে' ও গঙ্গাকে 'শিরে' লইলেন। সন্তুষ্ট হইয়া অনাদি বর দিলেন, "অন্তকালে ব্রহ্মা বিষ্ণু ভজিবা তুমাতে।" অতঃপর শিবের বীর্য্য হইতে 'কুলনাথে'র জন্ম ও গৌরীর বীর্য্য হইতে 'বিন্দুবতী'র জন্ম হইল। ধ্যানে আজ্ঞা পাইয়া শিব, কুলনাথের সহিত বিন্দুবতীর বিবাহ দিলেন, এবং কুলনাথকে যোগধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া "শিব গোত্র, নাথ পৌদ্যত" দিলেন।†

---

* 'আদেশ' শব্দ দণ্ডবৎ অর্থে পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইত। বিশ পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বেও নাথযোগিগণের কোনও উৎসবাদিতে বহু লোক জড় হইলে, যিনি সভার লোক মিলিত হওয়ার পরে আসিতেন, তিনি সভার লোকজনকে মাটিতে পড়িয়া দণ্ডবৎ কিম্বা নমস্কারাদি না করিয়া "সমাইর (=সবার) পদে আদেশ" বলিয়া সভায় আসন গ্রহণ করিতেন।

† যোগিতন্ত্রকলামতে শিব বা অনাদি যোগিনীকে বিবাহ করেন, এবং আদ্যনাথের সঙ্গে বিন্দুবতীর বিবাহ হয়। এই বিবাহে ব্রহ্মা মন্ত্রপাঠক, শিব যাজক।

তারপর অনাদিধর্ম্ম, বিষ্ণুকে লক্ষ্মী ও ব্রহ্মাকে সাবিত্রী সমর্পণ করিয়া, অলক্ষিতে দক্ষিণ-সাগরে চলিয়া গেলেন এবং সেখানে আসনে বসিয়া, মনে মনে কল্পনা করিয়া এক অক্ষয় বটবৃক্ষ, এক গৃধিনী, 'জম্মেজয় রাজা' (যমরাজা ?) ও চিত্রগুপ্ত সৃজন করিলেন এবং বিভিন্ন অঙ্গের ঘর্ম্ম হইতে পবন, চন্দনবৃক্ষ প্রভৃতি সৃজন করিলেন। অক্ষয় বটবৃক্ষ হইতে তিন যুগের নিদর্শন-স্বরূপ তিন তাল জন্মিল; সত্যযুগের তালের উপর গৃধিনী বসিল। যমরাজকে বটবৃক্ষের নীচে বসাইয়া জম্বুদ্বীপের রাজা করিয়া দিলেন। পাপ পুণ্য বুঝিবার ভার চিত্রগুপ্তকে অর্পণ করিলেন এবং গৃধিনীকে চারি যুগের সাক্ষিস্বরূপ সে স্থানে স্থাপন করিলেন। তারপর তাঁহার জটার মল হইতে যে 'হরমুল বৃক্ষ' উৎপন্ন হইল, তাহার ফল ভক্ষণ করিয়া, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবকে সৃষ্টি স্থিতি সংহারের ভার দিয়া, অনাদিধর্ম্মনাথ অনন্ত-শয্যায় শয়ন করিলেন।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—পিতার অন্বেষণ করিতে করিতে দক্ষিণ-সমুদ্রের নিকট গিয়া, গৃধিনীর নিকট হইতে সমস্ত কথা জানিতে পারিলেন এবং তিন ভাই সাগরের কূলে বসিয়া ধ্যান আরম্ভ করিলেন। তখন অনাদি, মৃত গরুর রূপ ধরিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণুর নিকট ভাসিতে ভাসিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন ব্রহ্মা বিষ্ণু উভয়েই ঘৃণাভরে ধ্যান হইতে উঠিয়া পলায়ন করিলেন। মৃত গরু যখন শিবের নিকট উপস্থিত হইল, তখন শিব চিন্তা করিলেন, এরূপ প্রাণী এখনও পর্য্যন্ত সৃষ্ট হয় নাই, ইহা নিশ্চয়ই পরমপিতার লীলা—এই ভাবিয়া জলে সাঁতার দিয়া গিয়া তিনি সেই গো-মূর্ত্তিকে ধরিলেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু ইহা দেখিয়া, শিবকে নিন্দা করিয়া চলিয়া গেলেন। অনাদিধর্ম্ম, তখন তিন ভাই কিরূপে তাঁহার সৎকার করিবেন, তাহা বলিয়া দিলেন—ব্রহ্মা বিষ্ণুর আচার "ভাশা পুড়াগাড়া" এবং শিব গর্ত্ত খুঁড়িয়া, আসনে বসাইয়া সমাধি করিবেন। শিব পিতাকে সমাধিস্থ করিয়া, ব্রহ্মা বিষ্ণুকে সেখানে লইয়া আসিলেন, তাঁহারা এখন পিতার দেহ দেখিতে পাইলেন, এবং শিবের নিকট হইতে শুনিয়া, পিতৃ আদেশমত তাঁহার সৎকার করিলেন।

অনাদিকে যখন দাহ করা হইল, তখন তাঁহার নাভি ভস্মীভূত হয় নাই। উহা জলে ভাসাইয়া দেওয়া হয় এবং রাঘব উহা ভক্ষণ করে। তারপর—

"রাঘবের পেট ফাটি মীন নিকলিলা।
নাভি হনে মিননাথ জন্ম হইলা॥" *

---

* মীননাথের জন্ম সম্বন্ধে অন্যত্র অন্যরূপ উল্লেখ আছে। গণ্ডযোগে এক ব্রাহ্মণের এক পুত্র জন্মে। পুত্র মা-খেকো হবে, এই আশঙ্কায় ব্রাহ্মণ তাহাকে জলে নিক্ষেপ করেন এবং রাঘব তাহাকে ভক্ষণ করে। যখন মহাদেব পার্ব্বতীর—

"তুন্মি কেনে তর গোসাঞি আন্মি কেনে মরি।
হেন তত্ত্ব কহ দেব জোগে জোগে তরি॥"—গোরক্ষবিজয়

এইরূপ প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য ক্ষীরোদসাগরে মনোহর টঙ্গিতে বসিয়া পার্ব্বতীকে যোগশাস্ত্রের গূঢ়তত্ত্ব বলিতেছিলেন, তখন—

"মাৎস্যরূপ ধরি তথা মীনমোচন্দর।
টঙ্গির লাবাতে রহে যোগাল হন্দর॥"—গোরক্ষবিজয়। (পর পৃষ্ঠে)

অনাদির পেট কাটিয়া চৌরঙ্গী* সিদ্ধার জন্ম হইল। অস্থির আলের তেজ হইতে জালন্ধরি-সিদ্ধা, কর্ণ হইতে কর্ণকাটি বা কানিফা, চর্ম্ম হইতে চর্মনাথ, ধূম্র হইতে ধূম্রনাথ, পা হইতে পাগ্‌লনাথ, নাভিস্থল হইতে নারদ প্রভৃতি অষ্টসিদ্ধা ও নবনাথের জন্ম হইল এবং—

"শ্রীগুলি ফুটি নিকলিছইন শ্রীনাথ।
অনন্তকুটি সিদ্ধার গুরু শ্রীগোরক্ষনাথ॥"

অনাদির চক্ষু ফুটিয়া পৃথিবীতে পড়িল এবং তাহা হইতে রুদ্রাক্ষবৃক্ষের জন্ম হইল। যোগিতন্ত্র-কলামতে অনাদির মস্তক হইতে গোরক্ষনাথের জন্ম হয় † এবং তাঁহার মুখ হইতে দাহননাথ, হৃদয় হইতে মেঘনাথ, নাভি হইতে পিণকনাথ, জঙ্ঘা হইতে উদ্ধারনাথ, জানু হইতে পাগলানাথ, বাহু হইতে ভূকটিনাথ, গুহ্য হইতে সত্যনাথ এবং চরণ হইতে বিন্দুনাথের উৎপত্তি হয়। তাঁহার হাড় হইতে হাড়িপা ও চর্ম্ম হইতে চৌরঙ্গী সিদ্ধার জন্ম হয়।

গোরক্ষনাথের জন্ম অনাদির অঙ্গ হইতে হইলেও তিনি অন্যান্য সিদ্ধার মত নহেন, তিনি অলেকনাথের স্বরূপ। অলেকনাথ অনাদিকে বলিতেছেন,—

"যেই কালে তুমার অং (অঙ্গ ?) আমি ছুড়ি জাইবা।
তুমার শৃগুলি ফুটি আমি নিকলিবা॥
আমার নাম গুরু গোরক ধরিবা।
গুরু গোরক নামে শংষার তরাইবা।"

পিতার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া, শ্রাদ্ধাদি করিবার জন্য ব্রহ্মা বিষ্ণু কুটেশ্বরে চলিয়া গেলেন এবং শিব শ্মশানে বসিয়া তপ আরম্ভ করিলেন। তপে সন্তুষ্ট হইয়া তখন অলেকনাথের স্বরূপ গোরক্ষনাথ সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন এবং শিবকে ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, "নিলবেদ" ও "শোসম্বেদে"র ‡ তত্ত্ব বলিয়া দিয়া তাঁহাকে শ্মশানের মাটি খুঁড়িতে আদেশ করিলেন।

এবং পার্ব্বতী যখন নিদ্রালসা হইয়া অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন, তখন ঐ বালক রাঘবের পেট হইতে "হুঁ হুঁ" বলিয়া শিবের কথার উত্তর দিতেছিল। তখন মহাদেব তাহাকে ধরিয়া ফেলেন এবং রাঘবের পেট চিরিয়া বাহির করেন।

* চৌরঙ্গী—হাড়িপা কানুপার সমসাময়িক একজন সিদ্ধা। বিশ্বকোষকারকের মতে এই সিদ্ধার নাম হইতে কলিকাতার চৌরঙ্গী রোডের নাম হইয়াছে। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, এই নাথসিদ্ধা কলিকাতার কালীঘাটের কালীর স্থাপক ও পূজক ছিলেন। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সন্নিকটে কোথায় নাকি তাঁহার আশ্রম ছিল।

† একখানি কলমী পদ্মাপুরাণে আছে—"মাথা ফুটি বাহির হইলা শ্রীগোলকনাথ।" গোলক স্থানে খুব সম্ভব গোরক্ষ হওয়া উচিত ছিল।

‡ আমরা এতকাল চারি বেদের কথাই জানিতাম। কিন্তু যোগিতন্ত্রকলা ও অনাদিপুরাণে নিলবেদ ও শোসবেদ নামে আরও দুইখানা বেদের উল্লেখ পাই। বহু অনুসন্ধান করিয়াও এই বিষয় অন্য কোনও বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। যোগিতন্ত্রকলা ও বেদমালা নামক আর একখানা ক্ষুদ্র পুথিতে নিম্নলিখিত বিবরণ পাইলাম,—

মাটি খুঁড়িয়া শিব যে সমস্ত বস্তু পাইলেন, তদ্দ্বারা গোরক্ষনাথ শিবকে নানারূপ অঙ্গ-ভূষণ প্রস্তুত করিয়া দিলেন। অনাদ্যের রুধিরে গৈরিক বসন; নাভির দ্বারা কর্ণের কুণ্ডল, নাসিকা দ্বারা নাদ, মেরুদণ্ড দ্বারা হস্তের "দ্বাদশ" প্রস্তুত করিয়া দিলেন। তারপর শ্মশানের ভস্মে সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত করিয়া, শিবের গলায় বাসুকিকে পৈতারূপে স্থাপন করিলেন এবং তাঁহার মস্তকে নিজ মস্তকের লাল টুপী * পরাইয়া দিলেন এবং রুদ্রাক্ষের মালা কণ্ঠে তুলিয়া দিলেন। গোরক্ষনাথ শ্মশানের ভস্ম হইতে "ভস্ম্যা" (বৃষ ?) সৃজন করিলেন এবং শিব সেই বৃষে চড়িয়া কুটেশ্বরে গমন করিলেন।

প্রথমে ত্রিরাত্র শ্রাদ্ধ হইল। এই শ্রাদ্ধে গোরক্ষনাথ অলক্ষিতে থাকিয়া পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। তারপর একাদশ দিবসে পুনর্ব্বার শ্রাদ্ধ হয়। এই শ্রাদ্ধেও গোরক্ষনাথ স্মরণমাত্রে "শ্রীকবিলাশ" হইতে আসিয়া পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন এবং ইন্দ্র, যম প্রভৃতি সমস্ত দেবগণ, চৌরঙ্গী প্রভৃতি অষ্ট সিদ্ধা, রাগ রাগিণী, বাসুকি, গৃধিনী পক্ষী প্রভৃতিকে আনিয়া শ্রাদ্ধে উপস্থিত করিয়াছিলেন। গোরক্ষনাথকে শিব ভিন্ন অন্য কেহ দেখিতে পাইতেন না। শ্রাদ্ধ হইতেছে, কিন্তু পুরোহিত নাই দেখিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু, শিবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—

"বাপের জজ্ঞ করিতে ব্রাহ্মণ কেবা য়েতে।"

শিব তদুত্তরে বলিয়াছিলেন,—

"শ্রীগুরু গোরক্ষনাথ পুরইত য়েথাতে॥
হস্ত পদ নাই তার বিন্দু হংশ কলা।
আছয়ে জগত ভরি শমাইর দরশনে খেলা॥
বাপের জজ্ঞেতে নাথ পুরইত হৈলা।
তাহানে কেয় দেখিতে না পাইলা॥
কিঞ্চিৎ ধ্যানে শুন আমার সাক্ষাতে।
য়েতেক মর্ম্মভেদ কইলাম তুমাতে॥"

"সামবেদ যজুর্ব্বেদ অথর্ব্ববেদ ঋগ্বেদ আর।
নিল অনিল বেদ ষষ্ঠম বেদ সার॥"—যোগিতন্ত্রকলা।
"পঞ্চমুখী ব্রহ্মা এক মুখ কাটিয়াছে রুদ্র।
সেই মুখ হইতে হুসমনা বেদ উৎপন্ন॥"—বেদমালা।

এই দুই অদ্ভুতপ্রকৃতির নামবিশিষ্ট বেদদ্বয়ের বিবরণ যদি কেহ কোথাও পাইয়া প্রকাশ করেন, তাহা হইলে বাধিত হইব।—লেখক।

* নাদপৈতা আজকালও নাথযোগিগণ ধারণ করেন, এবং স্থানে স্থানে অধুনাও অনেকে লাল টুপী ও কুণ্ডল ব্যবহার করিয়া থাকেন। ফরাসী পর্য্যটক de la valleর,ভ্রমণ-কাহিনীতেও যোগীদিগের এই লালটুপী ও কুণ্ডলের উল্লেখ পাওয়া যায়।

"He (Yogiraj) had a golden bead hanging from his ear as big as a musket-bullet ; and had a little red cap like those worn by Italian-galley slaves." (J. Tal-boys Wheeler's A Short History of India, Burma and Nepal.) 116-117.

সে যাহা হউক, শ্রাদ্ধ হইয়া গেল, পিণ্ডের অন্ন শিব নিজ হস্তে রন্ধন করিয়াছিলেন। নিমন্ত্রিত-গণকে ভোজন করাইবার জন্য "ভাণ্ডেরার" সামগ্রী আনান হইল এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, সাবিত্রী, লক্ষ্মী, গঙ্গা ও ভগবতীকে আদেশ করিলেন,—

"তুমি চাইরে মিলি রন্ধন করউব্বা ইহাতে।"

অন্ন ব্যঞ্জন রন্ধন করা হইল, পুরোহিতকে এই অন্ন ব্যঞ্জনের অর্ঘ্য দেওয়া হইল। অতঃপর নিমন্ত্রিতগণকে তৃপ্তির সহিত ভোজন করান হইল এবং তারপর সকলে স্ব স্ব স্থানে স্ব স্ব কর্ম্মে প্রস্থান করিলেন।

অনাদিপুরাণ প্রভৃতিতে বর্ণিত নাথধর্ম্মে সৃষ্টিতত্ত্ব ও সৃষ্টির ইতিহাস এই। এখন সৃষ্টি ত হইল। সৃষ্টির একদিন ধ্বংস হইবে, কিছুই থাকিবে না। তখন—

"পৃথিবী মিশাইব আবে, আব মিশাইল রবিতে।
রবি মিশাইল বায়ে বায় মিশাই আকাশেতে॥
কলসী ভাঙ্গিলে জেন মীশাইব আকাশে।
আকাশ ভাঙ্গিলে জাইব মহা আকাশে॥
রবি ভাঙ্গিলে জাইব তেন অভিপ্রায়ে।
শরূপ মিশাইব তেন নাথগুরুর পায়ে॥"

শ্রীরাজমোহন নাথ

—o—

"নাথধর্ম্মে সৃষ্টিতত্ত্ব" প্রবন্ধের আলোচনা *

ডাঃ শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়ুয়া এম্ এ, ডি লিট মহাশয় বলিলেন,—

প্রবন্ধ-লেখক শ্রীযুক্ত রাজমোহন নাথ অনাদি-পুরাণ, হাড়মালাগ্রন্থ ও যোগিতন্ত্রকলা নামক তিনখানি গ্রন্থের হস্তলিখিত পুথি অবলম্বন করিয়া, নাথধর্ম্মের সৃষ্টিতত্ত্ব নিরাকরণ করিতে গিয়াছেন। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে একখানি সংস্কৃতে ও অপর দুইখানি বাঙ্গালায় লিখিত হইয়াছে। ইহাদের রচনাকাল জানা যায় না। প্রত্যেক পুথির 'নিমগন' বা সমাপ্তি অংশে 'যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং' উক্তি আছে দেখিয়া মনে করিতে হয়, ইহা আজকালের, নিতান্ত আধুনিক সময়ের রচনা নহে। ইহাও নিশ্চিত যে, ইহা অতিশয় পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের রচনাও নহে। আমার বিশ্বাস, এই গ্রন্থগুলির মধ্যে সৃষ্টিতত্ত্ব বা cosmology বলিতে আমাদের যাহা বুঝা উচিত, ঠিক তাহা নাই; তন্মধ্যে কতকগুলি প্রাচীন সৃষ্টিতত্ত্ব, পৌরাণিক কাহিনী, উপকথা বা রূপকচ্ছলে সরল, সহজবোধ্য ও সাধারণ ভাষায় বর্ণিত আছে মাত্র। এই পৌরাণিক আধ্যাত্মিক কাহিনীর মূল অনুসন্ধান করিলে সর্ব্বাগ্রে ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের নাসদীয় সূক্তই আমাদের মনে পড়ে। বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বে আকাশ-বাতাস, মর্ত্ত্য-পাতাল, স্থাবর-জঙ্গমাদি বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝি, তাহা আদৌ ছিল না। চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারে আবৃত ছিল। অগাধ জলরাশি বা নিরাকারা বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে একমাত্র অলেখ প্রভু নিরঞ্জনই ছিলেন। তিনি জ্যোতির্ম্ময় ও আলোকস্বরূপ। তাঁহার দয়াতেই বিশ্বভুবনের সৃষ্টি হয়, জল স্থলের আবির্ভাব হয়, স্থাবর জঙ্গম উৎপন্ন হয়, মনুষ্য ও মনুষ্যসভ্যতার উৎপত্তি ও অভ্যুদয় হয়। আপাতদৃষ্টিতে নাসদীয় সূক্ত নাথসৃষ্টি-কাহিনীর প্রধান অবলম্বন হইলেও বস্তুতঃ ইহার মধ্যে অঘমর্ষণ, হিরণ্যগর্ভ, অনিল, ব্রহ্মণস্পতি, হিরণ্যগর্ভ ও বিশ্বকর্ম্মাদি সূক্তের উপদেশও বিদ্যমান আছে। শুধু তাহাই নহে। ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদাদি গ্রন্থের সৃষ্টিকথার প্রভাবও তন্মধ্যে যথেষ্ট আছে। আলোচ্য প্রবন্ধের উপসংহারে মোক্ষপ্রাপ্ত ব্যক্তির পরিণাম বর্ণনা-প্রসঙ্গে লেখক যে পদগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তন্মধ্যে স্পষ্ট উক্ত আছে—পৃথিবী জলে, জল রবি বা অগ্নিতে, অগ্নি বায়ুতে, বায়ু আকাশে এবং আকাশ মহাকাশে লীন হয়। একমাত্র অলেখ নিরঞ্জনই অবশিষ্ট থাকেন। সিদ্ধ নাথগুরুগণ মানব হইলেও তাঁহারা এবং প্রভু নিরঞ্জন স্বরূপতঃ একই।

প্রোক্ত নাথ সিদ্ধপুরুষদিগের মধ্যে গোরক্ষনাথই সকলের শীর্ষস্থানীয় শিরোমণি। প্রবন্ধের অবলম্বিত পুথির মধ্যে তাঁহাকে 'অনন্ত কুটি সিদ্ধার গুরু'রূপে প্রশংসা করা হইয়াছে। এই প্রশংসা নিরর্থক নহে। গোরক্ষনাথের আবির্ভাবকালে, পূর্ব্বে ও পরে আর্য্যাবর্ত্তে—বিশেষতঃ পূর্ব্বাঞ্চলে বহু নাথগুরু ও নাথপন্থী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বামাচারী ছিলেন, কেহ

---

* ১৫ই ভাদ্র ১৩৩১ তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রথম মাসিক অধিবেশনে এই প্রবন্ধ পাঠের পর যে সকল আলোচনা হয়, তাহাই দেওয়া হইল :—সম্পাদক।

দেহ যন্ত্রণার হইতে বিরত ছিলেন। তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মবাদী ছিলেন। সিদ্ধগণ সকলেই ঊর্দ্ধরেতা ছিল। দৈহিক ক্রিয়া ও ইন্দ্রিয়ভোগকে প্রাণায়ামাদি দ্বারা নিরুদ্ধ করিয়া অলেখ নিরঞ্জন আত্মার স্বরূপ দর্শন করাই তাঁহাদের সাধনার চরম লক্ষ্য ছিল। ন্যাসের স্থান অনুসারে নাথসিদ্ধগণ হাড়পা, কাণফা প্রভৃতি নামে বিশিষ্টতা লাভ করেন। গোরক্ষনাথের দৃষ্টি ব্রহ্মরন্ধ্রেই স্থাপিত ছিল। তিনি কামিনীকাঞ্চনমুক্ত ও অলৌকিক শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন। তিনি নাথ-ধর্ম্মের প্রভূত সংস্কার সাধনও করিয়াছিলেন। কদলীরাজ্যে কামিনী-কাঞ্চন-মোহে মীননাথের পতন হইয়াছিল সত্য। কিন্তু মীননাথ নিজে মিথুনবিরোধী ছিলেন। কাজেই তাঁহার পক্ষে গোরক্ষনাথের গুরু-হওয়ার অধিকার ছিল। আমার বিশ্বাস, গোরক্ষনাথের নামের ছায়ায় সকল নাথধর্ম্ম ও নাথ-সম্প্রদায়ের সমাবেশ হইয়া থাকিবে। পরে একই ভাবে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের নামের ছায়ায় বিভিন্ন-পন্থী বৈষ্ণবসম্প্রদায় সম্মিলিত হইয়াছিলেন। তথাপি চক্ষু থাকিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, এই সম্মিলন, সমাবেশ বা সমন্বয়ের অন্তরালে পূর্ব্ববিভিন্নতা এবং বৈশিষ্ট্যগুলিও বিদ্যমান আছে। নাথ-সৃষ্টিকাহিনীর ভিত্তি বৌদ্ধ সাহিত্য-দর্শন নহে। বৈদিক সাহিত্য বা বেদান্তই ইহার মূলে নিহিত আছে। বুদ্ধের আবির্ভাবের দুই তিন শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বাঞ্চল শৈব-জাতীয় বহু শ্রমণ ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের লীলাক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রাচীন বেদান্ত ও বৌদ্ধমতে ও বৌদ্ধমতের ভিত্তির উপর পরে বহু সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম ও সাধন-পন্থার সমাবেশ ও সংঘর্ষ হইয়াছিল। তন্মধ্যে অধিকাংশই এক ভাবে না এক ভাবে বৈদিক পরা বিদ্যার সহিত সংশ্লিষ্ট। তাঁহারা যাজক ব্রাহ্মণদিগের পৌরোহিত্য স্বীকার করিতেন না। ইহার আভাস আমরা বক্ষ্যমাণ পুথি-গুলিতে দেখিতে পাই। পিতৃযজ্ঞে বা পিতার শ্রাদ্ধকার্য্যে পুত্র ব্যতীত অন্য পুরোহিতের প্রয়োজন কি আছে? পুত্র ভিন্ন পিতার প্রতি অধিক শ্রদ্ধাবান্ আর কে হইতে পারে? গোরক্ষনাথের ধর্ম্মাদর্শমতে নাথসৃষ্টিকাহিনীতে পুরুষের সহিত প্রকৃতির সংযোগ থাকিতে পারে না; বাস্তবিক পক্ষে ইহার মধ্যে প্রকৃতিকে অলেখ নিরঞ্জনের পশ্চাতেই রাখা হইয়াছে। কিন্তু যখন কালক্রমে গৃহস্থগণ নাথধর্ম্মভুক্ত হইয়া পড়েন এবং পূর্ণভাবে নাথসমাজ বা church গঠিত হয়, তখন তাঁহাদের জীবনাদর্শের অনুযায়ী প্রকৃতি পুরুষ সংযোগাত্ম সাংখ্যভাবের অবতারণা করিতে হইয়াছে। সম্ভবতঃ এই সমাজ গঠন নাথধর্ম্মের আবির্ভাবের বহু বৎসর পরেই সম্ভব হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়ুয়া মহাশয় "নাথধর্ম্মে সৃষ্টিতত্ত্বের" সহিত ঋগ্বেদের সৃষ্টিতত্ত্বের সাদৃশ্য দেখাইয়া নাথধর্ম্মের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু ঋগ্বেদের সৃষ্টিতত্ত্ব, বিশেষতঃ পুরুষসূক্ত, প্রাচীন বলিয়া প্রতিপন্ন হয় নাই; সুতরাং ঋগ্বেদমূলক হইলে নাথধর্ম্মের সৃষ্টিতত্ত্ব অধিক পুরাতন হইতে পারে না। নাথধর্ম্ম বেদমূলক না হওয়াই সম্ভব। বেলুচিস্তানে, খাদারে ও গাতীতে এবং সিন্ধুদেশে, সেহ্‌বানে ও সক্করে মুসলমান নাথপন্থী আছে। সিন্ধুদেশে সনাতনপন্থী, শিখ ও হিন্দু নাথপন্থী আছে। ইহারা অনন্ত জ্যোতির উপাসনা করে এবং প্রদীপ

দিবারাত্রি জ্বালাইয়া রাখে। রাজপুতানার অলোয়ার রাজ্যের সেরিস্কা, ভর্ত্তরি ও ইন্দোর রাজ্যের হুমাখেড়ি নামক স্থানে নাথপন্থীদের আশ্রমে এইরূপ অনন্ত জ্যোতিঃ বা প্রদীপ দিবারাত্রি জ্বালাইয়া রাখা হয়। রাজপুতানা, মধ্যভারত ও গুজরাটের নাথপন্থীদের মধ্যে অগ্নি বা অনন্ত জ্যোতির উপাসনাই প্রবল। বেলুচিস্তান, সিন্ধু, রাজপুতানা, মধ্যভারত ও গুজরাটের নাথধর্ম্মে সাকার অগ্নির উপাসনার যে সাদৃশ্য আছে, তাহা বাঙ্গালার নাথপন্থীদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। পূর্ব্বদেশের অর্থাৎ বাঙ্গালার নাথধর্ম্ম শৈবধর্ম্মের প্রাবল্যের যুগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহা নাথগুরু গোরক্ষনাথের নব প্রতিষ্ঠান। বাঙ্গালা দেশের নাথপন্থীরা অনন্ত জ্যোতিঃ প্রজ্বালিত রাখে না। এই বিষয়ে পশ্চিম-ভারতের নাথধর্ম্মের সহিত পূর্ব্বভারতের বা বাঙ্গালার নাথধর্ম্মের সাদৃশ্য দেখা যায় না। পশ্চিম-ভারতের নাথধর্ম্মের সৃষ্টিতত্ত্ব অন্যরূপ; তাহাতে নিরঞ্জন কর্ত্তৃক অন্ধকার বা শূন্য হইতে অগ্নির বা আলোকের উৎপত্তির কথা আছে। সে উপাখ্যান পূর্ব্বদেশে শুনিতে পাওয়া যায় না। পশ্চিম-ভারতের নাথপন্থীরা বলে যে, উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভর্ত্তৃহরি নাথসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। সেই জন্য পশ্চিম-ভারতের নাথসম্প্রদায়ের গুরুগণ ভর্ত্তৃহরি বা ভর্ত্তরি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। নাথধর্ম্ম বৈদিক ধর্ম্ম অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু পূর্ব্বভারতের নাথধর্ম্ম গোরক্ষনাথ কর্ত্তৃক সংস্কৃত, ইহা আদিম নাথধর্ম্ম নহে।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন,—

আজ নাথধর্ম্ম সম্বন্ধে কতকগুলি নূতন কথা শুনিতে পাইলাম। শ্রীযুক্ত রাখালবাবু মুসলমান নাথপন্থীদের কথা বলিয়াছেন। মুসলমান নাথপন্থীদের কথা আমি পূর্ব্বে কিছুই জানিতাম না। আজ নূতন জিনিষ শেখা গেল। ‘প্রবাসী’তে আমি নাথধর্ম্ম সম্বন্ধে কয়েকবার আলোচনা করিয়াছি। সেই উপলক্ষে অন্যান্য স্থানের ন্যায় যোধপুরেও নাথধর্ম্ম সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। সেখানকার ‘দরবার লাইব্রেরী’তে ‘গোরখবোধ’ নামে একখানি পুঁথি দেখিতে পাই। তাহার সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে হাড়মালার সৃষ্টিতত্ত্ব মোটেই মেলে না। ইহার কারণ বোধ হয় এই যে, গোরক্ষনাথ যে একজনই ছিলেন, তাহা নহে। শঙ্করাচার্য্যের স্থলাভিষিক্ত শিষ্যেরা যেমন শঙ্করাচার্য্য নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন, সেইরূপ বোধ হয়, গোরক্ষের পরবর্ত্তী অনেক নাথসাধুও গোরক্ষনাথ নামে পরিচিত হইতেন। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। মহারাষ্ট্র দেশে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মারাঠী ভাষায় লিখিত ভাষ্য সমেত একখানি গ্রন্থ রচিত হয়—নাম ‘জ্ঞানেশ্বরী’। গ্রন্থকারের নাম জ্ঞানেশ্বর, গ্রন্থের রচনা ১২৯০ খৃষ্টাব্দ। এই পুস্তকে গোরক্ষনাথের নাম আছে, আরও লেখা আছে যে, জ্ঞানেশ্বর গোরক্ষনাথ হইতে শিষ্যপরম্পরায় চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। সুতরাং এ হিসাবে গোরক্ষনাথ দ্বাদশ শতকে আসিয়া পড়িতেছেন। নানক গোরখের তর্ক ব্যাপারও খুব প্রসিদ্ধ। এ ছাড়া গোরখনাথের সময় সম্বন্ধে বহু মতই প্রচলিত। এইরূপ নানা ব্যাপার দেখিয়া আমি সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, গোরক্ষনাথ একজন নন।

ইহাদের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ আছে। মত্তগোরক্ষসংবাদ, জ্ঞানসিদ্ধান্তযোগ, বিবেক-মার্ত্তণ্ড, মধনাথভক্তিসার—আরও অনেক বই আছে। এগুলি লইয়া বিশেষ সাবধানতার সহিত ইহাদের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে কথা বলিতে হইবে।

নাথেরা হঠযোগী। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মের সহিত মিশিয়া ইহাদের ধর্ম্ম অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহাদের গ্রন্থে বা মতে বৈদিক, বৌদ্ধ বা নানকপন্থী প্রভৃতি মতবাদ দেখিলেই যে সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, তাহাদের ধর্ম্ম বেদমূলক, বৌদ্ধমত-মূলক, তাহা নহে। এরূপ করিলে বরং আমরা ভুলই করিব। আমি নির্ব্বিবাদে বিলাতী মত অনুসরণ করিয়া বলিতে চাই না যে, পুরুষসূক্ত অপ্রাচীন। নাথধর্ম্ম বৈদিক ধর্ম্ম অপেক্ষা প্রাচীন, এ কথাও স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। রাখালবাবু বলিয়াছেন যে, নাথধর্ম্মের উৎপত্তি পশ্চিমে। কিন্তু বাঙ্গালায় যে নাথধর্ম্মের উৎপত্তি হয় নাই, ইহাও বলা যায় না। মীননাথ ও মৎস্যেন্দ্রনাথ, উভয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি এবং মৎস্যেন্দ্রনাথ একেবারে বাঙ্গালার লোক। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় মৎস্যেন্দ্র-নাথের 'কৌলজ্ঞানবিনির্ণয়' গ্রন্থ হইতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছেন যে, মৎস্যেন্দ্রনাথ বরিশালের চৈদোর লোক। জাতিতে কৈবর্ত্ত।

নাথেদের সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করিয়া, এইটাই যে নাথেদের সৃষ্টিতত্ত্ব, এরূপ বলিবার উপায় নাই। কালস্রোতে, স্থান ও গুরুভেদে নাথেদের সৃষ্টিতত্ত্ব নানাভাবে আলোচিত হইয়াছে। বিভিন্ন পুথি পাঠ করিয়া তাহার নির্ণয় করা দরকার।

সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্ মহাশয় বলিলেন,—

প্রথমে মনে হইয়াছিল যে, হয় ত অদ্যকার এই প্রবন্ধে একটি নীরস বিষয়ের আলোচনা হইবে। কিন্তু পরে দেখা গেল যে, আমরা আশাতীত আনন্দ উপভোগ করিয়াছি। তজ্জন্য প্রবন্ধপাঠক ডাঃ বড়ুয়া মহাশয় এবং আলোচনাকারী শ্রীযুক্ত রাখাল বাবু ও শ্রীযুক্ত অমূল্য বাবুকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। ডাঃ বড়ুয়া মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত রাখাল বাবুকে আমি অনুরোধ করি, তাঁহারা এ বিষয়ের আরও বিস্তৃত আলোচনা করিয়া পরিষদের কোন আগামী অধিবেশনে আমাদিগকে শুনাইবেন। প্রবন্ধোক্ত পুথির সঙ্গে হয় ত পশ্চিম দেশের নাথধর্ম্মের বৈসাদৃশ্য থাকিতে পারে, কিন্তু অদ্যকার আলোচিত সৃষ্টিতত্ত্ব যে বেদের সহিত সাদৃশ্যযুক্ত, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। নাসদীয় সূক্ত ছাড়া বেদের অন্যত্রও সৃষ্টির কথা আছে এবং তাহার সহিতও ইহার সাদৃশ্য আছে। বেদে "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং" বলিয়া যে ব্রহ্মের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাঁহার সহিত নাথধর্ম্মের "নিরঞ্জনে"র ত কোনই পার্থক্য দেখা যায় না। পরন্তু বেদে ব্রহ্মের "নিরঞ্জন" সংজ্ঞাটিও অপরিচিত নহে। তার পর গোরক্ষ-নাথকে নাথগুরু বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাও হিন্দুধর্ম্মের সহিত মেলে। পাতঞ্জলে ঈশ্বরকে "সঃ পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

2. Journal of the Royal Asiatic Society, October, 1923.

"Mr. N. K. Bhattasali's exhaustive study of the Coins and Chronology of the 14th century Sultans of Bengal is the sort of detailed work which it is now quite prohibitive to publish in this country. We are glad that his perseverance has overcome all difficulties of production and given us a book of considerable value, if limited in its appeal. His careful corrections of many previous misreadings will find general acceptance, and the chronological results derived from his patient work are quite important."

3. Mr. Howland Wood in the Journal of the American Oriental Society, August, 1923.

"As the title partly indicates, the present treatise covers the coinage of the Sultans of Bengal for a period of one hundred years, taking in only the coins of the House of Illiyas and of the line of Raja Ganesh, a period from 1339 to 1431 of our era.

The inspiration of this work was the find of 346 coins at Dacca in 1918. Mr. Bhattasali has produced a very painstaking work on the coins of this period. He has made a special effort to decipher the dates, and he has been able to prove through accumulated material now at hand that many coins previously published have been misread. One who is familiar with the coinage of the period realizes that, on account of the poorly and faultily written dates, incorrect reading is not surprising.

Besides, many coins have been badly mutilated by Shroffs, so that in many instances the inscription has been more or less obliterated. The author brings out the fact that both Edward Thomas and Blochmann, important as their works are, have fallen into frequent errors as regards the dates. Since these works were written, many Bengalese coins have come to light, and the Shillong and Calcutta Cabinets have published their series.

The history of the Bengal kings is very scanty, and the coins themselves must supply some of the gaps. The whole book shows a most careful examination of all historical data and published accounts of coins.

Mr. Bhattasali has very ably proved from the coins in this find that the Sultan Bayazid Shah actually existed—a fact that had been previously only suspected. A more important discovery was five coins in the find bearing the name of Alauddin Firoz Shah, the son of Bayazid Shah. This ruler was hitherto unknown. The author also ascribes the coins of Danujamardana Deva to Raja Ganesh.

The whole is a very careful and scholarly work on the period which it covers."

4. The Numismatic Chronicle, Nos. 11 & 12, 1923.

"The Curator of the Dacca Museum is to be congratulated on this valuable monograph. It is based on the study of a find of some 350 fourteenth-century coins of Bengal, and does much to correct and increase our knowledge of a very confused period. The coins of the Sultans of Benal offer more epigraphical difficulties than any other Muslim Series. The script is rude and corrupt, the important marginal legends are usually fragmentary, and the coins are defaced by shroff-marks to an extent quite unknown elsewhere. The scantiness of our historical sources gives the coins with their dates and mints an importance they do not possess in the Moghul series, for example. Previous writers on the series such as Thomas on the Kooch-Behar find, Nevill on the Khulna hoard, have given from the specimens at their disposal readings which Mr. Bhattasali's elaborate examination of the coins in Calcutta, Dacca and Shillong Museums, with the addition of those of the present hoard, now show to be untenable. The result is to clear up many puzzles and to illuminate many obscure points on the history of Bengal from the reign of Ghiyas (*sic.* Fakhr) al-Din Mubarak to that of Jalal al-Din Muhammad."

5. Indian Antiquary—November, 1923.

"This excellent monograph which is marked by careful reasoning and sound scholarship owes its publication in the present form to a remarkable find of 346 silver coins of the Bengal Sultans............... The hoard has proved to be extremely important from the standpoint of History and Numismatics............ The result is a considerable addition to our knowledge of the political History of Bengal in the 14th and 15th centuries A. D. and several new and important disclosures regarding the dates and identity of the kings who succeeded in turn to the thrones of Lakhnauti and Sonargaon.

Perhaps the most interesting deduction is the identification of Danujmarddana Deva with the Hindu Raja Ganesh, who after the death of Bayazid Shah in A. D. 1414, drove the Muhammadans from North Bengal....... The publication will be appreciated by students of Indian History and Numismatics."

6. Khan Bahadur Sayid Aulad Hasan, Author of Antiquities of Dacca.

"You could not have made me a more welcome new year's present. I have read it through with the greatest interest. It is a valuable contribution to the History of Bengal and deserves in every way to be appreciated as such. More power to your brain and elbow, I pray."

7. Mr. R. B. Ramsbotham, M. A., I. E. S., Principal, Hoogly College.

"........I offer you my cordial congratulation on such a real contribution to learning which certainly ought to win for you the Ph. D. degree of the Calcutta University.......... I hope the Bengal Government will purchase a good number of copies, for it is a work of genuine learning and scholarship and I was proud to receive a copy inscribed by the author."

8. Mv. A. F. M. Abdul Ali. Officer-in-Charge, Imperial Records Department.

"......Your book...... I have read it with great pleasure, and I must admit, with great profit to myself."

CONTENTS

একত্রিংশ ভাগ] [তৃতীয় সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা

সূচী

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

বিশেষ দ্রষ্টব্য—সদস্যগণের ঠিকানা পরিবর্ত্তন ঘটিলে, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক যথাসময়ে কার্য্যালয়ে সংবাদ দিবেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩৩১
বঙ্গাব্দের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ

সভাপতি

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্ত-রত্ন এম্ এ, বি এল্ এটর্ণি

সহকারী সভাপতিগণ

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, সিদ্ধান্তবারিধি

রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস্

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল

মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত স্যর বিজয়চন্দ্ মহ্ তাব বাহাদুর কে টি, জি সি এস্ আই, কে সি এস্ আই, কে সি আই ই, আই ও এম্

মহারাজ শ্রীযুক্ত স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে সি আই ই

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সি আই ই, বি এল্

শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস-সি (এডিন), এফ আর এস্ ই

সম্পাদক

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

সহকারী সম্পাদকগণ

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বি এল্

শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ (পদত্যাগ করায় পরে) শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্ সি,

পত্রিকাধ্যক্ষ

অধ্যাপক ডাক্তার কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা এম্ এ, বি এল্, পি আর এস, পি-এচ্ ডি

কোষাধ্যক্ষ

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর

চিত্রশালাধ্যক্ষ

শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই (অসুস্থতা বশতঃ পদত্যাগ করিবার পরে)

শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ, এটর্ণি

ছাত্রাধ্যক্ষ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ

গ্রন্থাধ্যক্ষ

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত

আয়-ব্যয়-পরীক্ষকগণ

শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়

১৩৩১ বঙ্গাব্দের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্ ; শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি ; শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ ; শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ ; রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ বাহাদুর ; শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ ; ডাক্তার আব্দুল গফুর সিদ্দিকী ; মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন এম্ এ, এল্ এম এস্ ; শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু নাট্য-কলা-সুধাকর ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ,এফ জি এস ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি-এচ্ ডি, এফ সি এস্ (লণ্ডন) ; ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম ডি, এম এস্‌সি ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্বনিধি এম্ এ ; শ্রীযুত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী ; রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর বি এ ; বৈদ্য-মহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন সেন কাব্যতীর্থ বিদ্যানিধি ; শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার এম্ এ ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম্ এ ; শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ ; শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় ; শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল্ ; শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায় তত্ত্বনিধি ; শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়তত্ত্ব।

পৃথিবী যে ভাবে সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার কথা, আকাশের কথা কৌতূহলোদ্দীপক-ভাবে লিখিত হইয়াছে। মূল্য ১॥০।

মেরুতত্ত্ব।

আদি জন্মভূমি উত্তর **মেরু**। তথা হইতে হিম প্রলয়ের সময় আর্য্যগণের **সুমেরু** (Mt. Altai) প্রদেশ আগমন। পরে মহাজলপ্লাবনের সময় তথা হইতে হিমালয় পর্ব্বতে **মহামেরু** প্রদেশে আগমনের কথা।

ভূতত্ত্ব, জ্যোতিষ, বেদ, পুরাণ, কোরাণ, বাইবেল, আবেস্তার মিলনে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে লিখিত। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সকলেই নিরপেক্ষ প্রামাণিক তথ্য পাইবেন। পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে সৃষ্টাব্দ ও খৃঃ পূঃ অব্দ দিয়া এই ধরণের ইতিহাস কোন দেশে নাই। কেমন করিয়া পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে, কি প্রকারে—কে আগে, কে পরে—কে কি ভাবে সংসারে বিচরণ করিয়াছে, কোন্ সময়ে কত উন্নতি করিয়াছে অর্থাৎ সৃষ্টির ইতিহাস, আকাশের ইতিহাস, অতি প্রাচীন কাল হইতে অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথম হইতে দেশের ইতিহাস, রাজার ইতিহাস, ভাষার ইতিহাস, সমাজের ইতিহাস ইহাতে পাইবেন।

ভারতী বলেন—"উপাখ্যানের ন্যায় উপভোগ্য।" "গ্রন্থখানি এমনই কৌতূহলোদ্দীপক, রচনা-প্রণালী এমনই সরল যে, সম্পূর্ণ অবিশেষজ্ঞ ব্যক্তিও এ গ্রন্থ পাঠে মুগ্ধ হইবেন, এক অজ্ঞাত সত্যের আলোক পাইয়া কৃতার্থ হইবেন। * * * আমরা অবিশেষজ্ঞ ব্যক্তিও গ্রন্থখানি আগাগোড়া পাঠ করিয়া অনেক কথা জানিয়াছি, শিখিয়াছি।"

শ্রীবিনোদবিহারী রায় বেদরত্ন।
পুরাতত্ত্ব-বিশারদ এল, এম, পি।
৭১।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বৈজ্ঞানিক-পরিভাষা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে বহুদিন হইতে বিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দ-সংগ্রহের কার্য্য চলিতেছে। পরিষদের বিজ্ঞান-শাখার কর্তৃত্বে নানা সাময়িক পত্র ও পুস্তকাদিতে প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক-পরিভাষা সংগ্রহ ও সঙ্কলন করা হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত অনেক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। সমস্ত গ্রন্থ পরিষদের গ্রন্থাগারে আছে কি না, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। এই জন্য, এতদ্দ্বারা পরিষদের সদস্য ও সহৃদয় দেশবাসীর নিকট বিজ্ঞান-শাখার পক্ষ হইতে এই অনুরোধ জানাইতেছি যে, তাঁহাদের নিকট যদি কোন বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ থাকে, তবে পরিভাষা-সংগ্রহ কার্য্যের সৌকর্য্যার্থে পরিষৎকে তাহা দান করিলে কিংবা কিছু দিনের জন্য ধার দিলে, পরিষৎ তাঁহাদের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ থাকিবেন। বলা বাহুল্য, তাঁহাদের প্রদত্ত পুস্তক সযত্নে ব্যবহৃত হইবে ও কার্য্যান্তে ফেরত দেওয়া হইবে এবং পুস্তক প্রকাশিত হইলে যথাস্থানে তাঁহাদের নাম কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লিখিত হইবে।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সহিত্য-পরিষদের বিজ্ঞান-শাখার আহ্বানকারী।

দুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডার

কতিপয় সহৃদয় ব্যক্তির সাহায্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে দুঃস্থ সাহিত্যিকগণকে সাহায্য করিবার জন্য একটি ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এপর্য্যন্ত এই ভাণ্ডারে শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয় ২১০০৲ দুই হাজার এক শত টাকার কোম্পানীর কাগজ এবং নগদ ৯৲ টাকা দান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির বিক্রয়লব্ধ অর্থ এই ভাণ্ডারে জমা হইবে।—

'বৃন্দাবন-কথা' পরিষদের সদস্যপক্ষে মূল্য ১৸০, সাধারণ পক্ষে ২॥০। কালিদাসের 'মেঘদূত' মূল্য সদস্য-পক্ষে ৸০, শাখা-পরিষদের সদস্য-পক্ষে ৸৶০ এবং সাধারণের পক্ষে ১৲ এক টাকা। উত্তরপাড়া বিবরণ—মূল্য ।৶০ আনা। ঋতুসংহারম্—১৲, পুষ্পবাণ-বিলাসম্—।৶০। ভারত ললনা ॥৶০। প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির।

৬৲ টাকায় পরিষদ্ গ্রন্থাবলী

এখনও পাওয়া যায়। এই বইগুলির মূল্য সদস্যপক্ষে ১৫॥০ ও সাধারণপক্ষে ২২॥৶০। কিন্তু পরিষদ্গ্রন্থাবলীর বহুলপ্রচারকল্পে সদস্যপক্ষে ৬৲ ও সাধারণপক্ষে ৭৲ টাকা মূল্যে দেওয়া হইতেছে—১। মায়াপুরী, ২। রাধিকার মানভঙ্গ, ৩। তীর্থভ্রমণ, ৪। তীর্থমঙ্গল, ৫। বিষ্ণুমূর্ত্তি-পরিচয়, ৬। গঙ্গামঙ্গল, ৭। জ্যোতিষ-দর্পণ, ৮। দুর্গামঙ্গল, ৯। নেপালে বাঙ্গলা নাটক, ১০। ধর্ম্মপূজা-বিধান, ১১। সারদামঙ্গল, ১২। জ্ঞান-সাগর, ১৩। মৃগলুব্ধ, ১৪। মৃগলুব্ধ-সংবাদ, ১৫। প্রাচীন পুঁথির বিবরণ (২য় খণ্ড), ১৬। পদকল্পতরু (১ম ও ২য় খণ্ড,) ১৭। শ্রীকৃষ্ণবিলাস, ১৮। বৌদ্ধগান ও দোহা। ১৯। ন্যায়দর্শন (১ম ও ২য় খণ্ড)।

HANDBOOK TO THE SCULPTURES IN THE **MUSEUM** OF THE **BANGIYA SAHITYA PARISHAD.** (WITH TWENTY SEVEN PLATES.)

BY MANOMOHAN GANGULY, B. E., M. R. A. S., &c.

Hony. Supdt. Museum, Bangiya Sahitya Parishad.

মূল্য—পরিষদের সদস্য পক্ষে ৩৲; শাখা-পরিষদের সদস্য-পক্ষে ৩৸০; সাধারণের-পক্ষে ৬৲

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ১৩২৪ সালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পুরাতন পত্রিকা পরিষদের সদস্যগণের এবং সাধারণের জন্য প্রতি বৎসরের মূল্য ১৲ টাকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

শ্রীরামকমল সিংহ; বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির।

শ্রীচৈতন্যের জগন্নাথদশক *

শ্রীচৈতন্যদেবের রচিত জগন্নাথদশক, ইদানীং কেহ দেখিয়াছেন বা উহার অস্তিত্ব জানেন বা ইহা কখন মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া জানি না। সন ১২৭৪ সালে ৯৬নং আহীরিটোলা ঠিকানার শ্রীনৃত্যলাল শীল দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত 'নিত্যকর্ম্ম' পুস্তকের ৫—৬ পৃষ্ঠায় "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রমুখপদ্মবিনির্গত শ্রীজগন্নাথাষ্টকং" দেখিতে পাই। উহা অত্যন্ত অশুদ্ধ। উহার প্রথম শ্লোক অবিকল উদ্ধৃত হইল,—

"কদাচিৎ কালিন্দীতটে বিপিন সঙ্গীততরল
মদাভি দশনকমল স্বাদু মধুপং।
মাপস্য ব্রহ্মাম ভবতি গণেশার্চ্চিতপদঃ
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥"

১৩২৮ চৈত্র সংখ্যার "সুবর্ণবণিক্‌সমাচারে" দেখিলাম, "কবি বিশ্বম্ভর পানি ও জগন্নাথ-মঙ্গল" প্রবন্ধ-লেখক ডাক্তার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় বলিতেছেন,—জগন্নাথমঙ্গলের সন ১৩০১ সালের সংস্করণে গ্রন্থশেষে "জগন্নাথের স্তব" নূতন সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। "জগন্নাথের স্তবটি সেই সর্ব্বজনপরিচিত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রমুখপদ্মবিনির্গত শ্রীজগন্নাথাষ্টক।"

তবেই দেখা গেল, ১২৭৪ বঙ্গাব্দে জগন্নাথ অষ্টক প্রথম মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। কিন্তু উহা অত্যন্ত অশুদ্ধ, উহা হইতে প্রকৃত পাঠের উদ্ধার হইবার সম্ভাবনা নাই। সন ১৩০১ সালে যে জগন্নাথ অষ্টক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা আমি দেখি নাই; সুতরাং জানি না, উহা পূর্ব্বোক্ত অষ্টকের শোধিত সংস্করণ কি না। আমি বহু বৎসর পূর্ব্বে আমার গৃহস্থিত পুথিসমূহের মধ্যে তিনখানি প্রাচীন পাতড়া পাই। ঐ তিনখানিতেই তিনটি জগন্নাথদশক লিখিত, জগন্নাথ অষ্টক নহে। তিনখানি পাতড়ার জগন্নাথদশকের পাঠের মেলন করিয়া উহার পাঠোদ্ধার করিয়াছিলাম। আমি বিবেচনা করি. মহাপ্রভু পুরীতে অবস্থানকালে এই জগন্নাথদশক রচনা করিয়া, ইহা দ্বারা জগন্নাথ দেবের স্তব করিয়াছিলেন। উত্তরকালে জগন্নাথদশকের দুইটি শ্লোক নৃত্য বাবুর আদর্শ পাতড়ায় নষ্ট হওয়ায় তৎপ্রকাশিত "নিত্যকর্ম্মে" জগন্নাথদশক, জগন্নাথ অষ্টকের রূপ ধারণ করিয়াছে। আমি যে জগন্নাথদশকের উদ্ধার করিয়াছিলাম, তাহা এই,—

"শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ॥
কদাচিৎ কালিন্দীতটবিপিনসংসর্গিভবনে
মুদাভীরীনারীবদনকমলস্বাদুমধুপঃ।
রমাশম্ভুব্রহ্মাসুরপতিগণেশার্চ্চিতপদো
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ১॥

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৮শ বার্ষিক দশম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

করে সব্যে বেণুং শিরসি শিখিপিচ্ছং কটিতটে
দুকূলং নেত্রান্তে সহচরকটাক্ষং বিদধৎ ।
সদা শ্রীমদ্বৃন্দাবনবিপিনলীলাপরিচয়ো
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ২ ॥
মহাম্ভোধেস্তীরে কনকরুচিরে নীলশিখরে
বসন্ প্রাসাদান্তঃ সহজবলভদ্রেণ বলিনা ।
সুভদ্রামধ্যস্থঃ সকলসুরসেবাবসরদো
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৩ ॥
কৃপাপারাবারঃ সজলজলদশ্রেণিরুচিরো
রমাবাণীসেব্যস্ফুরদমলপঙ্কেরুহপদঃ ।
সুরেন্দ্রৈরারাধ্যঃ শ্রুতিগণমুখোদ্গীতচরিতো
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৪ ॥
পরং ব্রহ্মাপীড়ঃ কমলবদনোৎফুল্লনয়নো
নিবাসী নীলাদ্রৌ নিহিতচরণোঽনন্তশিরসি ।
রসানন্দে রাধাসরসবপুরালিঙ্গনসুখী
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৫ ॥
রথারূঢ়ো গচ্ছন্ পথি মিলিতভূদেবপটলৈ-
স্তুতঃ প্রাদুর্ভাবং প্রতিপদমুপাকর্ণ্য সদয়ঃ ।
দয়াসিন্ধুর্বন্ধুঃ সকলজগতাং মুগ্ধসদয়ো
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৬ ॥
বরস্তং সংসারং হততমমসারং সুরপতে
বৃথাভোগাসক্তং সততমপরং দৈবতপথি ।
অহং যাচে নিত্যং পরমমচলং নিশ্চিতমিদং
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৭ ॥
নচ প্রাপ্যং রাজ্যং নচ কনকমাহো ন বিভবং
ন যাচেঽহং রম্যাং নিখিলবরকাম্যাং বরবধূং ।
সদাকালং কামং প্রমথপতিনোদ্গীতচরিতো
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৮ ॥
ঘনশ্যামাকারঃ সুরমধুরধামা ভবপিতা
মহেন্দ্রাদেরাদ্যো বররমণরাধার্পিততনুঃ ।
লসৎশ্রীবৎসাঙ্কস্তরুণতুলসীমাল্যসুভগো
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৯ ॥

সদানন্দাকারো জগতি জগতাং কিল্বিষহরো
জগন্মূলাধারো জলধিতনয়াসেবিতপদঃ।
জরামৃত্যুধ্বংসী জলদপটলশ্যামলরুচিঃ
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ১০॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রমাবিরচিতং শ্রীজগন্নাথ-দশকং সমাপ্তং॥

শ্রীশিবচন্দ্র শীল

ভারতীয় সূদবিদ্যা *

আর্য্য ঋষিগণের রচিত গ্রন্থাদি পাঠ করিলে দেখা যায়, পুরাকালে কি দর্শন, কি চিকিৎসা-শাস্ত্র, কি কৃষিশিল্প, কি সূদবিদ্যা বা সূপকারবিদ্যা, সকলেরই চরম উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বর্ত্তমান প্রবন্ধে সূদবিদ্যা অর্থাৎ পাকপ্রণালীর কিরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তাহার আলোচনা করিব।

সূদবিদ্যা বা সূপকারবিদ্যা (পাকপ্রণালী) চতুঃষষ্টি কলার অন্যতম। শাস্ত্রে দেখা যায়, উক্ত সূদবিদ্যায় পুণ্যশ্লোক নলরাজাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তৎপরে কুন্তীপুত্র দ্বিতীয় পাণ্ডব মহাবীর ভীমসেন। উক্ত দুই সূদবিদ্যাচার্য্যই পাকপ্রক্রিয়া সাধনার্থ বিভিন্ন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অপেক্ষাকৃত অতি প্রাচীন ভীমকৃত পাকশাস্ত্র কুত্রাপি আছে বলিয়া জানা যায় নাই। কিন্তু তদপেক্ষায় প্রাচীনতর মহারাজ নলকৃত পাকশাস্ত্র বিশেষ অনুসন্ধানে পাওয়া গিয়াছে। অদ্য সেই মহারাজ নলকৃত "পাকদর্পণ" হইতে "মাংসৌদন" (পলাউ) পাকের প্রক্রিয়া প্রদর্শন করিতেছি। যাবতীয় সূপকার অপেক্ষা মহারাজ নলের এমনই পাক বিষয়ে বৈচিত্র্য ছিল যে, তাঁহার পাচিত ব্যঞ্জনের স্বাদ অন্যের পাচিত ব্যঞ্জনের সহিত সম্পূর্ণ পৃথক্ হইত।

বনবাসিনী দময়ন্তীকে নিদ্রিতাবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া নলরাজা নিরুদ্দেশ হইলে পর, দময়ন্তী বিদর্ভ নগরে পিত্রালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বহুতর চেষ্টায়ও নলের অনুসন্ধান না পাইয়া, অনন্যোপায় হইয়া দময়ন্তীর পিতা ভীম ভূপতি, মহাপতিব্রতা দময়ন্তীর পুনঃ স্বয়ম্বরের ছল করিয়া সমস্ত রাজন্যগণকে বিদর্ভ নগরে সমবেত করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে নলরাজা ঋতুপর্ণ রাজার সারথি-রূপে "বাহুক" নাম ধারণ ও বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া উপস্থিত ছিলেন। দময়ন্তী প্রচ্ছন্নভাবে সখী কেশিনী দ্বারা নলের পাচিত মাংসৌদন আনাইয়া, তাহার সদ্গন্ধ ঘ্রাণ করিয়া ও সুরস আস্বাদন করিয়া, এই মাংসপাচককেই নল বলিয়া নিঃসন্দেহরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। নলের এমনই পাক-নৈপুণ্য ছিল। যথা,—

"পুনর্গচ্ছ প্রমত্তস্য বাহুকস্যোপসংস্কৃতং। মহানসাৎ শৃতং মাংসমানয়স্বেহ ভামিনি॥
সা গত্বা বাহুকস্যাগ্রে তন্মাংসমপকৃষ্য চ। অত্যুষ্ণমেব ত্বরিতা তৎক্ষণাৎ প্রিয়কারিণী॥
দময়ন্ত্যৈ ততঃ প্রাদাৎ কেশিনী কুরুনন্দন। সোচিতা নলসিদ্ধস্য মাংসস্য বহুশঃ পুরা।
প্রাশ্য মত্বা নলং সূদং প্রাক্রোশদ্ভৃশ-দুঃখিতা॥" (মহাভারত, বন—৭৫।২০—২৩)।

অর্থ—হে কেশিনি! তুমি পুনর্ব্বার তথায় যাইয়া প্রমাদগ্রস্ত বাহুকের পাচিত মাংস সেই রন্ধনশালা হইতে আনয়ন কর। দময়ন্তীর এরূপ আগ্রহ দেখিয়া কেশিনী পুনর্ব্বার ঐ পাকশালায় যাইয়া, সেই উষ্ণ মাংস অপহরণ করিয়া, দ্রুতগতিতে আসিয়া দময়ন্তীকে প্রদান করিল। পূর্ব্বে দময়ন্তী বহুবারই নলপক্ব মাংসের আস্বাদ বিশেষরূপ অবগত ছিলেন। এখন আবার সেই মাংস ভোজন করিয়া, অবিকল সেই আস্বাদ অনুভব করিয়া, ঋতুপর্ণ রাজার সারথি বাহুককেই নল স্থির করিয়া, অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন।

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৯শ বার্ষিক ১ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

এতদ্দ্বারা ইহাই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, নল রাজার সদৃশ পাকবিদ্যায় পরিনিষ্ঠিত আর দ্বিতীয় কেহ ছিল না। অতএব অদ্য নল রাজার কৃত "পাকদর্পণ" গ্রন্থ হইতে প্রথমতঃ মাংস পাকের প্রণালী জ্ঞাপন করিতেছি।

মাংসৌদন (পলাউ)

"ছাগমেষশকুন্তাদি-প্রাণিনাং পললং বুধঃ।
সমাদায় পুনস্তস্য ত্বগন্ত্রাণি সমুৎসৃজেৎ॥
তেষামেকতমং মাংসং ক্ষালয়েদ্বারিণা ততঃ।
অস্থিভিঃ সহ সংছিদ্য নিক্ষিপেত্তস্য ভাজনে॥"

অর্থ—পাঁঠা, মেড়া অথবা অপরাপর পক্ষী প্রভৃতি যে কোন প্রাণীর চর্ম্ম এবং আঁত পরিত্যাগ করিয়া, তাহার মাংস লইয়া প্রক্ষালন করিবে। পরে অস্থির সহিত খণ্ড খণ্ড করিয়া পাত্রে রাখিবে।

উৎক্রামোদকের লক্ষণ

"অনাপলং ততো ভাণ্ডে তণ্ডুলস্যোদকং শুভে।
নিধায় শুদ্ধমুদকং সমং কৃত্বাপয়েৎ সুধীঃ॥
তপ্তে পয়সি তন্মাংসং নিক্ষিপেৎ ক্ষালিতং পুনঃ।
পুনশ্চ নিক্ষিপেত্তত্র কুস্তুম্বুরীং বুধঃ।
তপ্তে মাংসে পুনঃ সম্যক্‌শোধয়েৎ চিক্কনং বিনা॥
শীতলঞ্চ পুনঃ কৃত্বা কুসুমৈরধিবাসয়েৎ।
ন্যসেচ্চ মৃগনাভিঞ্চ কর্পূরং হিমবারিচ॥
মুহূর্ত্তমেকং সংস্থাপ্য প্রসূনানি পরিত্যজেৎ।"
এতদুৎক্রামমুদকমাহুঃ সূদবিশারদাঃ॥

অর্থ—উৎক্রাম-জলের লক্ষণ—পরিষ্কার পাত্রে তুষ কঙ্করাদি না থাকে, এইরূপ তণ্ডুলের (চেলেনির) জল রাখিবে এবং যে পরিমাণ তণ্ডুলের জল, সেই পরিমাণে বিশুদ্ধ জল ঐ তণ্ডুল-জলের সহিত মিশাইবে। তৎপরে ঐ জল উষ্ণ করিয়া পূর্ব্বের প্রক্ষালিত মাংস ঢালিয়া দিবে। পুনর্ব্বার তাহাতে কুস্তুম্বুরী (কটফল) ও ধ'নের চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে মাংস চিক্কন সুসিদ্ধ না হইতে (পাকস্তু ত্রিবিধো মন্দশ্চিক্কনঃ খরচিক্কনঃ, বাগ্‌ভট কল্পে), ঈষত্তপ্ত আভাসিদ্ধ হইলে উত্তমরূপে ঐ জল ঢালিয়া লইবে। তৎপরে ঐ মাংসগালিত জল শীতল হইলে তাহাতে ফেলিয়া সুবাসিত করিবে। দণ্ড দুই কাল রাখিয়া ঐ পুষ্পগুলি উঠাইয়া ফেলিবে। এইরূপ প্রক্রিয়ায় সাধিত জলকে উৎক্রাম জল কহে। ইহা পাকাচার্য্যদিগের পরিভাষা।

উৎক্রাম শব্দের যোগার্থ

"সর্ব্বোদকাতিক্রমণাৎ উৎকৃষ্টত্বাদিদং পয়ঃ।
রসসর্ব্বস্বরূপত্বাদুৎক্রামমিতি কথ্যতে॥"

অর্থ—নিজের উৎকর্ষগুণে এই জল সকল জলকে অতিক্রম করিয়াছে এবং রসের সর্ব্বস্ব লাভ করে, এই জন্য ইহাকে উৎক্রাম জল কহে।

"ত্রিভাগপূরিতাং স্থালীং তজ্জলৈশ্চ প্রমাণবিৎ।
স্থাপয়েচ্চ তথা চুল্যাং তপ্তে পয়সি বহ্নিনা॥
চতুর্থাংশান্ ক্ষিপেৎ সম্যক্ ক্ষালিতান্ গৌরতণ্ডুলান্।
ঈষৎ পাকে তু সঞ্জাতে সুশুভে শালিতণ্ডুলে॥
আদায় পক্বপললমপক্বমথবামিষং।
জলে বিলীনে তন্তক্তমঙ্গারেষু সমাবিশেৎ॥
ক্ষীরঞ্চ নারিকেলস্য নবং সর্পিস্তথৈবচ।
ন্যসেত্তত্রৈব রম্যাণি কেতকীকুসুমানি চ॥
নিক্ষিপেৎ সকলাংস্তত্র পর্য্যটপ্রমুখোদ্ভবান্।
গন্ধৈঃ কর্পূরকস্তূরীসম্ভবৈশ্চাধিবাসয়েৎ॥
তন্মুখং ছাদয়েৎ সম্যক্ বিধানেন বিচক্ষণঃ।
লিম্পেত্তদগন্ধরক্ষার্থং তদ্রন্ধ্রং কনিকৈক্র্বং॥
আবর্ত্তনং পুনঃ কুর্য্যাদঙ্গারেষ্বেব তান্ পুনঃ।
যাবতা মৃদুভাবং স্যাৎ তাবত্তত্র প্রযোজয়েৎ॥
এবমামিষসম্ভূতং দাপয়েদন্নমীদৃশং।
ইদং রুচিকরং বৃষ্যং পথ্যং লঘু বল-প্রদং॥
ধাতুবৃদ্ধিকরত্বাচ্চ ব্রণদোষান্ প্রশাম্যতি॥"

অর্থ—পূর্ব্বপ্রস্তুত উৎক্রাম জল দ্বারা পাকপাত্রের তিন ভাগ পূর্ণ করিবে। উননের উপরে চাপাইয়া জল উষ্ণ হইলে পরে উৎকৃষ্ট শুভ্র তণ্ডুল ধৌত করিয়া অবশিষ্ট চতুর্থ ভাগ পূর্ণ করিবে। তৎপরে যখন দেখিবে, ঐ তণ্ডুল ঈষৎ সিদ্ধ হইয়াছে, তখন পূর্ব্বোক্ত অর্দ্ধপক্ব মাংস অথবা কাঁচা মাংস ঐ পাকপাত্রে ঢালিয়া দিবে। সমস্ত জল যখন শুকাইয়া যাইবে, তখন ঐ অন্ন-পাত্র জলন্ত অঙ্গারের উপর রাখিয়া, নারিকেলের দুগ্ধ, সদ্যোঘৃত এবং উত্তম কেতকীপুষ্প তাহাতে মিশাইবে এবং পাপর ভাজা প্রভৃতি পিষ্টককে খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহাতে মিশাইবে এবং কর্পূর, মৃগনাভি ইত্যাদি গন্ধ দ্রব্য সংযোগে সুবাসিত করিবে। এই সময়ে শরা দ্বারা পাকপাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া, ময়দা দ্বারা তাহার ফাঁক বন্ধ করিয়া দিবে। পুনর্ব্বার জলদঙ্গারের উপরে ঐ মাংসপাত্র চাপাইয়া এমন ভাবে অনুমান করিয়া সিদ্ধ করিবে, যাহাতে সেই মাংসৌদন অতীব কোমল হয়। এইরূপে পলাউ অতীব সুস্বাদু, বীর্য্যবর্দ্ধক, হিতকারী, লঘুপাক, বলবর্দ্ধক, সপ্ত ধাতুর পোষক এবং ব্রণ রোগনাশক জানিবে। মাংসপ্রিয় ধনিগণ একবার এইরূপ প্রণালীতে মাংস পাক করিয়া পরীক্ষা করিতে পারেন।

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ

বাঙ্গালা[1] ভাষায় অনুজ্ঞা

বাঙ্গালা ভাষায় সম্ভ্রমার্থে[2] অনুজ্ঞার মধ্যম পুরুষে দু'টি রূপ হয়,—

১। তুমি কর। ২। তুমি করিও।

প্রথমটীতে বর্ত্তমান কাল বুঝায়, দ্বিতীয়টীতে ভবিষ্যৎ সূচনা করে। দুইটী দৃষ্টান্ত দিতেছি—

১। যাহা জান, সত্য করিয়া **বল** (বর্ত্তমান অনুজ্ঞা),

২। সদা সত্য কথা **বলিও** (ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা)।

তুচ্ছার্থ মধ্যম পুরুষে ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার রূপ নিত্য-বর্ত্তমান (লট্) কালের রূপের সমান। কিন্তু বর্ত্তমান অনুজ্ঞার রূপ নিত্য-বর্ত্তমান কালের রূপ হইতে বিভিন্ন। যেমন—

১। তুই তাহাকে **বলিস্** যে, আমি ভাল আছি। (ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা)

২। তুই তাহাকে **বল্** যে, আমি ভাল আছি। (বর্ত্তমান অনুজ্ঞা)

৩। তুই কি **বলিস্**? (নিত্য-বর্ত্তমান)

ওদিকে কিন্তু সম্ভ্রমার্থ মধ্যমপুরুষে বর্ত্তমান অনুজ্ঞা ও নিত্য-বর্ত্তমানের রূপ একই। যেমন—

১। তুমি সত্য **বল** (বর্ত্তমান অনুজ্ঞা)

২। তুমি কি **বল**? (নিত্য-বর্ত্তমান)

বুঝাইবার জন্য একটী চিত্র দিতেছি :—

	তুমি **করিও**	ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা
নিত্য-বর্ত্তমান	তুই **করিস্**	ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা
নিত্য-বর্ত্তমান	তুমি **কর**	বর্ত্তমান অনুজ্ঞা
	তুই **কর**	বর্ত্তমান অনুজ্ঞা

'না' অর্থ বুঝাইতে কিন্তু আমরা ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার রূপই ব্যবহার করি। যেমন—

যাহা জানিস্, সত্য করিয়া বল্, মিথ্যা **বলিস্** না।

যাহা জান, সত্য করিয়া বল, মিথ্যা **বলিও** না।

অনুজ্ঞায় মান্যার্থ মধ্যম ও প্রথম পুরুষে—আপনি বা তিনি **করুন**। তুচ্ছার্থ প্রথম পুরুষে—সে **করুক**।

এই রূপগুলি বর্ত্তমান কালের রূপ হইতে পৃথক্। পূর্ব্ববঙ্গে 'করুন' স্থানে নিত্য-বর্ত্তমানের 'করেন' দেখিতে পাওয়া যায়। আধুনিক বাঙ্গালা ভাষায় উত্তমপুরুষের অনুজ্ঞায় বর্ত্তমান হইতে

১। ব্যুৎপত্তি বা প্রাচীন রূপ অনুসরণে বানান হইবে বাঙ্গালা (প্রাচীন বা° বঙ্গাল, ১৪ শতকের পারসীতে বঙ্গালহ্), উচ্চারণ অনুসারে বাংলা। "বাঙ্গলা" না ব্যুৎপত্তি-সম্মত, না উচ্চারণগত।

২। তুমি সম্ভ্রমার্থ, আপনি মান্যার্থ ও তুই তুচ্ছার্থ মধ্যম পুরুষ। আমি এই সংজ্ঞাগুলি হেমচন্দ্র বড়ুয়ার অসমীয়া ব্যাকরণ হইতে গ্রহণ করিয়াছি।

পৃথক্ কোন রূপ নাই। এখানে একটা কথা পরিষ্কার করিয়া রাখা ভাল। ভাষাতত্ত্বের হিসাবে 'তুই', 'তুমি' বাস্তবিক যথাক্রমে উত্তমপুরুষের একবচন ও বহুবচন। ইংরেজি thee, you এর কিংবা জর্ম্মান্ deu, Sie এর সঙ্গে তুই, তুমির বচন ও প্রয়োগের তুলনা করা যাইতে পারে।

তুই—<তই, (বৌদ্ধ গান)

{তইআ (সপ্তশতকে)}

<তই, তুই, তুএ (প্রাকৃত ; তৃতীয়ায়)

<তয়া, ত্বয়া (পালি ; তৃতীয়ায়)

<ত্বয়া (সংস্কৃত ; তৃতীয়ায়)

অন্য সমজাত (cognate) ভাষার সঙ্গে তুলনায় দেখি—হিন্দী মৈথিলী 'তূ', মারাঠী 'তূঁ', গুজরাটী 'তূঁ', পঞ্জাবী 'তূঁ', সিন্ধী 'তূঁ', নেপালী 'ত'—এ সমস্তই প্রথমার একবচনে। অবশ্য আসামী ভাষার 'তই' ও উড়িয়ার 'তু' বাঙ্গালা 'তুই' পদেরই মত তুচ্ছার্থ মধ্যমপুরুষ একবচন, এবং আসামী 'তুমি' ও উড়িয়া 'তুম্ভে' বাঙ্গালা 'তুমি' পদেরই মত সম্ভ্রমার্থ মধ্যমপুরুষ একবচন। কিন্তু ভাষাতত্ত্বের দিক্ হইতে বাং তুমি <তুহ্মি (মধ্যবাঙ্গালায়) <তুম্হে (বৌদ্ধগান) <তুম্হে (অপভ্রংশ, প্রাকৃত, পালি, বহুবচনে)। নব্য-হিন্দু-আর্য্য (Neo-Indo-Aryan) ভাষার সহিত তুলনায় মারাঠী 'তুম্হী', গুজরাটী 'তমে', নেপালী 'তিমি', বেদিয়া (Gypsy) 'তুমেন', পাঞ্জাবী 'তুসীঁ', সিন্ধী 'তবহীঁ'—মধ্যম পুরুষের বহুবচনে।

যদি বাঙ্গালা, অপভ্রংশ, প্রাকৃত, পালি ও সংস্কৃতে চর্-ধাতুর বর্ত্তমান কালের অনুজ্ঞার মধ্যম পুরুষের রূপ করা যায়, তবে আমরা দেখিব—

বাং চর্ <প্রা., পা., সং., চর

বাং চর <প্রাচীন বাং., প্রা., চরহ

<পালি চরথ = সং চরত

বাঙ্গালার নিত্য-বর্ত্তমান (লট্) ও অনুজ্ঞার (লোট) সম্ভ্রমার্থ মধ্যম পুরুষের গোলযোগ পালি-যুগের। পালি চরথ, প্রাকৃত চরহ = সং চরত, চরথ উভয়ই।

নব্য-হিন্দু-আর্য্য ভাষাসমূহের সহিত তুলনা করিলে—বাঙ্গালা 'চর্', আসামী, উড়িয়া, হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটী, পাঞ্জাবী, নেপালী চর্, সিন্ধী চরি, চরু। বাং, চর, উ. চর, পুরুলিয়া চরহ, চর, আস. চরাঁ (চন্দ্রবিন্দু প্রক্ষিপ্ত), নে. চরো, চরে, মা. চরা, হি. পা. গুজ. সিন্ধী চরো (<অপভ্রংশ চরহু)। মারাঠী ও আসামী ভিন্ন এই সমস্ত ভাষায় নিত্যবর্ত্তমান ও অনুজ্ঞার মধ্যমপুরুষ বহুবচনের রূপ একই।

এক্ষণে ১ম পুরুষের কথা। বাং সে <অর্দ্ধমাগধী সে (১মা ও ৩য়া) <সং তেন (৩য়া); বাং তিনি <সং তানি (যেমন দিদী <দাদী, তিসী <তসী <অতসী): তুলনায়—বাং সে, উড়িয়া, মৈথিলী সে, আসামী সি, ভোজপুরী সে; হিন্দী, পঞ্জাবী, সিন্ধী ব্রজবুলি সো—সমস্তই একবচন। বাং 'তিনি' মৈথিলী তনি, ভোজপুরী তৈন্হ, ব্রজ. তিনি, পঞ্জাবী. তিনী, সিন্ধী

তিনি, নেপালী তিন্‌হ। এই সমস্তই কর্ত্তা ভিন্ন অন্য কারকের বহুবচনের শব্দরূপের মূল (stem of oblique cases)।

বাং চরুক <প্রাচীন বাং চরউক <প্রা, চরউ+ক স্বার্থে <সং চরতু।

বাং চরুন <প্রাচীন বাং চরন্ত <প্রা পা. সং. চরন্ত।

অন্য ভাষার সহিত তুলনা করিলে—বাং চরুক, প্রাচীন বাঙ্গালা চরু, চরউ, চরুক, চরউক, আসামী চরক ; মৈথিলী চরু, চরৌক ; উড়িয়া চরু ; মারাঠী চরো, চরু ; নেপালী চরোস্‌। স্বার্থে "ক" বাং. আ. ও মৈ. ভাষায় দেখা যাইতেছে।

বাং চরুন, প্রাচীন বাঙ্গালা চরন্ত (আসামী চরোক), মৈথিলী চরৌন্হি, উড়িয়া চরন্তু, মারাঠী চরোৎ, চরুৎ, নেপালী চরুন্‌।

বাং, আ. উ. নে. ভিন্ন নব্য-হিন্দু-আর্য্য ভাষায় প্রথম পুরুষের নিত্য-বর্ত্তমান ও অনুজ্ঞার রূপ একই। স্বার্থে "ক" মধ্য-বাঙ্গালায় নিত্য-বর্ত্তমান, বর্ত্তমান অনুজ্ঞা, অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের তুচ্ছার্থে প্রথম পুরুষে বিকল্পে ব্যবহৃত হইত ; যেমন সে চরে, চরেক, চরু, চরুক, চরিল, চরিলেক, চরিব, চরিবেক। আধুনিক বাঙ্গালার অনুজ্ঞা হইলে "ক" স্থায়ী হইয়াছে।

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার উৎপত্তি কোথা হইতে? প্রথমে নব্য-হিন্দু-আর্য্য ভাষাসমূহের সহিত তুলনা করিয়া দেখা যাউক। আসামী ও উড়িয়ায় এই ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার তুল্যরূপ কোন পদ আছে কি না, জানি না। কিন্তু পূরবিয়া হিন্দীতে (Hoernler Eastern Hindi) বাঙ্গালার তুল্যরূপ পাওয়া যায়। যেমন—'চরিহ'।[১] বাঙ্গালার ন্যায় তাহাতেও বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ দুই অনুজ্ঞাই ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন সিন্ধী ভাষায় এবং কখন কখন নব্য-সিন্ধী ভাষায় 'চরিহে' এইরূপ অনুজ্ঞার মধ্যম পুরুষে বহুবচনের রূপ পাওয়া যায়। এইরূপ হিন্দী চরিয়ো, প. চরীও।

এক্ষণে ব্যুৎপত্তি হিসাবে, বাং চরিও <চরিহ (প্রাচীন বাং বৌদ্ধগান, কৃষ্ণকীর্ত্তন ইত্যাদি <* চরিহহ <চরিহিহ (অপভ্রংশ, প্রাকৃত) <চরিষ্যথ (সং)।

বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার তুচ্ছ মধ্যমপুরুষের রূপ নিত্য-বর্ত্তমানের তুল্য হইলেও তাহাদের উৎপত্তি বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। চরিস্‌ (অনুজ্ঞা) * চরিসি <চরিহসি (বৌদ্ধগান) <চরিহিসি (প্রাকৃত) <চরিষ্যসি (সং)।

চরিস্‌ (নিত্য-বর্ত্তমান) <চরসি—(প্রাচীন বাঙ্গালা, বৌদ্ধগান, প্রাকৃত, পালি ও সংস্কৃত)।

বৌদ্ধগানে এই ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার প্রয়োগ পাওয়া যায়।

১। 498. The pres. imper. may optionally add the following suff. in the 2nd person ; viz., sing. ইহে and plur. ইহ, e. g., পড়িহে *read thou*, পড়িহ *read you*. This is a respectful form of the imper. implying request or prayer rather than command, and may be called a *precative*. Sometimes it is used in the sense of a simple future. (Hoernle's Com. Gram. of Gaudian Languages, p. 339).

সদ্‌গুরু বোহে করিহ সো নিচ্চল। (ভুসুকু) ৩৭ পৃঃ।
জই তুম্হে ভুসুকু অহেই জাইবেঁ মারিহসি পঞ্চজনা
নলিনীবন পইসন্তে হোহিসি একুমণা॥ (ভুসুকু) ৪০ পৃঃ।

সংস্কৃত লৃট্‌ হইতে উদ্ভূত মধ্যম পুরুষের ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার পদ ছাড়া প্রাচীন বাঙ্গালায় প্রথম পুরুষ ও উত্তম পুরুষের পদও দেখা যায়।

	একবচন	বহুবচন
প্রথম পুরুষ—	চরিহে, চরিএ	×
মধ্যম পুরুষ—	*চরিসি	চরিহ
উত্তম পুরুষ—	চরিমো	চরিউঁ, চরিউ

এইগুলির প্রয়োগের দৃষ্টান্ত, প্রথম পুরুষে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন হইতে—

কেহো যবেঁ বেকত **করিহে** এহা কাজ।
আহ্মার থাঁথার তবেঁ তোহ্মে পাইবেঁ লাজ॥ ২৫১ পৃঃ
ধরী তোহ্মে আহ্মার বচনে।
নিষধ রাধাক যতনে॥
আর বার হেন না **করিহে**।
পুরুষের আখি **নিবারিহে**॥ ২৬২ পৃঃ
কান্দিআঁ জাগায়িবোঁ কাঁশে॥
পাছে কাহাঞি মোকে না **দিহে** দোষে॥ ১০০ পৃঃ
যবে কাহ্নু না **মিলিহে** করমের ফলে।
হাতে তুলিআ মো খাইবোঁ গরলে॥ ৩৬৬ পৃঃ
যবেঁ তোরে **মারিহে** পরাণে।
তবেঁ তোকে রাখিব কোণ জনে। ৬৫ পৃঃ
সুণী কি **বুলিহে** বাপ নান্দে।
বাঁশী হারাইলোঁ মো নিন্দে॥ ৩১৪ পৃঃ
শুণীএ যবেঁ সে আইহন বীর।
করেতেঁ তোহ্মা করিব চীর॥ ৪৩ পৃঃ
সখি সব নিষধ যতনে।
কেহো তার না **কহিএ** মরণে। ২৫৭ পৃঃ

কৃত্তিবাসের রামায়ণ (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ) হইতে—

আইসুক ভৃগুরাম তবেসি প্রাণ **জাইহে**।—উত্তরকাণ্ড, ১১৭ কলম

উত্তমপুরুষে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন হইতে—

কেমনে **বঞ্চিমো** মোঞেঁ একসরী কুঞ্জে। ৩৮৭ পৃঃ
আগু হউ রাধা পাঁছে **লইউ** আহ্মে ভার। ১৮৩ পৃঃ
এথাঁ আণ সঙ্কে আহ্মে দেখী।
আমৃতে **সিঞ্চিউ**[১] দুই আক্ষী॥ ১৯৯ পৃঃ
যুগতী **করিউ** এবেঁ সুন বড়ায়ি ল
তোর মোর এক মনে। ১২০ পৃঃ
চল রাধা পথ এড়ি **যাইউ** বনে বন। ১২১ পৃঃ
আনহ সকল সখিজন
মেলী **করিউ** যুগতী। ১৪১ পৃঃ
সন্ধা পার কর **যাইউ** মথুরার হাটে। ১৫৫ পৃঃ
আইস তোর সঙ্গে **জাইউ** বৃন্দাবন। ৩৫৪ পৃঃ

কৃত্তিবাসের রামায়ণ হইতে—

বিস্তারিয়া কহ মুনি **শুনিউ** কথন। উত্তরকাণ্ড, ৫৬ কলম।

চরিএ <চরিহে <* চরিহএ <চরিহই (অপভ্রংশ) <চরিহিই (প্রাকৃত) <চরিষ্যতি (সং)। তুলনায় প্রাচীন-হি. চরিহই, চরিহহি, ব্রজভাষা চরিহৈ, পূরবিয়া-হি. চরী (<*চরিঈ <*চরিহী)[২]। চরিএ পদটী বড় গোলমেলে। মধ্য বাঙ্গালায় ইহার তিন প্রকার প্রয়োগ পাওয়া যায়। (১) বর্ত্তমানে উত্তমপুরুষের বহুবচনে। আহ্মি চরিএ=সং অস্মাভিঃ চর্য্যতে। (২) বর্ত্তমান কর্ম্মবাচ্যে চরিএ=সং চর্য্যতে। (৩) ভবিষ্যতে প্রথম পুরুষে চরিএ=চরিহে=সং চরিষ্যতি। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে বিকল্পে হ লোপের দৃষ্টান্ত যথা,—বারহ, বার; গোহারী, গোআরী; খাহ=খাঅ। চরিমু, চরিহিমু, চরিমো <চরিহিমো, (প্রাকৃত) <চরিষ্যাম (সং)। চরিউ, চরিউ <* চরিহু <চরীসু (অপভ্রংশ) <চরিস্সং (প্রাকৃত) <চরিষ্যামি (সংস্কৃত)।

ব্যুৎপত্তি হইতে দেখা যাইতেছে, ‘চরিউ’ ও ‘চরিমো’ এই উভয়ের মধ্যে বচন পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তুলনায় বাং চরিউ, চরিউ, ব্রজভাষা চরিহৌঁ (একবচন), মাড়োয়ারী চরহূ (একবচন)[৩]; বাং চরিমু, চরিমো, আসামী চরিম (এক ও বহুবচন), উড়িয়া চরিমি (একবচন), (<প্রাকৃত চরিহিমি)। উড়িয়ার চরিবি পদের বিকারে চরিমি্ নহে, যেমন Hoernle প্রভৃতি মনে করেন (Hoernle, ৩৬৫ পৃঃ; Hallam এর Oriya Grammar, ৪৮১ পৃঃ)। সাহিত্যের ভাষা হইতে নির্ব্বাসিত হইলেও প্রাদেশিক ভাবে ‘চরিমু’ ও ‘চরিমো’ পদের প্রয়োগ আছে। যেমন দিনাজপুরে চরিম্; মালদহে চর্‌মু, রাজবংশী (রঙ্গপুর) চরিম্, চরিমু, চরিমো; ঢাকায় চরুম; সিলহটে চর্‌মু; চাক্‌মায় চরিম; বরিশালে চর্‌মু।

১। মূলে সিঞ্চউ ছাপার ভুল। টীকায় সিঞ্চিউ দেওয়া হইয়াছে।
২। Gaudian Grammar, ৩৫৬ পৃঃ।　　৩। ঐ, ৩৫৮ পৃঃ।

এক সময়ে পশ্চিমবঙ্গ সমেত সমস্ত বাঙ্গালা দেশের সাহিত্যে 'চরিমু' পদের বহুল ব্যবহার ছিল ;—

দৈত্য বলে ঝাট আন মহেশের শূল।
সেনা সনে রাবণার করিমু নির্মূল॥ (কৃত্তিবাস, উত্তরকাণ্ড, ১০৪ পৃঃ)
শাপ অগ্নি দিমু আজি কোন জনে তরি।
শাপ অগ্নিতে পোড়াইব অযোধ্যা নগরী॥ (ঐ, ২৮১ পৃঃ)
কেহ বলে পরাইমু পীত বসন।
চরণে নূপুর দিমু বলে কোহ্ন জন॥
শ্রীকৃষ্ণবিজয় (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৪র্থ সংস্করণ, ১৫৬ পৃঃ)
প্রভু বলে তোমরা সকলে যাহ ঘরে।
মুঞি আর না যাইমু সংসার ভিতরে॥
(বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়, চৈতন্য ভাগবত, ১১৮১ পৃঃ)
আজি তোর গলায় ফেলিমু গোড়পাট।
সবংশে কাটিমু তোর হস্তী ঘোড়া ঠাট॥
(ঐ, জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গল, ১১৫৬ পৃঃ)
হৃদয়ে ধরিমু তোমার কমল-চরণ।
নয়নে দেখিমু তোমার চাঁদ বদন॥ (ঐ, চৈতন্য-চরিতামৃত, ১২২৫ পৃঃ)

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় ভবিষ্যৎ কালেরও প্রয়োগ হয় ; যেমন, সদা সত্য কথা বলিও, কিংবা সদা সত্য কথা বলিবে।

আসামীতেও এইরূপ[১]। পুরবিয়া হিন্দীতেও এইরূপ প্রয়োগ দেখা যায়[২]। এইরূপ প্রয়োগ বাস্তবিক মূলানুযায়ী। কেন না, সং 'তব্য' প্রত্যয় হইতে বা. আ. পুরবিয়া হিন্দী প্রভৃতি ভাষার ভবিষ্যতের ইব, অব প্রত্যয় আসিয়াছে : বাং চলিব <চলিঅব্ব <চলিতব্য। ভবিষ্যৎ অর্থই বরং এই সব ভাষায় নূতন সৃষ্টি।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

পুস্তক-বিবৃতি

১। Grammatik der Prakrit-sprachen, von R. Pischel.
২। A Comparative Grammar of the Gaudian Languages by A. F. Rudolf Hoernle.
৩। An Introduction to the Maithili Dialect of the Bihari Language, Part I, Grammar, by G. A. Grierson.
৪। Oriya Grammar by E. C. B. Hallam.
৫। A Simplified Pali Grammar by E. Müller.
৬। অসমীয়া ব্যাকরণ, হেমচন্দ্র বরুয়া-প্রণীত।
৭। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।
৮। রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড, ঐ।

১। অস. ব্যাকরণ—৯১ পৃঃ। ২। Gaudian Grammar, ৩৫৫ পৃঃ, ৫০৮ প্যারা।

Scale—4⅛ inches = one mile.
উত্তর
রাধাকুণ্ডু জলা
হরিকুণ্ডু জলা
তারাজুলী নদী
দলকাকুণ্ডু জলা
গড় খাই
গড়ের মৃৎ-প্রাচীর
মাত্রাসিদ্ধি ধর্ম্মঠাকুর
গড় খাই
এই স্থানে প্রাচীরের চিহ্ন আছে
জালন্দর বা জালালে পুকুর
বাঘের পুকুর
জালন্দর বা জালালে
বর্ত্তমান চলিত নাম
গড় সুলতানপুর
গড় খাই
গড় খাই
গড় খাই
হনুমান দরজা
ভোবলা বা গড় ভবানীপুর মৌজা
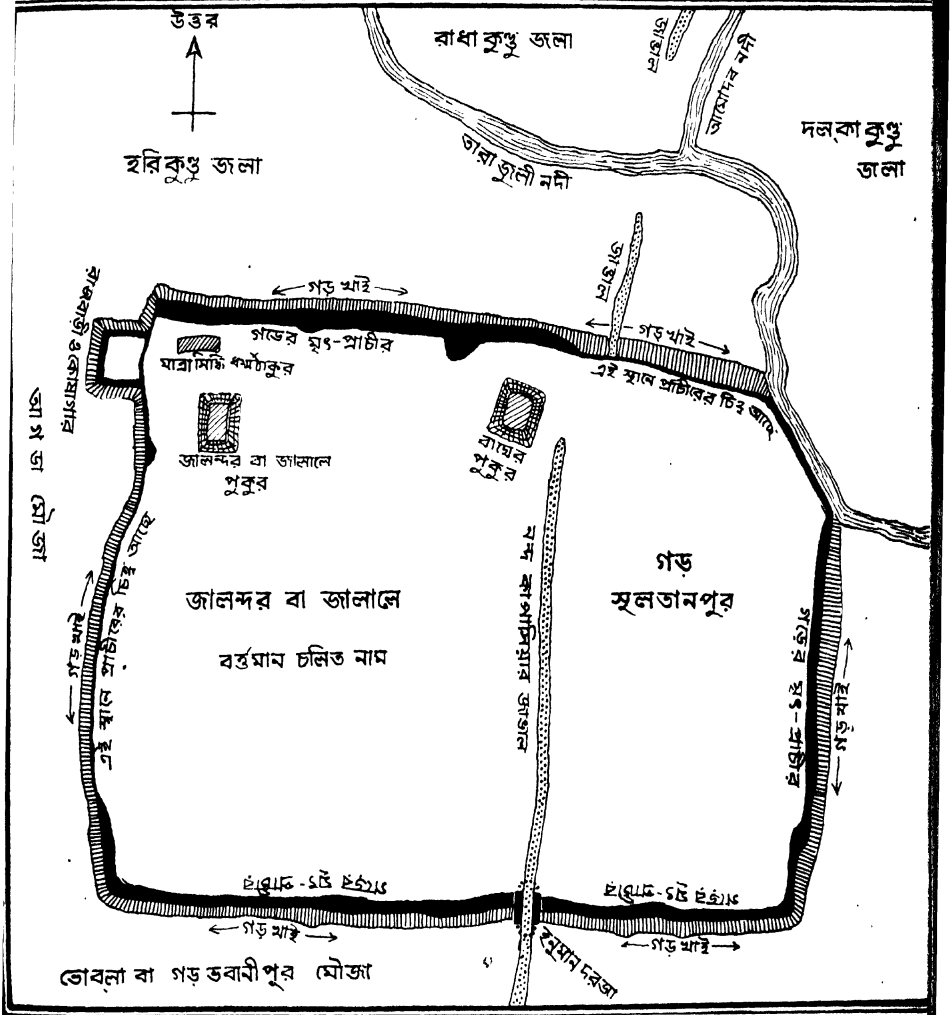
জালন্দার গড়

জালন্দার গড় *

(অস্তিত্বের অনুসন্ধান)

মাণিক গাঙ্গুলী, ঘনরাম প্রভৃতি কবিগণের রচিত ধর্ম্মমঙ্গলে ময়নার রাজা লাউসেনের কামদল বাঘ বধ একটী বিশিষ্ট পালা। লাউসেন, গৌড়াধিপ ধর্ম্মপালের শ্যালিকা রঞ্জাবতীর পুত্র; কর্ণসেন ইঁহার পিতা। ঢেকুরের ইছাই ঘোষের সহিত যুদ্ধে কর্ণসেনের পুত্রগুলি নিহত হয় এবং বৃদ্ধবয়সে রঞ্জাবতীর পাণি গ্রহণ করিয়া, লাউসেন গৌড়েশ্বরের নিকট "ময়নাভুবন" ইনাম পাইয়া তথায় রাজত্ব করিতে থাকেন। লাউসেন ধর্ম্মের সেবক এবং ধর্ম্মের তথা অন্যান্য দেবতাগণের কৃপা তাঁহার উপর যথেষ্ট। গৌড়েশ্বরের দর্শন কামনায় ময়না হইতে যাত্রা করিয়া, তিনি জালন্দার গড়ে কামদল বাঘ বধ করেন।

কামদল বাঘ বধ পালার উপাখ্যানভাগ এইরূপ,—জল্লাদ বা জালানশিখর জালন্দার গড়ের রাজা ছিলেন। একদা মৃগয়ায় গিয়া তারাদীঘীর জঙ্গলে একটী শার্দ্দূল-শাবক প্রাপ্ত হইয়া পুত্রস্নেহে তাহাকে পালন করিতে থাকেন। রূপী বাঘিনীর বেটা কামদল বাঘ দিনে দিনে প্রচণ্ড বিক্রমশালী ও অত্যাচারী হওয়ায় রাজা তাহাকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া রাখেন। কামদল বাঘ ইন্দ্রের নর্ত্তক ছিল; অভিশাপে ব্যাঘ্রজন্ম গ্রহণ করে। জালানশিখর শৈব ছিলেন—তাঁহার ভক্তি পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত হরপার্ব্বতী ভিক্ষার্থ আগমন করেন। রাজা দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ ভিক্ষা না দিয়া, কুক্কুর "লেলাইয়া" দেন। দেবী কুপিতা হইয়া কামদলকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিলে, কামদল বাঘ নগর ছারখার করিয়া দেয়। রাজা প্রাণভয়ে গৌড়ে আশ্রয় লয়েন। পরে গৌড়েশ্বরও সদলে ব্যাঘ্র দমনে আসিয়া, ব্যাঘ্ররাজ কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া পলায়ন করেন। সেই অবধি কামদল জালন্দার গড়ে রাজা হইয়া বসে ও অজেয় হইয়া উঠে। লাউসেন পরে তাহাকে মারিয়া ফেলেন।

গৌড়ের রাজা ধর্ম্মপাল ও ধর্ম্মমঙ্গলের ধর্ম্মপাল একই কি না, এ বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও দশম ও একাদশ শতাব্দীতে লাউসেনের স্থিতিকাল বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণের দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে। ধর্ম্মমঙ্গলের বর্ণিত অনেক স্থানের ও গড়-বাড়ীর নিদর্শন এখনও পাওয়া যায়। জালন্দার গড়ের সংবাদ আজ পর্য্যন্ত কেহ লয়েন নাই এবং তাহার অস্তিত্ব দেখাইতেই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

জালন্দার গড়ের নিদর্শন এখন যেখানে পাওয়া যায়, সেই গ্রামের নাম সুলতানপুর। ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত তল্পে বরদার মধ্যে ঐ গণ্ডগ্রামখানি অবস্থিত। ঘাটাল পাকা রাস্তা হইতে বরদার নিকট উত্তর মুখে খড়ার গ্রাম হইয়া একটী রাস্তা গিয়াছে এবং ঐ রাস্তাটী সুলতানপুর গ্রামে গিয়া শেষ হইয়াছে। তৎপরে ঐ গ্রামের জলার মধ্যে স্থানে স্থানে ঐ রাস্তার কিয়দংশ এখনও দৃষ্ট হয়। লোকে সাধারণতঃ ইহাকে "নন্দকাপাসিয়ার জাঙ্গাল" বলে। আমাদের মেদিনীপুর জেলার

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৩০শ বার্ষিক ৬ষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

একাধিক ইতিহাস রচিত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কেহই ইহার উল্লেখ করেন নাই। পুরাকালে এই জাঙ্গালটী একটী বিশিষ্ট রাজবর্ত্ম ছিল, এবং ইহা পুরী যাইবার রাস্তার সহিত পাঁশকুড়ার নিকট মিশিয়াছে। মোগল পাঠানের আমলে বাদসাহী রাস্তা বা সাহী সড়ক[১] জাহানাবাদ (বর্ত্তমান আরামবাগ) হইতে গোয়ালপাড়া (বর্ত্তমান পাঁশকুড়ার সন্নিকট) অবধি বিস্তৃত ছিল। ঐ রাস্তাটী গড়মান্দারন হইতে দারুকেশ্বর নদের কূলে কূলে চিতুয়া অবধি দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখে পাঁশকুড়া অবধি গিয়াছে এবং তথা হইতে মেদিনীপুর হইয়া সুবর্ণরেখার তীরে পুরীরাস্তার সহিত মিলিত হইয়াছে। উত্তর দিক্ হইতে মেদিনীপুর, তথা পুরীধাম যাইবার এইটিই প্রশস্ত রাস্তা ছিল। মোগল পাঠান যুদ্ধের সময় বাদসাহী ফৌজ বহুবার এই রাস্তায় যাতায়াত করিয়াছে। প্রবাদ যে, নন্দকাপাসিয়া নামক একজন উত্তরাঞ্চলের বস্ত্রব্যবসায়ী এই জাঙ্গালটী নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। ঐ রাস্তাই তৎকালে দক্ষিণে যাইবার short cut ছিল। বরদারাজ শোভাসিংহও বিদ্রোহী হইয়া, এই রাস্তা দিয়াই সৈন্য লইয়া গিয়া বর্দ্ধমান প্রভৃতি আক্রমণ করেন। তারাজুলী ও দামোদর নদ এই গড়খাইএর উত্তরে মিলিত হইয়া পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। এই স্থানটী প্রাচীন কালের দুর্গনির্ম্মাণের বেশ উপযোগী ছিল। নন্দকাপাসিয়ার জাঙ্গাল গড়ের মধ্যস্থল ভেদ করিয়া গিয়াছে এবং দক্ষিণ দিকে যেখানে গড়ে প্রবেশ করিয়াছে, সেখানে একটী বিস্তৃত দ্বার ছিল, তাহাকে এখনও 'হনুমানদরজা' বলিয়া থাকে এবং ইহার ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। গড়ের উত্তর পূর্ব্ব কোণে দল্‌কাকুণ্ড নামে একটী জলা বা বিল আছে। ঐখানেই তারাজুলী ও দামোদর প্রবাহিত হইত। এক্ষণে সরকারী বাঁধের কল্যাণে ঐ নদীদ্বয়ের মুখ বন্ধ হইয়া যাওয়ায় একটী জলা বা বিলে পরিণত হইয়াছে। দল্‌কাকুণ্ড পূর্ব্বকালে দল্‌কি সহর ছিল বলিয়া প্রবাদ এবং ঐ স্থানে সময়ে সময়ে ইষ্টকাদি-নির্ম্মিত গৃহাবশেষ ও ঘাট-বাঁধান পুষ্করিণী দেখা যাইত। ঐ স্থান হইতে একটি সুন্দর প্রস্তর-নির্ম্মিত শিবের লিঙ্গমূর্ত্তি উদ্ধার হইয়া, গ্রামের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বুড়া শিব বলিয়া পরিচিত আছেন। দল্‌কা নামটী কামদল নামের সহিত সাদৃশ্য আছে। আরামবাগ-গোঘাটের প্রসিদ্ধ ধর্ম্মঠাকুর স্বরূপনারায়ণের "কামিনী" স্বপ্নাদেশে দল্‌কার জলা হইতে পাওয়া গিয়াছে বলিয়া জানা গেল।

গড়ের মৃৎপ্রাচীর, যাহা এখনও অবশিষ্ট আছে, তাহা স্থানে স্থানে ৬০।৭০ ফুট উচ্চ এবং চতুর্দ্দিকে প্রায় এক মাইল ব্যাপিয়া এই প্রাচীর দেওয়া ছিল। গড়ের বায়ুকোণে "জালালে পুকুর" নামক একটী অতি বিস্তৃত দীর্ঘিকা ছিল, এক্ষণে তাহার অনেক মজিয়া গিয়াছে। উহার অতি

১। Badshahi Road—This road starting from Jehanabad where it was joined by roads from Burdwan and Satgaon went south-west to Mandaran, thence south-east along the Darkesvar River to Chitwa in Daspur Thana and thence nearly south to Goalpara near modern Panskura. From this place it apparently passed due east to Midnapur following very much the same line as the Grand Trunk Road and from Midnapur it ran a little to the west of the Orissa Trunk Road through old villages Kesiari and Gageneswar until it joined the Subarnarekha at Jaleswar.

Bengal District Gazetteer.

সন্নিকটে প্রাচীরের বাহিরে কতকটা খালি জায়গা পড়িয়া আছে এবং তদুপরি ইষ্টকাদি স্তুপাকারে রহিয়াছে। এইখানে রাজবাড়ী ও কোষাগার ছিল বলিয়া প্রবাদ। ঐ স্থানেই "যাত্রাসিদ্ধি" নামক "ধর্ম্মবিগ্রহ" বাগ্দি পণ্ডিতগণের দ্বারা অদ্যাপি পূজা পাইয়া আসিতেছেন। পণ্ডিতেরা বলেন, ঐ ঠাকুর রাজা লাউসেনের প্রতিষ্ঠিত। পূর্ব্বে ঠাকুরের পাকা মন্দির ছিল, তিনি এক্ষণে কাঁচা ঘরে আছেন। ঐ পণ্ডিতের নিকট আমি দ্বিজ রূপরামকৃত ধর্ম্মমঙ্গলের হস্তলিখিত পুঁথি প্রাপ্ত হইয়াছি। গড়ের নৈঋর্ত কোণে গড়ভবানীপুর বা ভোব্লা নামক মৌজায় বাসুলী দেবী গড়রক্ষাকারিণী বলিয়া পরিচিত আছেন। জাঙ্গালের অনতিদূরে "বাঘের পুকুর" নামে একটী পুষ্করিণী আছে, তথায় কামদল বাঘ লাউসেন কর্ত্তৃক হত হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ। কামদল বধ করিয়া লাউসেন জালন্দার গড়ের উত্তরে তারাদীঘীতে কুম্ভীর বধ করিয়াছিলেন। গড়ের উত্তরে তারাজুলী নামক নদী এবং তদুত্তরে তারাহাট নামক একটী প্রাচীন পল্লী ও একটী প্রকাণ্ড দীঘীর অবশেষ এখনও বিদ্যমান আছে।

প্রবাদ ও কাহিনীতে এই স্থান "জালন্দার গড়" বলিয়া ধরা যায়। কিন্তু ধর্ম্মমঙ্গলকারদিগের গৌড়ের পথের বর্ণনায় জালন্দাভূমি বর্দ্ধমানের উত্তর বলিয়া জানা যায়। পথের বর্ণনায় কবিগণ সকলেই প্রায় এক-মতাবলম্বী। ময়নাগড় মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত এবং বর্ত্তমান তমলুক হইতে ১৩।১৪ মাইল। কিন্তু কোন কবিই "জাহানাবাজ" বা বর্ত্তমান আরামবাগের দক্ষিণের পথের বর্ণনা বিশেষ ভাবে করেন নাই। ময়না হইতে তৎকালে আসিতে হইলে নিশ্চয় "নন্দকাপাসিয়ার জাঙ্গাল" দিয়া আসিতে হইত। কারণ, তখন অন্য কোন পথ ছিল না। পাঁশকূড়া হইতে বরদা হইয়া ঐ জাঙ্গাল ঘাটালের রাস্তায় মিশিয়া, আবার উত্তর মুখে বরাবর জালন্দার গড়ের ভিতর দিয়া জাহানাবাদে (জানাবাজে) পৌছিয়াছে। যে স্থানে ঘাটালের রাস্তায় মিলিয়াছে, সেখানে "সরণি" "তিন মুখে" গিয়াছে। ঘনরাম বলিতেছেন,—

লাউসেন ও কর্পূর সেন—

গুরুপদ ভাবি যান পরম কৌতুকে।
কতদূরে সরণি দেখেন তিনমুখে ॥
লাউসেন কন ভায়া এবে চল আগে।
পথে দাঁড়াইতে নারি যাব কোন দিগে ॥
এতেক কহিল যদি সরস চাতুরী।
কর্পূর কহেন দাদা নিবেদন করি ॥
অগ্রগামী তোমার কখন আমি নই।
ভালমন্দ পথের বিশেষ কথা কই ॥
যদি যাব মহাশয় পশ্চিম সরণি।
দেখিবে দ্বারকাপুরী অযোধ্যা অবনি ॥
মথুরা গোকুল গয়া গোবর্দ্ধন গিরি।
মধুর শ্রীবৃন্দাবন কাশী বিশ্বপুরী ॥

এ সকল পুণ্যস্থান করিয়া ভ্রমণ।
ছমাসের পরে যাবে গৌড়ভুবন॥
ঈশান অখিলখণ্ডে যদি যাও ভাই।
তিনমাসে তরণী সরণি সুখে যাই॥
বিরাট তনয় মুখে যদি কর ভর।
ছদিনে পাইবে রাজ্য গৌড় সহর॥

পূর্ব্বোক্ত জাঙ্গালটী যে স্থানে ঘাটালের রাস্তার সহিত মিশিয়াছে, তথায় "তেমাথানি" হইয়াছে। এই তেমাথানি হইতে একটী পথ পশ্চিম দিকে যাইয়া "পুরাতন রাণীগঞ্জ সড়কে" (old Ranigunj Road) মিশিয়াছে এবং এই পথ দিয়াই পূর্ব্বে লোকে হাঁটিয়া "পশ্চিমে" তীর্থ করিতে যাইত। ঈশান কোণ অভিমুখে পথের আর এক মুখ বরাবর বর্ত্তমান সালকিয়া[১] অবধি গিয়াছে এবং ঐ পথে গৌড় যাইতে হইলে সরস্বতী নদী বাহিয়া গঙ্গা দিয়া নৌকাযোগে যাইতে হইত। উত্তরমুখে বরাবর চলিলে জালন্দার গড় হইয়া শীঘ্র গৌড়ে যাইতে পারা যাইত। তাই লাউসেন কহিলেন,—

বিলম্বে নাহিক কার্য্য শীঘ্র চল ভাই।
ছমাস ছাড়িয়া ছদিনের পথে যাই॥
তরাসে তখন ফুটে কহেন কর্পূর।
ও পথের নামে প্রাণ করে দুর দুর॥
লাউসেন বলে কেন কিবা বল ভয়।
কর্পূর কহেন শুন দাদা মহাশয়॥
আগে ঐ অন্ধকার "জালন্দার গড়"।
গৌড়পতি প্রাণ লয়ে যায় দিল রড়॥—ইত্যাদি॥

সুতরাং এখানে পথের সহিত বর্ণনা মিলিয়াছে। কেবল "জানাবাজ" যাইবার পূর্ব্বে এই "জালন্দার গড়ের" বর্ণনা পাইলে ইহা যে নিশ্চয় সেই জালন্দার গড়, তাহা নিঃসংশয়ে অনুমান করা যাইত। এই সঙ্গে একখানি মানচিত্র দেওয়া গেল এবং আবশ্যকীয় স্থানগুলি চিহ্নিত করা হইয়াছে।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, উল্লিখিত স্থানটী "জালন্দার গড়" বলিয়া বিশেষ প্রতীতি হয় এবং প্রবাদ ও কিম্বদন্তী তথায় লোকের মুখে মুখে আজও পূর্ব্বের ন্যায় প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। ঐ স্থানটী বাগ্দিপ্রধান। এই বাগ্দিদেরই রাজা কামদলকে বাঘ বলিয়া

১। Salkhia as a centre from which four Roads radiated + + + + The fourth connected Salkhia with Tanna Fort and turned west to Sankrail and Amta where it bifurcated—one branch going to Ghatal and Khirpai and the other south-west to Midnapur.—Bengal District Gazetteer.

পরিচিত করা হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস। এই বাগ্দিরা এক্ষণে সামান্য কৃষিজীবী হইলেও, এখনও তাহারা আপনাদিগকে বিশেষ মর্য্যাদাবান্ মনে করে। কারণ, তাহারা সেখানের "রাজার জাতি"; তাহাদেরই কামদল বাঘ এককালে ঐ স্থানের অধিপতি ছিল। বাগ্দিদের ব্রাহ্মণ পৃথক্ এবং ঐ ব্রাহ্মণবংশ এখনও রাজপুরোহিত আখ্যায় ভূষিত ও গর্ব্বান্বিত। আমার আরও বিশ্বাস, ঐ স্থানের অনতিদূরে কবিকঙ্কণের "কালকেতুর" লীলাক্ষেত্র ছিল এবং তাহার রাজধানী গুজরাটের কিছু কিছু সন্ধান পাইতেছি এবং অন্যান্য উপাদান সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছি।

শ্রীমৃগাঙ্কনাথ রায়

বৈষ্ণব-সাহিত্যে সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ *

হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থান ও বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠা

বাঙ্গালার আদি বৈষ্ণব কবি জয়দেব যে দিন তাঁহার "কোমল-কান্ত-পদাবলী" গাহিয়া সারস্বত কুঞ্জ মুখরিত করিয়া তুলিলেন, সেই দিন বাঙ্গালার জাতীয় জীবনে প্রাণপুরুষের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, এই পরিচয় পাওয়া গেল। বাঙ্গালার প্রকৃতিতে যেন শ্রীরাধাকৃষ্ণের মধুর লীলার ভাব-রহস্য নিহিত রহিয়াছে। জ্যোৎস্না-প্লাবিত রজনীতে "শারদোৎফুল্লমল্লিকা" দর্শনে যদি কোন দেশের প্রাণ নাচিয়া উঠে, তবে সে আমার এই বঙ্গদেশের। এই দেশের জলে স্থলে বাতাসে যেন বৈষ্ণব-গীতিকবিতার সুর মাখান রহিয়াছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ হইতে উদ্ভূত "ভক্ত," "ভাগবত," "বৈষ্ণব," "বৈখানস" প্রভৃতি প্রাচীন সম্প্রদায় বা বর্ত্তমানের "শ্রী," "ব্রহ্ম," "রুদ্র" বা "সনক"-সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা প্রভুভাবের অনন্তমূর্ত্তি বা নারায়ণমূর্ত্তি বা বড় জোর লক্ষ্মীনারায়ণ-মূর্ত্তি। শ্রীবালগোপাল উপাসনায় বাৎসল্য রসেই ভারতীয় মাধুর্য্য-রস-সাধনার চরম উৎকর্ষ প্রকটিত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত-প্রণেতা শ্রীবিল্বমঙ্গল প্রভৃতি দুই চারিজন মহাভাগ্যবান্ সাধক শ্রীরাধাকৃষ্ণের মধুরলীলার রস আস্বাদন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধার প্রেম-মাহাত্ম্য আমাদের এই বঙ্গদেশেই প্রণালীবদ্ধভাবে উপলব্ধ ও প্রচারিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশই মধুর-রস-ভজনের প্রকৃষ্ট স্থান দেখিয়া পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পাদে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুরূপে প্রেম মূর্ত্তিমান্ হইয়া এই দেশে প্রকটিত হইয়াছিল। এই দেশের অন্যান্য সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়েরই উদ্ভব বঙ্গবহির্ভূত কোন প্রদেশে। কেবলমাত্র শ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলা উপাসনাযুক্ত বৈষ্ণবধর্ম্মই এই দেশের বক্ষোভেদ করিয়া উত্থিত হইয়াছে। তাই বৈষ্ণবগীতি-কবিতা বাঙ্গালার একবারে নিজস্ব সম্পত্তি, আর এই গীতিকবিতার আলোচনায় বাঙ্গালীর প্রাণ যতটা মাতিয়া উঠে, এত আর কিছুতেই উঠে না। ইহুদি জাতির প্রাণ লুক্কায়িত যেমন ধর্ম্মের মধ্যে, প্রাচীন গ্রীসের যেমন ছিল কলা-সাহিত্যের মধ্যে ও রোমের শৃঙ্খলা ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে, তেমনি মনে হয়, বাঙ্গালার প্রাণ লুক্কায়িত আছে বৈষ্ণব গীতি-কবিতার মধ্যে। তাই কবি জয়দেবের "গীতগোবিন্দ" দ্বারা বাঙ্গালার জাতীয় জীবন-প্রতিষ্ঠা সূচিত হইল। ভাব-প্রবণ বাঙ্গালী মধুর পদাবলীর মধ্যে তাহার অন্তরতম ভাবকে খুঁজিয়া পাইল।

রাষ্ট্রীয় বিপ্লব ও আবর্ত্তন এতকাল এই জাতীয় জীবনের নিজস্ব ভাবস্রোতের গতি রুদ্ধ করিয়াছিল। প্রিয়দর্শী অশোকের সময় হইতে স্কন্দগুপ্তের সময় পর্য্যন্ত বঙ্গের ভাগ্যচক্র সমগ্র উত্তরাপথের ইতিহাসের সহিত আবর্ত্তিত হইত। গুপ্তবংশের অধঃপতনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া ধর্ম্মপালদেবের অভ্যুদয় পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ হয় কামরূপ, কান্যকুব্জ, গুর্জ্জর বা রাষ্ট্রকূটের অধিপতিগণ দ্বারা আক্রান্ত হইত। পালবংশের শাসনকালেই সমগ্র বঙ্গদেশ যথার্থভাবে নিজস্ব শাসনকর্ত্তা পাইল। পরাক্রম-

---

* ব্যোমকেশ মুস্তফী সুবর্ণপদক প্রাপ্ত।

শালী পালরাজগণ বঙ্গ, গৌড়, রাঢ়, বরেন্দ্র, মিথিলা প্রভৃতি বঙ্গদেশের খণ্ডাংশগুলিকে স্বীয় অধিকারে আনিয়া সর্ব্বপ্রথমে এই দেশকে একটী রাষ্ট্রীয় একতা প্রদান করিলেন। কিন্তু তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্ম পালরাজগণের কুলধর্ম্ম হওয়ায় প্রজাসাধারণকে এই ধর্ম্ম মানিয়া চলিতে হইত। সুতরাং রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য হইলেও ভাবস্বাতন্ত্র্য তখনও বাঙ্গালার লাভ হয় নাই। সেনরাজগণ এই দেশের শৈব ও বৈষ্ণব রাজা ছিলেন। তাঁহাদের সময় হইতেই বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিক্রিয়াস্বরূপে হিন্দুধর্ম্মের পুনর্জ্জাগরণ আরম্ভ হয়। এই আন্দোলনকে আমরা Hindu Renaissance বা হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থান নামে অভিহিত করিতে পারি।

পেট্রার্কের ইতালীয় ভাষায় লিখিত লরার প্রতি প্রেমের কবিতাগুলিই যেমন ইউরোপের Renaissanceএর সূচনা করিয়াছিল, আমাদের দেশেও সেইরূপ জয়দেবের কবিতা নব জাগরণের সূত্রপাত করিল। গীতগোবিন্দের পদাবলী বাঙ্গালীর হৃদয়ের পুঞ্জীভূত ভাবরাজিকে যেন ভাষা প্রদান করিল—সে ইহাতে এতই মুগ্ধ হইল যে, এই মধুর ভাবকে জাতীয় জীবনের চরম সাধনারূপে স্থাপিত করিবার জন্য সে বদ্ধপরিকর হইল। জয়দেব বাঙ্গালী—তাঁহার কবিতা সংস্কৃত সমাস ও বিভক্তিযুক্ত হইলেও কোমলতায় ও পদসারল্যে তাহা বাঙ্গালাই। জয়দেবের সময় বঙ্গদেশ আত্মানুসন্ধানের পথে দাঁড়াইয়াছিল। জাতীয় ভাষার উন্নতি ব্যতীত জাতীয় জাগরণ স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পারে না। 'প্রাকৃতচন্দ্রিকায়' কৃষ্ণ পণ্ডিত (দ্বাদশ শতাব্দী) গৌড়ীয় ভাষাকে স্থান দান করিয়াছেন; তাহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, ইতালীর ন্যায় বাঙ্গালীও নবজাগরণের প্রারম্ভে নিজস্ব ভাষার উন্নতিতে মনোনিবেশ করিয়াছিল।

দ্বাদশ শতাব্দী হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইতালীর নবজাগরণের যুগ। ঐ সময়ে ইতালী বিদেশীয় আক্রমণ ও অত্যাচারে এবং স্বদেশীয়গণের গৃহবিবাদে জর্জ্জরিত। কিন্তু এত রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের মধ্যেও ইতালী একনিষ্ঠভাবে ইউরোপের মুক্তির জন্য সাধনা করিতেছিল। বঙ্গদেশও ঠিক ঐ সময়েই পাঠান আক্রমণ ও অধিকারের ফলস্বরূপ রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থানের জন্য প্রাণপণ সাধনা করিতেছিল।

কিন্তু এই সাধনার দুইটী প্রধান অন্তরায় ছিল। নবজাগরণের আন্দোলন এই অন্তরায়দ্বয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইয়া শক্তিই সঞ্চয় করিয়াছিল এবং তাহারই ফলে ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব-সাহিত্যে হিন্দুজীবনের এক নব অভ্যুদয়ের চিত্র দেখিতে পাই। বাঙ্গালার ধর্ম্মে কর্ম্মে ও জ্ঞানে জাতীয় ভাববিকাশের প্রধান অন্তরায় ছিল তথাকথিত বৌদ্ধধর্ম্ম। দ্বাদশ শতকের শেষ পাদেও বঙ্গদেশে যে বুদ্ধদেবের পবিত্র নাম পূজিত হইত, তাহার প্রমাণ জয়দেবের দশাবতারস্তোত্রের মধ্যে বুদ্ধদেবের স্তোত্র হইতে পাওয়া যায়। ভোটদেশীয় বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস-লেখক তারানাথ খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতেও বঙ্গে বৌদ্ধ নিদর্শন দেখিয়াছিলেন। ১৬০৮ খৃঃ অঃ তিব্বতদেশীয় পণ্ডিত বুদ্ধগুপ্তনাথ বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের অল্প পরিমাণ প্রভাব দেখিতে পাইয়াছিলেন। আজও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব এ দেশ হইতে একবারে বিলুপ্ত হয় নাই, তাহা ধর্ম্মঠাকুরের প্রকৃত তত্ত্ব বাহির করিয়া মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় ঘোষণা করিয়াছেন।

প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম্ম কিন্তু বহুকাল পূর্ব্বেও ভারতবর্ষে লোপ পাইয়াছিল। মন্ত্রযান ও বজ্রযানের সম্মিলনজাত এক অপধর্ম্ম পালরাজগণের সময়ে বঙ্গদেশকে অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। এই অপধর্ম্মের আচার ব্যবহার বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার জাতীয় জীবনের উপর এতই কলুষিত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত স্ত্রীপুরুষের মধ্যে শ্লীলতার স্বাভাবিক ব্যবধান অতি অল্পই রক্ষিত হইত। তথাকথিত বৌদ্ধগণের আচার ব্যবহার অত্যন্ত কদর্য্য ছিল বলিয়া বোধ হয়, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বৌদ্ধগণ আলাপের—এমন কি, দর্শনের পর্য্যন্ত অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

যদ্যপি অসম্ভাষ্য বৌদ্ধ অযুক্ত দেখিতে।
তথাপি বলিলা প্রভু গর্ব্ব খণ্ডাইতে ।.২৮—৮।

"বাঙ্গালার ইতিহাসে" শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, "মুসলমানগণের বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি যত বিদ্বেষ ছিল, হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি তত অধিক ছিল না।" কিন্তু বাঙ্গালার হিন্দু অভ্যুদয়ের আন্দোলন শুধু মুসলমানগণের উপরই সদ্ধর্ম্মের বিলোপনের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত ছিল না। বঙ্গ-নিকুঞ্জের মধুর পিক চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি বাঙ্গালীর প্রাণের গান বৈষ্ণব-পদাবলী গাহিয়া জনসাধারণের মনোহরণ করিতেছিলেন। এই অপূর্ব্ব পদাবলীর মোহন ধ্বনিতে বাঙ্গালীর প্রাণের গোপন তন্ত্রী বাজিয়া উঠায় দলে দলে লোক হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত মধুর রসের উপাসনার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। ইহা ছাড়া প্রাচীন হিন্দু পুরাণ ও ইতিহাসগুলির যথেষ্ট আলোচনা হইতে লাগিল। দেশের ভাষায় না বলিলে দেশবাসী জনসাধারণের প্রাণস্পর্শ করিবে না জানিয়া, রামায়ণ, মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতের বহুল অনুবাদ হইতে লাগিল। ইহার ফলেও নরনারী হিন্দুধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। বৌদ্ধতন্ত্রের স্থলে হিন্দুতন্ত্র ব্যাখ্যাত হইতে আরম্ভ করিল। চণ্ডী, মনসা, শীতলা প্রভৃতি লৌকিক দেবতার পূজার প্রচলন দ্বারাও হিন্দুধর্ম্ম সাধারণের মন আকর্ষণ করিল। এইরূপে বৌদ্ধ ধর্ম্মের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইয়া বাঙ্গালা দেশে জাতীয় ভাষা ও জাতীয় ভাবের প্রতিষ্ঠা হইল।

হিন্দু ধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থানের দ্বিতীয় শত্রু হইয়াছিল মুসলমান ধর্ম্ম। মুসলমানগণ বঙ্গদেশ অধিকার করার পর শুধু যে তরবারির সাহায্যে তাঁহাদের ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা নহে। অবশ্য অনেকেই রাজানুগ্রহ লাভের আশায় বা রাজ উৎপীড়নের ভয়ে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু এক শ্রেণীর লোক মুসলমান পীর ও তাপসগণের মহান্ ধর্ম্মপ্রবণতায় আকৃষ্ট হইয়াও ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার হিন্দুসমাজের নিকৃষ্ট জাতিসমূহও উচ্চ সম্মান লাভের আশায় রাজধর্ম্মে যোগদান করিয়াছিলেন। এই ত্রিবিধ আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য হিন্দুসমাজ বদ্ধপরিকর হইল। হিন্দুসমাজের, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণের শিথিলপ্রায় আচার ব্যবহার আবার সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য স্মৃতিশাস্ত্রের পুনরালোচনা হইতে লাগিল। প্রাচীন স্মৃতির যে সমস্ত অনুশাসন কালোপযোগী নহে, তাহা বাদ দিয়া ও যে সমস্ত আচার সমাজ রক্ষার জন্য সবিশেষ প্রয়োজন, তাহা স্মৃতিশাস্ত্রের অন্তীভূত করিয়া এক নব্য স্মৃতি রচিত হইতে লাগিল। একদিকে

এই নব্য স্মৃতির সৃষ্টি হয় নাই ; দুই তিন শতাব্দী ধরিয়া হিন্দুসমাজকে মুসলমান প্রভাব হইতে রক্ষা করিয়া সুসংস্কৃত করিবার যে আন্দোলন চলিতেছিল, তাহারই ফলস্বরূপ হইতেছেন স্মার্ত্ত রঘুনন্দন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি যে, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয়ের নিকট রঘুনন্দনের পূর্ব্ববর্ত্তী স্মার্ত্তগণের স্মৃতিনিবন্ধের পুথি আছে। সেই পুথি হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, রঘুনন্দনের স্মৃতির অধিকাংশই তাঁহার নিজের লেখা নহে। সুতরাং নব্য স্মৃতি ব্যক্তিবিশেষের মস্তিষ্কপ্রসূত নহে, বাঙ্গালার নব জাগরণের আন্দোলনের ফল, তাহা প্রমাণিত হইল।

হিন্দুসমাজ শুধু স্মৃতিশাস্ত্র রচনা করিয়াই সমাজ রক্ষা সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট হন নাই। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চ জাতির মধ্যে বৌদ্ধ বা মুসলমান ধর্ম্মের সংস্পর্শে যে সমস্ত গলদ ঢুকিয়াছিল, তাহাও পঞ্চদশ শতাব্দীতে নব জাগরণের দিনে বিদূরিত হইল। ১৪৮০ খৃঃ অঃ দেবীবর ঘটক রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণ-সমাজের সংস্কার সাধন করিয়া মেল নিয়ম প্রচলিত করিলেন। এই ঘটনার কিছু কাল পূর্ব্বে বারেন্দ্র-কুলশাস্ত্র-বিশারদ উদয়নাচার্য্য, ভাদুড়ী বারেন্দ্র কুলীন-সমাজকে আটটী পটিতে বিভক্ত করেন। এ দিকে দক্ষিণবঙ্গে দেবীবরের সমকালবর্ত্তী পরমানন্দ বসু দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজে পুত্র পৌত্রাদিক্রমে সমান পর্য্যায়ে বিবাহ দিবার কুলবিধি প্রচারিত করিয়াছিলেন। এই সময়ে চন্দ্রদ্বীপেও রাজা পরমানন্দ রায় বঙ্গজ কায়স্থদিগের সামাজিক কুলাচার সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম অবধারণ করিয়া যান।

পদাবলী, পুরাণ, ইতিহাস, তন্ত্র ও স্মৃতির আলোচনা ছাড়া নব্য ন্যায়ের চর্চ্চাও বঙ্গদেশে হিন্দু-ধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থানের, তথা বাঙ্গালীর নব জাগরণের, বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। মিথিলা এই নব্য ন্যায়ের আদিস্থান ছিল। বৌদ্ধ ও মুসলমান ধর্ম্মকে যুক্তি দ্বারা পরাভব করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপনের জন্য নব জাগরণের আন্দোলন তর্কশাস্ত্রের সাহায্যেই বৌদ্ধ ধর্ম্মকে পরাভূত করিয়াছিল। যথা,—

তর্কপ্রধান বৌদ্ধশাস্ত্র নব মতে।
তর্কেই খণ্ডিল প্রভু না পারে স্থাপিতে॥
বৌদ্ধাচার্য্য নব নব প্রশ্ন উঠাইল।
দৃঢ় যুক্তি তর্কে প্রভু খণ্ড খণ্ড কৈল॥—চৈঃ চঃ।

বঙ্গদেশে কিয়ৎকাল বসবাস করিবার পর এই দেশের শাস্ত্র ও আচার ব্যবহার জানিবার জন্য মুসলমানগণের মধ্যে এক প্রকার আগ্রহ জন্মিল। মুসলমান অধিপতিগণ উৎসাহ দিয়া মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি অনুবাদ করাইলেন। তাহাতে বঙ্গভাষার সমৃদ্ধি সাধন হওয়ায় বাঙ্গালার নব জাগরণের যথেষ্ট আনুকূল্য সাধিত হইয়াছিল।

এই নব জাগরণের আন্দোলন ফলে বঙ্গদেশ সমগ্র ভারতবর্ষের সহিত অন্তরের যোগ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও নিজের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করিল। ইউরোপীয় Renaissanceএ যেমন প্রাচীন গ্রীক ও লাটিন সাহিত্যের আলোচনার ফলে দেশব্যাপী এক নব জীবনের সঞ্চার হইয়াছিল এবং পরিণামে

জাতীয়ভাব প্রচারিত হইয়াছিল, আমাদের দেশেও তদ্রূপ বিদ্যালোচনার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশের জাতীয়ভাব বিকশিত হইল। রঘুনন্দনের স্মৃতি বঙ্গদেশ ব্যতীত আর কোথাও প্রচলিত নাই। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ সমগ্র তন্ত্রের সার উদ্ধার করিয়া বাঙ্গালার শক্তি-পূজার এক অভিনব সুগম পন্থা আবিষ্কার করিয়া দিয়া গেলেন। আর কাণভট্ট শিরোমণি তাঁহার অলোকসামান্য প্রতিভার প্রখর জ্যোতিঃসম্পাতে নব্য ন্যায়দর্শনকে বাঙ্গালীর নিজস্ব সম্পত্তিরূপে পরিণত করিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে বঙ্গের বিদ্যাপীঠ নদীয়ার উপাধি ভারতীয় পণ্ডিতসমাজে তাদৃশ শ্রদ্ধা পাইত না, তিনি নদীয়ার উপাধিকে ভারতের শ্রেষ্ঠ উপাধি করিলেন।

বঙ্গদেশে পীঠস্থান ছাড়া তীর্থ ছিল না—মহাপ্রভু নবদ্বীপকে বঙ্গের তীর্থ করিয়া তুলিলেন। বঙ্গদেশ যে ভারতের গতানুগতিক চিন্তাধারা বর্জ্জন করিয়া স্বাধীনভাবে নিজের জাতীয় জীবনের সমস্যার সমাধান করিতে পারে, নব্য ন্যায়, নব্য স্মৃতি, তন্ত্র ও বিশেষ করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মদ্বারা তাহাই প্রমাণীকৃত হইল। এই স্বাধীনভাবে চিন্তা করাই নব জাগরণের বৈশিষ্ট্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্ব অবস্থা বর্ণনা করিতে যাইয়া বৈষ্ণব কবিগণ বিদ্যা-জগতের এক মহা সমৃদ্ধ অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ বর্ণনার যাথার্থ্য যাহাতে আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি, তজ্জন্য বঙ্গের নবজাগরণের ইতিহাসের সংক্ষেপে আলোচনা করিলাম। বাঙ্গালার পরবর্ত্তী সামাজিক ইতিহাস বুঝিবার পক্ষেও এই নবজাগরণের ইতিহাস অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

বৈষ্ণব-সাহিত্যে নবজাগরণের চিত্র

ইতালীর ফ্লরেন্সের ন্যায় নবদ্বীপ নবজাগরণের আন্দোলনের কেন্দ্রস্বরূপ হইয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে নবদ্বীপ বিদ্যারসে একেবারে উন্মত্ত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

নবদ্বীপের সম্পত্তি কে বর্ণিতে পারে।
একো গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে॥
ত্রিবিধ বয়সে একো জাতি লক্ষ লক্ষ।
সরস্বতীদৃষ্টিপাতে সভে মহাদক্ষ॥
সভে মহা অধ্যাপক করি গর্ব্ব ধরে।
বালকেহো ভট্টাচার্য্য সনে কক্ষা করে॥
নানা দেশ হইতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায়॥
অতএব পড়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়।
লক্ষ কোটি অধ্যাপক নাহিক নির্ণয়॥—চৈঃ ভাঃ।

ইউরোপীয় Renaissanceএ যেমন দেখা যায়, জ্ঞানপিপাসু ছাত্রবৃন্দ অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়া আল্‌প্স্ পর্ব্বত পার হইয়া ইতালীতে গমন করিতেন এবং ইতালীতে পাঠ না লইলে তাঁহাদের বিদ্যা

সমাপ্ত হইত না, সেইরূপ আমাদের জাতীয় জীবনের জাগরণের যুগে নবদ্বীপে পাঠ না লইলে কাহারও বিদ্যা সমাপ্ত হইত না। বিদ্যা-গৌরবে মণ্ডিত নবদ্বীপের উল্লিখিত চিত্রখানির পার্শ্বে পেরিক্লীসের যুগের এথেন্সের চিত্রও কি ম্লান বলিয়া বোধ হয় না? কবি কর্ণপূর শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মহাকাব্যে কিরূপ ব্যক্তিগণ দ্বারা শাস্ত্র আলোচিত হইত, তাহা লিখিয়াছেন,—

বসন্তি যত্র ক্ষিতিদেবসত্তমাঃ
সদা সদাচারপরাঃ পরায়ণাঃ।
নিরন্তরং বেদবিধানকর্ম্মসু
শ্রুতিস্মৃতীনাং বিষয়ঃ শরীরিণঃ॥

ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনা যে খুব প্রবলভাবে হইত, তাহা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের "বিরাগ" নবদ্বীপ দর্শন করিয়া বর্ণন করিতেছেন,—

অভ্যাসাদ্য উপাধিজাত্যনুমিতিব্যাপ্ত্যাদিশব্দাবলে-
র্জন্মারভ্য সুদূরদূরভগবদ্বার্ত্তাপ্রসঙ্গা অমী।
যে যত্রাধিককল্পনাকুশলিনঃ তে তত্র বিদ্বত্তমাঃ
স্বীয়ং কল্পনমেব শাস্ত্রমিতি যে জানন্ত্যহো তার্কিকাঃ॥

প্রাচীন ভারতে যেমন অশ্বমেধ বা রাজসূয় যজ্ঞ করিবার উপলক্ষ্যে প্রবলপরাক্রান্ত কোন রাজা অপর রাজন্যবর্গকে পরাজিত করিয়া রাজচক্রবর্ত্তী হইতেন বা অধুনা ইউরোপ ও আমেরিকার মুষ্টিযুদ্ধ প্রভৃতিতে মল্লগণকে হারাইয়া মল্লশ্রেষ্ঠ "জগদ্বিজয়ী" উপাধি ধারণ করেন, সেইরূপ বিদ্যা-লোচনার যুগে প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ ভারতবর্ষের সমস্ত পণ্ডিতকে পাণ্ডিত্য ও তর্কযুদ্ধে পরাজিত করিয়া দিগ্বিজয়ী উপাধি লাভ করিতেন। সমসাময়িক ইউরোপীয় Renaissanceএ ও Scholastic Vogents দেখিতে পাওয়া যায়। ষোড়শ শতাব্দীর 'Frier Bacon and Frier Bungay' নামক নাটকে মহাপ্রভুর দিগ্বিজয়ী পরাভবের অনুরূপ একটী চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। বৈষ্ণব-সাহিত্যে আমরা অনেকগুলি দিগ্বিজয়ীর সাক্ষাৎ লাভ করি। (১) শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে মহাপ্রভু কর্ত্তৃক কেশব কাশ্মীরীর পরাজয়কাহিনী বর্ণিত আছে। (২) ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশে শ্যামদাস নামে এক দিগ্বিজয়ীর সাক্ষাৎ পাই।

এক দ্বিজ দিগ্বিজয়ী বহু দেশ জিনি।
শান্তিপুরে উপনীত হইলা আপনি॥
বেদপঞ্চানন আখ্যা প্রভুর শুনিঞা।
তাঁহার নিকটে গেলা অতি হর্ষ হৈয়া॥

(৩) প্রেমবিলাসে শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট রূপচন্দ্র দিগ্বিজয়ীর পরাভবের কথা আছে,—

দিগ্বিজয় করি তেহো নানা স্থানে যায়।
যেখানে পণ্ডিত দেখে বিচার করয়॥

(৩) নরোত্তমবিলাসে দিগ্বিজয়ী মুরারির সহিত ঠাকুর মহাশয়ের, ব্রাহ্মণ বড়, কি বৈষ্ণব বড়, এই সকল লইয়া তর্কের কথা বর্ণিত আছে।

পরাভব হইয়া দিগ্বিজয়ী সবে কয়।
বৈষ্ণবমহিমা কহি মোর সাধ্য নয়॥

(৪) ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের সংগৃহীত বঙ্গসাহিত্য-পরিচয় গ্রন্থে প্রকাশিত একখানি প্রাচীন দলিল হইতে জানা যায় যে, ১৭১৭ খৃঃ অঃ রাধামোহন ঠাকুর জয়পুরের রাজার প্রেরিত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে পরাস্ত করিয়া ব্রজলীলার পরকীয়াবাদ স্থাপন করেন। দেশের ধনিগণও বিদ্যারসে মাতোয়ারা ছিলেন। তাই এই সমস্ত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত যশোবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ঐশ্বর্য্যও লাভ করিতেন।

পরমসমৃদ্ধ অশ্ব গজযুক্ত হই।
সভা জিনি নবদ্বীপে গেলা দিগ্বিজয়ী॥—চৈঃ ভাঃ।

ধর্ম্মসংস্কার

শুধু বিদ্যার আলোচনাদ্বারা সম্যক্‌ভাবে জাতীয় উন্নতি সংসাধিত হইতে পারে না। বিদ্যা আলোচনার ফলে বুদ্ধি সুতীক্ষ্ণ হয়, স্বাধীন চিন্তা বিকাশ লাভ করে। কিন্তু এই স্বাধীন চিন্তা বিকাশের সঙ্গে হৃদয়ের যোগ না থাকিলে সাধারণ সামাজিক আচার ব্যবহারের প্রতি অবহেলা-বশতঃ সমাজে দুর্নীতিই প্রকাশ পায়। ইতালীর Renaissanceএ তাহাই হইয়াছিল, Boccacioর Decameron তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। আমাদের দেশের অন্তরাত্মাও শুধু বিদ্যার আলোচনায় তৃপ্ত হইতে পারে নাই।

রমাদৃষ্টিপাতে সর্ব্বলোক সুখে বসে।
ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহাররসে॥
কৃষ্ণনাম ভক্তিশূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য আচার॥—চৈঃ ভাঃ।

অদ্বৈত, শ্রীবাস প্রভৃতি অনুভবী ভক্তগণ যথার্থই উক্ত প্রকার দুঃখ বোধ করিয়াছিলেন। Martin Luther যেমন ইউরোপীয় Renaissanceএর পরিণত ফল, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও তেমনি জাতীয় নবজাগরণপ্রসূত স্বাধীন চিন্তার চরম বিকাশ। এক দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্মও ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মের বিরুদ্ধে একটী protest। মানবজন্ম কোন পূর্ব্বকৃত দুষ্কৃতির ফলস্বরূপ বলিয়া সাধারণতঃ এতকাল বিবেচিত হইত। হিন্দুগণ ক্রিয়াকর্ম্ম বা জ্ঞানসাধনা করিয়া হয় স্বর্গলাভ, না হয় মোক্ষলাভ করিয়া মানবজন্ম পরিহার করিতে চেষ্টাপরায়ণ ছিলেন। কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম জগতের অবিসম্বাদিত মধ্যস্থ (Medium between God and man) ছিল। মহাপ্রভু প্রথমতঃ ধর্ম্মরাজ্যে জাতি অপেক্ষা গুণের অধিকার স্থাপন করিলেন। মানবিকতার মহিমা ঘোষণা করাই বৈষ্ণব ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য। চণ্ডিদাস গাহিয়াছিলেন,—

শুন হে মানুষ ভাই !
সবার উপরে   মানুষ বড়
তাহার উপরে নাই ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাবাদের প্রথম কথাই হইতেছে,—

কৃষ্ণের যতেক লীলা   সর্ব্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহার স্বরূপ।
গোপ-বেশ বেণুকর   নবকিশোর নটবর
নরলীলার হয় অনুরূপ ॥—চৈঃ চঃ।

প্রেমের রাজ্যে মানব ও ভগবান্ সমভূমিতে দণ্ডায়মান। ভগবান্ মানবের প্রেমলাভের জন্য ব্যাকুল—এমন কি, তিনি মানবের দ্বারে প্রেমের ভিখারী।

মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধভক্তি ॥
আপনাকে বড় মানে আমাকে সম হীন।
সেই ভাবে আমি হই তাহার অধীন ॥
মাতা মোরে পুত্রভাবে করয়ে বন্ধন।
অতি হীন জ্ঞানে করে লালন পালন ॥
সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
"তুমি কোন বড় লোক, তুমি আমি সম" ॥—চৈঃ চঃ।

বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস বুঝার পক্ষে মহাপ্রভু মানবকে কি গৌরবময় স্থান দান করিয়া মানবের মনকে উন্নত করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা বুঝা বিশেষ প্রয়োজন। লীলাবাদেই বঙ্গদেশের জাতীয় নবজাগরণের ইতিহাস পূর্ণতা লাভ করিল। এক্ষণে বৈষ্ণব-সাহিত্যে এই নবভাবে অনুপ্রাণিত জাতির সামাজিক ইতিহাস কি ভাবে লিখিত হইয়াছে, দেখা যাউক।

কোন দেশেই দুই এক শতাব্দীর মধ্যে সামাজিক আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন হয় না; ভারতবর্ষের ন্যায় সংরক্ষণশীল দেশের পক্ষে এ কথা বিশেষভাবে সত্য। বাঙ্গালাদেশে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত যে বৈষ্ণব-সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা মুসলমানগণের শাসনের সময়। সুতরাং কালানুসারে (chronologically) (১২০০—১৮০০) এই সময়ে সামাজিক ইতিহাস রচনা করার বিশেষ প্রয়োজনও নাই, আর আয়াসসাধ্যও বটে। প্রাক্‌চৈতন্য, চৈতন্য ও চৈতন্যের পরবর্ত্তী যুগের মধ্যে ধর্ম্ম ও সমাজের যে পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল, তাহা যথাস্থানে নির্দ্দেশ করিয়া যাইব।

বাঙ্গালার ধর্ম্ম

ধর্ম্মকেই মধ্যমণির ন্যায় স্থাপন করিয়া ভারতবর্ষের সমগ্র জীবন বিকাশ লাভ করিয়াছিল।

ধর্ম্ম আন্দোলন হইতেই বাঙ্গালাদেশে সাহিত্যের উৎপত্তি। অতএব সর্ব্বপ্রথমে বৈষ্ণবসাহিত্যে বঙ্গদেশের ধর্ম্ম ইতিহাসের কি উপকরণ পাওয়া যাইতে পারে, তাহাই দেখা যাউক।

বৌদ্ধধর্ম্ম

মহাপ্রভুর সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব যে ভারতবর্ষ হইতে বিলুপ্ত হয় নাই, তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যভাগবতে নিত্যানন্দ প্রভুর তীর্থপর্য্যটনের মধ্যে বৌদ্ধগণের সহিত তাঁহার সাক্ষাতের কথা লিখিত আছে।

তবে নিত্যানন্দ গেলা বৌদ্ধের ভবন।
দেখিলেন প্রভু বসি আছে বৌদ্ধগণ॥
জিজ্ঞাসেন প্রভু কেহো উত্তর না করে।
ক্রুদ্ধ হই প্রভু লাথি মারিলেন শিরে॥—চৈঃ ভাঃ।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভ্রমণকালে বৌদ্ধ পণ্ডিতের সহিত বিচার বর্ণিত হইয়াছে। বৌদ্ধগণকে হিন্দুগণ এ সময়ে "পাষণ্ডী" নামে অভিহিত করিতেন।

পাষণ্ডীর গণ আইল পাণ্ডিত্য শুনিঞা॥
গর্ব্ব করি আইল সঙ্গে শিষ্যগণ লঞা॥
বৌদ্ধাচার্য্য মহাপণ্ডিত নিজ মতে।
প্রভু আগে উদ্‌গ্রাহ করি লাগিল কহিতে॥—চৈঃ চঃ।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় "বেণের মেয়ে" নামক উপন্যাসে বৈষ্ণবগণের মধ্যেই বৌদ্ধধর্ম্মের অধিক প্রচার ছিল লিখিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকেও সেই কথা পাওয়া যায়।

সংজ্ঞামাত্রবিশেষতো ভুবভুবো বৈষ্ণাস্ত বৌদ্ধা ইব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বৌদ্ধগণ এ সময়ে সমাজে অত্যন্ত হেয় হইয়াছিলেন। মহাপ্রভু স্বয়ং বৌদ্ধগণকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। তর্কে পরাজিত হইয়া বৌদ্ধগণ মহাপ্রভুর বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র করিতে যাইয়া নিজেদের আচার্য্যকেই বিপদাপন্ন করিয়াছিলেন। তখন,—

হাহাকার করি কান্দে সব শিষ্যগণ।
সবে আসি প্রভুপদে লইল শরণ॥
তুমিহ ঈশ্বর সাক্ষাৎ ক্ষম অপরাধ।
জীয়াহ আমার গুরু করহ প্রসাদ॥
প্রভু কহে সবে কহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি।
গুরুকর্ণে কহ কৃষ্ণনাম উচ্চ করি॥
তোমা সবার গুরু তবে পাইবে চেতন।
সর্ব্ব বৌদ্ধ মিলি করে কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন॥

গুরুকর্ণে কহে কহ কৃষ্ণ রাম হরি।
চেতন পাইল আচার্য্য উঠে হরি বলি॥
কৃষ্ণ কহি আচার্য্য প্রভুকে করয়ে বিনয়।
দেখিয়া সকল লোক পাইল বিস্ময়॥—চৈঃ ভাঃ।

শ্রীচৈতন্য তর্কদ্বারা বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়া ও কৃপাদ্বারা বৌদ্ধগণকে বৈষ্ণব করিয়া ভারতবর্ষে বৌদ্ধপ্রভাব বহুল পরিমাণে খর্ব্ব করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব ধর্ম্মশাস্ত্রে কিন্তু বৌদ্ধগণকে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষার অযোগ্য বলিয়া উল্লেখ আছে।

"জৈমিনিঃ সুগতশ্চৈব নাস্তিকো নগ্ন এব চ।
কপিলশ্চাক্ষপাদশ্চ ষড়েতে হেতুবাদিনঃ॥
এতন্মতানুসারেণ বর্ত্তন্তে যে নরাধমাঃ।
তে হেতুবাদিনঃ প্রোক্তাস্তেভ্যস্তন্ত্রং ন শ্রাপয়েৎ॥"—শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

নিত্যানন্দবংশবিস্তার নামক নাতিপ্রামাণিক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, বীরভদ্র গোস্বামী নাড়ানাড়ী নামধারী বৌদ্ধধর্ম্মাশ্রিত বহুসংখ্যক নরনারীকে খড়দহে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।

তান্ত্রিক বামাচার

বৈষ্ণব-সাহিত্যে বামাচারের প্রাবল্যের নিদর্শন যথেষ্ট পাওয়া যায়। শান্তিপুর গমনকালে শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ এক বামাপন্থী সন্ন্যাসীর আশ্রমে উঠিয়াছিলেন।

বামাপন্থী সন্ন্যাসী মদিরা পান করে।
নিত্যানন্দ প্রতি তাহা কহে ঠারে ঠোরে॥
শুনহ শ্রীপাদ কিছু "আনন্দ" আনিব।
তোমা হেন অতিথি বা কোথায় পাইব॥
নগনী হইয়া মদ্য পিয়ে স্ত্রীসঙ্গ আচরে।
তথাপি ঠাকুর গেল তাহার মন্দিরে॥—চৈঃ ভাঃ।

কৃষ্ণদাস কর্ত্তৃক অনূদিত ভক্তমাল গ্রন্থে দেখা যায়,—

কাটোয়ার ফৌজদার নবাব সরকারে।
শক্তি উপাসক হয় ভজে বামাচারে॥
কাঁটাছেড়া মদ্যমাংস সদা ব্যবহার।
যোগিনীচক্রেতে বসি করয়ে আহার॥

দেশে দুর্নীতির প্রাদুর্ভাব

বামাচার-ধর্ম্মের স্রোত দেশের মধ্যে প্রবল ভাবে বহিতে থাকায় দেশের জনসাধারণের মধ্যে অত্যন্ত দুর্নীতি প্রকাশ পাইয়াছিল। পানদোষ সমাজে অত্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

হরি বলি হাতে তালি দিয়া কেহো নাচে।
উলাসে মদ্যপগণ যায় তার পিছে॥—চৈঃ ভাঃ।

মদ্যপগণের বর্ণনা বৈষ্ণব-সাহিত্যে বহু স্থানে দেখা যায়। দুর্নীতির প্রাবল্যের উদাহরণস্বরূপ গোবিন্দ দাসের কড়চার একটী বর্ণনা উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

স্বার্থপর দুরাচার মদ্য মাংস খায়।
কলির জীবের বল কি হবে উপায়॥
শিশ্নোদরপরায়ণ নিষ্ঠা-বিবর্জ্জিত।
অর্থের লাগিয়া মিথ্যা কহে অবিরত॥
যোনিকীট রমণীর মুখ লালা খায়।
ভক্তি অমৃতের ধারা নিছিয়া ফেলায়॥
বেশ্যার অন্নেতে রুচি বেশ্যা অনুগত।
কনক কামিনী বালা কামকেলিরত॥
এ কারণ মুহি শিখা সূত্র তেয়াগিয়া।
বেড়াইব দ্বারে দ্বারে হরিনাম দিয়া॥

নরোত্তম-বিলাসে প্রাপ্ত খেতুরীর মহোৎসবের পূর্ব্বে তদ্দেশবাসিগণের ব্যবহারও গোবিন্দদাসের প্রদত্ত চিত্রের অনুরূপ,—

এ দেশের লোক দস্যুকর্ম্মে বিচক্ষণ।
না জানয়ে ধর্ম্ম কিম্বা কর্ম্ম বা কেমন॥
করয়ে কুক্রিয়া যত কে কহিতে পারে।
ছাগ মেষ মহিষ শোণিত ঘর দ্বারে॥
কেহ রহে মনুষ্যের কাটা মুণ্ড লৈয়া।
খড়্গ করে করয়ে নর্ত্তন মত্ত হৈয়া॥
সে সময়ে যদি কেহ সেই পথে যায়।
হইলেও বিপ্র তার হাত না এড়ায়॥
সবে স্ত্রী-লম্পট জাতি বিচার রহিত।
মদ্য মাংস বিনা না ভুঞ্জয়ে কদাচিত॥

সাধারণের দুর্নীতির এই চিত্রের ঐতিহাসিকতার বিরুদ্ধে এই বলা যাইতে পারে যে, নিজ ধর্ম্মের মহিমা ও প্রাধান্য স্থাপনের জন্য চিরকালই ধর্ম্মসম্প্রদায় তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তন অবস্থাকে মসিলিপ্ত করিয়া অঙ্কন করিয়া থাকেন। তবে বহু গ্রন্থে একই অবস্থার বর্ণনা দেখিয়া মনে হয় যে, এ বর্ণনার মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু সত্যাভাস আছে।

শাক্তধর্ম্ম

✓ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে শাক্ত ধর্ম্মই জনসাধারণের ধর্ম্ম ছিল বলিয়া বোধ হয়। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে লিখিত আছে যে, যবন রাজা কাজীর স্বপ্নাদেশে নবদ্বীপে অত্যাচার করিতে নিবৃত্ত হইলেন। ইহা হইতে তৎকালীন শাক্তধর্ম্মের প্রভাব প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় অনুমান করিয়াছেন। দুর্গোৎসবে খুব আনন্দ হইত বলিয়া নবদ্বীপে ভক্তগণ যখন কীর্ত্তনানন্দে বিভোর হইতেন, তখন—

নাগরিয়াগুলা বোলে মাগি খাই মরে।
অকালেই দুর্গোৎসব আনিলেক ঘরে॥—চৈঃ ভাঃ।

মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরি প্রভৃতি শক্তির লৌকিক প্রকাশগুলিও যথোপচারে পূজিত হইতেন।

মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে।
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জনে॥
বাসুলী পূজয়ে কেহো নানা উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহো যক্ষ পূজা করে॥—চৈঃ ভাঃ।

বাসুলী দেবীকে বৌদ্ধধর্ম্মের বজ্রযানের বজ্রধাত্বীশ্বরী বলিয়া প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব অনুমান করেন।

শৈবধর্ম্ম

তৎকালে শৈবধর্ম্মের প্রভাবও নিতান্ত কম ছিল না।

একদিন আসি এক শিবের গায়ন।
ডমরু বাজায় গায় শিবের কথন॥
আইল করিতে ভিক্ষা প্রভুর মন্দিরে।
গাইয়া শিবের গীত বেড়ি নৃত্য করে॥—চৈঃ ভাঃ।

ধর্ম্মে প্রাণহীনতা ও বৈষ্ণবতার অভাব

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষপাদে বঙ্গে যে ধর্ম্মই প্রচলিত থাকুক না কেন, তাহা কেবল বাহ্য আচারেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল। ধর্ম্মের সহিত জাতীয় জীবনের যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল।

যেবা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী মিশ্র সব।
তাহারা কেহ না জানয় গ্রন্থ অনুভব॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সভে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিতে যমপাশে বান্ধি মরে॥
না বাখানে যুগধর্ম্ম কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
দোষ বহি গুণ কারো না করে কথন॥

যেবা সব বিরক্ত তপস্বী অভিমানী।
তা সভার মুখেহ নাহিক হরিধ্বনি॥
অতি বড় সুকৃতি সে স্নানের সময়।
গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ নাম উচ্চারয়॥
গীতা ভাগবত যে যে জনে বা পড়ায়।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায়॥
এই মত বিষ্ণুমায়া-মোহিত সংসার।
দেখি ভক্ত সব দুঃখ ভাবেন অপার॥

দেশের চিন্তাশীল ভাবুকসম্প্রদায় এইরূপ ধর্ম্মের জন্য আকুতি প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়াই বৈষ্ণবধর্ম্ম দেশে এতটা প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিল।

মহাপ্রভুর ধর্ম্ম প্রচার

দেশের লোক প্রথমে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারে যথেষ্ট বাধা প্রদান করিয়াছিল। নবদ্বীপের পণ্ডিত-সমাজ জ্ঞানমার্গের কথা বুঝিতেন—বৈষ্ণবধর্ম্মের অপূর্ব্ব ভাব উন্মাদনা তাঁহাদের নিকট অদ্ভুত ও অভিনব বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল। সেই জন্যই মহাপ্রভু যখন ভক্তগণকে লইয়া প্রথমে কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁহারা—

শুনিলেই কীর্ত্তন করয়ে পরিহাস।
কেহো বলে সব পেট পুষিবার আশ॥
কেহো বলে জ্ঞানযোগ এড়িয়া বিচার।
উন্মত্তের প্রায় নৃত্য এ কোন ব্যাভার॥—চৈঃ ভাঃ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর বঙ্গ, উড়িষ্যা, দাক্ষিণাত্য ও পশ্চিম প্রদেশের কিয়দংশে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম অতি অল্পকালমধ্যে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। এক মহাভাবের প্রবল বন্যায় বঙ্গ ও উড়িষ্যা ডুবিয়া গিয়াছিল। এই ধর্ম্ম প্রচারের জন্য সভা করিয়া বক্তৃতা দিতে হয় নাই, মঠ বা বিহার স্থাপন করিয়া জনসাধারণকে উপদেশ দিতে হয় নাই—তরবারি ত ধরিতে হয়ই নাই। ভাব যেন সংক্রামক হইয়া দেশের মধ্যে প্রচারিত হইয়া গিয়াছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভ্রমণ-কাহিনী হইতে গৌড়ীয় ধর্ম্মের প্রচার-পদ্ধতি বুঝা যাইবে।

এই শ্লোক পড়ি পথে চলে গৌরহরি।
লোক দেখি পথে কহে বোল হরি হরি॥
সেই লোক প্রেমে মত্ত বলে হরিকৃষ্ণ।
প্রভুর পাছে সঙ্গে যায় দর্শনে সতৃষ্ণ॥
কথো দূরে রহি প্রভু তারে আলিঙ্গিয়া।
বিদায় করেন তারে শক্তি সঞ্চারিয়া॥

সেই জন নিজগ্রামে করিলা গমন।
কৃষ্ণ বলি হাসে কান্দে নাচে অনুক্ষণ॥
যারে দেখে তারে কহে কহ কৃষ্ণনাম।
এই মত বৈষ্ণব কৈল সব নিজ গ্রাম॥
গ্রামান্তর হৈতে আইসে দেখে যত জন।
তাহার দর্শন-কৃপায় হয় তাঁর সম॥
সেই যাই নিজগ্রাম বৈষ্ণব করয়।
অন্যগ্রামী আসি তারে দেখি বৈষ্ণব হয়॥
সেই যাই আর গ্রাম করে উপদেশ।
এই মত বৈষ্ণব হইল সব দক্ষিণ দেশ॥—চৈঃ চঃ।

নিত্যানন্দ, রূপ, সনাতন প্রভৃতি পদ্ধতি অনুসারে অন্যান্য দেশে প্রেমধর্ম্ম যাজন করিলেন,—

মথুরাতে পাঠাইল রূপ সনাতন।
দুই গোসাঞি কৈল ভক্তি প্রচারণ।
নিত্যানন্দ গোসাঞি পাঠাইলা গৌড়দেশ।
তিঁহো ভক্তি প্রচারিল অশেষ বিশেষ॥—চৈঃ চঃ।

পরবর্ত্তী আচার্য্য নরত্তোম ঠাকুর মহাশয়, শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্যামানন্দ, বীরভদ্র গোস্বামীও বঙ্গ উড়িষ্যায় প্রেমধর্ম্ম প্রচার করেন। নিত্যানন্দপত্নী শ্রীজাহ্নবাদেবী ও শ্রীনিবাস আচার্য্যের কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণীও বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া বৈষ্ণবজগতের পূজা পাইয়া থাকেন। মহাপ্রভু সাধারণকে সন্ন্যাস উপদেশ না দিয়া গার্হস্থ্যাশ্রমেই থাকিতে বলিয়াছেন; এইরূপে সমাজসংস্কার হইয়াছিল। মহাপ্রভু স্বয়ং, ছয় গোস্বামী ও কতিপয় প্রচণ্ড বৈরাগ্যশালী মহাজন সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও মহাপ্রভু তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারকালে জনসাধারণের প্রতি সন্ন্যাস উপদেশ করেন নাই; গৃহে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিতেই উপদেশ দিয়াছিলেন। কূর্ম্ম নামে এক বৈদিক ব্রাহ্মণ তাঁহার সঙ্গে যাইতে চাহিলে,—

প্রভু কহে ঐছে বাত কভু না কহিবা।
গৃহে রহি কৃষ্ণনাম নিরন্তর লৈবা॥—চৈঃ চঃ।

সৌজাত্য-বিদ্যায় ভারতবাসী চিরদিনই বিশ্বাসবান্। তাই জাতীয় উন্নতির জন্য গুণকর্ম্ম-বিভাগযুক্ত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম এ দেশে প্রচলিত হইয়াছিল। বৈষ্ণবের সন্তান বৈষ্ণব হইবারই সম্ভাবনা অধিক। মহাপ্রভু ও তাঁহার পরিকরগণের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গেই যাহাতে বৈষ্ণবধর্ম্ম বিলোপ না পায়, তজ্জন্য সাধনপথে অগ্রসর ভক্ত মহাপুরুষগণকে মহাপ্রভু বিবাহ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। এই জন্যই শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, শ্রীনিবাস আচার্য্য, গৌরীদাস পণ্ডিত ও শ্রীমুকুন্দ দেব প্রভৃতি বিবাহ করিয়াছিলেন। ঈশাননাগরকৃত অদ্বৈতপ্রকাশে লিখিত আছে,—

একদিন শ্রীঅদ্বৈত ডাকি পুত্রগণে।
নির্জ্জনে কহয়ে অতি মধুর বচনে॥
অহে বৎসগণ সভে স্থির কর মন।
গার্হস্থ্য ধর্ম্মের সার করহ শ্রবণ॥
সন্ধ্যাবন্দনাদি আর মধ্য মহাযজ্ঞ।
যেই জন করে নিত্য সেই মহাবিজ্ঞ॥

অদ্বৈত প্রভুর পুত্র অচ্যুত বাল্যকাল হইতেই পরম বৈষ্ণব। তিনি বিবাহ করেন নাই বলিয়া অদ্বৈতপ্রভু তাঁহাকে বিগ্রহসেবার পর্য্যন্ত ভার দিলেন না।

অতএব শ্রীবিগ্রহের সেবাদিক ক্রিয়া।
তোমা হৈতে না চলিবে দেখিনু বুঝিয়া॥—অঃ প্রঃ।

সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, মহাপ্রভু বাঙ্গালার সামাজিক জীবনকে ভাঙ্গিয়া সব সন্ন্যাসী করিয়া দিতে চাহেন নাই। বরং তিনি সেই সামাজিক জীবনে প্রেমভক্তির ভাব প্রবেশ করাইয়া সমাজকে সুসংস্কৃত করিতে চাহিয়াছিলেন।

প্রেমধর্ম্ম প্রচারের পর বঙ্গদেশের নৈতিক অবস্থার যে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। যে ধর্ম্মের মূলমন্ত্র "জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণবসেবন," যে ধর্ম্মে সাধন করিবার প্রণালী হইতেছে,—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

সে ধর্ম্মের বহুল প্রচারের সঙ্গে যে দেশের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? জগাই মাধাইয়ের ন্যায় মদ্যপ, চান্দরায় ও তাহার অনুচরগণের ন্যায় দস্যুগণকে যে ধর্ম্ম পরম বৈষ্ণব করিতে পারিয়াছে, সে ধর্ম্ম নিশ্চয়ই অন্ততঃ কিছুকালের জন্যও জনসাধারণের চরিত্রকে মহৎ করিয়া তুলিয়াছিল। বৈষ্ণব কবি ও গ্রন্থকারগণ যেন দৈন্য ও বিনয়ের এক একজন অবতার। বৃদ্ধ জরাতুর শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ "ছোট বড় ভক্তগণ, বন্দো সভার শ্রীচরণ, সভে মোরে করহ সন্তোষ।" বলিয়া সমস্ত পাঠকবৃন্দের কৃপাভিক্ষা করিয়াছেন। জগতের ইতিহাসে পাঠকের নিকট গ্রন্থকারের ঈদৃশ বিনয় প্রকাশ নিতান্তই দুর্লভ। তন্ত্রাচার প্রচারের ফলে সমাজে ব্যভিচার দেখা দিয়াছিল। মহাপ্রভু বৈষ্ণব সাধকের পক্ষে স্ত্রীমুখ দর্শন পর্য্যন্ত নিষেধ করিয়া দিলেন।

প্রভু কহে বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন॥—চৈঃ চঃ।

ছোট হরিদাসকে দণ্ডপ্রদান করিয়া বৈষ্ণবসমাজে মহাপ্রভু এক উচ্চ আদর্শ স্থাপন করিলেন। এই মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া দেশবাসিগণ কিছুকালের জন্য ব্যভিচারাদি দোষ ত্যাগ করিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়।

ধর্মসংঘর্ষে শোণিতপাত ভারতের ইতিহাসে বিরল। তবে মানবপ্রকৃতি সর্ব্বত্রই সমান—তাই বিভিন্ন দেবতার উপাসকগণের মধ্যে প্রায়ই কলহ উপস্থিত হইত, যদিও সে কলহ বাক্যেই পর্য্যবসিত হইত। বৈষ্ণবশাস্ত্রকারগণ উচ্চ নৈতিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া অন্য দেবদেবীর নিন্দা বা অবজ্ঞা করা নিষেধ করিয়া দিলেন।

হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।
ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন॥
(ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উদ্ধৃত পদ্মপুরাণের শ্লোক।)

শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের মঙ্গলাচরণে শ্রীচৈতন্যের সহিত গণপতি, হরগৌরী, সরস্বতী ও দেবগণের বন্দনা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, বৈষ্ণবগণ ধর্ম্মবিরোধে বা ধর্ম্মকলহে যোগদান করিতেন না। শাক্ত ও বৈষ্ণবের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বৈষ্ণবধর্ম্মের উন্নতির যুগ গত হইবার পর। পরবর্ত্তী কালে রচিত ভক্তমাল গ্রন্থে শাক্তবৈষ্ণবের দ্বন্দ্বের বিস্তর আভাস "গোবিন্দ কবিরাজ", "রবীন্দ্রনারায়ণ রায়" প্রভৃতির চরিত্রে পাওয়া যায়।

বৈষ্ণবধর্ম্ম বঙ্গদেশে বিস্তৃতি লাভ করিলেও শাক্তধর্ম্মকে দেশ হইতে বিদূরিত করিতে পারে নাই। তবে, পরবর্ত্তী চণ্ডী বা অপর কোন লৌকিক দেবতার মঙ্গলসাহিত্যে শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দকে বন্দনা করা হইয়াছে। ঐ সমস্ত মঙ্গলকাব্য জনসমাজে গীত হইত; সুতরাং গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে মহাপ্রভুর বন্দনা থাকায় দেশের উপর বৈষ্ণবপ্রভাব উপলব্ধি করা যায়। মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর "চণ্ডী"তে, ভবানীপ্রসাদ রায়ের "দুর্গামঙ্গলে", রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের "শিবায়নে" ও ঘনরামের "ধর্ম্মমঙ্গলে" অন্যান্য পৌরাণিক দেবদেবীর সহিত একসঙ্গে মহাপ্রভুর বন্দনা আছে। মহাপ্রভুর জীবনকালেই তাঁহার অবতারত্ব ঘোষিত হইয়াছিল। উক্ত মঙ্গলাচরণ পাঠে জানা যায় যে, সাধারণ হিন্দুসমাজ এ মত মানিয়া লইয়াছিল। বৈষ্ণব-সমাজে ত শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের মূর্ত্তি-উপাসনাই আরম্ভ হইয়াছিল।

প্রভুর মন্দিরে শীঘ্র লইয়া চলিলা।
নিত্যানন্দ চৈতন্য দর্শন করাইলা॥

শাক্ত সাহিত্যে মহাপ্রভু শুধু পূজিত হয়েন নাই—শাক্ত ধর্ম্মের উপর তাঁহার ধর্ম্মের প্রভাবও বিস্তৃত হইয়াছিল। শাক্ত সাহিত্যের "আগমনী গীতির" বাৎসল্যরস বৈষ্ণবপদাবলীর নিকট ঋণী। বৈষ্ণবধর্ম্ম বাঙ্গালার শাক্ত ধর্ম্মের সাধ্য বস্তু পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছিল।

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

রামপ্রসাদ সেন এই ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া গাহিয়াছেন,—

নির্ব্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল,
ওরে চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসি॥

বৈষ্ণবধর্ম্মের অবনতি

বৈষ্ণবধর্ম্ম রস-সাধনার ধর্ম্ম। অতি উচ্চাঙ্গের সাধক না হইলে এই ধর্ম্ম সাধন করিতে যাইয়া রসের বিকারদ্বারা অভিভূত হইবার আশঙ্কা আছে। তাই মহাপ্রভু সাধারণকে শুধু নামকীর্ত্তনে অধিকারী বলিয়াছেন। কিন্তু এত করিয়া উপদেশ দিয়াও তিনি রসের বিকার হইতে এক শ্রেণীর লোককে বাঁচাইতে পারেন নাই। ইহ'রা সহজিয়া বা বাউল নামে এ দেশে পরিচিত। সহজধর্ম্ম অতি প্রাচীন কাল হইতে এদেশে প্রচলিত ছিল। মধ্যযুগে মন্ত্রযান ও বজ্রযান সম্প্রদায়ের সহিত এই সহজধর্ম্ম মিশ্রিত হইয়া কলুষিত আকার ধারণ করে। পরকীয়া স্ত্রী এই ধর্ম্মের সাধনের অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয়। চণ্ডীদাস একজন, কি বহু, সে তর্কের মধ্যে প্রবেশ না করিয়াও আমরা বলিতে পারি যে, খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে সহজধর্ম্ম প্রচলিত ছিল।

সহজ সহজ সবাই কহয়ে
সহজ জানিবে কে।
তিমির অন্ধকার যে হয়েছে পার
সহজ জেনেছে সে ॥
পরকীয়া ধন সকল প্রধান
যতন করিয়া লই।
নৈষ্ঠিক হইয়া ভজন করিলে
পদ্ধতি সাধক হই।

সহজধর্ম্মের পরকীয়াবাদকে মহাপ্রভু সুসংস্কৃত করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মে গ্রহণ করেন। লীলায় শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরকীয়াভাব হইলে রসের পরিপুষ্টি হয়। এই জন্য ভক্তগণ সখী ও মঞ্জরীগণের অনুগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণলীলা পরকীয়াভাবে স্মরণ মনন করিবেন। কিন্তু এই সাধনায় কোন নারীর প্রয়োজন নাই, তাহা বারংবার ঘোষণা করা হইল।

গোপিকাভাবের এই সুদৃঢ় নিশ্চয়।
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা অন্যত্র না হয় ৷—চৈঃ চঃ।
পরকীয়াভাবে অতি রসের নির্য্যাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নহে বাস ৷—কর্ণানন্দ।

সুতরাং রক্ত মাংসের দৈহিক ব্যাপারকে বৈষ্ণবশাস্ত্রকারগণ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া উচ্চাঙ্গের ভজনপ্রণালী স্থাপন করিলেন। এই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার ফলে পরকীয়াবাদ ভাবরাজ্যের কি এক অপূর্ব্ব সুষমা লাভ করিয়াছে, তাহা উজ্জ্বলনীলমণি নামক বৈষ্ণব রসশাস্ত্র পাঠ করিলে বুঝা যায়। কিন্তু দুই শতাব্দীর মধ্যেই এক শ্রেণীর লোকে এই উচ্চভাবের কথা বিস্মৃত হইয়া গেল। তাহারা মহাপ্রভু ও তদনুগত শ্রীরূপ গোস্বামী, নরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতি মহাজনগণের নাম দিয়া এক ধর্ম্ম কল্পনা করিয়া চালাইতে লাগিল। ইহারা কি ভাবে বৈষ্ণবগণের পূজনীয়

আচার্য্যবৃন্দকে স্বদলে টানিয়াছে, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। প্রেমদাস-রচিত "আনন্দ-ভৈরবে" লিখিত আছে,—

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
তাহার চরিত্র গোসাঞি করিয়াছে বর্ণন ॥
সেই অনুসারে বিদ্যাপতির করণ।
চণ্ডীদাস সেই ধর্ম্ম করেছে যাজন ॥
জয়দেব গোসাঞির সেই মত হয়।
গৌণরূপে ভজন কৈল ছয় মহাশয় ॥
মহাপ্রভুর মনের করণ না যায় বর্ণনে।
নিত্যানন্দ প্রভুর চরিত্র দেখহ নয়নে ॥
বীরভদ্র গোসাঞির কি কহিব গুণে।
বৈরাগীকে শিখাইল আপন কারণে ॥
যদি এহেন বাক্যে কেহ প্রতীত না হয় মনে।
বার শত নাড়াকে তের শত নাড়ী দিবেন কেনে ॥
যে সব বৈরাগী প্রকৃতির মুখ নাহি দেখে।
এখন প্রকৃতি বিনে তিলার্দ্ধ না থাকে ॥

উদ্ধৃত অংশের শেষ দুই পঙ্‌ক্তির মধ্যে বৈষ্ণবধর্ম্মের পতনের ইতিহাস নিহিত আছে। সহজিয়াগণ প্রচার করিয়াছিল যে,—

মানুষের দেহ হয় নিত্যবৃন্দাবন।
পুরুষ প্রকৃতি ইথে জানিহ কারণ ॥

—গৌরীদাসের নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী।

চিত্তসংযম, ব্রহ্মচর্য্য ও ভগবানে আত্মসমর্পণযুক্ত যে সাধনা বৈষ্ণবধর্ম্মের অঙ্গীভূত, সেই সাধনাকে সহজিয়াগণ বলিল,—

হাস্যরস কৌতুকে সদা কাল গোঙাইবে।
ইহা নহিলে ব্রজপ্রাপ্তি করিতে নারিবে ॥

সপ্তদশ শতাব্দী হইতে সহজিয়াধর্ম্ম বহুলভাবে প্রচারিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। এই সম্প্রদায়ের বহু গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। গ্রন্থের সংখ্যা দেখিয়াই বঙ্গদেশে ইহার প্রভাব অনুমান করা যাইতে পারে। সহজিয়া বৈষ্ণবগণ সমাজে অত্যন্ত হেয়। কিন্তু প্রায় দুই শত বৎসর কাল ইহারাই বৈষ্ণব, বৈরাগী আখ্যায় অভিহিত হওয়ায় অধুনা ভজননিষ্ঠ কোন ভক্তকে ভদ্রসমাজে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিতে হইলে আবার বৈষ্ণব শব্দের সদ্‌ব্যাখ্যা করিয়া দিতে হয়। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, এই উপধর্ম্ম মূল বৈষ্ণবধর্ম্মের কণ্ঠ একেবারে রোধ করিতে পারে নাই।

ক্ষীণভাবে চলিলেও বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম কোন দিনই বঙ্গদেশে বিলুপ্ত হয় নাই—হইলে আজ আর বৈষ্ণবগ্রন্থরাজি আমাদের নয়নগোচর হইত না।

বর্ণাশ্রম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম

বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে ভিত্তি করিয়া ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল প্লাবনের সময় ইহার প্রভাব মন্দীভূত হইলেও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের উপর দিয়া বহু ঝঞ্ঝা বহিয়া গিয়াছে, কিন্তু আজও সে ধর্ম্ম হিন্দুগণের মধ্যে প্রচলিত আছে। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মূল হিন্দুর জাতীয় জীবনের অন্তস্তলে প্রোথিত।

কিন্তু বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে পরমার্থের চরম অবস্থা বা সাধ্য বস্তু বলিয়া ভারতবর্ষ কখনই ঘোষণা করে নাই। মোক্ষ প্রাপ্তির ইচ্ছা আসিলে যতিধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ। শ্রীশঙ্করাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত দশনামী সন্ন্যাসিসম্প্রদায়, হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে থাকিয়াও নিজদিগকে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উপরিতন অবস্থায় স্থিত কল্পনা করিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন করেন না।

শ্রীমন্মহাপ্রভুও ভারতের এই সনাতন পন্থা অবলম্বন করিয়া ঘোষণা করিলেন যে, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সাধারণ গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনের উপযোগী হইলেও ইহা মানবের উচ্চতর জাগ্রত ক্ষুধাকে পরিতৃপ্ত করিতে সমর্থ নহে। ভাবভক্তির রাজ্যের উচ্চ গ্রামে আসীন ভক্তের পক্ষে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পালন করার কোনই প্রয়োজন নাই। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের উপরিতন অনেকগুলি সাধনরাজ্যের অবস্থা চরিতামৃতের মধ্যলীলায় রায় রামানন্দ-সংবাদে লিখিত হইয়াছে। তথায় বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে মহাপ্রভু বাহ্য ধর্ম্ম বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

প্রভু কহে পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।
রায় কহে স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়॥
বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষকারণম্॥
প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর॥—চৈঃ চঃ।

প্রেমরাজ্যের জাতিভেদ অন্যপ্রকার,—

কিবা বিপ্র কিবা শূদ্র ন্যাসী কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥—চৈঃ চঃ।
যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার॥—চৈঃ চঃ।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসও এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছেন,—

মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥

ভক্তিশাস্ত্রগুলিতে বর্ণাশ্রমধর্ম্মাচারের সহিত ভক্তিধর্ম্মের সম্বন্ধ সুস্পষ্টভাবে লিখিত হইয়াছে।

সম্মতং ভক্তিবিজ্ঞানাং ভক্ত্যঙ্গত্বং ন কর্ম্মণাং।

অর্থাৎ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম্মপরম্পরা ভক্তির অঙ্গ, কিন্তু তাহা ভক্তিতত্ত্ববেত্তাদের মত নহে। শ্রীজীব গোস্বামী এই শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন,—

"বর্ণাশ্রমাচারেত্যাদিকং অজাতদৃঢ়শ্রদ্ধং শুদ্ধভক্ত্যনধিকারিনং প্রত্যেবোক্তমিতি ভাবঃ।"

এই নীতি অনুসরণ করিয়া বহু শুদ্ধ ভক্ত শ্রীকৃষ্ণ ভজন সম্বন্ধে জাতিধর্ম্মকে তুচ্ছ করিয়া বৈষ্ণবত্বকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন। গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী, যাঁহার সম্বন্ধে প্রেমবিলাসে লিখিত আছে,—

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ তিঁহো পণ্ডিত প্রধান।
পাঁচ শত পড়ুয়ায় নিত্য অন্ন কৈল দান॥

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, যদুনাথ বিদ্যাভূষণ, কাশীনাথ তর্কভূষণ, হরিদাস শিরোমণি, চন্দ্রকান্ত তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ কায়স্থকুলোদ্ভব নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীরসিকানন্দ, শূদ্র শ্যামানন্দের নিকট ও কাটোয়ার যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী শ্রীগদাধর দাস মহাশয়ের নিকট পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেতর জাতি ব্রাহ্মণের গুরু হওয়ায় সামাজিক বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। নরোত্তম-বিলাসে লিখিত আছে,—

নরোত্তম শিষ্য কৈলা অনেক ব্রাহ্মণ।
পাষণ্ডী ব্রাহ্মণ সব হৈল অগ্নি সম॥

রাজা নরসিংহ পণ্ডিত সহ নরোত্তমের সহিত ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। অবশ্য বিচারে দিগ্বিজয়ী মুরারির পরাভব হয়।

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে, ষোড়শ শতাব্দীতে হিন্দুসমাজে সংস্কার আরম্ভ হইয়াছিল। মেলবন্ধন ও নব্যস্মৃতি প্রচার প্রভৃতি দ্বারা হিন্দুসমাজ পূর্ব্ববর্ত্তী বৌদ্ধপ্লাবন ও মুসলমান অত্যাচারজাত ত্রুটিগুলি সংশোধন করিয়া লইতেছিল। শ্রীচৈতন্যভাগবতে বর্ণিত সুবুদ্ধি খাঁর উপাখ্যান হইতে আমরা তদানীন্তন সমাজের উপর বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রভাব বুঝিতে পারি। সুবুদ্ধি খাঁ হুসেন সাহার প্রভু ছিলেন। হুসেন বাদশা হইয়া স্ত্রীর প্ররোচনায় সুবুদ্ধি খাঁর মুখে জোর করিয়া জল দেন। সুবুদ্ধি খাঁ নিজের দোষ নাই জানিয়াও, জাতিপাত হইয়াছে, এই চিন্তায় আকুল হইয়া উঠিলেন। পণ্ডিতগণ ব্যবস্থা দিলেন যে, এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত তুষানলে প্রাণত্যাগ। ষোড়শ শতাব্দী বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পুনরুজ্জীবনের যুগ বলিয়াই মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত এই আচার হিন্দুসমাজের বুকে এতটা বাজিয়াছিল। জন্মগত অধিকারই যে সময়ে সমস্ত বিষয় নিরূপিত করিতেছিল, সে সময় সাধনরাজ্যেও গুণগত অধিকারকে স্থান দিতে হিন্দুসমাজ পরাঙ্মুখ হইয়াছিল।

লৌকিক ব্যবহারে কিন্তু মহাপ্রভু বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অবহেলা করেন নাই। প্রেম সাধনার রাজ্যে জাতিধর্ম্ম উপেক্ষিত হইলেও সাধক ভক্ত লৌকিক চেষ্টা ও ব্যবহারের সময় বর্ণাশ্রমধর্ম্ম মানিয়া চলিবেন, ইহাই বৈষ্ণবশাস্ত্রের উপদেশ। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রভাব তখন এতটা প্রবল যে, মহাপ্রভু চেষ্টা করিলেও ইহাকে উঠাইয়া দিতে পারিতেন কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

মহাপ্রভু স্বয়ং ব্রাহ্মণেতর কোন জাতির বাড়ীতে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন, এরূপ কথা কোন লীলাগ্রন্থে লিখিত নাই। বরং "নিমন্ত্রণ লইল জানি বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ" প্রভৃতি কথাই আছে। জগন্নাথক্ষেত্রে কোন কোন সময়ে এক সঙ্গে বসিয়া সকল জাতীয় ভক্তই আহার করিয়াছেন—কিন্তু তাহা শ্রীধামের ও প্রসাদের সম্মান প্রদর্শন জন্য। কোন সামাজিক ভোজে সকল জাতি এক সঙ্গে বসিয়া আহার করিয়াছেন, এরূপ কথা কুত্রাপি লিখিত হয় নাই। শ্রীসনাতন গোস্বামী যবন-সংসর্গ হেতু নিজকে পতিত মনে করিতেন। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রতি সম্মানবশতঃ তিনি মন্দিরের পথে না যাইয়া উত্তপ্ত বালুকাময় সমুদ্রতীরবর্ত্তী পথে যাতায়াত করিতেন। স্বয়ং মহাপ্রভু মহাপ্রসাদ পাইবার জন্য শ্রীহরিদাস ঠাকুর মহাশয়কে আহ্বান করিলেও তিনি কাতরভাবে দূরে পড়িয়া থাকিতেন, কদাচ নিকটে যান নাই।

অদ্বৈত-প্রকাশ-রচয়িতা ব্রাহ্মণ ঈশান নাগর মহাপ্রভুর পদধৌত করিতে যান—কিন্তু ব্রাহ্মণ-তনু বিষ্ণুতনু বলিয়া মহাপ্রভু ইহাতে সম্মত হয়েন নাই। ঈশান তখন উপবীত ছিঁড়িয়া ফেলিলেন।

তাহা দেখি মোর প্রভু হাসিয়া কহিলা।
কি লাগি ঈশান বিপ্রধর্ম্ম বিনাশিলা।
দ্বিজাতির যজ্ঞসূত্র চিত্তশুদ্ধিদাতা॥
নিরন্তর পরব্রহ্মে হৃদয় নিযোক্তা॥
এত কহি প্রভু পুনঃ পৈতা দিল মোরে।—অঃ প্রঃ।

লৌকিক ব্যবহারে ভোজন ও বিবাহেই বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পরিচয় পাওয়া যায়। বৈষ্ণব বংশধর উৎপন্ন করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মকে স্থায়িত্ব প্রদান করিবার জন্য শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, শ্রীনিবাস প্রভৃতি অনেক মহাজন পরজীবনে বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইঁহারা কিংবা অন্য কোন মহাপ্রভুর ভক্ত স্বজাতীয় ছাড়া অন্য জাতি হইতে কন্যা গ্রহণ করিয়াছেন, এ কথা দেখিতে পাই না। নিত্যানন্দ প্রভুর ন্যায় প্রচণ্ড অবধূতও স্বজাতি, এমন কি, স্বশ্রেণীর কন্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভোজনবিচার না থাকিলেও এই জন্য তাঁহার বংশধরগণও ব্রাহ্মণসমাজে স্থান পাইয়াছিলেন। "কুলকল্পতরু" নামক কুলশাস্ত্রে লিখিত আছে,—

নিতাইতনয় বীরভদ্র নাম তাঁর।
স্বনামে হইল তাঁর ভাবের সঞ্চার॥
সিন্দুরমধ্য গাঁই আছিল নিতাই।
অবধৌত কল্পতরু বন্দ্যবংশ গাঁই॥

বংশগ্লানি হইল করি কুল অপচয়।
উদাসীন হইলে কভু জাতি নাহি রয়
উভয় বর্জনে "বীর" সঙ্কেত হইল।
কুলাচার্য্য বটব্যাল রচনা করিল॥

অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত হইলেও উভয়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া প্রীতি আরও বর্দ্ধিত হয়, ইহা উভয়েরই ইচ্ছা হইল। কিন্তু এই ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করিতে যাইয়া তাঁহাদের বেগ পাইতে হইয়াছিল, তাহাতেই তৎকালীন হিন্দুসমাজের উপর বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রভাব ও তাহার নিকট বৈষ্ণবগণের মস্তক অবনত করার কথা পাওয়া যায়। নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার কন্যা গঙ্গাদেবীকে অদ্বৈত প্রভুর ভাগিনেয় ঘনশ্যামের হস্তে সমর্পণ করিতে চাহিলেন। কিন্তু রাঢ়ী ও বারেন্দ্রে বিবাহ সমাজে প্রচলিত ছিল না; সুতরাং তৎকালীন বঙ্গসমাজের এই দুই মহাপ্রভাবশালী ব্যক্তিকে সভা আহ্বান করিয়া পণ্ডিতসমাজের মত লইতে হইয়াছিল। রাঢ়ী ও বারেন্দ্রের মধ্যে আদানপ্রদানের এই প্রথম উদাহরণ। প্রেম-বিলাস যে বলিয়াছেন,—

রাঢ়ী ও বারেন্দ্রের বিয়ে হয়েছে অনেক।
দেশভেদে নামভেদ এই পরতেক॥

ইহার অর্থ হইতেছে এই যে, রাঢ় ও বরেন্দ্র এই দুই ভূমিতে বাস করা হেতু যখন শ্রেণীভেদ হইয়াছিল, তখন অধুনা রাঢ়দেশবাসীর সহিত বরেন্দ্রদেশবাসীর বিবাহ ত অনেকই হইয়াছে। কেবল তাহাকে রাঢ়ী শ্রেণীর সহিত বরেন্দ্র শ্রেণীর বিবাহ বলে না, এই মাত্র। উদ্ধৃত পয়ার উপরিউক্ত বিবাহের সমর্থন করিবার জন্যই রচিত হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে রাঢ়ী ও বারেন্দ্রের মধ্যে কোন বিবাহ এ পর্য্যন্ত হয় নাই। "বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস"-প্রণেতা দুর্গাচন্দ্র সান্যালও এই মত পোষণ করেন।

বৈষ্ণবগণ যে লৌকিক ব্যবহারে বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে অবহেলা করেন না, তাহা বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাস পাঠ করিলেও বুঝা যায়। এই গ্রন্থে বৈষ্ণবের ভক্তিসাধনের ও সদাচারের যাবতীয় কথা লিখিত হইয়াছে। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন তৎকৃত একাদশীতত্ত্ব, বিষ্ণুপূজাপদ্ধতি ও আহ্নিক-তত্ত্বে শ্রীহরিভক্তিবিলাসের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের অধিকাংশ ব্যক্তিই গৃহস্থ—সুতরাং তাঁহাদের পুত্রকন্যার উপনয়ন বিবাহাদি প্রয়োজন। বৈষ্ণবধর্ম্মে যদি বর্ণাশ্রম অস্বীকৃত হইত, তবে বৈষ্ণবস্মৃতিগ্রন্থ হরিভক্তিবিলাসে উপনয়ন বিবাহাদির স্বতন্ত্র ব্যবস্থা থাকিত। কিন্তু স্মার্ত্ত বিধান অনুসারে ঐ সমস্ত লৌকিক কর্ম্ম সম্পাদিত হওয়াই বৈষ্ণব-শাস্ত্রকারগণের অভিপ্রেত বলিয়া তাঁহারা এ সম্বন্ধে কোন স্বতন্ত্র ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করেন নাই। বলা বাহুল্য, বাউলসম্প্রদায়ের অংশবিশেষের হিন্দুসমাজে প্রবেশ লাভের ব্যর্থ চেষ্টাজাত সংযোগী বৈরাগিগণের মধ্যে বিবাহে যে মালা চন্দন বদল প্রথা আছে, তাহা বিশুদ্ধ বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত

অনুমোদিত নহে। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের দশবিধ সংস্কারের মধ্যে কেবল শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বিধি শ্রীহরিভক্তিবিলাসে দৃষ্ট হয়।

প্রাপ্তে শ্রাদ্ধদিনেঽপি প্রাগন্নং ভগবতেঽর্পয়েৎ।

তচ্ছেষেণৈব কুর্ব্বীত শ্রাদ্ধং ভাগবতো নরঃ॥

স্মার্ত্ত বিধান অনুসারেও যখন শ্রাদ্ধের পূর্ব্বে যজ্ঞেশ্বরকে শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যের অগ্রভাগ নিবেদন করা হইয়া থাকে, তখন উদ্ধৃত বিধি বর্ণাশ্রমাচারের প্রতিকূল নহে, পরন্তু অনুকূল। স্মার্ত্ত বিধানে যাহা সামান্য বিধি, বৈষ্ণব স্মৃতিতে তাহাই বিশেষ বিধি করা হইয়াছে।

প্রেমবিলাসের চতুর্ব্বিংশতি বিলাসে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজের ইতিবৃত্ত ও কুলমর্য্যাদা সম্বন্ধে বিশদভাবে বর্ণনা আছে। খুব সম্ভব, প্রেমবিলাসের এই অংশ অত্যন্ত আধুনিক। কিন্তু তাহা হইলেও বৈষ্ণবগ্রন্থের পরিশিষ্টে যে কুলাচার বর্ণিত আছে, তাহা হইতে অনুমিত হয় যে, মহাপ্রভুর উপাসকগণের মধ্যে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রভাব শিথিল হয় নাই।

এই সমস্ত তত্ত্ব ও প্রমাণ ভালভাবে আলোচনা না করিয়াই আধুনিক লেখকগণ এই ভ্রান্ত মত প্রচার করেন যে, মহাপ্রভু জাতিধর্ম্ম উঠাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন ও জাতিধর্ম্মের প্রভাব সমাজে তখন শ্লথ হইয়া গিয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

জৈনদিগের দৈনিক ষট্‌কর্ম্ম*

হিন্দু দ্বিজাতির পক্ষে প্রতিদিন পাঁচটী মহাযজ্ঞের † অনুষ্ঠান করিবার ব্যবস্থা আছে। অবশ্য এই যজ্ঞগুলির মধ্যে সকলগুলিতেই দেবতোদ্দেশে অগ্নিতে আজ্যাদি আহুতি দিতে হয় না। এই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান একটু অন্যরূপ। বেদাদির অধ্যয়ন এবং অধ্যাপন ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃলোকের তর্পণ পিতৃযজ্ঞ, বৈশ্বদেব হোম দেবযজ্ঞ, পশু পক্ষীদিগকে অন্নদান ভূতযজ্ঞ আর অতিথিপূজন নৃযজ্ঞ ‡। প্রাচীন কালে প্রত্যেক দ্বিজ নিত্য নিয়মিতভাবে এই পাঁচ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। এগুলি তাঁহাদের নিত্যকর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের বর্ণনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। হিন্দুগণের এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুরূপ জৈনগণের পক্ষে প্রতিদিন অনুষ্ঠেয় ষট্‌কর্ম্ম বা ছয়টী কার্য্যবিশেষের অনুষ্ঠান করিবার নিয়ম আছে। সেইগুলির বিষয় সংক্ষেপে কথঞ্চিৎ আলোচনা করিবার অভিপ্রায়েই এই প্রবন্ধ লিখিত হইতেছে। জৈন শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—

দেবপূজা গুরূপাস্তিঃ স্বাধ্যায়ঃ সংযমস্তপঃ।
দানং চেতি গৃহস্থানাং ষট্‌ কর্ম্মাণি দিনে দিনে॥

দেবপূজা, গুরুর উপাসনা, স্বাধ্যায় (শাস্ত্রাধ্যয়ন), সংযম, তপস্যা এবং দান, এই ছয়টী কর্ম্ম প্রত্যেক গৃহস্থেরই প্রতিদিন অনুষ্ঠান করিতে হইবে। ইহাই জৈন শাস্ত্রের বিধান। এই ষট্‌কর্ম্মই জৈনদিগের নিত্যকৃত্যের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। জৈন শ্রাবক প্রতিদিন তাঁহার ধর্ম্মের জন্য শাস্ত্রের নির্দ্দেশানুসারে অন্য কোনও কার্য্য করুন আর নাই করুন, এই ষট্‌কর্ম্মের অনুষ্ঠান তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। তবে কোন বিধিই সকলের পক্ষে সমানভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে না। যিনি সম্যগ্‌জ্ঞানী, যিনি বিদ্বান্‌, যিনি সমর্থ, তিনি সম্যক্‌রূপে এই ষট্‌কর্ম্মের সমস্ত বিধান পালন করিয়া চলিবেন। আর যিনি অল্পজ্ঞ—যিনি অসমর্থ, তিনি যথাসাধ্য প্রতিদিন ষট্‌কর্ম্মের প্রত্যেক কর্ম্মের অন্ততঃ আংশিক অনুষ্ঠান করিবেন। কার্য্যতঃও দেখিতে পাওয়া যায়, জৈনদিগের মধ্যে সকলেই যথাশক্তি ষট্‌কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ফলতঃ, হিন্দু ব্রাহ্মণাদির সন্ধ্যাবন্দনাদির মত এই ষট্‌কর্ম্ম জৈনদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য নিত্যকর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত। এই সকল কর্ম্মানুষ্ঠানের যে সকল বিধান জৈনশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাদেরই সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আলোচনা এইবার করিব।

দেবপূজা

দেব (চতুর্ব্বিংশতি অতীত জিন বা তীর্থঙ্কর, চতুর্বিংশতি বর্ত্তমান তীর্থঙ্কর এবং চতুর্বিংশতি ভবিষ্যৎ তীর্থঙ্কর), গুরু (আচার্য্য, উপাধ্যায়, সাধু, মুনি প্রভৃতি) ও শাস্ত্র—এই সকলকেই জৈনগণ

---

* বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ২১শ বার্ষিক ২য় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

† ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও নৃযজ্ঞ।

‡ অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্‌।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোহতিথিপূজনম্‌।—মনুসংহিতা ৩.৭০।

দেবতাজ্ঞানে পূজা করিয়া থাকেন। নিত্যপূজায় সাধারণতঃ তাঁহারা তীর্থঙ্করগণের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভক্তিসহকারে জল প্রভৃতি অষ্ট দ্রব্যের দ্বারা সেই মূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকেন। কাহারও কাহারও নিজ গৃহেই এইরূপ জিনমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে। যাঁহাদের বাড়ীতে এইরূপ জিনমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, তাঁহারা গৃহেই নিত্যপূজা সম্পন্ন করিতে পারেন। কিন্তু যাঁহাদের গৃহে এরূপ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত নাই, তাঁহারা নিকটবর্ত্তী জিনমন্দিরে যাইয়া পূজাকার্য্য সমাধা করেন। একটী কথা এ স্থানে বলা দরকার। জৈনেরা যে সকল দেবমূর্ত্তি প্রস্তুত করেন, তাহা হয় ধাতুময়ী, না হয় পাষাণময়ী। মৃন্ময়ী মূর্ত্তি প্রস্তুত করা তাঁহাদের শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

নিত্যপূজার সময় যে মন্দিরে যে তীর্থঙ্কর প্রধানরূপে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার পূজা করা বিধেয়। একসঙ্গে চতুর্বিংশতি তীর্থঙ্করের পূজাও করা যাইতে পারে। এইরূপ একত্র চতুর্ব্বিংশতি তীর্থঙ্করের পূজা করার নাম "সমুচ্চয়চতুর্ব্বিংশতিজিনপূজা।"

জৈনদিগের পূজ্য এই যে জিন বা তীর্থঙ্কর, ইঁহারা মানবরূপেই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তবে তাঁহারা তপশ্চর্য্যাদির প্রভাবে কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করিয়া মোক্ষলাভ করিয়াছেন এবং সর্ব্বজ্ঞতা প্রভৃতি গুণলাভ করিয়া সাধারণকে মোক্ষলাভের উপায়সমূহ (বা মোক্ষমার্গ) নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। এইরূপ মুক্ত পরমাত্মার পূজাকে জৈনাচার্য্যগণ শ্রাবকের দৈনন্দিন কৃত্যের মধ্যে প্রধান স্থান দিয়া বোধ হয় ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, এই তীর্থঙ্করগণই প্রত্যেক শ্রাবকের আদর্শস্বরূপ হওয়া উচিত এবং প্রত্যেক শ্রাবকেরই তাঁহাদের অবলম্বিত পন্থা অনুসরণ করিয়া এবং তাঁহাদের আচরণের সর্ব্বথা অনুকরণ করিয়া, তাঁহাদেরই মত মোক্ষলাভের জন্য যত্নবান্ হওয়া উচিত। জৈন শাস্ত্রের যে ইহাই একমাত্র অভিপ্রায়, তাহা জিনপূজার মন্ত্রগুলি মনোযোগের সহিত পাঠ করিলেও স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয়। মোক্ষ ভিন্ন জৈনদিগের জীবনের অপর কোন লক্ষ্য নাই—মোক্ষলাভই এই নিত্য জিনপূজার মুখ্য ও একমাত্র উদ্দেশ্য—পূজার প্রতিমন্ত্রে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়।

পূজাকালে তীর্থঙ্করের উদ্দেশে জলচন্দনাদি উৎসর্গ করিবার সময় প্রত্যেক স্থলেই এক একটী কামনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুদিগের পূজার মধ্যে এ জিনিষটী নাই। তাঁহারা পূজার প্রারম্ভে কামনার উল্লেখ করিয়া সঙ্কল্প করিয়া থাকেন বটে; তবে পাদ্যাদি উৎসর্গ করিবার সময় কোন কামনা করেন না। কিন্তু জৈনগণ ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের দ্বারা পূজা করিবার সময় ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে মুক্তির কামনা করেন। উদাহরণ দিলেই কথাটী স্পষ্ট হইবে।

"ওঁ হ্রীং বৃষভাদিবীরান্তেভ্যো জন্মমৃত্যুবিনাশনায় জলং নির্ব্বপামি,......ভবতাপবিনাশায় চন্দনং নির্ব্বপামি,......অক্ষতপদপ্রাপ্তয়ে অক্ষতান্ নির্ব্বপামি,......কামবাণবিধ্বংসনায় পুষ্পং নির্ব্বপামি,......... ক্ষুধারোগবিনাশনায় নৈবেদ্যং নির্ব্বপামি,...... মোহান্ধকারবিনাশনায় দীপং নির্ব্বপামি,......অষ্টকর্ম্মদহনায় ধূপং নির্ব্বপামি,......মোক্ষফলপ্রাপ্তয়ে ফলং নির্ব্বপামি,......অনর্ঘ্যপদপ্রাপ্তয়ে অর্ঘ্যং নির্ব্বপামি।"

জৈনদিগের এই কামনা সম্বন্ধে আর একটী বিষয়ও লক্ষ্য করিতে হইবে। পূজার্চ্চনাদির সময়

হিন্দুদিগের কামনার বিষয় পুত্র, পৌত্র, ধন, ঐশ্বর্য্য, অক্ষয় স্বর্গলাভ প্রভৃতি। কিন্তু জৈনগণ দৈনন্দিন দেবপূজায় সময়ও এই সকল বিনশ্বর বস্তু কামনা করেন না। প্রত্যেক জৈনেরই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য মোক্ষপ্রাপ্তি। সুতরাং তাঁহারা সেই মোক্ষপ্রাপ্তির অনুকূল বিষয় ব্যতীত অপর বিষয়ের কামনা কদাপি করেন না। অবশ্য হিন্দুরও যে চরম লক্ষ্য মোক্ষ, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। তবে হিন্দু দার্শনিকের মতে প্রারম্ভ হইতেই মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য প্রয়াস করিলে অনেক সময় সে প্রয়াস ব্যর্থ হইয়া যায়। সংসারের প্রতি যত দিন মনের বৈরাগ্য উপস্থিত না হয়, ততদিন মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য যত্ন করা পণ্ডশ্রম ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই জন্য স্বর্গভোগাদি নশ্বর বস্তু প্রাপ্তির জন্য মানুষ প্রথমে পূজার্চ্চনাদির অনুষ্ঠান করুক—এইরূপে চিত্ত শুদ্ধ হইলে এবং বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে তখন মোক্ষ-লাভের জন্য যত্ন করিলে তাহা অল্প সময়ের মধ্যেই ফলপ্রসূ হইবে। জৈনগণ তাহার উত্তরে বলিবেন—চিত্তশুদ্ধিই যদি পূজাদির উদ্দেশ্য হয় এবং কামনার দ্বারা লোকের চিত্ত পূজাদির দিকে আকৃষ্ট করাও যদি প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে এ উভয় কার্য্যই ত পূজার সময় মোক্ষপ্রাপ্তির অনুকূল ইন্দ্রিয়-জয়াদি ও মোক্ষলাভের কামনাদ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে।

যাহা হউক, পূজাদি ব্যাপারে এইরূপ মোক্ষলাভের যে কামনা এবং প্রারম্ভ হইতেই সকলের চিত্ত জীবনের এই চরম লক্ষ্যের দিকে উন্মুখ করিবার জন্য এই যে চেষ্টা, তাহা যে বিশেষ প্রশংসনীয়, তাহাতে সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই। জৈনদিগের প্রত্যেক ধর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যেই এই চরম লক্ষ্যের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়া জৈন শাস্ত্রকারগণ প্রত্যেকের সম্মুখেই যে সকল সময়ের জন্য এক উচ্চ আদর্শ উপস্থিত রাখিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। জীবনের যেটি লক্ষ্য হওয়া উচিত, সেটীর কথা এইরূপ সকল সময়ে সকলের হৃদয়ের মধ্যে জাগরূক করিয়া রাখার উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা পণ্ডিত মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন।

আমরা প্রকৃত বিষয় হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন প্রকৃতের অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। পূজা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে যে জিন বা তীর্থঙ্করের পূজা করা হইবে, তাঁহার আবাহন, স্থাপন ও সন্নিধীকরণ * করিতে হয়। তাহার পর পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রের দ্বারা জল, চন্দন, অক্ষত, পুষ্প, নৈবেদ্য, দীপ, ধূপ ও ফল, এই অষ্ট দ্রব্যের সাহায্যে পূজা করিতে হয়। ইহারই নাম অষ্টক বা অষ্টদ্রব্য-পূজা। ইহার পর পঞ্চকল্যাণকের অনুষ্ঠান করা হয় অর্থাৎ অর্চ্চনীয় তীর্থঙ্করের গর্ভ, জন্ম, তপস্যা, জ্ঞানলাভ ও মোক্ষের কথা স্মরণ করিয়া এক একটী অর্ঘ্য দেওয়া হয়। ইহার পর স্তোত্রাদি বা জয়মালা পঠিত হয়। এইরূপ স্তোত্রাদি পাঠ করিতে করিতে জিনমূর্ত্তিকে প্রদক্ষিণ করা হইয়া থাকে।

হিন্দুদিগের যেমন এক দেবতার পূজা করিবার সময় মূল পূজার পূর্ব্বে ও পরে গণেশাদি নানা দেবতার পূজা করিয়া লইতে হয়, জৈনদিগের সেইরূপ কোনও বিধান দেখা যায় না। তারপর হিন্দুদিগের মধ্যে পূজার দ্রব্যাদির বাহুল্যানুসারে ষোড়শোপচার, দশোপচার ও পঞ্চোপচার, এই কয়টী

* আবাহন করিবার সময় 'অত্র অবতর অবতর সং বৌষট্', স্থাপন করিবার সময় "অত্র তিষ্ঠ তিষ্ঠ ঠঃ ঠঃ" এবং সন্নিধীকরণের সময় 'অত্র মম সন্নিহিতো ভব ভব বষট্।' এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়।

জৈনধর্মেতে পাওয়া যায়। দৈনদিগের মধ্যে কিন্তু মাত্র ঐ অষ্টকের ব্যবস্থা। তবে প্রতিদিনই যে সকলে ঐ আটটী দ্রব্যের দ্বারা পূজা করেন, এমন নহে। সংক্ষেপের জন্য বেশীর ভাগ লোকেই জিনমন্দিরে যাইয়া জিনদেবের দর্শন ও তাঁহার উদ্দেশে অক্ষত অথবা পুষ্প ও যে কোন একটী ফলমাত্র উৎসর্গ করিয়া থাকেন। তবে এইটুকু অনুষ্ঠান করিতে পারত পক্ষে প্রায় কোন স্ত্রীপুরুষই বাধা করেন না।

গুরূপাস্তি

যাঁহারা সংসারের মায়া পরিত্যাগ করিয়াছেন—বিষয়ের প্রলোভন যাঁহাদিগকে প্রলুব্ধ করিতে পারে না—কামক্রোধাদি যাঁহাদের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছে, এরূপ মুনিদিগের সেবা বা উপাসনা করাও প্রত্যেক শ্রাবকের দৈনন্দিন কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত। কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা প্রতিনিয়তই ইঁহাদিগের সেবা করা উচিত, ইহা জৈনশাস্ত্রের বিধি *। এইরূপ মুনির পার্শ্বে বসিয়া তাঁহাদের নিকট শ্রদ্ধার সহিত বিবিধ বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ করাও এই গুরূপাসনারই অন্তর্গত। তারপর এইরূপ গুরুকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার নিকট নিজের আচরিত পাপের কথাও প্রকাশ করা উচিত। † এইরূপে গুরুর নিকট স্বকৃত পাপের বিষয় উল্লেখ করিলে এক দিকে যেমন গুরু সমস্ত বিষয় বুঝিয়া কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতে পারেন, অন্য দিকে আবার শ্রাবকের ইহা বলিতে বলিতে পাপের প্রতি ঘৃণা স্বতঃই উৎপন্ন হয় এবং সে পাপ পরিত্যাগ করিবার জন্য তাহার হৃদয়ে বাসনা প্রবল হইয়া উঠে। ফলতঃ অপরের নিকটই হউক বা নিজ মনে মনেই হউক, স্বকৃত পাপের একবার আলোচনা করিলে তাহাতে যথেষ্ট সুফল পাওয়া যায়।

তবে আজকাল আর সাধারণতঃ সেই নির্গ্রন্থ দিগম্বর মুনি বহুল পরিমাণে পাওয়া যায় না। এই জন্য সেইরূপ মহাপুরুষদিগের কথা স্মরণ করা এবং সম্যগ্-দৃষ্টি ও সম্যগ্‌জ্ঞান যাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এরূপ ঐলক, ক্ষুল্লক ‡ ও ব্রহ্মচারীকেই সেবা করা এবং তাঁহাদের নিকট বসিয়া উপদেশ গ্রহণ করা গুরূপাস্তির অনুকল্পরূপে বিহিত হইয়াছে।

---

* সাগারধর্ম্মামৃত—২।৪৩। † সাগারধর্ম্মামৃত—৬।১১।

‡ উৎকৃষ্ট জৈন শ্রাবকদিগের মধ্যে দুই ভেদ—(১) ঐলক, (২) ক্ষুল্লক। ক্ষুল্লক অপেক্ষা ঐলকের স্তর উচ্চে। ক্ষুল্লক একখানি কৌপীন ও একখণ্ড ক্ষুদ্র উত্তরীয় মাত্র ধারণ করিয়া থাকেন। তাঁহার নিকট জলপানের জন্য একটী কমণ্ডলু, ভোজনের জন্য একটী পাত্র এবং মাটি হইতে কীটপতঙ্গাদি অপসারিত করিবার জন্য ময়ূরপুচ্ছনির্ম্মিত পিচ্ছিকা থাকে। ক্ষুল্লককে বিশেষ যত্নের সহিত সামায়িক, প্রোষধোপবাস, স্বাধ্যায় ও অন্যান্য ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়। ঐলককেও মুনিদিগের ন্যায় শ্রদ্ধার সহিত বিবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়। রাত্রিতে তাঁহার পক্ষে মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক ধ্যানস্থ হইবার বিধান আছে। একখানি কৌপীন, পিচ্ছিকা ও একটী কমণ্ডলু ভিন্ন ঐলকের অন্য কোনও দ্রব্য রাখিবার নিয়ম নাই।

[illegible] খাদ্য সম্বন্ধে উভয়কেই শ্রাবকের দানের উপর নির্ভর করিতে হয়। তবে শ্রাবক স্বয়ং অভ্যর্থনা [illegible] করিলে যাচিয়া শ্রাবকের বাড়ীতে ইঁহারা ভোজন করেন না।

স্বাধ্যায়

প্রত্যেক জৈনের পক্ষেই প্রতিদিন যথাসাধ্য কিছু সময় জৈনশাস্ত্র আলোচনা করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, জৈনগণ শাস্ত্রগ্রন্থকে দেবতার মত ভক্তি ও পূজা করেন। সুতরাং শাস্ত্রালোচনও যে তাঁহাদের পক্ষে দৃঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত কর্ত্তব্য, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। যিনি গ্রন্থ পাঠ বা শ্রবণ করিবেন, তাঁহাকে পবিত্রভাবে ভক্তির সহিত ঐ কার্য্য করিতে হইবে, ইহা জৈনশাস্ত্রের বিধি। অপবিত্র বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া, অস্নাত অপবিত্র দেহে, অপরিষ্কৃত ও অপবিত্র স্থানে বসিয়া অশ্রদ্ধার সহিত শাস্ত্রগ্রন্থের অধ্যয়ন বা আলোচনা করিলে উহাতে শাস্ত্রের অবমাননা করা হয় এবং সেরূপ অধ্যয়ন বা আলোচনায় কোনরূপ সুকৃতি লাভ হয় না বলিয়া জৈনশাস্ত্রকারগণ উহা নিষিদ্ধ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন।

জৈনদিগের এই স্বাধ্যায় শব্দে শাস্ত্রের অধ্যয়নমাত্রই বুঝিতে হইবে না। ফলতঃ, শাস্ত্রের অধ্যয়ন ব্যতীতও স্বাধ্যায়ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে। কথাটী একটু পরিষ্কার করিয়া বলা দরকার। জৈনশাস্ত্রকারগণ স্বাধ্যায়ের কয়েকটী প্রকারভেদ স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে স্বাধ্যায় পাঁচ প্রকার—বাচনা স্বাধ্যায়, পৃচ্ছনা স্বাধ্যায়, অনুপ্রেক্ষা স্বাধ্যায়, আম্নায় স্বাধ্যায় ও ধর্ম্মোপদেশ স্বাধ্যায় *। বিশুদ্ধভাবে শাস্ত্রগ্রন্থের পঠন ও পাঠনের নাম বাচনা স্বাধ্যায়। প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে ইহাই যথার্থ স্বাধ্যায়। শাস্ত্রগ্রন্থের কোন অংশ বুঝিতে না পারিলে জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট বিনীতভাবে তাহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিবার নাম পৃচ্ছনাস্বাধ্যায়। গুরুর নিকট হইতে শ্রুত বিষয়ের পুনঃ পুনঃ চিন্তা ও অভ্যাস করার নাম অনুপ্রেক্ষাস্বাধ্যায়। শুদ্ধভাবে স্পষ্টরূপে (আর্ষ আম্নায়ানুসারে অর্থ বুঝিয়া) শাস্ত্রগ্রন্থ আবৃত্তি করার নাম আম্নায়স্বাধ্যায়। জনসাধারণকে উন্মার্গ হইতে সৎপথে আনিবার জন্য এবং তাহাদিগকে পদার্থের যথার্থ স্বরূপ বুঝাইবার জন্য ধর্ম্মবিষয়ে উপদেশ দেওয়ার নাম ধর্ম্মোপদেশস্বাধ্যায়।

এই পঞ্চবিধ স্বাধ্যায়ের মধ্যে যে কোন স্বাধ্যায়ের অনুষ্ঠান করা প্রত্যেক শ্রাবকের পক্ষে প্রতিদিনই কর্ত্তব্য। স্বাধ্যায়ের এই কয়টী ভেদ থাকায় জৈনদিগের মধ্যে দুইটী সুন্দর জিনিষ লক্ষিত হয়। প্রথমতঃ, ইহাতে কি পণ্ডিত, কি মূর্খ—কি অক্ষরজ্ঞ, কি নিরক্ষর—কি উচ্চজাতি, কি অস্পৃশ্য নীচ জাতি, সকলের পক্ষেই একপ্রকার না একপ্রকার স্বাধ্যায় পালন করা সম্ভবপর হয়। দ্বিতীয়তঃ, ইহাতে সমাজের প্রত্যেকেই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞান লাভ করিতে পারে। বাঙ্গালাদেশে যখন কথকতার প্রচলন খুব বেশী ছিল, তখন যেমন বঙ্গপল্লীর আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই হিন্দুপুরাণ ও হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করিত, স্বাধ্যায়ের এইরূপ নানা ভেদ জৈনশাস্ত্রে বর্ণিত হওয়ার দরুণ এবং এই স্বাধ্যায় প্রত্যেক জৈনের অবশ্যকর্ত্তব্য দৈনন্দিন কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত হওয়ায় জৈনশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বহু জটিল ও গভীর তত্ত্ব সম্বন্ধেও জৈন সাধারণ লোকের তেমনই যথেষ্ট জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। নিরক্ষরেরাও দর্শনের প্রতিপাদ্য কঠিন কঠিন বিষয় সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ অভিজ্ঞ—এরূপ লোক

* তত্ত্বার্থাধিগমসূত্র—৯।২৫।

বোধ হয়, জৈনদিগের মধ্যে ভিন্ন অপর কোনও ধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে পাওয়া যায় না। মুক্তি কি—মুক্তি লাভের উপায় কি, তত্ত্ব কয় প্রকার, প্রমাণ কাহাকে বলে, জ্ঞান কয় প্রকার, জীব কয় প্রকার প্রভৃতি বিষয়ে প্রশ্ন করিলে প্রত্যেক জৈন শ্রাবকই তাহার কিছু উত্তর দিতে পারিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ, এই বিষয়টী লক্ষ্য করিয়া আমি প্রকৃতপক্ষেই বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়াছি। আমার মনে হয়, প্রত্যেক ধর্ম্মেই এইরূপ ধর্ম্মগ্রন্থের স্বাধ্যায়ের ব্যবস্থা থাকা দরকার।

সংযম

জৈনশাস্ত্রকারদিগের মতে সংযম দুই প্রকার—(১) ইন্দ্রিয়সংযম, (২) প্রাণিসংযম। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে তাহাদের বিষয় হইতে নিবৃত্ত করার নাম ইন্দ্রিয়সংযম। আর প্রাণিহিংসা হইতে বিরত হওয়ার নাম প্রাণিসংযম। এই দুই সংযম অভ্যাস করিবার জন্য প্রত্যেক শ্রাবককেই প্রতিদিন যথাশক্তি চেষ্টা করিতে হইবে। 'আজ আমি এই জিনিসটী দেখিব না', 'আজ আমি এই জিনিসটী খাইব না' প্রতিদিন শ্রাবককে এইরূপ একটী একটী (শক্ত্যনুসারে একাধিক) প্রতিজ্ঞা করিয়া এবং সেই প্রতিজ্ঞানুসারে কার্য্য করিয়া সংযম অভ্যাস করিতে হইবে। ইহাই তাহার পক্ষে দৈনন্দিন কর্ত্তব্য সংযম। এইরূপে অভ্যাস করিলে কালক্রমে তাহার দুই প্রকার সংযমই অভ্যস্ত হইবে এবং ধর্ম্মবিষয়ে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়া সে সাক্ষাৎ মুক্তির কারণ মুনিধর্ম্ম ধারণ করিতে সক্ষম হইতে পারিবে।

তপঃ

ধর্ম্মে প্রবৃত্তি বাড়াইবার জন্য প্রতিদিনই যথাশক্তি কিছু না কিছু তপশ্চর্য্যা বা আত্মধ্যানাদির অনুষ্ঠান করাও কর্ত্তব্য। এইরূপ ক্রিয়ার আর এক নাম সামায়িক। ইহার অনুষ্ঠান আদৌ কঠিন নহে। "ওঁ নমঃ সিদ্ধেভ্যঃ," "শ্রীবীতরাগায় নমঃ," "ণমো অরহন্তাণং" "ণমো সিদ্ধাণং" ইত্যাদি মন্ত্রের যে কোন একটী যথাশক্তি স্থিরচিত্তে সংযত ও পবিত্রভাবে জপ করাই এই অনুষ্ঠানের মুখ্য কর্ত্তব্য। এরূপ জপের দ্বারা চিত্তের পবিত্রতা ও একাগ্রতা সাধিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

এই তপশ্চর্য্যার মধ্যে আর একটী কার্য্য করিবারও বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রাবক যে যে পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে, মনে মনে তাহার আলোচনা, তাহার জন্য অনুতাপ এবং সেইরূপ কার্য্য ভবিষ্যতে যাহাতে সঙ্ঘটিত না হয়, সে বিষয়ে মনে মনে চিন্তা করাও তপশ্চর্য্যার অন্তর্ভুক্ত। এরূপ চিন্তা ও আলোচনার দ্বারা যে অনেক উপকার হয়, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। জৈনাচার্য্যগণ তপস্যার দ্বাদশ প্রকার ভেদের বর্ণনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে ছয় প্রকার বাহ্য তপঃ ও ছয় প্রকার আভ্যন্তর তপঃ। অনশন, অবমৌদর্য্য, বৃত্তিপরিসংখ্যান, রস-পরিত্যাগ, বিবিক্তশয্যাসন ও কায়ক্লেশ, এই ছয়টী হইল বাহ্য তপঃ। খাদ্যদ্রব্যাদি বাহ্য বস্তু বিষয়েই এই তপের বিধান; তাই ইহার নাম বাহ্য তপঃ। প্রায়শ্চিত্ত, বিনয়, বৈয়াবৃত্ত্য, স্বাধ্যায়, ব্যুৎসর্গ ও ধ্যান, এই ছয়টী আভ্যন্তর তপঃ। এই দ্বাদশবিধ তপস্যা মুনিগণেরই মুখ্য কর্ত্তব্য। তবে শ্রাবকগণ যথাশক্তি ইহাদের অনুষ্ঠান করিবেন, ইহাই জৈনশাস্ত্রের নির্দেশ।

এক্ষণে সংক্ষেপে এই তপস্যাগুলির লক্ষণ নির্দ্দেশ করিব। সংযম অভ্যাস করিবার নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য খাদ্য, স্বাদ্য, লেহ্য, পেয়, এই চারি প্রকার ভোজন ত্যাগ করার নাম অনশন তপঃ। বিবিধ উৎসবাদি উপলক্ষে হিন্দুদিগের যে উপবাসের বিধান আছে, জৈনদিগের অনশন তপঃ অনেকটা সেইরূপ। উপোষিত অবস্থায় পূজা ধ্যানাদির অনুষ্ঠানে চিত্তের একাগ্রতা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। সংযমাভ্যাস, ইন্দ্রিয়দমন, এবং চিত্তের একাগ্রতা সাধনের উদ্দেশ্যে অল্প পরিমাণে (আকণ্ঠ পূর্ণ না করিয়া) ভোজন করার নাম অবমৌদর্য্য। অধিক পরিমাণে ভোজন যেমন স্বাস্থ্যের অনিষ্ট জন্মায়, তেমনই ধর্ম্মানুষ্ঠানের পথে বাধা হইয়া দাঁড়ায়। "আজ মাত্র দুই বাড়ীতে যাইব। আহার মিলে ত ভাল; নহিলে উপবাসী থাকিব।" এইরূপ প্রতিজ্ঞানুসারে কার্য্য করার নাম বৃত্তিপরিসংখ্যান। সংযমাভ্যাসার্থ ঘৃত, দুগ্ধ, দধি, গুড়, লবণ, তৈল প্রভৃতির মধ্যে প্রতিদিন এক বা একাধিক রসত্যাগ করার নাম রসপরিত্যাগ *। চিত্তের একাগ্রতাসাধনের জন্য নির্জ্জন স্থানে শয়ন ও উপবেশন করিবার নাম বিবিক্তশয্যাসন। শরীরের প্রতি মমত্ব ত্যাগ করিয়া নানারূপ কষ্ট সহ্য করার নাম কায়ক্লেশ। এই সকল তপগুলি সংযমাভ্যাস, ইন্দ্রিয়দমন, চিত্তের একাগ্রতাসাধন প্রভৃতি বিষয়ে যে একান্ত উপযোগী, তাহা একটু বিবেচনা করিলেই বুঝা যায়। অবশ্য নব্যসম্প্রদায়ের অনেকে হয় ত ইহাকে প্রশংসার চক্ষে দেখিবেন না। কিন্তু সংযম অভ্যাস করাই যদি লক্ষ্য হয়, তবে তাহা ত্যাগের মধ্য দিয়া ভিন্ন ভোগের মধ্য দিয়া হয় না, এ কথা স্থির নিশ্চিত।

আভ্যন্তর তপের সকলগুলির লক্ষণ বলা প্রয়োজনীয় মনে করি না। প্রায়শ্চিত্ত, বিনয় ও ধ্যান, ইহাদের অর্থ সকলেই জানেন। স্বাধ্যায়ের কথা ইতঃপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। মুনি প্রভৃতির সেবা করার নাম বৈয়াবৃত্ত্য। পরিগ্রহপরিত্যাগের নাম ব্যুৎসর্গ।

দান

প্রতিদিন যথানিয়মে যে শ্রাবক কিছু দান করে এবং যথাশক্তি তপশ্চর্য্যা করে, সে জন্মান্তরে শ্রেষ্ঠ লোকে গমন করিয়া থাকে। † এই জন্যই সাগারধর্ম্মামৃতকার শ্রাবকের দৈনন্দিন আচারের বর্ণনা করিবার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—"তাহার পর ভক্তির সহিত যথাশক্তি সৎপাত্রকে (দানাদির দ্বারা) সন্তুষ্ট করিয়া এবং আশ্রিত সকল লোকেরই সন্তোষ বিধান করিয়া যথাকালে পরিমিত আহার করিবে। ‡

দান করিবার সময়ে সৎপাত্রকেই দান করা উচিত। জৈনাচার্য্যগণের মতে সৎপাত্রের মধ্যেও উত্তম, মধ্যম ও জঘন্য, এই তিন শ্রেণী আছে। সংসারত্যাগী মুনিই উত্তম পাত্র। সম্যগ্‌দৃষ্টি-সম্পন্ন শ্রাবক মধ্যম পাত্র আর যাহাদের সম্যগ্‌দর্শন নাই, এরূপ সাধারণ ক্ষুধাতুরাদি দুঃখী মাত্রেই জঘন্য পাত্র। উত্তম পাত্রে দান করিতে পারিলে তাহাতেই সমধিক ফল লাভ হয়; তবে

---

* হিন্দুদিগের মধ্যেও এইরূপ সংযমাভ্যাসের জন্যই প্রতিদিন কোনও না কোনও দ্রব্য পরিত্যাগ করিবার ব্যবস্থা আছে।

† সাগারধর্ম্মামৃত—২।১৯।   ‡ সাগারধর্ম্মামৃত—৬।২৩।

উত্তম পাত্র পাওয়া না গেলে অগত্যা মধ্যম বা অধম পাত্রকেই দান করিতে হইবে, ইহা জৈন শাস্ত্রের মত ও গৃহস্থগণের প্রাত্যহিক কর্ম্ম।

ইঁহাদের মতে দান চারি প্রকার—অভয়দান, আহারদান, বিদ্যাদান ও ঔষধদান। এই চারি প্রকার দানের মধ্যে সকলগুলি না হউক, অন্ততঃ একটী প্রত্যহ প্রত্যেক শ্রাবকের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। সকল লোকের বাঞ্ছিত ধর্ম্ম, কাম, অর্থ ও মোক্ষ—উৎকৃষ্ট সুখ প্রভৃতি লাভ করা প্রাণ না থাকিলে সম্ভবপর হয় না। সুতরাং প্রাণই ইহাদের সকলের মূল। সেই মূলীভূত প্রাণ-রক্ষার জন্য যিনি অভয়দান করেন, তিনি কি ই বা দান না করেন অর্থাৎ তাঁহার দানই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।* অভয়দানের এই প্রশংসাসূচক বাক্য হইতে প্রতীত হইতেছে যে, জীব রক্ষা করার জন্য যে অহিংসা-ব্রতের অনুষ্ঠান, তাহাও এই অভয়দানেরই অন্তর্ভুক্ত।

শাস্ত্রপাঠেই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয় জ্ঞান জন্মে—শাস্ত্রপাঠেই ধর্ম্মে অনুরাগ জন্মায়, পাপরাশি দূর করে এবং চিত্তকে পবিত্র করে; সুতরাং সেই শাস্ত্র দান করা একান্ত কর্ত্তব্য †। এই শাস্ত্রদানই বিদ্যাদান নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

যাহার জন্য লোকে ভার্য্যা, ভ্রাতা এবং পুত্রকেও ত্যাগ করে, যাহা বিনা ব্রতাদি সকলই নষ্ট হয়, যাহার অভাবে পীড়িত হইয়া লোকে ক্ষুধার প্রকোপে অখাদ্য পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হয়, সংযত সাধু ব্যক্তিকে সেই আহার দান করা কর্ত্তব্য। ‡

শরীর সুস্থ থাকিলেই তপঃ ধ্যান প্রভৃতি সম্ভব, এই নিমিত্ত রোগ শান্তির জন্য সাধু ব্যক্তি-দিগকে ঔষধ দান করা উচিত। ** এইরূপে এই চারি প্রকার দানের মাহাত্ম্যই জৈন শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

শ্রাবকগণ যথাশক্তি এই সকল দানকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে সমাজে কাহারও কোন কষ্ট থাকিতে পারে না—মুনিগণ নিশ্চিন্ত মনে তপশ্চর্য্যাদি কার্য্য করিতে পারেন; তাঁহাদের যদি কোনও অভাব অভিযোগ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আর কিছুর জন্য না হউক, অন্ততঃ পুণ্যার্জ্জনের জন্যও শ্রাবক তাহা দূর করিতে পারে। বস্তুতঃ জৈনদিগের এই ষট্‌কর্ম্ম একদিকে যেমন অনুষ্ঠাতার ধর্ম্মোন্নতির কারণ হইয়া থাকে, অন্য দিকে সেইরূপ যাঁহারা ধর্ম্মার্জ্জনের জন্য প্রাণ পণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের যাহাতে কোন বিঘ্ন না হয়, বরং তাঁহারা যাহাতে সুখে ও নিশ্চিন্তভাবে ধর্ম্মার্জ্জন করিয়া নিজের এবং অপরের উন্নতির বিষয়ে সহায়তা করিতে পারেন, সে কার্য্যে শ্রাবককে প্রবৃত্ত করাইয়া সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া থাকে।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

---

* সুভাষিতরত্নসন্দোহ—৪৭৬।

† ঐ — ঐ। —৪৭৭।

‡ ঐ — ঐ। —৪৭৮।

** ঐ — ঐ —৪৭৯।

একত্রিংশ বার্ষিক

প্রথম বিশেষ অধিবেশন

স্যর আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশার্থ আহুত

২৯এ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১, ১২ই জুন ১৯২৪, বৃহস্পতিবার, অপরাহ্ণ ৬।০টা

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু নাট্যকলাসুধাকর—সভাপতি

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিষদের সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু নাট্যকলাসুধাকর মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিবার পর সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল্ মহাশয়কে "স্যর আশুতোষ চৌধুরী" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিতে আহ্বান করিলেন।

শ্রীযুক্ত চারু বাবু তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধে প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় স্যর আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের নানা গুণের পরিচয় প্রদান করিয়া লিখিয়াছেন যে, স্যর আশুতোষ, দেশের দুর্দ্দিনে দেশবাসী তাঁহার দ্বারস্থ হইলে সাগ্রহে তাঁহাদিগকে সৎপরামর্শ দিতেন। দেশের মঙ্গল কামনায় তিনি ধ্যানরত যোগীর ন্যায় আত্মজীবন নিয়োজিত করিতেন। তাঁহার চরিত্রের বল প্রভূত ছিল। সর্বোপরি তাঁহার ছিল তাজা সরল প্রাণ। দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা, ধর্ম্ম, সাহিত্য, আর্ট ও সঙ্গীতের উন্নতিকল্পে তিনি যে পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ অনুষ্ঠানের তিনি প্রাণস্বরূপ ছিলেন। স্যর রাসবিহারীর মৃত্যুর পর তিনি ঐ অনুষ্ঠানের সভাপতিপদে বৃত হন। রাজনীতি-ক্ষেত্রে তাঁহার জীবনের কতখানি তিনি উৎসর্গ করিয়াছিলেন তাহা দেশবাসীর ভুলিবার নয়। বঙ্গ-সাহিত্যের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল। পুরাতন "ভারত ও বালক" ও "ভারতী"তে প্রকাশিত তাঁহার প্রবন্ধাবলীতে তাঁহার চিন্তাশীলতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি অতি সরল ভাষায় দার্শনিক প্রবন্ধগুলি লিখিয়াছিলেন। ২ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত "হিন্দু আর্য্য কি না" প্রবন্ধে তাঁহার গবেষণার গভীরতা দেখা গি । ১৯১২ সালে দিনাজপুরে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতিরূপে তিনি যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার বঙ্গভাষার প্রতি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও ভালবাসার পরিচয় পাওয়া যায়। কিছু দিন তিনি বিলাতে "ঈগল" পত্রিকা দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত সামাজিক উন্নতি-মূলক প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। তাঁহার সহধর্ম্মিণীর প্রতিষ্ঠিত "সঙ্গীত-সঙ্ঘের" তিনি একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ভারতীয় শিল্পের প্রতি

তাঁহার অনন্ত-সাধারণ অনুরাগ ছিল। ব্যবহারজীবিরূপে ও কলিকাতা হাইকোর্টের জজ-রূপে তিনি যে যশঃ অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বজন-সুবিদিত। তিনি জানিতেন, মানবতার পূজা ভগবানের আরাধনার নামান্তর—তাই তিনি মানবের সেবার অধিকার পাইলে আপনাকে ধন্য মনে করিতেন।

(এই প্রবন্ধ ১৩৩১ আষাঢ় মাসে "মানসী ও মর্ম্মবাণী" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে)।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্ মহাশয় নিম্নলিখিত **প্রথম প্রস্তাব** উপস্থিত করিলেন :—

"বঙ্গের বরেণ্য কৃতী সন্তান, বিনয় ও সৌজন্যের আদর্শ, নানা সদ্‌গুণের আধার, নানা দেশহিতকর অনুষ্ঠানের উৎসাহদাতা, সাহিত্যামোদী ও সাহিত্যিক, কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি, মনীষিবর স্তর আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোকাভিভূত স্বজনগণের নিকট আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।"

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। তিনি বলিলেন যে, আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের সহিত বহুদিন তিনি নানা সূত্রে সংশ্লিষ্ট এবং নানা ক্ষেত্রে তাঁহার সহযোগিতা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীকে মানুষ করিয়া গড়িবার জন্য তিনি সর্ব্বদাই আগ্রহান্বিত ছিলেন। জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের সম্পর্কে এ বিষয়ে তাঁহার মন্তব্য তিনি বহুরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের বিস্তৃত আলোচনার উপযুক্ত স্থান আজ এখানে নহে। তিনি নানা গুণের আধার ছিলেন। তাঁহার দেশপ্রেম, জীবে দয়া, বিপন্নের সহায়তার কথা সকলের সুপরিচিত। তিনি আমাদের এই পরিষদের প্রতি কতদূর আকৃষ্ট ছিলেন, তাহার বিষয় অনেকেই অবগত নহেন। পরিষৎ যে বৎসর জন্মগ্রহণ করেন—সেই বৎসর হইতেই তিনি ইহার সদস্য ছিলেন। অর্থদান ও পুস্তকদান ব্যতীত তিনি নানাভাবে ইহার সৌষ্ঠব বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট-মনোযোগ দিয়াছিলেন। পরিষদের চিত্রশালায় ও মন্দির সাজাইবার জন্য কোন বিদেশী দ্রব্য যাহাতে ব্যবহৃত না হয়, তাহার জন্য তিনি রামেন্দ্র বাবুকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারই প্রস্তাবে পরিষদ্ মন্দিরে বঙ্কিমচন্দ্রের মূর্ত্তি আজ শোভা পাইতেছে।

শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্‌সি, এফ আর এস ই মহাশয় এই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, ১৮৮৬ খৃঃ তিনি আশুতোষকে জানিতে পারেন এবং ১৯০১ হইতে ১৯০৭ পর্য্যন্ত তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া চলিবার তাঁহার সৌভাগ্য হইয়াছিল। সেই সময় তাঁহার হৃদয়ের উচ্চতম আশা ও আকাঙ্ক্ষা এবং দেশসেবার প্রণালী জানিবার সুযোগ হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু বলিতে গিয়া থামিয়া গিয়াছেন—পরিষদে রাজনীতির আলোচনা না করাই সমীচীন। কিন্তু জীবত

ব্যক্তির পক্ষে যাহা রাজনীতি, স্বর্গগত মহাত্মাদের সম্বন্ধে তাহাই ত ইতিহাস। ইতিহাসের আলোচনায় কখনও দোষ হইতে পারে না—সাহিত্য-পরিষদেও না। স্বর্গীয় চৌধুরী মহাশয় বর্দ্ধমানের বঙ্গীয় প্রাদেশিক-সমিতির অভিভাষণে পরাধীন জাতির রাষ্ট্রনীতির চর্চ্চার ব্যর্থতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা অনেকেরই স্মরণ আছে। দুঃখের বিষয়, কেহই এই সংক্ষিপ্ত চুম্বক মূল-সূত্রটির কোনও ব্যাখ্যা করেন নাই। বক্তার মনে হয় যে, মহাত্মাজীর Doctrine of Non-Co-Operationএর ইহা একটি খাঁটি পূর্ব্বাভাস। সে সময়কার রাষ্ট্র-নৈতিক সভাসমিতির কি ব্যবস্থা ছিল, তাহা অনেকেরই স্মরণ নাই। স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস পালের নেতৃত্বে বাঙ্গালার ভূস্বামিগণ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার পৃষ্ঠপোষক। সুরেন্দ্র বাবু ভারত-সভার প্রাণ ও কর্ণধার। উভয় সভাই আবেদন নিবেদন লইয়া ব্যস্ত। কংগ্রেস কন্‌ফারেন্সও সেই প্রচলিত ধারার অনুসরণে দেশের সমস্ত প্রার্থনা-পত্রের উদ্গীরণে পর্য্যবসিত হইতেছিল। এই ভাবে ভূস্বামিগণ নিজেদের ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীন-চিন্ততা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। দেশের এই সব দুর্গতির প্রতিরোধ করিবার জন্য আশুতোষ বাঙ্গালায় একটি স্বাধীনচেতা ও স্বাবলম্বী মনস্বিসম্প্রদায় গঠনে একটি রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সৃজন করিয়া বঙ্গদেশের চিন্তার ধারার গতি ফিরাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কি ভাবে তিনি সাক্ষাতে ও পরোক্ষে লর্ড কর্জ্জনের Indian Universities Commissionএর এবং বাঙ্গালা-বিভাগের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়াছিলেন, তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। সেই সময় যাঁহারা চৌধুরী মহাশয়ের সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শিশিরকুমার ও মতিলাল ঘোষের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতপক্ষে সেই আন্দোলনই বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে প্রথম সাড়া। তাঁহারই চেষ্টায় খাটোয়াদের সেই নির্ব্বাণোন্মুখ লক্ষ্মী-তুলসী কাপড়ের কল বাঙ্গালায় 'বঙ্গলক্ষ্মী মিলে' পরিণত হয়। স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিবার জন্য দেশে তখন সাড়া পড়িয়া যায়। ঘরে ঘরে Fly Shuttle ও সুতা সরবরাহ করিবার জন্য নানা অনুষ্ঠানের সৃষ্টি হইল। চামড়া ট্যানিং শিখাইবার জন্য স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরীকে তিনি নিজ ব্যয়ে মাদ্রাজে পাঠাইয়াছিলেন। দেবেন বাবু ট্যানিং শিখিয়া আসিবার পর চৌধুরী মহাশয় ও আরও চারি জন একটি কারখানা খুলিলেন। সেই কারখানা হইতে এক্ষণে সুবৃহৎ National Tannery দাঁড়াইয়াছে। জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের কথা বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। পূর্ব্বোক্ত বক্তারা তাহা বলিয়াছেন। তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি ছিলেন এবং ওরিয়াণ্টাল আর্ট সোসাইটির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পিয়ানো হারমোনিয়ম ও গ্রামোফোনে যখন দেশ প্লাবিত, তখন তাঁহারই চেষ্টায় বাঙ্গালী মোজার্ট হাণ্ডেল ও জোয়াকিমকে ছাড়িয়া আবার তানসেনের তানপুরা আর তামিলের বীণ, মৃদঙ্গ, পাখোয়াজের সঙ্গে সুর মিলাইয়া শ্মশান ভারতে রাগরাগিণীর স্বরালাপের সূত্রপাত করিল। আশুতোষকে হারাইয়া আমরা আমাদের নেতা ও নিয়ন্তা হারাইলাম।" (এই বক্তৃতা ১৩৩১ আষাঢ় মাসের নব্যভারতে প্রকাশিত হইয়াছে)। তৎপরে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রথম প্রস্তাব গ্রহণ রিলেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব—

"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি ও ইহার উন্নতি ও সৌষ্ঠববৃদ্ধির জন্য সতত প্রয়াসী স্যর আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের উপযুক্ত স্মৃতি পরিষৎ মন্দিরে রক্ষার সমুচিত ব্যবস্থা করিবার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর ভার অর্পিত হউক।"

মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া বলিলেন, "স্যর আশুতোষের সহিত আমার শোণিত-সম্বন্ধ—তিনি আমার বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন, সম্পর্কে খুল্লতাত হইতেন। তাঁহার অভাবে দেশের কি হইবে—বঙ্গের কি দশা হইবে এবং আমাদের উত্তর-বঙ্গের কি হইবে, তাহাই আমার একমাত্র চিন্তা। শিক্ষায়, সৌজন্যে, পদমর্য্যাদায় তিনি আমাদের আদর্শস্থানীয় ছিলেন। নীরবে কি ভাবে দেশের কাজ করিতে হয়, তাহা তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। যাহা আমরা হারাইয়াছি তাহা আর ফিরিয়া আসিবে কি না সন্দেহ।"

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, বি এল, এম্ এল্ সি মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন, "আমরা এ দেশে মহাপুরুষগণের স্মৃতিরক্ষা করে আসছি—মৃত মহাত্মার স্মৃতিরক্ষার প্রস্তাব সফল করিবার জন্য দেশবাসী যে পরিষৎকে সাহায্য করবেন তাহা আমার বিশ্বাস আছে। শ্রীযুক্ত চারু বাবু ও শ্রীযুক্ত চৌধুরী মহাশয় অনেক কথা বলিয়াছেন। স্যর আশুতোষ বর্দ্ধমানে যাহা বলেছিলেন, তাহা স্পষ্ট সত্য কথা—স্পষ্ট সত্য কথা বলা তাঁহার প্রধান গুণ ছিল। জেনারেল এসেমব্লি কলেজে বিচারপতি নরিস সাহেবের সভাপতিত্বে ৩৬ বৎসর পূর্ব্বে এক সভা হয়। প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্ন-পত্র সে বৎসর যুক্তিসঙ্গত হয় নাই, তাহা তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন। তিনি ব্যবহার-বিদ্যায় এবং গণিতে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। পুরাতন দেশীয় কলাবিদ্যার আদর্শ দেশে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করেছিলেন।" সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

তৃতীয় প্রস্তাব—

"প্রথম প্রস্তাবের প্রতিলিপি স্বর্গীয় স্যর আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের পুত্রের নিকট অদ্যকার সভার সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে প্রেরিত হউক।"

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া বলিলেন যে, স্যর আশুতোষ ব্রাহ্মণোচিত সত্ত্বগুণের সমষ্টি ছিলেন। স্থিতিশীলতা তাঁহার চরিত্রের অন্যতম গুণ ছিল। তিনি natures gentleman ছিলেন এবং তাঁহার চিত্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। তাঁহার পরিবারবর্গের নিকটও আমরা কৃতজ্ঞ—কারণ, তাঁহারা আমাদিগকে স্যর আশুতোষ চৌধুরী দান করিয়াছিলেন। আজ তাঁহার জন্মদিন, ৬৪ বৎসর পূর্ণ হইল। আশা করি, পরিষদের এই মন্তব্যের প্রতিলিপিতে তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গ কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিতে পারিবেন।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার এম্ এ মহাশয় সর্ব্বান্তঃকরণে এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল

সভাপতি শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বলিলেন, "আজ এই শোক-প্রকাশের দিনেও পরিষদের পক্ষ হতে আনন্দ-প্রকাশ করতে হচ্ছে—আজ অনেক পরিচিত মুখ দেখছি ও লোকসমাগমও যথেষ্ট হয়েছে।

"আজ যে ভাব, কাল তাহা উল্টে যাচ্ছে, ভাবের প্রবাহের স্থিরতা নাই। স্যর আশুতোষ বয়সে আমার ছোট ছিলেন—অথচ তিনিই আগে গেলেন। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু প্রভৃতির বক্তৃতা হতে বুঝতে পারছি—আশুতোষ অনেক কাজ করেছেন।

"দেশে যে নাড়ী এসেছে—ইহা এখনও তর্জ্জনীযুক্ত নাড়ী ইহা বলতে পারি না—ব্রাণ্ডি খাওয়ান নাড়ী। যাঁহারা নীরবে কাজ করেন—এখনও আমরা অনেক সময় তাঁহা-দিগকে লক্ষ্য করতে পারি না। যাঁহারা সেই সব কাজের সম্পাদক আছেন—কেবল তাঁহাদিগকেই দেখি।

"আশু বাবুর গর্ভধারিণী রত্ন-প্রসবিনী। তাঁরা ৬ ভাই—এক একটি রত্ন। আশু বাবু বিলেত থেকে এসে এ পর্য্যন্ত অনেক রোজগার করেছিলেন—কিন্তু তিনি বিলেত ফেরতাদের মত টাকা উড়িয়ে দিতেন না। তাঁর ভিতর খাঁটি বাঙ্গালীর ভাব ছিল। ১৮৯৭ সালে আমি কাশী যাই, তিনিও যান। তাঁহার সহিত এক সঙ্গে ১৮।১৯ দিন কাটাই—সেখানে বিশ্বনাথ, কেদার প্রভৃতি সমস্ত দেবদেবীর মূর্ত্তি ভক্তিভাবে ও বিশুদ্ধভাবে দেখেছিলেন—তাঁর মধ্যে এতটুকু পেঁয়াজের গন্ধ ছিল না। তাঁহার শিষ্টাচার, মধুর প্রকৃতি, সর্ব্বদা হাসিমুখ কিছুতেই ভোলা যায় না। He was a born gentleman.

"সঙ্গীতকে তিনি কি ভাবে দেখতেন—তা আপনারা সমস্ত শুনলেন। সৌভাগ্যক্রমে সরস্বতীর মত গুণবতী স্ত্রী তিনি পেয়েছিলেন। তাঁরই নেতৃত্বে সঙ্গীত-সঙ্ঘের সৃষ্টি হয়েছিল।"

তৎপরে তিনি জানাইলেন যে, স্বর্গীয় স্যর আশুতোষের উপযুক্ত পুত্র চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত আর্য্যকুমার চৌধুরী মহাশয় স্বহস্তে তাঁহার পিতার একখানি তৈলচিত্র অঙ্কিত করিয়া পরি-ষৎকে দান করিবেন।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া যে সকল সদস্যের পত্র আসিয়াছে তাহা পাঠ করিলেন :—

১। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

২। মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ রায় বাহাদুর

৩। শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী

রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর কর্ত্তৃক সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা-ভঙ্গ হয়।

শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়　　　　শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

সহকারী সম্পাদক।　　　　সভাপতি।

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন

স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের

পরলোকগমনে শোক-প্রকাশার্থ আহুত

১লা আষাঢ় ১৩৩১, ১৫ই জুন ১৯২৪, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬৷৹টা

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই—সভাপতি

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া জানাইলেন, আজ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি, বাঙ্গালী-শ্রেষ্ঠ, ধর্ম্মবীর ও জ্ঞানবীর স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অকালমৃত্যুতে শোক প্রকাশের জন্য সকলে সমবেত। এই বলিয়া তিনি সকলকে এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করিলেন।

১। কাশীর শাখা-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিহর শাস্ত্রী মহাশয় স্বরচিত সংস্কৃত ভাষায় একটি কবিতা পাঠ করিলেন।

২। তৎপর শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত এবং শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় তাঁহাদের রচিত সময়োপযোগী কবিতা পাঠ করিলেন।

৩। মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর "স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়" নামক এক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। নিম্নে প্রবন্ধের সার-মর্ম্ম দেওয়া হইল।

"বাঙ্গালার বুকভরা ধন, বাঙ্গালীর মাথার মণি, সুস্থকায় আশুতোষ মহাকালের আহ্বানে উর্দ্ধলোকে প্রয়াণ করিয়াছেন। আমাদের যাহা কিছু ছিল, দিনে দিনে সমস্ত হারাইয়া আমরা নিঃস্ব ও কাঙ্গাল হইয়াছি। তথাপি সাত রাজার ধন একটি মাত্র মাণিক আমাদের ছিল। কাল আসিয়া আজ সেই অমূল্য নিধি অপহরণ করিয়া নিল। এ দুঃখ রাখিবার আর স্থান নাই। জীব-জগতে জন্ম ও মরণ চিরন্তন নিয়ম। কিন্তু যে চলিয়া গেলে দেশের সকলের সব ফুরাইয়া যায়, তাহার যাওয়া কি সাংঘাতিক! হায় দুর্ভাগ্য দেশ! বিধাতার সকলগুলি বজ্র কি তোরই শিরে পড়িবার জন্য উদ্যত হইয়া আছে? আশুতোষ বাল্যাবধি সকল পরীক্ষায় উচ্চ স্থান লাভ করিয়াছিলেন, ব্যবহার-শাস্ত্রে তিনি কৃতী ছিলেন, ধর্ম্মাধিকরণে ন্যায়াধীশরূপে তাঁহার উর্দ্ধে স্থান ছিল, কিন্তু এ সকল দিক্ দিয়া তাঁহাকে বুঝা যাইবে না। তাঁহাকে বুঝিতে হইলে তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হইবে ও তাঁহার প্রশস্ত বক্ষঃকবাটের অন্তরালে যে বিশাল হৃদয় ছিল, তাহা ধ্যান-নয়নে দেখিবার চেষ্টা করিতে হইবে। আশুতোষ বুঝিয়াছিলেন, সরস্বতীর আরাধনায় দেশবাসীর অন্ধতমসাচ্ছন্ন হৃৎকন্দর আলোকিত করিয়া বিদ্যার প্রভাবে অবিদ্যা দূর করিতে

পারিলে, বঙ্গজননীর বহু কোটি সন্তান মানুষ হইবে—তাহাদের দুঃখ দূর হইতে পারিবে। তাই তিনি এই মঙ্গলময় কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই মঙ্গল-ব্রত পালনে মহাপুরুষ এক দিনের জন্যও কর্ত্তব্য-পথভ্রষ্ট হন নাই। একদা এমন দুঃসময় আসিয়াছিল, যেদিন ভারতের প্রধানতম রাজপুরুষের কোপদৃষ্টিপাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা খর্ব্ব হইবার উপক্রম হইয়াছিল। কিন্তু আশুতোষ তখন সব্যসাচীর ন্যায় গাণ্ডীব ধারণ করিয়া আততায়িগণকে নিরস্ত করিয়াছিলেন। ইহা সকলেরই সুবিদিত। তিনি অর্জ্জুনের ন্যায় এক হস্তে সারস্বত-কুঞ্জের শত্রু সংহার করিয়াছেন, অপর হস্তে নিপুণ উদ্যানপালের ন্যায় সেই সারস্বত-কুঞ্জের শোভা সম্বর্দ্ধন করিয়াছেন। এক সময় ছিল, যখন শিক্ষিত বঙ্গসন্তান, মাতৃভাষাকে যথাসম্ভব বর্জ্জন করাই পুরুষার্থ বলিয়া মনে করিতেন। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন আশুতোষ ধীরে ধীরে ইহার সংস্কার করিয়া আজ বঙ্গসরস্বতীর স্বর্ণসিংহাসন রচনা করিয়া দিয়াছেন—বঙ্গসন্তান আজ বঙ্গভাষার পরীক্ষা দিয়া শ্রেষ্ঠতম উপাধি গ্রহণ করতঃ নিজেকে ধন্য মনে করিতেছে। আশুতোষের অভাবে সদ্যঃসমাবৃত্ত বঙ্গের শিক্ষিত যুবকগণের কি অভাব ঘটিল, তাহারা কি অন্তরঙ্গ বন্ধু হারাইল, তাহা তাহারাই জানে। ইংরাজী শিক্ষার উপাদেয় ফল ছিলেন বাঙ্গালার এই আশুতোষ। ইংরাজের যাহা ভাল, ইংরাজী শিক্ষার যাহা উত্তমতম, তৎসমুদয় আশুতোষ পূর্ণমাত্রায় লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার দূষিতাংশ তাঁহার ত্রিসীমানায় আসিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে অসনে বসনে, আচারে ব্যবহারে, ধর্ম্মে কর্ম্মে, এরূপ বিশুদ্ধ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ আর একটিও আছে কি না, আমি জানি না। তিনি যে বিদ্যাপীঠ-সংগঠন-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার সম্পূর্ণাঙ্গ সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বেই দ্রোণকল্প বীর-ব্রাহ্মণ অকালে স্বর্গপুরে প্রয়াণ করিলেন। বাঙ্গালার যে ইন্দ্রপাত হইয়া গেল, সেই ইন্দ্রের পুনরাগমনের পথের প্রতি বাঙ্গালী সজল নয়নে চাহিয়া থাকিবে। হে ভূদেব! এই কথা তুমি স্বর্গপুরে বসিয়া স্মরণ করিও।"

৪। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ, এফ জি এস্ মহাশয় "৺আশুতোষ মুখোপাধ্যায়" শীর্ষক এক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। নিম্নে প্রবন্ধের সার-মর্ম্ম দেওয়া হইল।

"কুশাগ্রবুদ্ধি আশুতোষ এত বড় ছিলেন যে, তাঁহার কৃতকার্য্যগুলির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য সাধারণে উপলব্ধি করিতে পারিত না। তাঁহার ন্যায় কর্ম্মী পুরুষ ভারতে আর দ্বিতীয় নাই, এবং পৃথিবীতেও যে বেশী আছে তাহা মনে হয় না। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত নানা দেশহিতকর অনুষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কিন্তু জাতীয়তার যে উচ্চ আদর্শ লইয়া তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য করিতেন, অন্যান্য অনুষ্ঠানেও তিনি প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে সেই এক উদ্দেশ্য সাধনেই নিযুক্ত ছিলেন এবং তপস্বীর ন্যায় একাগ্রচিত্তে সেই দিনের দর্শনের চেষ্টাতে ব্যাপৃত থাকিতেন যে দিন জগতের বিদ্বন্মণ্ডলীর সভায় ভারতবাসী গৌরবের স্থান অধিকার করিতে পারিবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য আশুতোষ যে সকল কাজ করিয়াছেন তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য,—(ক) বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রত্যক্ষভাবে উচ্চ-

শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা, (খ) বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার বিষয়ান্তর্গত করণ, (গ) ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ভাষা ও সাহিত্যসমূহের ব্যুৎপত্তি অনুসন্ধানে উৎসাহ প্রদানার্থ Indian Vernaculars নামক একটি বিষয় এম্ এ পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত করণ, (ঘ) ভারতীয় ইতিহাসের চর্চ্চার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করণ, (ঙ) বিশুদ্ধ বিজ্ঞান আলোচনার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ও ব্যবহারিক-বিজ্ঞান আলোচনার সূত্রপাত করণ এবং (চ) জীবতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলির পাঠ্যের ব্যবস্থা করণ। এতদ্ব্যতীত University Journal of Letters এবং University Journal of Science নামক দুইখানি পত্রিকা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। বেশবিন্যাস প্রভৃতি বাহ্য চাকচিক্যে মুগ্ধ না হইয়া প্রাচীন কালের হিন্দুদিগের ন্যায় ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করা যে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কর্ত্তব্য, এই আদর্শ তিনি ছাত্র মণ্ডলীর সমক্ষে জানাইয়াছিলেন। মাতৃভাষার যথেষ্ট অনুশীলন যে আমাদের দেশে হইতেছে না, আমাদের দেশের সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার করণ যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী যুবকের একটি অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহাও তিনি জলদগম্ভীর স্বরে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে দেশে মৌলিক গবেষণার যে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, তাহা সকলেই স্বীকার করেন এবং যেদিন আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র রায় নিজ নিজ পরীক্ষাগারে তাঁহাদের শিষ্যদের সহিত মৌলিক গবেষণা-কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন, সেই দিন ভারতবর্ষে মৌলিক গবেষণার ইতিহাসে এক নূতন ধারার প্রবর্ত্তন হইল ও তখন সকলেই আশা করিল, আশুতোষের নেতৃত্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ মৌলিক গবেষণার সুবিধা পাইবেন। কার্য্যতঃ, তিনি নানা বাধা অতিক্রম করিয়া এ পথ সুগম করিয়া দিয়া দেশের যে কত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন তাহা দেশবাসী অবনত মস্তকে স্বীকার করিবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই আশুতোষের স্মৃতি-মন্দির এবং তিনি স্বহস্তে তাহা নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। এই মন্দিরকে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে দিলে বাঙ্গালী অজ্ঞাতসারে নিজের মৃত্যুকে নিজে বরণ করিয়া লইবে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসিগণের মধ্যে ভাগবত ঐক্য সাধনের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষা অধ্যয়নের যে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহার মূলে তাঁহার দেশমাতৃকার প্রতি গভীর ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয়রূপে পরিণত করিবার জন্য তিনি কোন সৎ পন্থাই ত্যাগ করেন নাই।

"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার তিরোধানে যে কত ক্ষতি অনুভব করিতেছে তাহা পরিষদের হিতৈষিগণ বিশেষভাবে অনুভব করিতেছেন। তিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিষদের জন্য বিশেষ কিছু করেন নাই। তিনি পরিষদের পক্ষে কাশীরামের মহাভারত সম্পাদনের ভার লইয়াছিলেন, কিন্তু প্রাচীন পুথি সংগৃহীত না হওয়ায় তিনি এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই। পরিষৎ যে সকল উদ্দেশ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি সেই সকল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যতখানি চেষ্টা ও যত্ন করিয়াছেন, অন্যে ততদূর করিয়াছেন কি না সন্দেহ। দেশে যাহাতে বঙ্গভাষার সাহায্যে পঠন ও পাঠন হইতে পারে এবং বঙ্গভাষা শিক্ষার্থিগণের পাঠ্য বিষয়ান্তর্গত হয়, তাহার

জন্য পরিষৎ প্রায় প্রথমাবধি চেষ্টা করিতেছিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনেও মন্তব্যাদি গৃহীত হইয়াছিল। এই চেষ্টার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ তাঁহারই সহায়তায় বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের পঠন পাঠন ও পরীক্ষার জন্য বিশিষ্ট ব্যবস্থা হইয়াছে। পরিষৎ আশা করিতেন যে, যদি আশুতোষ আরও কিছুদিন জীবিত থাকিতেন, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের আদর উত্তরোত্তর বাড়িয়া যাইত। দেশে অন্যান্য সাময়িক পত্রিকার সহিত তুলনায় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার স্বাতন্ত্র্য এই যে, যে সমস্ত প্রবন্ধ পুরাতন কথার বা অপরের আবিষ্কৃত পুরাতন তথ্যের অনুবৃত্তি বা ব্যাখ্যামাত্র সে সকল প্রবন্ধ উৎকৃষ্ট ও শিক্ষাপ্রদ হইলেও এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে না। যে প্রবন্ধে কোনরূপ নূতন অনুসন্ধানের বা নূতন গবেষণায় আবিষ্কৃত বা নূতন চিন্তায় লব্ধ কোন তথ্যের সংবাদ আছে সেই সকল প্রবন্ধই পরিষৎ-পত্রিকার উপযুক্ত। পরিষৎ আশা করেন যে, বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক দ্বারা আবিষ্কৃত নূতন তথ্য বাঙ্গালা ভাষাতে পরিচালিত পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া দেশে বিদেশে বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালী জাতির গৌরব বিস্তার করিবে। স্যর আশুতোষ পরিষদের এই বৈশিষ্টের প্রতিধ্বনি করিয়া পাটনায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতিরূপে বলিয়াছিলেন "অদ্য আমার প্রধান বক্তব্য এই যে, শুধু বঙ্গের জাতীয় সাহিত্য গঠন করিলেই চলিবে না, বঙ্গের জাতীয় সাহিত্য কি উপায়ে জগতের অপরাপর দেশের বিদ্বদ্বৃন্দেরও আরাধ্য হইতে পারে তাহারও চিন্তা করিতে হইবে। * * * তবেই তো বঙ্গভাষা অমরত্ব লাভ করিবে। যদি এমন ভাবে বঙ্গ সাহিত্য গঠিত হয়, এমন সম্পদে বঙ্গ সাহিত্য সুসম্পন্ন হয় যে, সেই সম্পদের উৎকর্ষে পৃথিবীর অপরাপর মনীষিগণের চিত্ত আমার বঙ্গ সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়, আজ যেমন করিয়া আমরা অনেক অনর্থ ও শিক্ষনীয় বিষয় আয়ত্ব করিবার নিমিত্ত পাশ্চাত্য দেশের অনেক ভাষা শিখিতে প্রয়াস করিয়া থাকি, সেইরূপ বঙ্গভাষায় যদি এমন অনেক উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বিষয় এবং আবিষ্কার উপনিবদ্ধ হয়, যাহা কৃতবিদ্যমাত্রেরই সর্ব্বথা অবশ্য শিক্ষনীয়, অথচ পৃথিবীর অন্য কোন ভাষায় ঐ ঐ বিষয় সমূহ এতাবৎকাল লিপিবদ্ধ হয় নাই, তাহা হইলে পৃথিবীর সর্ব্বস্থানের বিদ্বদ্বৃন্দই সাগ্রহে বঙ্গভাষা শিক্ষা করিবেন।" সেই জন্য মনে হয় আশুতোষের মৃত্যুতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মত অন্য কোন সভাসমিতিরই তত ক্ষতি হয় নাই। কার্য্যবশে এই মহাপুরুষের সংস্পর্শে আসিবার ও তাঁহার আজ্ঞানুযায়ী কার্য্য করিবার সুযোগ পাইয়া প্রবন্ধ লেখক নিজেকে ধন্য মনে করিতেন। স্বামী বিবেকানন্দ আশুতোষের সমসাময়িক ছিলেন। স্বামীজী 'কর্ম্মযোগে' যে সকল মূল-সূত্রের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন, আশুতোষের কার্য্যেই সেই সকল মূল-সূত্র বাস্তব সত্যে পরিণত হইতে দেখা গিয়াছে।

৫। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় নিম্নলিখিত **প্রথম প্রস্তাব** উপস্থিত করিলেন—

"ভারতবর্ষের এক সময়ের প্রধান জ্ঞানবীর ও কর্ম্মবীর, ব্যবহার-শাস্ত্রে অদ্বিতীয়, কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন ও প্রাণ-স্বরূপ, সর্ব্বপ্রকার শিক্ষাবিস্তারের নির্ঝর, উচ্চতম শিক্ষার প্রধান অভিভাবক, ব্যবহার-শাস্ত্রে নূতন নূতন তত্ত্ব

আবিষ্কারের প্রধান উৎসাহদাতা, বঙ্গভাষার অনুশীলন ও প্রসারকল্পে অদম্য উৎসাহ ও অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত নিজ অতুলনীয় শক্তি যিনি নিয়োজিত করিয়াছিলেন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি, বাঙ্গালীর সর্ব্ববিধ শিক্ষা ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কীয় সমস্ত জাতীয় অনুষ্ঠানের যিনি পরম হিতৈষী নেতা ও পরামর্শদাতা ছিলেন সেই মনস্বী সহৃদয় মধুরভাষী প্রতিভাবান্ বাণীর বরপুত্র, দেশ-মাতৃকার প্রিয়তম সন্তান, দেশাত্মবোধের প্রধান পুরোহিত বাঙ্গালীর গৌরব, পুরুষসিংহ স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অকস্মাৎ পরলোকগমনে বঙ্গদেশ এবং সমগ্র ভারতবর্ষের সহিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন এবং অদ্যকার এই বিশেষ অধিবেশনে পরিষৎ সমবেত হইয়া গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারের সহিত সমবেদন প্রকাশ করিতেছেন।"

এই প্রস্তাব উপস্থিত করিবার সময় শ্রীযুক্ত বিপিন বাবু যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহার সার-মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"আশুতোষের চরিতালেখ্য আঁকিবার সময় এখনও আসে নাই। রবিবারে তিনি চলিয়া গিয়াছেন—বৃহস্পতিবার সিমলা যাইবার পথে আমার সহিত পাটনা রেল-ষ্টেশনে তাঁহার দেখা হয়। হাসিয়া হাসিয়া কত কথা বলিলেন। সোমবারে অপরাহ্নে আইন-বৈঠকের ঘরে ঢুকিয়াই শুনিলাম, আশুতোষ চলিয়া গিয়াছেন। প্রথমে বিশ্বাস হয় নাই। তিনি আমাদের কর্ম্মজীবনে যে স্থানটা অধিকার করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার তিরোধানে কতটা যে শূন্য হইয়া গিয়াছে, এখনও আমরা তাহা ধারণা করিতে পারিতেছি না। সেই জন্যই বলিতেছিলাম তাঁহার চরিতালেখ্য লিখিবার সময় আসে নাই। আজ স্মরণের দিন, অঙ্কনের দিন নহে।

"আশুতোষের সখ্যের বা সাহচর্য্যের গৌরব আমার নাই। তাঁহার সহিত যখন পরিচয় হইল, তখন দেখিলাম যে, তাঁহার মনীষাই যে বড় তাহা নহে, তাঁহার হৃদয়টাও খুব উদার ও স্নেহপ্রবণ। পরিবার পরিজন এবং বন্ধুবান্ধবদিগের প্রতি আত্যন্তিক আসক্তি তাঁহাকে তাঁহার বাহিরের কর্ম্মক্ষেত্রে কখন কখনও কর্ত্তব্যের শাণিত-ক্ষুরধার-পথ হইতে স্বল্পবিস্তর বিচ্যুত করিয়াছে, লোকে এই কথা মনে করে। ইহা সত্য হইলেও তাঁহার অনুরাগের আগুনে এই ত্রুটিও বিধাতার চক্ষে হয়ত ভস্ম হইয়া তাঁহার চরিত্রকে নির্ম্মল করিয়াছে। এই অনুরাগে তাঁহার জীবনে এমন একটা মিষ্টতা আনিয়া দিয়াছিল, যাহাতে যে তাঁহার নিকট যাইত, তাহাকেই অল্পবিস্তর আকর্ষণ করিত। তাঁহার প্রকৃতিতে পরকে আপনার করিবার একটা আশ্চর্য্য শক্তি ও সঙ্কেত ছিল।

"আমরা আশুতোষকে পূর্ব্বে আমল-তন্ত্রের সহায় বলিয়া দেখিয়া আসিয়াছি। ঘটনা-ক্ষেত্রে তাঁহার বাড়ীতে পরে একদিনের কথাবার্ত্তায় তিনি বলিয়াছিলেন—"আমার মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতাটী পড়িয়া দেখিবেন। সেখানে আমার মুখে মুখোস ছিল না। প্রাণ খুলিয়া সকল কথা কহিয়া আসিয়াছি।" কার্য্যতঃ এই দিনেই আশুতোষের সঙ্গে আমার কাছাকাছি প্রথম দেখাশুনা। কার্য্যের দ্বারা তাঁহার বিচার

করিলে চলিবে না ; তাঁহার নিজস্ব প্রকৃতি দ্বারাই তাঁহার বাহিরের কর্ম্মজীবনের ভাল মন্দের ওজন করিতে হইবে। যাঁহারা তাঁহার চরিত্রের অন্তঃপুরে কখনও প্রবেশ করিবার অধিকার পান নাই, তাঁহারা তাঁহার জটিল প্রকৃতির এবং বিচিত্র কর্ম্মের ভাল মন্দের সত্য বিচার কখনও করিতে পারিবেন না। তিনি দেশের দশজন হইতে আপনাকে পৃথক্ করিতে চাহেন নাই বলিয়াই আপনার মানসিক মতবাদে অত্যন্ত উদার হইয়াও ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আচার আচরণে এবং ধর্ম্মের বাহ্য ক্রিয়া কলাপে কখনও প্রচলিত হিন্দুয়ানীর গণ্ডী ছাড়িয়া যান নাই। ইহার মূলে তাঁহার তথাকথিত স্বধর্ম্মনিষ্ঠা অপেক্ষা, আমার মনে হয়, গভীর স্বাজাত্যাভিমানই বেশী বিদ্যমান ছিল।

"আশুতোষ বাংলাকে, বাঙ্গালীর ভাষাকে, বাঙ্গালীর সাধনা ও সভ্যতাকে কতটা যে ভাল বাসিতেন, বাঁকীপুরে বাংলা-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে যাইয়া তাহার পরিচয় পাই। আশুতোষ বাংলা লেখক না হইয়াও বাংলা সাহিত্যকে কি গভীর অনুরাগের চক্ষে দেখিতেন এই অভিভাষণে তাহার প্রথম পরিচয় পাই। বংলা সাহিত্যকে আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত করিয়া বাঙ্গালীর মনীষাকে আধুনিক বিশ্বসাধনার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তাঁহার প্রাণে গভীর আকাঙ্খা ছিল। এই আকাঙ্খার প্রেরণাতেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধি পরীক্ষাতে আশুতোষ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে একটা বিশিষ্ট স্থান দিয়াছিলেন। তাঁহার অভাবে বাংলার কর্ম্মজীবন পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালীর মনীষা বৈধব্যগ্রস্ত হইয়াছে।"

শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ডি এস্‌সি ব্যারিষ্টার মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন যে, এই অমিততেজ পুরুষশ্রেষ্ঠ মনীষির পরলোকগমনে বঙ্গদেশ শোকে সমাচ্ছন্ন।

ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলে পর সকলে দণ্ডায়মান হইয়া প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

৬। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ মহাশয় নিম্নলিখিত **দ্বিতীয় প্রস্তাব** উপস্থিত করিলেন—

"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উপযুক্ত স্মৃতি পরিষৎ-মন্দিরে রক্ষার সমুচিত ব্যবস্থা করিবার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর ভার অর্পিত হউক।"

এই প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন যে, স্যর আশুতোষ যে কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন সে দিক্ দিয়া দেশের সর্ব্বসাধারণকে উদ্বোধিত করিতে পারিলেই তাঁহার প্রকৃত স্মৃতি রক্ষা হইবে। তাঁহার plain living এবং high thinking এবং তাঁহার patriotismই ছিল জীবনের লক্ষ্য। বহুক্ষেত্রে তিনি তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। Sadler Commissionএ কিরূপ নিভিক চিত্ততা এবং অমিত ও অদম্য তেজের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সকলেই অবগত

আছেন। পরিষৎকে তিনি যে স্নেহ ও ভালবাসিতেন তাহার বহু প্রমাণ তিনি দিয়াছেন। পরিষদ্-মন্দিরে তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতি রাখা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে পর সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে ইহা গৃহীত হইল।

৭। শ্রীযুক্ত ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম্ এ, পি এচ্ ডি মহাশয় নিম্নলিখিত **তৃতীয় প্রস্তাব** উপস্থিত করিলেন—

"প্রথম প্রস্তাবের প্রতিলিপি স্বর্গীয় স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্রের নিকট অদ্যকার সভার সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে প্রেরিত হউক।"

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে ইহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

৮। তৎপরে শ্রীযুক্ত চণ্ডীদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বরচিত একটি কবিতা পাঠ করেন।

৯। অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—"অনেক দিনের কথা, বোধ হয় ১৮৮২ কি ১৮৮৩ সালে হবে, কোন রাজকার্য্যের জন্য আমাকে ৺রাধিকাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অতিথি হ'তে হয়েছিল। সেদিন তাঁর বাড়ীতে কেউ ছিলেন না। আমাকে অনেক বেলা পর্য্যন্ত সেখানে থাকতে হল, কেননা কাজটি গুরুতর ছিল। বেলা অনেক হয়ে গেল দেখে রাধিকাবাবু বল্লেন, তাইত আপনাকে খাইয়ে না দিলে হয় না, আমার দাদার বাড়ীতে চলুন। সেখানে এসে একটী ছেলেকে ডেকে বল্লেন, এঁকে এখানে খাইয়ে দেবে। বলামাত্র ছেলেটি একটী আলমারীর drawer খুল্ল, একখানা সাদা কাপড় ও পরিষ্কার তোয়ালে বের করে নিয়ে "আসুন" বলে স্নানের ঘর দেখিয়ে দিয়ে চলে গেল। রাধিকা বাবুকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাক, ছেলেটী কে? বল্লেন আমার ভাইয়ের ছেলে, নাম আশুতোষ, ভাল পাশ করেছে। এই ছেলেটী Universityতে first হয়েছিল, আমরা শুনেছিলাম। আমি দেখ্‌লাম, বড় মানুষের ছেলে হয়েও কাপড় গামছা গুছিয়ে রাখে, অতিথি এলে কি রকম ভাবে সম্মান করতে হয় জানে, ইউনিভারসিটীর ছেলেদের মধ্যে এরূপ প্রায় পাওয়া যায় না। রাধিকা বাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম একে বিলেত পাঠাবেন নাকি? তিনি বল্লেন—বিলেত পাঠাবার মত নাই; যদি হতে হয় এই দেশেই হবে। সেই হতে আশুতোষের প্রতি আমার আন্তরিক আকর্ষণ হল। ক্রমে আমরা দুইজন Asiatic Societyর member হই ১৮৮৫ সালের জানুয়ারীতে। সেই থেকে আমরা দুই জনে একত্রে অনেক সময় সাহিত্যিক নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি।

"১৮৮৮ সালে আশুতোষ লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছাত্র, চারিদিকে তাঁর নাম হয়েছে; এমন ছেলে University থেকে আর বেরোয় নি। ইলবার্ট সাহেব তাঁর উচ্চ প্রশংসা করেছেন। ক্রমে তাঁর চেষ্টা হল—Universityতে ঢুকবার। কিন্তু প্রথমে হ'ল না, হল আমার। তিনি ছাড়বার পাত্র নন, ইল্‌বার্ট সাহেব ইজিপ্টের Finance Commissioner হয়ে ছিলেন,

সেখান থেকে পত্র আসতে আশু বাবু ১৮৮৯ সালে Fellow হন। তখন এসে আমাকে বল্লেন —আপনি কেন Fellow হয়েছেন জানেন? I knocked and you entered, আমি হই নি বলে আপনি হয়েছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—এখন তুমি কি করবে? তিনি বল্লেন—University উদ্ধার করব। কি করে? Universityর নাম কলকাতা University না রেখে ঢাকা University রাখা উচিত। কারণ, সে সময় পূর্ব্ববঙ্গের শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ ও শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু Syndicateএর মেম্বর ছিলেন এবং পি. কে. রায় Registrar ছিলেন। কথা হল, পূর্ব্ববঙ্গ united, পশ্চিমবঙ্গ united নয়; তিনি বল্লেন, পশ্চিমবঙ্গকে united করতে হবে। সে বিষয়ে আমার সহায়তা চাইলেন। আমি বল্লাম এ হতে পারে না, এর মধ্যে এমন লোক আছে, যারা নিজের জন্য সব করবে, পরের জন্য কিছুই করবে না। তার পর আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কি করে united করবে? তিনি বল্লেন, প্রথমেই আপনাকে Syndicateএ ঢুকতে হবে। আমি বল্লাম আমি যাব না, আপনি যান। সে বৎসর আমরা তাঁকে Syndicateএ ঢুকিয়ে দিই। তখন তাঁর পক্ষে অনেকের ভোট হওয়া চাই। ভোট সংগ্রহের ভার অনেকটা আমার উপর পড়ল। আশু বাবু নিজেও canvass করতে গেলেন। আমি নিজে যে কয়জনের ভোট সংগ্রহ করি তাঁদের নাম বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কানাইলাল দে, রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, ব্রহ্মমোহন মল্লিক প্রভৃতি ১২ জন। এঁদের মধ্যে Engineer একজন ছিলেন। আশু বাবু ঢুকলেন। প্রথম চেষ্টা হল Western Bengalকে united করার। প্রথম বৎসরে unity হল না। দুই তিন বৎসরে পশ্চিমবঙ্গ মিলিত হল, সকলে আশুতোষের admirer হলেন। তখন পূর্ব্ববঙ্গ দেখলেন, মুখে ঝগড়া করে কিছু হবে না, তাঁরাও মিলে গেলেন। এই সময় আশু বাবুর খুব একটা crisis আসল। আনন্দমোহন বাবুর ছেলেকে Griffith সাহেব অপমানিত করেছিলেন। আশু বাবুকে সে অপমানের প্রতিবিধানের চেষ্টা করতে হল। সে জন্য Griffith সাহেবকে Registrarএর পদ ত্যাগ করতে হয়। সুতরাং পশ্চিম এবং পূর্ব্ববঙ্গ মিশে গেল। তখন Education Departmentএর চক্ষু ফুটল। আশুতোষ অতি ভয়ঙ্কর লোক, কারুকে মানেন না, এঁকে Syndicate হতে তাড়াতে হবে। তখন Sir Alfred Croft ছিলেন Director of Public Instruction। তেমন মাথাওয়ালা লোক বাংলায় আসেন নি। তিনি সমস্ত লেপ্টানেণ্ট গভর্ণরদের unpaid minister ছিলেন। যাঁরা Senateএর সভ্য ছিলেন, তাঁদের Croft চিঠি লিখে পাঠালেন কাকে ভোট দিতে হবে। খবরের কাগজে তা নিয়ে হাঙ্গামা হল। আশুতোষ তার বিরুদ্ধে agitation করালেন, কিন্তু কিছু হল না। সে বার আশুতোষ Syndic হতে পারেন নাই। তাঁর জীবনে সেই একবার elected হতে পারেন নি। তিনি দুঃখিত হলেন, তাঁর মুখের ভাব দেখে গুরুদাস বাবু Dais থেকে নেমে এসে বল্লেন দুঃখিত হবার কারণ নেই, এই রকম হয়ে থাকে, কখনও ফল হয়, কখনও হয় না। আমি তখন তাঁকে বল্লাম Sir A. Croft আসছে বছর চলে যাবেন, বুড়া বয়সে গুরুভার

বহন করতে পারবেন না। তারপর Senateএর কাজ যেমন চলছিল তেমনি চলবে। যা বল্লাম তাই হল, Croft সাহেব পর বৎসর দেশে চলে গেলেন। আশুতোষ অপ্রতিদ্বন্দ্বী হলেন। ইউনিভার্সিটীতে তিনি যা করেন তাই হয়। সাহেবেরা অত্যন্ত opposition করেও বড় কিছু করে উঠতে পারেন না। তাঁরা যখন দেখলেন, কোন রকমে এঁর সঙ্গে এঁটে উঠা যায় না, তখন ভাবলেন আইন বদলিয়ে দেওয়া যাক। সুতরাং একটা Commission বসাতে হবে। তার পর Lord Curzon Commission বসালেন, আশুতোষকে Commissionএ নেওয়া হল না। কিন্তু কথা হল, বাংলায় যখন Commission আসবে, তখন তিনি member হবেন, বাংলার বাইরে হবেন না। সে ভাবে আশুতোষ বসলেন। তখন Universityকে officialise করবার যে কিছু চেষ্টা সব হয়েছিল। একমাত্র গুরুদাস বাবু note of dissent লিখেছিলেন, বাকী সমস্ত সভ্য officialise করবার পক্ষে ছিলেন, তাই হয়ে গেল। আশুতোষ দুঃখিত হলেন। কিন্তু এমনি কর্ম্মক্ষেত্র, এমনি অদৃষ্টের বিড়ম্বনা, নূতন আইন চালাবার ভার সম্পূর্ণরূপে আশুতোষের উপর পড়ল। ভিতরে কি হল জানি না, কিন্তু যে Lord Curzon তাঁকে তাড়াবার চেষ্টা করেছিলেন, আইন করলেন, Commission করলেন, তা হতেই তিনি ইউনিভার্সিটীর সর্ব্বময় কর্ত্তা হলেন। তার পর Lord Mintoকে চিঠি লিখলেন, এঁকেই Vice-Chancellor কর। যতদিন Lord Minto ছিলেন, আশুতোষের Vice Chancellorএর পদ অব্যাহত ছিল। Lord Hardingeএর সময় তাঁকে সরাবার চেষ্টা হয়েছিল। দু তিন বৎসর কিছুই করে উঠতে পারেন নি, তার পর সরিয়ে দিলেন। ক্রমে ক্রমে সর্ব্বাধিকারী, Sanderson সাহেব, ডাক্তার নীলরতন সরকার Vice-Chancellorএর পদে প্রতিষ্ঠিত হলেন। কাজে গোলমাল হতে লাগল। Lord Ronaldshay দেখলেন, গোলমালে কাজ হবে না, তিনি সমস্ত ভার আশুতোষের উপর ন্যস্ত করলেন। তখন থেকে আবার গোলযোগ আরম্ভ হল, তিনি যে সকল প্রকাণ্ড ব্যাপার করেছিলেন, নিজে আট নয় বৎসর Vice-Chancellorএর পদে থেকে যে scheme তৈরী করেছিলেন, তা চালাবার ভার তাঁর উপর পড়ল। কিন্তু টাকা নেই, গোড়া থেকে টাকা দাও, টাকা দাও। যে টাকা দেবে তার সঙ্গে ঝগড়া হবেই। India Governmentএর সঙ্গে ঝগড়া হল। India Government হাল ছেড়ে দিলেন। সে ভার Bengal Governmentএর হাতে পড়ল। Bengal Government গোড়াতেই দেউলে। আশুতোষও টাকা ছাড়বেন না, সেই ঝগড়া এসে পড়ল Lord Lyttonএর ঘাড়ে। তিনি কি করেন? পরস্পর গালমন্দ হয়ে নিষ্পত্তি হয়ে গেল। আর এক জনকে Vice-Chancellor করা হয়। কিন্তু তাঁকেও আশুতোষের হাতে পড়তে হল, আশুতোষ ছাড়া কাজ করা যায় না। ও দিকে টাকা নাই, budgetএর কর্ত্তা বল্লেন টাকা কোথায় পাব? আশুতোষ বল্লেন Govt. দিতে বাধ্য, দেবেন না কেন? এই করতে করতে তিনি স্বর্গারোহণ করলেন। এখন Universityর কি অবস্থা হবে কেউ বলতে পারে না। আশুতোষ অশ্বত্থ গাছের মত ছিলেন। সে গাছের আওতায় আর আর যত গাছ ছিল, সব শুকিয়ে গেছে।

৩॥০ লাখ টাকার deficit budget, কি করে এ টাকা পূরণ হবে? অনেকের সঙ্গে কথা কয়েছি, সকলে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছেন। আশুতোষের University career আমি যতদূর জানি, বল্লাম।

"দ্বিতীয় কথা—তাঁর সঙ্গে আমাদের সাহিত্য-পরিষদের সম্বন্ধ। সাহিত্য-পরিষৎ অনেক দিন থেকে আশুতোষকে এখানে নিয়ে আস্‌তে চেষ্টা করেছে, তিনি কখনও আসেন নি। তাঁকে সহকারী সভাপতি করা হয়েছে, আমি তাঁহার বাড়ীতে গিয়েছি, এ সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছে। তিনি বলতেন, শাস্ত্রী মহাশয়, আমাকে কেন সহকারী সভাপতি করেছেন? আমার University ছেড়ে আসবার যো নেই, আপনি আছেন, আমাকে কি করতে হবে বলুন? আর আপনি অনুগ্রহ করে আমার একটা কাজ করবেন, আমাকে বাংলা বইএর একটা Library করে দেবেন। আমি সময় সময় বই পেলে বলতাম, লম্বা লিষ্ট করে দিতাম। বাংলার প্রতি গোড়া থেকে তাঁর অনুরক্তি ছিল সন্দেহ নাই। সে অনুরক্তির পরিচয় তিনবার পেয়েছি। প্রথম ১৮৯১ সালে, তখন বঙ্কিম বাবু ছিলেন। চেষ্টা করলেন Universityতে বাংলা ঢোকাতে হবে। ইংরেজী সংস্কৃত আছে, বাংলা নেই কেন? তার জন্য উদ্যোগ হল, সভা হল। বাংলায় তখন এমন element ছিলেন, যাঁরা দাঁত আর মুখ দিয়ে আঁচড়াতে লাগলেন। আমরা পারলাম না। তখন স্যর গুরুদাস Vice-Chancellor ছিলেন, তিনি যা বলেছিলেন সব ছাপা নেই। আমি সমস্ত শুনেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, এমন দিন আসবে, যে দিন সমস্ত পরীক্ষা Entrance, I. A., B. A. বাংলায় দিতে পারা যাবে, এই বলে বাংলা ভাষার গুণ গান করলেন। সেবার Entrance Examinationএ বাংলায় প্রবন্ধ লেখবার অনুমতি হল। তার জন্য স্বতন্ত্র certificate দেওয়া হত। দ্বিতীয়বার আমি উপস্থিত ছিলাম না, তখন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বেশী করে বাংলা প্রচলন করতে চেষ্টা করেন ১৮৯৬।৯৭ সালে। আশুতোষকে এ বিষয়ে বেশী উদ্যোগী করবার জন্য, তিনিই resolution move করবেন, এইরূপ স্থির হয়। ১৮৯৪ সালে বঙ্কিমচন্দ্র স্বর্গারোহণ করেন। ক্রমে ক্রমে আস্তে আস্তে Universityতে B. A. পর্য্যন্ত বাংলা উঠল। যখন নূতন আইন মতে Universityর কার্য্য আরম্ভ হল, তখন ঠিক হল history, mathematics এ সব বাংলায় হবে। সাহিত্য-পরিষৎ এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। এখন M. A. পর্য্যন্ত বাংলা হয়েছে। দেখাদেখি ঢাকা Universityতেও বাংলা হয়েছে।

"আশুতোষ সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যে সাক্ষাৎ ভাবে যোগ দিতে পারেন নি, এ জন্য মনে করবেন না সাহিত্য-পরিষদের উপর তাঁর অশ্রদ্ধা ছিল, একে তিনি অবজ্ঞা করতেন; তা তিনি করতেন না। তিনি যখন মায়ের নামে medal দিয়েছিলেন, তখন সেই কমিটিতে সাহিত্য-পরিষদের প্রতিনিধি থাকবে এই ব্যবস্থা করেছিলেন, সুতরাং পরিষৎকে তাঁর নিজের মনে করতেন। তিনি মাকে কি রকম ভক্তি করতেন, তা জগৎবিদিত। তাঁকে বিলেতে পাঠাবার চেষ্টা করবার সময় Lord Curzon বলেছিলেন—By my command you go

to your mother and tell her that I command her to allow you go to England, আশুতোষ উত্তর দিয়েছিলেন—Viceroyএর আমার মাকে হুকুম দিবার ক্ষমতা নেই।

"সাহিত্য-পরিষদের প্রতি তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। নিজের কন্যার নামে—যে কন্যার বিধবা বিবাহ নিয়ে তুমুল আন্দোলন হয়েছিল, ঝগড়া বিবাদ হয়েছিল, সে কন্যা যখন মারা যায় তখন তার নামে "কমলা Readership" স্থাপিত হল। মায়ের নামের মেডেলের কমিটিতে যেমন সাহিত্য-পরিষদের প্রতিনিধি নিয়েছিলেন, প্রিয়তমা কন্যার নামের মেডেলের কমিটিতেও সাহিত্য-পরিষদের প্রতিনিধি নেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি যে সাহিত্য-পরিষৎকে কত অন্তরের সহিত ভালবাসতেন তা বলে শেষ করা যায় না।

"যে উদ্দেশ্যে সাহিত্য-পরিষদের সৃষ্টি সে উদ্দেশ্য তিনি চিরকাল মনে করে রেখেছিলেন। সুবিধা হলেই সাহায্য করতেন। অনেক সময় সাহিত্য-পরিষদের কথা শুনে কাজ করতেন সুতরাং সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, সে কেবল কর্ম্ম-ক্ষেত্রের সম্বন্ধ তা নয়, হৃদয়ের সম্বন্ধ।

"আর একটা কথা বলি। না বল্লেই ভাল হত, সেটা ব্যক্তিগত কথা। প্রচার ছিল, আমার সঙ্গে তাঁর অহিনকুলতা ছিল। কিন্তু কথাটা পুরো সত্য নয়। প্রথমে তাঁর সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল। তার একটা লক্ষণ—এই ছেলে পুলে তাঁরও হয়েছে, আমারও হয়েছে, আমার ছেলেদের নামের শেষে "তোষ", আর তাঁর ছেলেদের নামের শেষে "প্রসাদ"। এটা কি মনে করেন শুধু accident ? তা নয়। আমাদের পরস্পরের প্রতি অস্ফুট অব্যক্ত অথচ গভীর প্রীতি ছিল। তবু বলব তাঁর সঙ্গে অহিনকুলতা হয়েছে; এমন কোন কোন কাজ ছিল, তিনি বলেছেন ভাল হবে, আমি বলেছি, ক্ষতি হবে। সুতরাং ঝগড়া এক আধটু হবেই। যদি একজন ক্রমাগত তাঁর বিরুদ্ধে যায়, তাকে সরিয়ে দেবেনই, তা না করলে কাজ করা যায় না। তাই আমাকে সরিয়ে দিয়েছেন, সেই জন্য তাঁকে admire করি; তাঁর কাজের ভিতর ঢুকে যদি সর্ব্বদা তাঁকে oppose করতাম, তা'হলে তিনি অত কাজ করতে পারতেন না। তার পর আর একটা কথা। তাঁর মৃত্যুর মাস খানেক আগে এসিয়াটিক সোসাইটী "কমলা Readership" কমিটিতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করা হবে। Annandale সাহেব বল্লেন, কমিটিতে এসিয়াটিক সোসাইটীর পক্ষে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় থাকবেন। আশুতোষের supporters যাঁরা ছিলেন, তাঁরা বল্লেন, "সে হবে না, হবে না। স্যর আশুতোষ অত্যন্ত বিরক্ত হবেন," একথা শুনে আমাদের Chairman স্যর রাজেন্দ্র বল্লেন, "এ সব কি কথা ? তিনি ভার দিয়েছেন তোমরা করবে। আমরা যাঁকে মনোনীত করি তিনিই হবেন, আশুতোষ বিরক্ত হবেন, সে কি কথা ?" আমি যখন ঢাকা থেকে ফিরে এলাম, Secretary বল্লেন, স্যর আশুতোষকে এই সমস্ত কথা বলেছিলাম। তিনি বলেছেন no better selection could be made। সুতরাং কোথায় অহিনকুলতা ? Political ক্ষেত্রে ঝগড়া হলে, যে প্রবল হয় সে দুর্ব্বলকে

সরিয়ে দেয়, তা না হলে কাজ হয় না। হৃদয়ের ভাব ছেলেদের নামে প্রকাশ, কমলা Readershipএর প্রতিনিধি নিয়োগে প্রকাশ।

"আশুতোষের মৃত্যুতে বাংলাশুদ্ধ যেমন দুঃখিত, আমি তার থেকে এক বিন্দু কম দুঃখিত হই নি। ২৬শে মে বাড়ীতে একটা কাজকর্ম্ম ছিল, যখন বেরিয়ে এলুম, একটি ছোকরা এসে বল্ল, সতীশ বাবুর কাছে telephone এসেছে। তিনি বল্লেন আশুতোষ মুখার্জ্জি dead। আমি অবাক্ হয়ে রইলাম, তেল মাখছিলাম, হাত মাথা থেকে উঠল না, যেমন ছিল তেমনি রইল। আশুতোষ যেমনটী গিয়েছেন, তেমনটী আর হবে না, আস্তে আস্তে গঙ্গাস্নান করতে গেলাম। চোখের জল সকলের পড়ছে, আমারও পড়ছে।

"আশুতোষ সম্বন্ধে নিজের personal experience বল্লাম। বক্তৃতা করবার ক্ষমতা নাই, plain facts বল্লাম, আর কিছু বলব না, আমাকে মাপ করুন।"

তারপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সভাপতি।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের
বার্ষিক স্মৃতি-উৎসব

১৫ই আষাঢ় ১৩৩১, ২৯এ জুন ১৯২৪, রবিবার, প্রাতঃকাল।

এই দিন প্রাতে কবির বহুসংখ্যক ভক্ত এবং সাহিত্যিক লোয়ার সার্কুলার রোড, গবর্মেণ্ট-সিমেট্রিতে কবির সমাধি পার্শ্বে-সমবেত হইয়া কবির পরলোকগত আত্মার কল্যাণ কামনা করেন এবং বঙ্গবাসীর পক্ষ হইতে শ্রদ্ধা ভক্তি নিবেদন করেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে ডাঃ শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয়ের নেতৃত্বে প্রাতের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, রায় শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দাস গুপ্ত বাহাদুর, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষাল, ডাঃ শ্রীযুক্ত এচ্ ডব্লিউ বি মরেণো এবং কবির দৌহিত্র শ্রীযুক্ত নিস্ সাহেব বক্তৃতা ও প্রার্থনাদি করেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত সুবোধ রায় মহাশয় একটি কবিতা পাঠ করেন এবং শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রসেবক নন্দী মহাশয় শ্রীযুক্তা স্বর্ণলতা দেবী মহাশয়া-রচিত একটি কবিতা পাঠ করেন।

তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন

১৫ই আষাঢ় ১৩৩১, ২৯এ জুন ১৯২৪, রবিবার।

শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল—সভাপতি

ঐ দিন অপরাহ্ণ ৬৷৷০টার সময় সাহিত্য-পরিষদ্-মন্দিরে মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-উৎসব সম্পর্কে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশন হয়। নির্দ্ধারিত সভাপতি শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় যথাসময়ে উপস্থিত হইতে না পারায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে ডাঃ শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্‌সি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তৎপরে নিম্নলিখিতভাবে কার্য্যারম্ভ হয়।

১। শ্রীযুক্ত সুবোধ রায় এবং শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয়দ্বয় তাঁহাদের রচিত কবিতা পাঠ করিলেন।

২। শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বসাক মহাশয় "মেঘনাদ বধ কাব্য" হইতে কিয়দংশ আবৃত্তি করিলেন।

৩। শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার ভাগবত-রত্ন এম্ এ মহাশয় "মধুসূদনের স্বাদেশিকতা" নামে এক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

এই সময় শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় আসিলেন এবং শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয় তাঁহাকে সভাপতির আসন ছাড়িয়া দিলেন।

৪। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্ এ মহাশয় বলিলেন যে, মধুসূদনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, বঙ্গভাষাকে সমৃদ্ধ করা। এই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার কাব্য ও কবিতায় ইংরেজী ও ইউরোপের ভাষা ও সাহিত্যের বহু ভাব প্রদান করিয়াছেন।

৫। শ্রীযুক্ত ডাঃ এচ ডব্লিও বি মরেণো এম্ এ, পিএচ্ ডি মহাশয় ইংরেজী ভাষায় বলিলেন যে, মাইকেল মনে প্রাণে বাঙ্গালী ছিলেন। খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তিনি পর পর দুইটী ইউরোপীয় মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। তিনি এত উচ্চশিক্ষিত ছিলেন যে, তাঁহার পক্ষে সামাজিক রীতি-নীতির বন্ধন অনাবশ্যক ছিল। এই হিসাবে তাঁহাকে সামাজিক বন্ধনমুক্ত হিন্দু সাধুগণের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। মাইকেল বাঙ্গালার মিল্টন ছিলেন এবং তাঁহার দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখা যায় যে, বঙ্গদেশে কত বড় মনীষীর উদ্ভব হইতে পারে। বাঙ্গালীর মধ্যে মাইকেলই প্রথম ইউরোপীয় মহিলা বিবাহ করিবার দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়া যান। এখনকার বঙ্গসমাজে ইহা সাহসের পরিচয় নহে। দ্বিতীয়বারও তিনি অন্য একটি আংগ্লো ইণ্ডিয়ান মহিলাকে বিবাহ করেন—এই দ্বিতীয়া স্ত্রী তাঁহার প্রতি কত অনুরক্তা ছিলেন—তাহা সকলেই জানিত। কবির শেষ জীবনের দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যেও—সেই সাধ্বী স্ত্রী কত আগ্রহের সহিত স্বামীর সেবা করিতেন। প্রিয়তম স্বামীর মৃত্যুর কয় ঘণ্টা মাত্র পরেই এই সতীর পরলোক-

প্রাপ্তি হয়। এই অসামান্যা পতিগতপ্রাণা সাধ্বী স্ত্রী, বক্তার ন্যায় আংগ্লো-ইণ্ডিয়ানকুলে জন্মগ্রহণ করেন। দুঃখের বিষয়, এতদিন তাঁহার সমাধিস্থান কোথায় ছিল, তাহা কাহারও গোচর ছিল না। সম্প্রতি তাঁহাদের চেষ্টায় সে স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং কবির পার্শ্বেই তিনি শায়িত আছেন। বর্ত্তমান বৎসরেই সে স্থান সংস্কৃত হইয়াছে ও তদুপরি প্রস্তরফলক স্থাপিত হইয়াছে।

তৎপরে বক্তা, কবির দৌহিত্র—শ্রীমতী হেনরিয়েটা শর্ম্মিষ্ঠার পুত্র শ্রীযুক্ত বি, এস্, নিস্ (Mr. B. S. Nyss.) সাহেবকে সমবেত সভ্যমণ্ডলীর নিকট পরিচয় করিয়া দিলেন।

সভাপতি মহাশয় কবির চিত্র হইতে মাল্য গ্রহণ করিয়া শ্রীযুক্ত নিস্ সাহেবের গলদেশে অর্পণ করিয়া তাঁহাকে কিছু বলিতে অনুরোধ করিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত নিস্ সাহেব বলিলেন যে, তিনি দেশপূজ্য বাঙ্গালী মাতামহের গৌরবে আজ গৌরবান্বিত; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি মাতৃস্নেহলাভে বঞ্চিত—যেহেতু, তিনি ভূমিষ্ঠ হইবার পরই—তাঁহার মাতা হেনরিয়েটা শর্ম্মিষ্ঠা দেবীর পরলোকপ্রাপ্তি হয়। এই বলিয়া তিনি তাঁহার বাল্যজীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলিলেন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, যদিও ভাষার দ্বারা মানুষের ভাবের অভিব্যক্তি হয়—তথাপি সময়ে সময়ে ভাষা চিন্তার ধারাকেও নিয়ন্ত্রিত করে। মধুসূদনের ক্ষমতাশালী লেখনী বাঙ্গালীর জাতীয়তাকে প্রভূত পরিমাণে ক্ষমতা, চেতনা ও সাহস দান করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত তিনি "ব্রজাঙ্গনা কাব্যের" ন্যায় সুমধুর কাব্য লিখিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন যে, তিনি কোমলকান্ত পদও রচনা করিতে পারিতেন।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রমোহন সিংহ বি এ বাহাদুর বলিলেন যে, যদিও মাইকেল বাহ্যতঃ বিদেশী আচরণে ও চালচলনে অভ্যস্ত ছিলেন, তথাপি তাঁহার অন্তঃকরণ সর্ব্বদাই দেশীয় ভাবে ভরপুর ছিল এবং বাঙ্গালার রীতি নীতি, পূজা অনুষ্ঠান প্রভৃতির স্মৃতি সর্ব্বদাই তাঁহার হৃদয়ে ভাসমান থাকিত। প্যারী সহরে অবস্থানকালে তিনি "কোজাগরী লক্ষ্মীপূর্ণিমা" বিষয়ে কবিতা লিখিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কবির দেশ-প্রীতির বিষয় কিছু বলিলেন।

শ্রীযুক্ত ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম্ এ, পিএচ্ ডি মহাশয় বলিলেন যে, মাইকেল দেখাইয়া গিয়াছেন যে, প্রতীচ্য জগতের সেক্‌সপীয়র, ডাণ্টে প্রভৃতির ন্যায় বঙ্গদেশে উচ্চশ্রেণীর কবিও জন্মগ্রহণ করিতে পারে।

শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয় কবির নানা গুণের আলোচনা করিলেন।

তৎপরে, হিন্দুস্কুল মাইকেল মধুসূদন স্মৃতি-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায় মহাশয় স্মৃতি-সমিতির পক্ষ হইতে অর্থ সাহায্য চাহিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন, সভাপতি মহাশয় তাহা পাঠ করিলেন। পত্রখানির বিষয়ে যথা কর্ত্তব্য ব্যবস্থা করিবার জন্য পরিষদের সম্পাদক মহাশয়ের উপর ভার অর্পিত হইল।

অতঃপর সভাপতি শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় বলিলেন যে, গবর্মেণ্ট সিমেটি তে মাইকেল মধুসূদনের সমাধির চতুর্দ্দিকে যে লৌহ-বেষ্টনী আছে, তাহা বাড়াইয়া মাইকেলের পত্নীর সমাধিস্থানটিকেও ঘিরিয়া দিবার ব্যবস্থা করা উচিত। স্থির হইল, এই বিষয়ে যথাকর্ত্তব্য করিবার জন্য পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর ভার দেওয়া হউক।

তৎপরে তিনি বলিলেন যে, মাইকেলের জীবদ্দশায় তাঁহাকে দেখিবার তাঁহার সুযোগ হয় নাই। মাইকেলের সময়ে এবং হয়ত তাহার কিছু দিন পূর্ব্বেও আজকালকার মত বঙ্গভাষার এত শব্দসম্পদ্ ছিল না। বঙ্গদেশ তখন বুঝিতে পারিয়াছিল যে, নব নব ভাবসম্ভার ব্যক্ত করিবার ও ভাষাকে সুগঠিত করিবার শক্তি তাহার কত অপ্রচুর। মাইকেলের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার এই দৈন্য ঘুচিয়াছিল। মাইকেল আর একটি কাজ করিয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালীর মনে এই শক্তির সঞ্চার করিয়া দিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালী জাতি সেই সকল জাতির সমতুল্য যে সকল জাতির মধ্যে সেক্‌সপীয়র ও মিল্টন প্রভৃতির আবির্ভাব হইয়াছে। এই কথা ঠিক যে, মাইকেলের পূর্ব্বেও বাঙ্গালীর অতুলনীয় বৈষ্ণব-সাহিত্য ছিল—কিন্তু তাহা লোকলোচনের অগোচর ছিল। বোধ হয়, শিক্ষিত বাঙ্গালী অক্ষয়চন্দ্র সরকার এবং সারদাচরণ মিত্র মহাশয়দ্বয়ের সম্পাদিত "প্রাচীন কবিতা-সংগ্রহে" তাহার প্রথম পরিচয় পায়। ঈশ্বর গুপ্তও বোধ হয় বাঙ্গালীর ভাবরাজ্যে মাইকেলের ন্যায় চেতনা ও দেশপ্রীতির উন্মেষ করিতে পারেন নাই। মাইকেলের দেশাত্মবোধ সুগভীর ছিল। কিন্তু এই দেশাত্মবোধ তাঁহাকে বিদেশী বিদ্যা ও সভ্যতার অনুশীলন বর্জ্জন করিতে শিক্ষা দেয় নাই। তিনি প্রতীচ্যের অনুকরণ করেন—তিনি পশ্চিমা শিক্ষা দীক্ষা সভ্যতা হজম করিয়াছিলেন। অশ্বমেধের ঘোটকের ন্যায় তিনি তাঁহার মনকে যথেচ্ছ ভ্রমণের স্বাধীনতা দিয়াছিলেন—কোথাও তাহাকে আবদ্ধ রাখেন নাই। তাঁহার মানসিক শক্তি দিগ্বিজয়ী হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিল—এবং মাতৃভাষাকে অপূর্ব্ব সম্পদ্‌শালিনী করিল। মাইকেল ইচ্ছা করিতেন না যে, তাঁহার দেশবাসী কূপমণ্ডুক হইয়া বসিয়া থাকে।—যেহেতু এই জন্যই মধ্যযুগে বঙ্গদেশের অত দুর্দ্দশা ও অধঃপতন হইয়াছিল। অন্য জাতির নিকট এ বিদ্যা ও সভ্যতা শিক্ষা করিবার অধিকার ব্যক্তিবিশেষের ন্যায় জাতিরও আছে। যদি বঙ্গদেশ ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা ভারতমাতাকে বেশী কিছু দিতে সমর্থ হইয়া থাকে, তবে তাহার কারণ, সে বিদেশ হইতে অনেক জিনিষ আনিতে পারিয়াছিল বলিয়া। মাইকেল তাঁহার জীবনে এবং তাঁহার লেখায় এই কথাই—এই মহৎ শিক্ষাই দিয়া গিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্তৃক সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সভাপতি।

—o—

চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন

৩রা শ্রাবণ ১৩৩১, ১৯এ জুলাই ১৯২৪, শনিবার, অপরাহ্ণ ৬৷৷০টা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই—সভাপতি

আলোচ্য-বিষয়—সভাপতির অভিভাষণ—"হিন্দু ও বৌদ্ধে তফাৎ" নামক প্রবন্ধ-পাঠ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলেন। এই অভিভাষণে তিনি "হিন্দু ও বৌদ্ধে তফাৎ" বিষয়ে আলোচনা করিলেন।*

প্রবন্ধ পাঠের পর রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সি আই ই, আই এস ও, এম্ বি, এফ সি এস্ রসায়নাচার্য্য মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, "আমরা আজ অনেক জ্ঞান লাভ করিলাম। বাঙ্গালায় তাঁহার মত জ্ঞানবান্ আর কেহ নাই। তিনি সাহিত্য-পরিষদের সভাপতিরূপে বাঙ্গালার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। শ্রোতা ও সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। তৎপরে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সভাপতি।

ত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশন

৪ঠা শ্রাবণ ১৩৩১, ২০এ জুলাই ১৯২৪, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫৷৷০টা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—

১। গত অধিবেশনগুলির কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। ত্রিংশ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ৩। একত্রিংশ বার্ষিক আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ বিজ্ঞাপন, ৪। সহায়ক ও সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৫। একত্রিংশ বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপন,

---

*৩১শ ভাগ ২য় সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

৬। একত্রিংশ বর্ষের জন্য পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব, ৭। শ্রীযুক্ত সুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক-পদে নিয়োগ করিবার জন্য শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী মহাশয়ের প্রস্তাব, ৮। পুথি ও পুস্তকোপ-হারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৯। চিত্র-প্রতিষ্ঠা—(ক) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়-প্রদত্ত পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ৺সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের তৈলচিত্র, (খ) শ্রীযুক্ত জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়-প্রদত্ত ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের তৈলচিত্র, (গ) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডারের অর্থে প্রস্তুত ৺রায় সাহেব বিহারিলাল সরকার মহাশয়ের তৈলচিত্র এবং (ঘ) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস মহাশয়-প্রদত্ত ৺প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস মহাশয়ের তৈলচিত্র, এবং ১০। বিবিধ।

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। সর্ব্বসম্মতিক্রমে বিগত অধিবেশনগুলির কার্য্য-বিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

২। সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ত্রিংশ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলেন।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর বলিলেন, "বিগত বর্ষে পরিষৎ কি কি কার্য্য করিয়াছেন, তাহা আমরা শুনিলাম। অবশ্য, এই কার্য্য-বিবরণে কর্ম্মচারিগণের কেবল সুখ্যাতিই করা হয় নাই, তাঁহারা যে সকল কার্য্য করিয়া উঠিতে পারেন নাই, তাহার কথাও যথাস্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে। পরিষৎ একটি প্রকাণ্ড প্রতিষ্ঠান। ইহার উদ্দেশ্য এক দিনেই সিদ্ধ হইতে পারে না। তবে বিগত বর্ষে আমরা যে উদ্দেশ্যের পথে কতকটা অগ্রসর হইয়াছি, তাহা বলিতে পারা যায়। কার্য্য-বিবরণের মধ্যে আপনারা পরিষদের দেনার পরিমাণ জানিতে পারিলেন। সদস্যগণের নিকট হইতে নিয়মিতভাবে চাঁদা পাওয়া গেলে ইহা অনায়াসেই পরিশোধ হইতে পারে। "রমেশ-ভবনের" কার্য্য অল্প দিনের মধ্যেই শেষ হইবে। আমরা শুনিলাম যে, ইহার জন্য প্রায় ১২০০০৲ টাকা দেনা রহিয়াছে। আশা করি, সত্বরেই ইহা শোধ হইবার মত টাকা পাওয়া যাইবে।" এই বলিয়া তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, বর্ত্তমান ত্রিংশ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ গৃহীত হউক। রায় শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ বাহাদুর এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলিলেন, "পরিষদের আর্থিক অবনতি, কার্য্যালয়ের বিশৃঙ্খলা, পুস্তকালয়ের বর্ত্তমান অবস্থা, এবং গ্রন্থ ও পত্রিকাদি প্রকাশের অনিয়ম ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা করিয়া, ইহার উন্নতির উপায় নির্দ্ধারণ জন্য পরিষদের ২১ জন সভ্য এক বিশেষ অধিবেশন অহ্বানের প্রার্থনা করিয়াছেন। অদ্যকার সভায় উক্ত বিষয়গুলির আলোচনা সম্ভবপর নহে বলিয়া আমি প্রস্তাব করি যে, কার্য্য-তালিকার অন্তর্গত ২।৩ ও ৬ সংখ্যক বিষয় অর্থাৎ ত্রিংশ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ, একত্রিংশ বার্ষিক আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ ও একত্রিংশ

বর্ষের জন্য পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন স্থগিত থাকুক।" এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবু গ্রন্থাগারের র‍্যাকের জন্য ১০০৲ টাকা দান করিবেন জানাইলেন।

শ্রীযুক্ত সুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন সেন ও শ্রীযুক্ত ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন এম এ, পিএচ্ ডি মহাশয়গণ শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবুর প্রস্তাব সমর্থন করিলেন এবং শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ মহাশয় আয়-ব্যয়-বিবরণের প্রণালী সম্বন্ধে কয়েকটি আপত্তি জানাইয়া বলিলেন যে, ঐ হিসাব সংশোধিত না হইলে এই কার্য্য-বিবরণ গ্রহণ করা যায় না। শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র বাবুই এই প্রণালী প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, এই বলিয়া তিনি শ্রীযুক্ত জ্ঞান বাবুর স্বাক্ষরিত ৫ বৎসর পূর্ব্বের নথি উপস্থিত করিলেন। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায় মহাশয় হিসাব সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সুধীর বাবুর মুদ্রিত প্রশ্নের উত্তর চাহিলেন।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলিলেন, "ত্রিংশ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ, আয়-ব্যয়-বিবরণ ও কর্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োগ প্রস্তাবের আলোচনা স্থগিত করিয়া কোনও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। ইহাতে কার্য্য-সম্পাদনে বিলম্ব করিয়া পরিষদের অনর্থক ক্ষতি করা হইবে মাত্র। বার্ষিক অধিবেশনই কর্ম্মাধ্যক্ষগণের কার্য্যের দোষগুণ ও পরিষদের অবস্থা বিষয়ে বিচার করিবার উপযুক্ত কাল। ইহার জন্য স্বতন্ত্র অধিবেশন আহ্বানের কি প্রয়োজন? যদি আপনারা দেখেন যে, পুরাতন কর্ম্মাধ্যক্ষেরা কার্য্যে শিথিলতা প্রকাশ করিয়াছেন, তবে আপনারা এই অধিবেশনেই তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করিয়া নূতন কর্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োগ করুন। ইহার জন্য অধিবেশন স্থগিত রাখিয়া কোনই লাভ নাই, বরং বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং আমি সংশোধিত প্রস্তাব করি যে, বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ, আয়-ব্যয়-বিবরণ এবং কর্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োগের প্রস্তাব অদ্যকার সভাতেই আলোচিত হউক।" শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী ও শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার বি এল্ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

পরে সভাপতি মহাশয় এই উভয় প্রস্তাব সম্বন্ধে উপস্থিত সদস্যগণের ভোট গ্রহণ করিলে শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাবের পক্ষে ১৫ এবং শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবের পক্ষে ৫৯ ভোট হওয়ায় শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবুর প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইল।

এই সময় শ্রীযুক্ত সুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আয়-ব্যয় সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ ছাপান আপত্তি পাঠ করেন এবং শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় তাঁহার কতিপয় আপত্তির উত্তর প্রদান করেন।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়, শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়দ্বয়ের আপত্তির উত্তর প্রদান করিয়া বলেন যে, কলিকাতা প্রদর্শনী হইতে পরিষৎ কোন টাকা পায় নাই। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র বাবু বলিলেন, তিনি ইহা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয় এই কথার বিশেষভাবে প্রতিবাদ করিলেন।

তৎপরে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত সুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের উত্থাপিত আরও কয়েকটী আপত্তির উত্তর প্রদান করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, আর কিছু কাহারও জানিবার আছে কি না। আর কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইল না। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত কিরণ বাবু ১৩৩১ সালের আনুমানিক আয়-ব্যয় তালিকা মুলতুবি রাখা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবুর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দেখান যে, এই আয়-ব্যয় তালিকা প্রস্তুতের সভায় উপস্থিত থাকিয়া শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবু ঐ তালিকা মঞ্জুর করিয়া স্বাক্ষর করিয়াছেন। এই সময় শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় সভাপতি মহাশয় ও সদস্যগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া পরিষৎ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।

তৎপরে রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর ত্রিংশ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তাব উপস্থিত করিলে ইহার বিপক্ষে ৪ জন এবং সপক্ষে ৫৪ জন সদস্য ভোট প্রদান করায় ত্রিংশ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ গৃহীত হইল।

৩। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ১৩৩১ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ বিজ্ঞাপন করিলে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে উক্ত আনুমানিকআয়-ব্যয়-বিবরণ গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত সুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ গ্রহণের পূর্ব্বে প্রত্যেক সদস্যের নিকট উহা পাঠাইবার প্রস্তাব করিলে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয় উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করেন। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ মহাশয় বলেন যে, সাধারণ সভায় সরাসরি ভাবে কোনও প্রস্তাব গ্রহণ না করিয়া কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির মধ্য দিয়া গ্রহণ করাই নিয়ম। এই বিষয়ে কিছু আলোচনার পর সভাপতি মহাশয় বলেন যে, তিনি নিজেই এ বিষয়ে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন।

৪। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়, যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত সাধারণ-সদস্যগণের নাম পাঠ করিলে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইঁহারা পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন। পরিশিষ্টে সাধারণ-সদস্যতালিকা দ্রষ্টব্য; পরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে সহায়ক-সদস্যরূপে প্রস্তাব করিলে এবং শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাহা সমর্থন করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইঁহারা সহায়ক-সদস্যরূপে পুনর্নির্ব্বাচিত হইলেন।

(১) শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ। (২) শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী।
(৩) ,, স্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী। (৪) ,, পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

৫। সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় জানাইলেন যে, প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা অনুসারে নিম্নোক্ত ২০ জন সদস্য আগামী বর্ষের জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—

*১। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
*২। „ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি এল্, এটর্ণি
*৩। „ রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর সি আই ই, আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস্
*৪। „ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্
*৫। „ ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা এম্ এ, বি এল্, পিএচ ডি
৬। „ ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্
*৭। „ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
৮। „ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি
৯। „ মৃণালকান্তি ঘোষ
১০। „ জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্
১১। „ বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ
১২। „ রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ
১৩। „ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
১৪। „ ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী
১৫। „ মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন এম্ এ, এল্ এম্ এস্
১৬। „ অমৃতলাল বসু নাট্যকলাসুধাকর
১৭। „ হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ, এফ্ জি এস্
*১৮। „ কিরণচন্দ্র দত্ত
*১৯। „ মন্মথমোহন বসু এম্ এ
২০। „ ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম্ এ, পিএচ ডি

নিম্নোক্ত ছয় জন শাখা-পরিষৎসমূহ হইতে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে প্রতিনিধি-সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—

(১) শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
(২) „ ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল্
(৩) „ মহেন্দ্রচন্দ্র রায় তত্ত্বনিধি
(৪) „ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
(৫) „ সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
(৬) „ ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়

৬। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব অনুসারে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর আগামী বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষ-পদে নির্ব্বাচিত হইলেন।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি এল্, এটর্ণি

প্রস্তাবক—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই

সহকারী সভাপতি—

(১) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই
(২) রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
(৩) রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য, সি আই ই, আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস্
(৪) শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্
(৫) মহারাজ শ্রীযুক্ত স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর কে সি আই ই
(৬) মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত স্যর বিজয়চাঁদ মহাতাপ বাহাদুর জি সি এস্ আই, কে সি এস আই, কে সি আই ই, আই ও এম্
(৭) শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সি আই ই, বি এল্
(৮) শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্‌সি (এডিন), এফ আর এস ই

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ
সমর্থক—শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী
সমর্থক—রায় শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর এম্ এ, বি এল্

সহকারী সম্পাদক—

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত
,, হেমচন্দ্র ঘোষ
,, নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
,, দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্‌সি
,, ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বি এল্
,, তারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম্ এ
সমর্থক—শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি এল্

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি এল্
সমর্থক— শ্রীযুক্ত রায় জলধর সেন বাহাদুর

পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা এম্ এ, বি এল্, পিএচ ডি,

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সরকার বি এল
সমর্থক— শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত

চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্‌সি
সমর্থক— শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন

ছাত্রাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ
প্রস্তাবক—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সি আই ই, আই এস্ ও, এম্ বি
সমর্থক—শ্রীযুক্ত বিমলকান্তি ঘোষ এম্ এ, বি এল্

গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রায় কৃপানাথ দত্ত বাহাদুর
সমর্থক— শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্‌সি

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক—

শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সত্যচরণ বসু এম্ এ
সমর্থক—শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ

৭। প্রস্তাবকর্ত্তা উপস্থিত না থাকায় শ্রীযুক্ত সুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে সম্পাদক-পদে নিয়োগ করিবার জন্য শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী মহাশয়ের প্রস্তাব আলোচিত হইল না। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত সুধীর বাবু উক্ত পদে নির্ব্বাচিত হওয়ার প্রস্তাবে সম্মতি প্রত্যাহার করেন।

এই সময় শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত এবং শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, পূর্ব্বোক্ত কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির এই আটজন সভ্য কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের স্থলে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যপদ-প্রার্থীদের পরবর্ত্তী সংখ্যা হইতে, প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যানুসারে, নিম্নলিখিত ৮ জন কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য হইলেন—

২১। শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্‌সি
২২। " বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
২৩। " বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ
২৪। " রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী
২৫। " রায় যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর বি এল্
২৬। " বৈদ্যমহোপাধ্যায় গিরিজাপ্রসন্ন সেন কাব্যতীর্থ
২৭। " হেমচন্দ্র সরকার এম্ এ
২৮। " নিবারণচন্দ্র রায় এম্ এ

৮। পরিশিষ্টে লিখিত পুথি ও পুস্তক প্রদর্শনান্তে উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৯। সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত চিত্রসকল প্রতিষ্ঠা করিলেন।—

(ক) পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ৺সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের তৈলচিত্র। এই চিত্রখানি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রদান করিয়াছেন।

(খ) ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের তৈলচিত্র। চিত্র-প্রদাতা—শ্রীযুক্ত জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়।

(গ) ভূতপূর্ব্ব "বঙ্গবাসী" সম্পাদক রায় সাহেব ৺বিহারিলাল সরকার মহাশয়ের তৈলচিত্র। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডারের অর্থে এই চিত্রখানি প্রস্তুত হইয়াছে। ৺গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রতিবর্ষে এই ভাণ্ডারে ৫০৲ দান করিয়া থাকেন।

(ঘ) ৺প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস মহাশয়ের তৈলচিত্র। প্রদাতা—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। খড়দহের ৺প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস মহাশয় ১৯শ শতাব্দীর ১ম ভাগে একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ও কায়স্থ-সমাজে মান্যগণ্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বহু গ্রন্থ ছাপাইয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। পুরীতে জগন্নাথ দেব রত্নবেদীর উপর যেরূপ প্রতিষ্ঠিত আছেন, সেইরূপ তিনি একলক্ষ শালগ্রাম শিলার দ্বারা রত্নবেদী প্রস্তুত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, "৫ বৎসর নিয়মের বলে আজ শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়কে পরিষদের সভাপতি-পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারা গেল না। পরিষদের সভাপতির আসন তাঁহারই প্রাপ্য—বঙ্গদেশে তাঁহার স্থান পূরণ করিতে পারেন, এমন লোক নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমরা আশা করি, আগামী বর্ষে আমরা আবার তাঁহাকে তাঁহার যোগ্য আসনে বসাইতে পারিব। তাঁহাকে পাইলাম না বলিয়াই তাঁহার রিক্ত আসনে রন্ধ্রশোধকরূপে আপনাদের আদেশমত আমাকেই বসিতে হইতেছে।"

শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীঅভয়কুমার গুহ
সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্য

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, প্রস্তাবিত সদস্য—শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, জমিদার, পোঃ কোতরং, ভদ্রকালী, হুগলী; শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত, ভাইস্-চেয়ারম্যান, কোতরং, হুগলী; শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এম আর এস্ (লণ্ডন), ৯১২ খেলাত ঘোষ লেন;

শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র শেঠ বি এল্, উকীল, ১৫৩ বলরাম দে ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সরকার, শুকজোড়া, পোঃ গেলিয়া, বাঁকুড়া। প্রঃ—শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার এম্ এ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি সরকার এম্ এ, বি এল্, ৮ সার্কুলার রোড, হাওড়া। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ বি এল্, উকীল, দুমকা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রমোহন মৈত্র এম্ এ, বি এল্, ৮।২এ হাজরা রোড, (জমিদার, তালন্দ, রাজসাহী)। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত মিহিরকুমার মৈত্র বি এল্, ৭২ ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন সেন, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন সেন বি এল্, উকীল, ৬ উল্টা-ডাঙ্গা জংশন রোড, কলিকাতা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সমঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সদঃ—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মল্লিক, ১১ শিকদারপাড়া ষ্ট্রীট, জোড়াসাঁকো। প্রঃ—ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী, সমঃ—ঐ, সদঃ—মৌলবী তালিম উদ্দীন আহম্মদ তারিকুল আলম এম্ এ, বি এল্, সাব-ডিবিশন্যাল অফিসার, বারাসত। প্রঃ—শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ, সমঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার ঘোষ এম্ এ, বি টি, ৭৫।২ সুকিয়া ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, লেক্চারার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৩০ তারক চ্যাটার্জ্জি লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ঘোষ এম্ এ, সমঃ—ঐ, সদঃ—মৌলবী মোজাম্মেল হক্ বি এ, ওরিয়ণ্টাল প্রিণ্টার্স কোং লিমিটেড, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্‌সি, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দালাল বি এল্, ১১ উল্টাডাঙ্গা মেন রোড। প্রঃ—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত দুলালচাঁদ দাস, ৩৮।১ নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত রামসত্য মুখোপাধ্যায়, নসিগ্রাম, বর্দ্ধমান; শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায়, সহকারী শিক্ষক, গুপ্তিপাড়া হাই স্কুল। প্রঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, কামদেবপুর, মেটিয়ারী, নদীয়া। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, সমঃ—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সদঃ—শ্রীযুক্ত গোলাপলাল ঘোষ, সম্পাদক—"অমৃত-বাজার-পত্রিকা," ২ আনন্দ চ্যাটার্জ্জি লেন; শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, ১৪২ বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সমঃ—ঐ, শ্রীযুক্ত শশাঙ্কভূষণ সিংহ এম্ এ, বি এল্, ব্যারিষ্টার, বার লাইব্রেরী পাটনা; শ্রীযুক্ত হীরালাল দাশগুপ্ত, "তরুণ" সম্পাদক, বরিশাল। প্রঃ—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬৮।১ শিকদারবাগান ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ২১ বলরাম দে ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গুঁই, ৯।১০।৩১ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সমঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র, নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট।

খ—পরিশিষ্ট

উপহৃত পুথি ও পুস্তক

পুথি

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, উপহৃত পুথি—১। পদার্থদর্শাভিখ্যা। ক্রীত,—২। জাতক-কর্ম্মপদ্ধতি, ৩। তার্কিকসার টীকা, ৪। ভুবনদীপকবৃত্তি, ৫। নিঘণ্টু নামগুণসংগ্রহ, ৬। অভিধানচিন্তামণি—নাম-মালা, ৭। ত্রিশতীবৃত্তি, ৮। গণিত-সার। উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র চৌধুরী। ৯। চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদী, ১০। অক্রূর আগমন, ১১। মহাভারত—কর্ণপর্ব্ব, ১২। চৈতন্য-মঙ্গল—অন্ত্য খণ্ড, ১৩।১৪। মহাভারত—স্বর্গারোহণ পর্ব্ব, ১৫। পাণ্ডব মিলন, ১৬।১৭। মহাভারত—গদাপর্ব্ব, ১৮। মহাভারত—মৌষলপর্ব্ব, ১৯। মহাভারত—আশ্চর্য্য পর্ব্ব, ২০। দুর্ব্বাসার পারণ, ২১। লক্ষ্মাচরিত্র, ২২। শিবরামের যুদ্ধ, ২৩। গুরুদক্ষিণা, ২৪। প্রহ্লাদচরিত্র, ২৫। ভক্তিচিন্তামণি, ২৬।২৭। গোকুলবিলাস, ২৮। বঞ্চিত রায়ের পালা, ২৯। কাপাসের পালা, ৩০। সীতাহরণ, ৩১। পদাবলী, ৩২। তিলি জাতির কুল আর্যা। উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্কনাথ রায়—৩৩। ধর্ম্মমঙ্গল, ৩৪। শীতলামঙ্গল। উপহারদাতা শ্রীযুক্ত নির্ম্মলকৃষ্ণ দেব—৩৫। পঞ্জিকাবিবরণসংগ্রহ। শ্রীযুক্ত চিত্তসুখ সান্যাল,—৩৬। বিদ্যাসুন্দর।

পুস্তক।

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত রামানুজ চক্রবর্ত্তী, উপহৃত পুস্তক—১। দেববাণী, ১ম প্রচার, ২। ঐ, ২য় প্রচার। শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাকৃচী সরস্বতী—৩। দেববীণা, ৪। চিত্রে ভাব-বৈচিত্র্য। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—৫। মাসিক বসুমতী, ১ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১৩২৯। শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা—৬। শিবপুর কলেজ পত্রিকা ১৩১৩।১৫, ৭ সংখ্যা। মৌলবী মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্—৭। পারস্য-প্রতিভা। শ্রীযুক্ত রাজকুমার চক্রবর্ত্তী—৮। সন্দীপের ইতিহাস। শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণতীর্থ—৯। ব্যথার সুখ। ১০। ঘরে পরে। ১১। ভুল। শ্রীযুক্ত বিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী—১২। আসাম-প্রসঙ্গ। শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বসাক—১৩। সারথি ১ম বর্ষ সম্পূর্ণ ও ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা। ১৪। ইতিহাস ও আলোচনা, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১০ম সংখ্যা। ১৫। বালক ১ম ও ৫ম বর্ষ। ১৬। ঐতিহাসিক চিত্র, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন দত্ত—১৭। গন্ধবণিক্ মাসিক পত্রিকা ৩য় ভাগ, ১৩২৯। ১৮। গন্ধবণিক্ মহাসম্মিলনীর অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ, ১৩৩০। ১৯। ঐ সভাপতির অভিভাষণ, ১৩৩০। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী—২০। দয়ানন্দের স্বরচিত জীবনবৃত্ত। ২১। দয়ানন্দের জন্মস্থানাদি নির্ণয়। ২২। আদর্শ সংস্কারক দয়ানন্দ। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—২৩। কৈকেয়ী। ২৪। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের বিবৃতি। শ্রীযুক্ত রাধারমণ সাহা—২৫।২৬। পাবনা জেলার ইতিহাস ১ম ও ২য় খণ্ড। শ্রীযুক্ত স্বামী নিগমানন্দ পরমহংস—২৭। ব্রহ্মচর্য্য সাধন, ২৮। যোগীগুরু, ২৯। জ্ঞানী গুরু, ৩০। তান্ত্রিক গুরু, ৩১। প্রেমিকগুরু,

৩২। মায়ের কৃপা, ৩৩।৩৪ তত্ত্বমালা ১ম ভাগ, ও ২য় ভাগ, ৩৫। সাধকাষ্টক, ৩৬। বেদান্ত-বিবেক, ৩৭। উপদেশরত্নমালা। শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ দাস—৩৮।৩৯। কঙ্ক। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—৪০। শ্রীচৈতন্য, ৪১। মশার যুদ্ধ। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—৪২। ভারতে বলিপ্রথা, ৪৩। সাধনা। শ্রীযুক্ত প্রসাদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—৪৪। মাধবাচার্য্য। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র—৪৫।৪৬। স্বরদ-শিক্ষা ১ম ভাগ, ২য় ভাগ। শ্রীযুক্ত শৈলেশ্বর সান্যাল—৪৭। সরল গঠনতত্ত্ব। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর—৪৮। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতি। শ্রীযুক্ত রায় যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর—৪৯। আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ, ১ম ভাগ। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ—৫০। আলোচনা-চতুষ্টয়। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার—৫১।৫২।৫৩। শিল্পী হেমেন্দ্রনাথ ১ম ভাগ, ২য় ভাগ, ৩য় ভাগ। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর—৫৪। সাকার ও নিরাকার তত্ত্ববিচার, ৫৫। অনুপমা, ৫৬। তোড়া, ৫৭। সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—৫৮। শনির পাঁচালী। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায় তত্ত্বনিধি—৫৯। শাস্ত্রতত্ত্ব—ঋগ্বেদসংহিতা, ১ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৫ম—৬ষ্ঠ সংখ্যা। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র সুর—৬০। বিদ্যাপতি। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী—৬১। কান্তনামা বা রাজধর্ম্ম। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—৬২।৬৩। সঙ্গীত-সোপান। শ্রীযুক্ত ব্রাহ্মণরক্ষা-সভার সম্পাদক—৬৪। সমাজ-সংস্করণ। শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ দাস —৬৫। গীতি-পুষ্পাঞ্জলি।

উপহারদাতা—The Registrar, Calcutta University, উপহৃত পুস্তক—1. Journal of the Department of Letters, Vol. XI. 1924. The Superintendent, Naval Observatory, Washington D. C.—2. Total Eclipse of the Sun, January, 24, 1925. The Superintendent, Govt. Printing, India—3. Review of Agricultural Operations in India, 1922,24. The Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depot.—4. Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the year 1922-23. The Superintendent, Government Printing, India—5. Progress of Education in India 1917-1922 (Eighth Quinquennial Review) Vol. I. 6. Epigraphia Indica. Vol. XVII, Part VI. (April 24). 7. Review of the Trade of India in 1922-23. 8. Statistical Tables relating to Banks in India, 1922. শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—9. The Kingdom of God is Within you, 10. My Religion, 11. The Tribes on my Frontier, 12. Personality. 13. Glimpses of Bengal, 14. The Eternal Wisdom, 15. Tolstoy, his Life and Writings, 16. Devi Gita, 17. Aggressive Hinduism, 18. Ruskin's Treasuries. The Superintendent, Govt Printing, India—19. Progress of Education in Bengal, 1917-1922 (6th Quinquennial Review). The Surveyor General of India—20. General Report of the Survey of India during 1922-23. শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—21. My Strangest Case. 22. My Master as I saw Him, 23. Haridasi, 24. Hindu Science

of Marriage, 25. Ancient Babylonia. The Officer-in-charge, Bengal Secretariat—26. Report on Administration of Bengal 1922-23. 27. Reports on Survey and Settlement Operations in Bengal for the years 1922-23. The Secretary, Smithsonian Institution—28. Smithsonian Mathematical Formulæ and Tables of Elliptic Functions. 29. Mandan and Hidatsa Music. 30. Excavations in the Chama Valley, New Mexico. The Royal Siamese Consulate General—31. Samantapasadika (Commentary on the Vinayapitaka) Vol. 1. 32. Do. Vol. II. 33. Paramatthajjotika (Commentary on Khuddakapatha of Khuddakanikya) Vol. I. 34-35. Paramatthadipani (Commentaries on the Udanavagga Itivattaka of the Khuddakanikya) Vol. I. 36. Saddhammappajjotika (Commentary on the Maha and Cullanides of the Khuddakanikya) Vol. I. 37. Do. Vol. II. 38. Saddhammapakasini (Commentary on the Patisam Chidamagga of the Khuddakanikya) Vol. I. 39. At-thasalini (Commentary on the Dhammasangini) Vol. 1. 40. Sammohavinodini (Commentary on the Vibhanga of the Abhiddhammapitaka) Vol. I. 41. Paramat-thadipani (Commentary on the Pancappakarana of the Abhiddammapitaka) Vol. I. 42. Visuddhimagga, Vol. I. 43. Do. Vol. II. 44. Do. Vol. III. 45. Abhidhammattha Sangaha and Abhedhammattha Vibhasini in one Vol. The Secretary, Indian Association for the Cultivation of Science.—46. Proceedings of the Indian Association for the Cultivation of Science, Vol. VIII. Part III. 47. Do. Part IV. The Director, Museum of Fine Arts—48. Forty Eighth Annual Report of the Museum of Fine Arts, Boston, for the year 1923. The Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depot—49. Bengal Legislative Council Proceedings, Vol. XIV. No. 2. 50. Do. No. 3. 51. Do. No. 4. 52. No. 5. 53. Twelfth Triennial Report on Vaccination in Bengal for the years 1920-21, 1921-22 & 1922-23. 54. Bengal Public Health Report, Bengal Sanitary Board Report and the Report of the Chief Engineer, Bengal Health Department for the year 1922. The Director, Geological Survey of India—55. Records of the Geological Survey of India. Vol. LVI. Part I. 1924. The General Manager, Calcutta Exhibition.—56. Official Hand-Book and Guide of the Calcutta Exhibition, December 1923. রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর—57. The Scientific and Other Papers. Vol. I. The Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depot—58. Annual Report of the Department of Fisheries in Bengal for the year ending 31st March 1923. শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—59. Minutes of Evidence of Mr. Jatindra Nath Bose before the Royal Commission on the Public Services. The Superintendent, Government Printing, India—60. Annuul Report of the Board of Scientific Advice for India, for the year 1922-23. The Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depot.—61. Report on the Working of the Co-operative Societies in Bengal 19-22-31. The Superintendent, Government Printing, Allahabad, U. P.—62. The Third Triennial Report on the Search for Hindi Manuscripts for the years 1912, 1913 & 1914. The Director, Geological Survey of India.—63. Records of the Geological Survey of India, Vol. LV. Part 2 1923.

পঞ্চম বিশেষ অধিবেশন

১৫ই ভাদ্র ১৩৩১, ৩১এ আগষ্ট ১৯২৪, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্, এটর্ণি—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—

১। পরিষদের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থার অবনতি।

২। কার্য্যালয়ের বিশৃঙ্খলা।

৩। পুস্তকাগারের বর্ত্তমান অবস্থা।

৪। পরিষদের গ্রন্থ এবং পত্রিকা প্রকাশের বর্ত্তমান অবস্থা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ-প্রমুখ একুশ জন সদস্যের স্বাক্ষরিত গত ২৪এ আষাঢ় ১৩৩১ তারিখের পত্র পাঠ করিলেন এবং এই পত্রে উল্লিখিত বিষয়গুলির আলোচনার জন্য উক্ত পত্রস্বাক্ষরকারিগণকে এবং প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবুকে আহ্বান করিলেন। তিনি বলিলেন যে, স্বাক্ষরকারী মহোদয়েরা পরিষদের উন্নতির জন্যই আলোচনার সুযোগ চাহিয়াছেন। কারণ, পরিষদের কার্য্যপরিচালনে যদি কোন বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে, তাহার সংশোধন কল্পে সদস্যগণের মতামত বিশেষ উপকারী।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলিলেন যে, পরিষদের অনিষ্ট করিবার কাহারও ইচ্ছা নাই—কোন বাঙ্গালীরই সে অভিপ্রায় থাকিতে পারে না। পরিষদের কার্য্যে যে সকল ত্রুটি ও বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে, তাঁহারা তাহারই সংশোধন ইচ্ছা করেন।

এই সময় শ্রীযুক্ত সুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, তিনি অদ্যকার অধিবেশনের পত্র পান নাই। শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবু বলিলেন যে, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ এবং তিনি নিজেও আজকার অধিবেশনের পত্র পান নাই। যদিও সম্পাদক মহাশয় তাঁহাকে স্বতন্ত্র পত্র লিখিয়া অদ্যকার অধিবেশনের সংবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় জানাইলেন যে, তিনিও পত্র পান নাই।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবু প্রস্তাব করিলেন যে, যখন কয়েক জন সদস্য পত্র পান নাই, তখন অন্য কোন আলোচনা না হইয়া একটি ছোট সমিতি গঠন করা হউক এবং তাঁহাদিগকে ২ মাস সময় দিয়া তাঁহাদের মন্তব্য জানাইতে অনুরোধ করা হউক। পরে এক বিশেষ অধিবেশনে সেই মন্তব্য আলোচনার জন্য উপস্থিত করা হউক।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, এই বিশেষ অধিবেশনে বিজ্ঞাপিত বিষয় ব্যতিরেকে কোন নূতন প্রস্তাব উপস্থিত হইতে পারে না। যদি কোন নূতন প্রস্তাব থাকে, তবে তাহা পরিষদের নিয়মানুসারে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে অগ্রে উপস্থিত করিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত রাখাল বাবুর প্রশ্নের উত্তরে সভাপতি মহাশয় বিশেষ অধিবেশন আহ্বান সম্বন্ধে ৫৩ (খ) এবং কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অধিকার সংক্রান্ত ৪২ (ক) সংখ্যক নিয়ম পাঠ ও ব্যাখ্যা করিলেন এবং রুলিং (Ruling) দিলেন যে, শাখা-সমিতি গঠন সম্পর্কে জ্যোতিষ বাবুর নূতন প্রস্তাব আজ আসিতে পারে না, অতএব বিজ্ঞাপিত আলোচ্য বিষয়গুলির আলোচনা হউক।

রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস্ মহাশয় বলিলেন যে, উক্ত বিষয়গুলির সম্যক্ আলোচনার পূর্ব্বে শাখা-সমিতি গঠনের কথাই উঠিতে পারে না। কারণ, যেমন কয়েকজন পরিষদের কার্য্যের দোষ ধরিতেছেন, তেমনি আরও জন কয়েক এমন আছেন, যাঁহারা সে দোষ স্বীকার করিতে প্রস্তুত নন; অতএব পূর্ব্বে আলোচনার দ্বারা দোষগুলি প্রমাণিত হওয়া প্রয়োজন, পরে শাখা-সমিতি গঠনের প্রস্তাব উঠিতে পারে।

শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, অদ্যকার অধিবেশনের পত্র যখন কয়েক জন সদস্য পান নাই, তখন অদ্যকার অধিবেশন স্থগিত রাখা হউক। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর বলিলেন যে, অদ্য অধিবেশন স্থগিত রাখা সমীচীন নহে। ২।৪ জন সদস্য ডাকঘরের গোলযোগে পত্র পাইতে না পারেন। পত্র পাঠাইবার সময় রীতিমত পরীক্ষা করা হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত রাজকুমার চক্রবর্ত্তী এম্ এ মহাশয় বলিলেন যে, অনেকে দূর হইতে হয়ত অনেক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও পরিষদের দোষ নিরাকরণের উপায় নির্দ্ধারণ করিবার আশায় আসিয়াছেন। অতএব অধিবেশনের কার্য্য স্থগিত থাকা কিছুতেই উচিত নয়।

সভাপতি মহাশয় অধিবেশন স্থগিত রাখার প্রস্তাবে ভোট লইলেন। প্রস্তাবের পক্ষে ৯ জন ও বিপক্ষে ২১ জন ভোট দেওয়ায় প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইল।

শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন যে, স্বাক্ষরকারীদের অপর কেহ এইবার তাঁহার বক্তব্য বলুন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবুর বক্তব্য এখনও শেষ হয় নাই। তাঁহার বক্তব্য শেষ হইলে অপর কেহ বলিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবু বলিলেন যে, পরিষদের সদস্য-সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে। অনেক সদস্য তাঁহাকে বলিয়াছেন যে, পরিষদে কাজ করিবার কোন স্কোপ্ (Scope) বা ক্ষেত্র তাঁহারা পান না, সেখানে একটা দল আছে—সে দল তাঁহাদিগকে কাজ করিতে দেন না। এই অভিযোগ সম্বন্ধে বিচার করা উচিত। এতদ্ব্যতীত অনেকে কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচনের জন্য নাম পাঠাইতে পারেন না—কেন না, বর্ত্তমান কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি তাঁহাদিগকে নির্ব্বাচন করেন না। প্রস্তাবিত কর্ম্মাধ্যক্ষকে লিখিত সম্মতি দিবার নিয়ম থাকায় তাঁহারা নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন কি না, এই আশঙ্কায় লিখিত সম্মতি দিতে চাহেন না। ইহাতে পরিষদের

অনিষ্ট হয়। অনেকে বলেন যে, পত্র লিখিলে তাঁহারা সময়মত উত্তর পান না এবং কখন কখনও শাখা-সমিতিগুলির অধিবেশনের আহ্বান-পত্র অধিবেশনের দিনই সভ্যগণ পাইয়া থাকেন। গত বৎসর অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু মহাশয় সহকারী সম্পাদকত্ব ত্যাগ করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষপদে থাকা তাঁহার সম্মানের হানিকর। এ কথা তিনি কি জন্য লিখিয়াছিলেন, তাহার অনুসন্ধান করা উচিত। গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই মহাশয় তাঁহার পদত্যাগ-পত্রে পরিষদের পুস্তকাগারের অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা লিখিয়াছিলেন এবং সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়কে বৎসরের মধ্যে কোন কাজই দেওয়া হয় নাই। এ সকল বিষয়ের অনুসন্ধান হওয়া দরকার। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য কর্ম্মাধ্যক্ষগণ পরস্পর একযোগে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে পারেন নাই। প্রতিশ্রুত এককালীন দান কর্ম্মাধ্যক্ষগণের অবহেলায় আদায় হয় না। যথা, হাওড়ার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঘোষের নিকট তাঁহার প্রতিশ্রুত টাকা আদায় করার চেষ্টা হয় নাই। এ সকল যাহাতে না হয়, তাহা করা উচিত। আরও শুনা যায় যে, পরিষদের দৈনিক আদায়ের টাকা কোষাধ্যক্ষের নিকট যায় না। সমস্ত টাকা পাঠাইয়া দরকার-মত সেখান হইতে টাকা আনাইয়া ব্যয় করা উচিত। পুস্তকালয়ের দুষ্প্রাপ্য পুস্তক পরিষদের বাহিরে যাইবে না, এইরূপ নিয়ম আছে অথচ অন্য লোকে লইয়া যায়। ৺জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী এবং ৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রদত্ত পুস্তকগুলি রাখিবার রীতিমত ব্যবস্থা হয় নাই কেন?

পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত চুণীবাবুর সভাপতিত্বে বার্ষিক অধিবেশনে তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে জানান হয় যে, পর বৎসরেই "রমেশ-ভবন" সম্পূর্ণ হইবে। এখনও তাহা হয় নাই। শুনিয়াছিলাম যে, শ্রীযুক্ত জে, সি, মুখার্জ্জি মহাশয় টাকা দিতেছেন না বলিয়া কাজ বন্ধ আছে। তাঁহার সহিত শ্রীযুক্ত মুখার্জ্জি মহাশয়ের দেখা হয়, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, এ গুজব মিথ্যা। সত্বরে "রমেশ-ভবন" সম্পূর্ণ হওয়া উচিত।

এই সকল কথা জানাইয়া শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবু বলিলেন যে, তাঁহার নিজের মনে যে সকল কথা উঠিয়াছে এবং যে সকল কথা অপরের মুখে শুনিয়াছেন, তিনি তাহাই বলিলেন। এক্ষণে এই সকল অভিযোগের প্রতীকার করিয়া যাহাতে পরিষদের ভবিষ্যৎ উন্নতি সাধিত হয়, তজ্জন্য সদস্যগণের সমবেতভাবে চেষ্টিত হইতে হইবে।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, তিনি নিজে শ্রীযুক্ত জে, সি, মুখার্জ্জি মহাশয়কে টাকার জন্য তাগাদা করিয়াছিলেন। "রমেশ-ভবনের" সংগৃহীত টাকা তাঁহার নিকট ছিল। অধিকাংশ টাকাই তিনি প্রয়োজনমত দিয়াছিলেন। অবশিষ্ট যাহা তাঁহার কাছে ছিল, তাহাও বোধ হয়, ১৬।১৭ দিন হইল তিনি দিয়া দিয়াছেন এবং তাহা হইতে কণ্ট্রাক্টারকে তাঁহার প্রাপ্য দেওয়ায় "রমেশ-ভবনের" কার্য্য প্রায় শেষ হইতে চলিয়াছে। "রমেশ-ভবনের" পৃথক্ কমিটি আছে। "রমেশ-ভবন" নির্ম্মাণ ব্যাপারে পরিষদের কোন সংস্রব নাই।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর কোষাধ্যক্ষের নিকট পরিষদের আদায়ী টাকা প্রেরণের

খাতা দেখাইয়া বলিলেন যে,গত কল্য ১৪ই তারিখ পর্য্যন্ত সমস্ত টাকা কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট চালান দেওয়া হইয়াছে, এবং ব্যয়ের জন্য যে ভাবে requisition বই লেখা হয় ও কোষাধ্যক্ষের নিকট হইতে টাকা আনা হয়, তাহাও দেখাইলেন এবং বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবু খাতাপত্র দেখিলে এ বিষয়ে কোন প্রশ্নই করিতে পারিতেন না।

শ্রীযুক্ত সুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, গত বর্ষের আয়-ব্যয়-তালিকায় দেখা গিয়াছে যে, আয়ের অনুপাতে ব্যয় করা হয় নাই। যে আয় হইয়াছে, তাহার অনুপাতে কর্ম্মচারীদের বেতন বেশী দেওয়া হইয়াছে। এ ভাবে ব্যয় না বাড়াইয়া পত্রিকা এবং গ্রন্থাবলী মুদ্রণের জন্য বজেটে বেশী টাকা ধরা উচিত। স্থায়ী-তহবিল হইতে যে টাকা লওয়া হইয়াছে, তাহা পূরণ করিবার সমুচিত ব্যবস্থা করা উচিত।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, স্থায়ী-তহবিল হইতে ধার এক বৎসরেই সমস্ত লওয়া হয় নাই। স্বর্গীয় রামেন্দ্র বাবুর সময় ৪০০০৲ টাকা লওয়া হইয়াছিল। সে ১০।১২ বৎসর আগেকার কথা। ১৩৩০ বঙ্গাব্দে এক পয়সাও ধার লওয়া হয় নাই। ১৩২৯ বঙ্গাব্দে ৭০০৲ টাকা মাত্র লওয়া হয়। বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল বলিয়াই টাকা ধার করিতে হইয়াছিল। সে সময় শ্রীযুক্ত রাখাল বাবু প্রভৃতিও পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন। যাহা হউক, এই যে ৭ হাজার টাকা স্থায়ী-তহবিল হইতে লওয়া হইয়াছে, তাহা শোধ করিতেই হইবে। এই বলিয়া সকল সদস্যকে তিনি এ বিষয়ে সাহায্য করিতে এবং বাকী অনাদায়ী টাকা যাহাতে আদায় হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিলেন এবং বলিলেন, "বিশেষ টাকা আদায় করিয়া বিশেষ ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে হইবে। সকলেই চেষ্টা করিলে এ কাজ সহজসাধ্য হয়। এই দেনার জন্য বাজারে পরিষদের কলঙ্ক রটিয়াছে, ইহার জন্য আমরা সকলেই দায়ী। সকলেই নিজ নিজ বন্ধুবর্গকে পরিষদের পক্ষে অনুরোধ করুন। প্রত্যেক সদস্য ৩৲ টাকা করিয়া সাহায্য করিলে এই দেনা সহজেই শোধ হইতে পারে।"

সভাপতি মহাশয় আরও বলিলেন যে, গ্রন্থাবলী মুদ্রণে ১৩২১ হইতে ১৩৩০ পর্য্যন্ত মোট ৩১২০০৲ টাকা ব্যয় করিবার কথা, তাহার স্থলে পরিষৎ ৩১৪৩৩৲ টাকা ব্যয় করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রাখাল বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ কোন্ বৎসর ৩৬০০৲ টাকা হিসাবে ব্যয় হইয়াছে?

সভাপতি মহাশয়, উত্তরে জানাইলেন যে, এ কয় বৎসরের মধ্যে তিন বৎসর—শ্রীযুক্ত স্যর জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বের সময় গভর্মেণ্টের নিকট হইতে ১২০০৲ টাকা গ্রন্থাগারের আসবাব প্রভৃতি খরিদের জন্য ব্যয় করিবার অনুমতি পাওয়া গিয়াছিল। ১৩২১ সালে ৩৩৩৫৴৬, ১৩২২ সালে ৩০৩০৸৴৯, ১৩২৩ সালে ৫৩৯৪৴৯, ১৩২৪ সালে ৩৯৮৯৻৯, ১৩২৫ সালে ২৫৮৪৸৯, ১৩২৬ সালে ২৪০১।৶৬, ১৩২৭ সালে ১৯৩৯॥৯, ১৩২৮ সালে ২৭৪৩॥৶, ১৩২৯ সালে ২৩৫৮৶৯ এবং ১৩৩০ সালে ১৯১২৸৴৬ গ্রন্থ প্রকাশে ব্যয় হয়। অতএব মোটের উপর পরিষৎকে দোষ দেওয়া যায় না।

শ্রীযুক্ত রাখাল বাবু ৺ত্রিবেদী মহাশয়ের সময়ে তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া কি ভাবে মাননীয় লায়ন সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার পর গবর্মেণ্টের নিকট হইতে টাকা পাওয়া যায়, তাহার বিবরণ দিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, গবর্মেণ্টের সর্ত্ত অনুসারে প্রতি বৎসর ছত্রিশ শ' টাকা এক্ষণে ব্যয় করা হয় না কেন ?

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, প্রতি বৎসর ছত্রিশ শ' টাকা ব্যয় না হইলেও মোটের উপর এ কয় বৎসর নির্দ্ধারিত টাকা ব্যয় হইয়াছে। কোন বছর কম, আবার কোন বছর বেশী ব্যয় হইয়াছে। ১৩২৭ সালের পর গবর্মেণ্টের নির্দ্ধারিত মেয়াদের পর কেন ৩৬ শ' টাকা ব্যয় হয় নাই, তাহা এক্ষণে বলা কঠিন। তবে ভবিষ্যতে যাহাতে প্রতি বৎসর ৩৬ শ' টাকা ব্যয় হয়, তাহার জন্য বর্ত্তমান কর্ম্মাধ্যক্ষগণ দায়ী। ঐ টাকা ব্যয় করিতেই হইবে।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবু বলিলেন যে, ১৩৩০ সালে ৩৬শ' টাকা ব্যয় হয় নাই, উপরন্তু ১৭০০৲ টাকা দেনা রহিয়াছে।

শ্রীযুক্ত সুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, এই দেনা শোধের ও আগামী বৎসর ৩৬০০৲ টাকা ব্যয়ের কি ব্যবস্থা হইবে, জানিতে চাহিলেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, গ্রন্থ মুদ্রণে বর্ত্তমান বর্ষে ৩৬০০৲ টাকা ব্যয় করিতে হইবে, এইরূপ কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি স্থির করিয়াছেন। গত বর্ষের গ্রন্থ প্রকাশের দেনা ১৭০০৲ টাকাও শোধ দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তৎপরে তিনি বলিলেন, "আমার আরজি পুনরায় আপনাদের নিকট পেশ করিতেছি। পরিষদের লাইব্রেরীর বহু অভাব মোচনের বিষয় আপনারা ভুলিয়া যাইবেন না। শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবু গত বার্ষিক অধিবেশনে জানাইয়াছেন যে, তিনি পুস্তকাধার প্রস্তুত করিবার জন্য ১০০৲ দান করিবেন। পরিষদের প্রথম সভাপতি রমেশ বাবুর স্মৃতি-মন্দির নির্ম্মাণের জন্য, লাইব্রেরীর জন্য এবং পরিষদের স্থায়ী-তহবিলের দেনা পরিশোধের জন্য আপনারা অগ্রসর হউন। দেনা শোধ না হইলে পরিষৎ দৃঢ়-ভিত্তির উপর দাঁড়াইতে পারিবে না।"

শ্রীযুক্ত রাখাল বাবু বলিলেন যে, ৺সারদা বাবুর সময় একবার প্রত্যেক সদস্যকে ৬৲ হিসাবে দান করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল। তাহাতে বোধ হয় ৫০০৲।৬০০৲ টাকা উঠিয়াছিল। সদস্যসংখ্যা না বাড়াইলে আয় বৃদ্ধি হইবে না। দেশে বিদেশে লোক পাঠাইয়া সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। সভাপতি এবং সম্পাদক মহাশয় এ কাজের ভার লইলে সহজসাধ্য হয়। ইহাই আয়-বৃদ্ধির প্রধান উপায়।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, "শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবু সদস্যসংখ্যা হ্রাস হওয়ার কথা বলিয়াছেন। সদস্যগণের চাঁদা বাকি পড়ার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি বহু সদস্যের নাম তালিকা হইতে বাদ দিতে বাধ্য হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাখাল বাবু, সভাপতি ও সম্পাদকের উপর সদস্য সংগ্রহের ভার দিতে চাহেন। কিন্তু আমাদের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলকেই আমরা পরিষদের সদস্য করিয়াছি—আমাদের তালিকা প্রায় নিঃশেষ হইয়াছে। নূতন সদস্য

সংগ্রহের বাধাও অল্প নহে। মাঝে মাঝে সংবাদ পত্রে পরিষদের অযথা কলঙ্কের কথা প্রকাশিত হওয়ায় অনেকে সদস্য হইতে চাহেন না। পরিষৎ কোন দলবিশেষের নহে। সকলের চেষ্টায় ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—আবার সকলেই ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিবেন। ৺রামেন্দ্র বাবু পরিষদের জন্য প্রাণপাত করিয়াছেন—সেরূপ কর্মী আমরা কোথা পাইব? আমরা সকলে ত আর রামেন্দ্র বাবু নহি। তবে আমরা সংহত এবং সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করিলে রামেন্দ্র বাবুর অভাব কতক পরিমাণে পূরণ করিতে পারি। সংবাদ-পত্রে যথেষ্ট অনিষ্ট করিয়াছে। যদি সংবাদপত্র পরিচালকগণ পরিষদের উদ্দেশ্য বুঝিয়া সংযতভাবে পরিষদের সমালোচনা করেন, তবে পরিষদের কল্যাণ হয়। কর্ম্মাধ্যক্ষগণ সকলে অবৈতনিক। তাঁহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য অন্য কর্ম্ম করিতে হয়। শ্রীযুক্ত রাখাল বাবু ইচ্ছা করিলেই অনেক নূতন সদস্য সংগ্রহ করিয়া দিতে পারেন। শুধু সদস্য সংগ্রহ করিলে চলিবে না—ইহার স্থায়িত্বের জন্য অর্থসংগ্রহও করা চাই। বড়ই দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, দেশের প্রতিষ্ঠানগুলির উপর দেশের লোকের কর্ত্তব্যবুদ্ধি এখনও সম্যক্ জাগরিত হয় নাই। আমাদের জাতিগত এই স্বভাব হঠাৎ পরিবর্ত্তিত হইবে না। পরিষদের এমন একশত সদস্য এখনও নিশ্চয় আছেন, যাঁরা ইচ্ছা করিলেই এক বৎসরেই ৭ হাজার টাকা দেনা শোধ করিয়া স্থায়ী তহবিলের জন্য কিছু জমাইয়া দিতে পারেন। আমাদের সম্পাদক মহাশয় ও আরও কেহ কেহ ইতি-মধ্যেই অর্থ সংগ্রহের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সম্পাদক মহাশয় ইতি-মধ্যেই ৩০০৲ টাকার প্রতিশ্রুতি পাইয়াছেন। আমি নিজে দেনা শোধের জন্য ৫০০৲ টাকা দিতে প্রতিশ্রুতি দিতেছি। খুব সম্ভব পরিষদের আর এক হিতাকাঙ্ক্ষীর নিকট হইতে আমরা ৫০০৲ পাইতে পারিব।

"আপনাদিগকে আমার অনুরোধ, আপনারা পূর্ব্বের কথা ভুলিয়া যান। পূর্ব্বের দলাদলি ও বিরোধের কথা ভুলিয়া যান। আমি স্বীকার করিতেছি যে, আমিও ঝগড়া করিয়াছি—সে ঝগড়া পরিষদের হিত ভাবিয়াই করিয়াছি। আসুন, সকলে মিলিয়া কাজে অগ্রসর হই। পরিষদের কর্ম্মক্ষেত্রের প্রসার বৃদ্ধি করুন—আমাদের এখানে ক্ষেত্র প্রস্তুত আছে—ক্ষেত্রী নাই। শ্রীযুক্ত রাখাল বাবু পুনাতে মহারাষ্ট্রীয়দের মধ্যে তাঁহার অনেক শক্তির অপব্যয় করিয়াছেন। আমি চাই, শ্রীযুক্ত রাখাল বাবু পরিষদের ইতিহাস-শাখাকে সজীব করুন। পরিষদের উপর রাগ বা অভিমান করিয়া ইহাকে ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। কর্ম্মীরা আসুন, কাজ করুন, বঙ্গের এই প্রধানতম প্রতিষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করুন, বাঙ্গালী জাতির মুখ উজ্জ্বল করুন।"

শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবু সভাপতি মহাশয়ের এই আশার বাণীর জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলেন এবং প্রস্তাব করিলেন যে, সংবাদ-পত্রে সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে একটি বিজ্ঞপ্তি পাঠান হউক।

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবুকে ঐরূপ বিজ্ঞপ্তির একটি খসড়া প্রস্তুত করিতে

অনুরোধ করিলেন এবং বলিলেন যে, ঐ খসড়া কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে উপস্থিত করিয়া তার পর সংবাদ-পত্রে দেওয়া হইবে।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর বলিলেন যে, জ্যোতিষ বাবু কর্ম্মীর কথা বলিয়াছেন। যাঁহারা প্রকৃত কর্ম্মী, তাঁহাদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে আসিবার যে কোন বাধা বিপত্তি আছে, তাহা তিনি অবগত নহেন।

শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত এম্ এ, মহাশয় বলিলেন যে, কর্ম্মাধ্যক্ষগণ সকলেই অবৈতনিক, তাঁহারা সকলেই যথাশক্তি পরিশ্রম করেন। তাঁহাদের নির্ব্বাচন কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচনের মত নিয়মানুসারে হইলে, বোধ হয় উপযুক্ত কর্ম্মাধ্যক্ষ পাওয়া যাইবে। তখন আর অভিযোগের কারণ থাকিবে না। গণতন্ত্রমূলক নির্ব্বাচন হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। তিনি এই সকল নিয়ম পরিবর্ত্তনের এক প্রস্তাব দিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে কি হইল, তাহা তিনি এখনও জানিতে পারেন নাই। কার্য্যালয়ের বিশৃঙ্খলা সম্বন্ধে তিনি বলিলেন যে, যে পত্রদ্বারা কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যপদপ্রার্থী হইবার জন্য সদস্যগণকে আহ্বান করা হয়, সে পত্র এবং গত বার্ষিক অধিবেশনের পত্র তিনি পান নাই। আজিকার অধিবেশনের পত্রেও ঠিকানা ভুল ছিল। সংবাদ-পত্রে এ অধিবেশনের সংবাদ দেওয়া উচিত ছিল, তাহা কেন হয় নাই, তাহা তিনি জানিতে চাহিলেন।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর বলিলেন যে, আজিকার এ বিশেষ অধিবেশন সাধারণের জন্য নয় বলিয়া সংবাদ-পত্রে নোটিশ দেওয়া হয় নাই।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের ইতিহাসে এইরূপ অধিবেশন এই প্রথম। এইজন্য সংবাদ-পত্রে ইহার বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় নাই।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত মহাশয় বলিলেন যে, এ শ্রেণীর অধিবেশনের সংবাদ সংবাদপত্রে দেওয়ার প্রথা আছে। কেবলমাত্র সদস্যগণকে আসিতে অনুরোধ করিলেই চলিত। যাঁহারা পত্র পান নাই, তাঁহারাও সংবাদ-পত্রে এই অধিবেশনের সংবাদ পাইলে হয় ত আসিতে পারিতেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, গণতন্ত্রের বিষয়ে শ্রীযুক্ত অনাথ বাবুর বেশ পক্ষপাত দেখা গেল। গণতন্ত্রের গণ ও জন সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা ভিন্নরূপ। কিন্তু সে বিষয়ের আলোচনা আজ না হওয়াই ভাল। পরিষদের নিয়মানুসারে ১লা চৈত্রের পূর্ব্বে পত্রদ্বারা কর্ম্মাধ্যক্ষের নাম প্রস্তাব করিয়া পাঠাইতে হয় এবং সেই সঙ্গে প্রস্তাবিত কর্ম্মাধ্যক্ষের লিখিত সম্মতিও জানাইতে হয়। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেন—ভালই, না করেন, তাহা প্রস্তাবককে জানান হয়, তিনি বার্ষিক অধিবেশনে ইচ্ছামত সেই প্রস্তাব আবার উপস্থিত করিতে পারেন। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যনির্ব্বাচনের সময় সকল সদস্যকেই সংবাদ দেওয়া হয় ও প্রস্তাবিত সভ্যদিগের বিষয়ে পত্রদ্বারা ভোট লওয়া হয়। এ ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের মর্য্যাদা কোথায় ক্ষুণ্ণ হয়, তাহা বোধগম্য হইতেছে না। কর্ম্মাধ্যক্ষ-পদে নির্ব্বাচিত হইবার

জন্য লিখিত সম্মতি পাওয়া দুষ্কর হইলে ও শ্রীযুক্ত অনাথ বাবুর মতে অসঙ্গত হইলে ঐ নিয়ম পরিবর্তন করিবার প্রস্তাব তিনি দিতে পারেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, হাওড়ায় শ্রীযুক্ত মতিলাল প্রেমোহন ঘোষ মহাশয়কে তাঁহার প্রতিশ্রুত টাকার জন্য রীতিমত তাগাদা করা হইয়াছে। তাঁহার পারিবারিক দুর্ঘটনা ও কন্যার বিবাহ থাকায় তিনি এ পর্য্যন্ত টাকা দিতে পারেন নাই। সত্বরেই দিবেন, এইরূপ জানাইয়াছেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, পরিষদের নিয়মানুসারে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অনুমতি মতে সদস্যগণ গ্রন্থাগার হইতে দুষ্প্রাপ্য পুস্তক বাড়ী লইয়া যাইতে পারেন।

শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অনুমতি ব্যতীত যদি কোন সদস্য দুষ্প্রাপ্য বই বাহিরে লইয়া গিয়া থাকেন, তৎসম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইবে? সভাপতি মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন যে, যদি শ্রীযুক্ত হিরণ বাবুর জানা থাকে, তবে তিনি সেই সদস্যের নাম জানাইতে পারেন।

শ্রীযুক্ত হিরণ বাবু জানাইলেন যে, বর্ত্তমান সম্পাদক মহাশয় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির বিনা অনুমতিতে দুষ্প্রাপ্য বই, যথা—হালহেডের গ্রামার লইয়াছিলেন।

সভাপতি মহাশয় প্রকৃত অবস্থা জানাইবার জন্য অনুরোধ করিলে সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে, পরিষদে Bureau of Information বা অনুসন্ধান-সমিতি করা হইয়াছে। সময় সময় বহু অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির পত্রের উত্তরে তাঁহাকে অনেক সাহিত্যিক সংবাদ অনুসন্ধান করিয়া জানাইতে হয়। এই জন্য অনেক সময় তাঁহার ঐ শ্রেণীর পুস্তক গ্রন্থাগার হইতে লইতে হয়। বই লইয়া তিনি পরিষদের চিত্রশালার ঘরে বসিয়া কাজ করিতেন এবং সেখানেই বই রাখিতেন, বাড়ী লইয়া যান নাই।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, সম্পাদক মহাশয় দুষ্প্রাপ্য পুস্তক লইয়া কাজ করেন এবং পরিষদে বসিয়াই কাজ করেন। তিনি ঐরূপ পুস্তক বাহিরে লইয়া যান নাই। অতএব সম্পাদক মহাশয়ের এ বিষয়ে কোনই ত্রুটি হয় নাই।

তৎপরে অন্যান্য বিষয়ের আলোচনার পর তিনি বলিলেন, অদ্য বহু বিষয়ের আলোচনা হইল। যদি কাহারও কিছু আরও বক্তব্য থাকে, তবে তিনি কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির গোচরে আনিলে তাহার যথাযোগ্য আলোচনা হইবে। এই বলিয়া তিনি অদ্যকার আলোচ্য বিষয়ের প্রস্তাবকগণকে ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত চুণী বাবু সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীঅভয়কুমার গুহ
সহকারী সম্পাদক। সভাপতি।

পত্রিকা ১৩শ হইতে ১৮শ ফর্ম্মা ভাৰ্গবী আহির প্রেসে, কার্য্যবিবরণ ৬ষ্ঠ হইতে ১৬শ ফর্ম্মা ধীর প্রেসে, বিজ্ঞাপন শ্রীপতি প্রেসে এবং মলাট ও ছবি ইউ রায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

একত্রিংশ ভাগ] [চতুর্থ সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা

সূচী

(প্রবন্ধের মতামতের জন্ত পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

বিশেষ দ্রষ্টব্য— সদস্যগণের ঠিকানা পরিবর্ত্তন ঘটিলে, তাঁহারা অনুগ্রহ-পূর্ব্বক যথাসময়ে কার্য্যালয়ে সংবাদ দিবেন।

মূল পত্রিকা ভারতমিহির প্রেসে, টাইটেল ও বিজ্ঞাপন কোহিনূর প্রেসে, কার্য্যবিবরণ সুধীর প্রেসে, মলাট মেসার্স ইউ রায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

কবি বিদ্যাপতি নাশির শাহার কাছে কোন সাহায্য পাইয়াছিলেন কি না, জানা যায় না। তবে তাঁহার একটি পদের ভণিতায় আছে,—

সে যে নাসিরা সাহ জানে
যারে হানিল মদন-বাণে।
চিরঞ্জীব রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর
কবি বিদ্যাপতি ভাণে॥

অর্থনৈতিক অবস্থা

বৈষ্ণব-সাহিত্যে মহোৎসবের ভূরি বর্ণনা দেখিয়া মনে হয় যে, সে সময়ে দেশের লোকের বিশেষ অর্থকষ্ট ছিল না। মুদ্রার প্রচলন থাকিলেও কড়ি দ্বারা কর প্রদান ও ক্রয়বিক্রয় হইত। সনাতন গোস্বামী বহু স্বর্ণমুদ্রা উৎকোচ দিয়া বাদশাহের নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। তিন মুদ্রায় ভোট-কম্বল পাওয়া যাইত। মহাপ্রভুকে খুব পরিপাটী করিয়া খাওয়াইবার জন্য চারি আনার অধিক লাগিত না। আট কড়িতেই খাজা ও সন্দেশ পাওয়া যাইত।

রঘুনাথদাস—মাসে তুই দিন কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ।
তুই নিমন্ত্রণ লাগি কৌড়ি অষ্টপণ॥—চৈঃ চঃ।

ভক্তমালের শ্রীনরসীভক্ত-চরিত্রের নিম্নলিখিত বর্ণনা পড়িলে বুঝা যায় যে, তৎকালে দেশে এক প্রকার banking system ছিল।

এক যে বৈষ্ণব যান দ্বারকা দর্শনে।
হুণ্ডি করিবারে গেলা মহাজন স্থানে॥
হুণ্ডি নাহি দিল কহে বিদ্রূপ করিয়া।
নরসী ভকত স্থানে হুণ্ডি লহ গিয়া॥
উদার বৈষ্ণব তাহা সত্য করি মানে।
ছুটিতে ছুটিতে গেলা বৈষ্ণবের স্থানে॥
তাহারে কহেন এক শত টাকা লহ।
দ্বারকা মোকামে মোরে হুণ্ডি লিখি দেহ॥
তেঁহো কহে ভাল ভাল শত টাকা দেহ।
হাজার টাকার হুণ্ডি লিখি দেহ লহ॥
হুণ্ডি লিখি দিলেন শ্যামল সাহার নামে।
কহে সে তুথর বড় দ্বারকার ধামে॥
যার হুণ্ডি চলে সর্ব্বদেশ বেয়াপিয়া।
যাবামাত্র টাকা পাবে হুণ্ডি সমপিয়া॥

দেশে দুর্ভিক্ষ মাঝে মাঝে হইত। রেল ষ্টীমার না থাকায় লোক দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত দেশ ত্যাগ করিত। 'জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল' পাঠে জানা যায় যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে শ্রীহট্টে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল এবং বহু ব্যক্তি শ্রীহট্ট ত্যাগ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন।

শিক্ষা-প্রণালী

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে, খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে বঙ্গদেশ প্রকৃতই সারস্বত-কুঞ্জে পরিণত হইয়াছিল। উচ্চ শিক্ষার যথেষ্ট বিস্তার এই যুগে সাধিত হইয়াছিল। নবদ্বীপ সেই উচ্চ-শিক্ষার কেন্দ্রস্থল ছিল। ছাত্রগণ গুরুগৃহে আসিয়া অধ্যয়ন করিতেন। গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী সম্বন্ধে লিখিত আছে,—

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ তিঁহো পণ্ডিত প্রধান।
পাঁচ শত পড়ুয়ায় নিত্য অন্ন কৈল দান॥

নবদ্বীপে বহুতর ছাত্রের সমাগম হওয়ায় প্রত্যেক পণ্ডিতেরই অনেকগুলি করিয়া ছাত্র হইয়াছিল—সুতরাং নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের পক্ষে সকল ছাত্রকে অন্নদান করা অতি দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল।

ছাত্রগণ ব্যাকরণ পড়িয়া পাঠ আরম্ভ করিত। কলাপ ব্যাকরণই সমধিক আদৃত ছিল। নিম্নে তৎকালের দুইটি পাঠ্য-তালিকা প্রদত্ত হইল।

সুবন্ত দশনাকার পড়িল ষট্কারক।
সটীক কলাপ পড়ে সভার ব্যাপক॥
নবদ্বীপের ভিতর পণ্ডিত গঙ্গাদাস।
তাহার মন্দিরে কৈল বিদ্যার প্রকাশ॥
চন্দ্র সারস্বত নব কাব্য নাটকে।
স্মৃতি তর্ক সাহিত্য পড়িল একে একে॥—জয়ানন্দ।
শ্রুতিধর প্রভু পড়ে কলাপ ব্যাকরণ।
দৃষ্টিমাত্র শিখে সূত্র অর্থ বিবরণ॥
শ্রীঅদ্বৈত পড়ে তবে সাহিত্যাভিধান
অলঙ্কার জ্যোতিষাদি কৈল সমাধান॥—অঃ প্রঃ।

দর্শনশাস্ত্রের আলোচনাও তৎকালে যথেষ্ট হইত—

ন্যায় সাংখ্য পাতঞ্জল মীমাংসা দর্শন।
বৈশেষিক বেদান্তে নিপুণ যত জন॥—চৈঃ ভাঃ।

ছাত্র-জীবন

সে সময়ে ছাত্রগণ স্নান করিতে যাইয়াও পাঠ্য বিষয়ের তর্ক ও আলোচনা করিত। বিদ্যার্থী ছাত্রগণের এই বিদ্যাকৌতুকলীলা শ্রীবৃন্দাবনদাস অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। অধীত বিদ্যার তর্ক হইতে পরস্পরের অধ্যাপকের বিদ্যা লইয়াও কলহ হইত।

কেহো বোলে "তোর গুরু, কোন্ বুদ্ধি তার।"
কেহো বোলে "বোল এই আমি শিষ্য যাঁর॥"—চৈঃ ভাঃ।

বিদ্যা-প্রচার

Renaissance যুগের Florenceএর ন্যায় নবদ্বীপ বিদ্যার কেন্দ্রস্থল হইলেও, নবদ্বীপ একা এই সুবিধা ভোগ করে নাই। সমস্ত বঙ্গদেশে নবদ্বীপ বিদ্যা পরিবেষণ করিয়া দিয়াছিল। নদীয়ায় শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ গ্রীসের Sophistগণের ন্যায় বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে গমন করিয়া শিক্ষা দিতেন। মহাপ্রভু এইরূপে পদ্মানদীতীরে যাইয়া বিদ্যাদান করিয়া আসিয়াছিলেন,—

মহাবিদ্যাগোষ্ঠী প্রভু করিলেন বঙ্গে।
পদ্মাবতী দেখি প্রভু ভুলিলেন রঙ্গে॥
সহস্র সহস্র শিষ্য হইল তথাই।
হেন নাহি জানি, কে পড়য়ে কার ঠাঁই॥—চৈঃ ভাঃ।

সংস্কৃতবিদ্যা শুধু ব্রাহ্মণগণের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল না। কায়স্থ রঘুনাথদাস গোস্বামী স্তবমালা, মুক্তাচরিত ও দানচরিত নামক অত্যুৎকৃষ্ট সংস্কৃত কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন। কায়স্থ নরোত্তমদাস ঠাকুর ও রামানন্দ রায় সংস্কৃতবিদ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। বৈদ্য শিবানন্দের পুত্র পরমানন্দ কবিকর্ণপুর শ্রীচৈতন্য মহাকাব্য, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়, আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ, অলঙ্কারকৌস্তভ, কৃষ্ণ ও গৌর-গণোদ্দেশদীপিকা ও চৈতন্যশতক সংস্কৃতে রচনা করিয়াছেন। মুরারিগুপ্ত তাঁহার কড়চা সংস্কৃতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীখণ্ডবাসী নরহরি সরকার ঠাকুর সংস্কৃতে গৌরগণার্চ্চন-দীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন।

উচ্চশিক্ষা সকলে লাভ করিতে না পারিলেও, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার অভাব ছিল না। বড় বড় পণ্ডিতে সাধারণের নিকট শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতেন, উপাস্য দেবদেবীগণের লীলা ও স্তুতিবর্ণন-মূলক গান হইত, তাহাতে সকলে শিক্ষালাভ করিত।

এক স্থলে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা হয়।
অন্য স্থলে চৈতন্যভাগবত চরিতামৃত কয়॥
প্রথমে করয়ে গান চৈতন্যমঙ্গল।
তার পরে হয় গান শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল॥

পরে হয় গোবিন্দের গৌরকৃষ্ণলীলাগান।
নরোত্তমের গানে সবার জুড়ায় মন প্রাণ॥
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের কৃষ্ণলীলাগানে।
যে শুনে হরয়ে তার মন আর প্রাণে॥

ভাষা ও সাহিত্য

সাধারণের মধ্যে প্রেমধর্ম্মের ব্যাখ্যা প্রচার করিবার জন্য অনেক বৈষ্ণব পণ্ডিত গতানুগতিকতা ত্যাগ করিয়া সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থ না লিখিয়া বাঙ্গালায় গ্রন্থ লিখিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ন্যায় দার্শনিক গ্রন্থ যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বাঙ্গালায় লিখিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, ইহা তাঁহার মহত্ত্বেরই অন্যতম নিদর্শন। বৈষ্ণবসাহিত্যিকগণই বাঙ্গালা সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্যতা প্রদান করেন। জীবনী, দর্শন, গান, ভ্রমণবৃত্তান্ত, মনোবিজ্ঞান, স্মৃতি প্রভৃতি নানা বিভাগে গ্রন্থ লিখিয়া বৈষ্ণবগণ বাঙ্গালা ভাষাকে সমৃদ্ধিসম্পন্না করিয়া তুলিলেন।

বৃন্দাবনে বৈষ্ণবগণের একটি উপনিবেশ বসিয়াছিল। তাই বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে "ব্রজবুলির" যথেষ্ট মিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্ব ও পশ্চিম-বঙ্গে তখনও ভাষার যথেষ্ট প্রভেদ ছিল ঈশানের অদ্বৈত-প্রকাশের ভাষার সহিত চৈতন্যভাগবতের ভাষা মিলাইলেই এ কথা বুঝিতে পারা যাইবে।

সমাজে স্ত্রীজাতির স্থান

মহাপ্রভু তাঁহার উদার প্রেমধর্ম্মে "স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা" নীতি অবলম্বন করেন নাই। পুরুষের সহিত ধর্ম্মরাজ্যে স্ত্রীজাতির সমান অধিকার, ইহাই বৈষ্ণবগণ প্রচার করেন। "কর্ণানন্দে" শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর বহু স্ত্রীশিষ্যের পরিচয় আছে। মহাপ্রভুর তিরোভাবের পর নিত্যানন্দ-পত্নী শ্রীজাহ্নবাদেবীর বৈষ্ণব-সমাজে যে প্রভাব দেখা যায়, তাহা হইতে তৎকালীন বঙ্গসমাজে মহিলার স্থান নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত হইবে না। এই জাহ্নবাদেবী বঙ্গরমণীকুলের মধ্যে অতি শ্রেষ্ঠ স্থান পাইবার উপযুক্ত। বহু বৎসর ধরিয়া তিনিই বৈষ্ণবসমাজের নেত্রী ছিলেন। ভক্তিরত্নাকর, প্রেমবিলাস ও নরোত্তমবিলাস পাঠে জানা যায় যে, তাঁহার আজ্ঞাতেই খেতুরীর মহোৎসবে সমস্ত কার্য্য নিষ্পন্ন হইত। এই বঙ্গরমণী বৃন্দাবন হইতে বঙ্গের প্রান্তসীমা পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি শুধু যে উপদেশিকা হইয়া সেবা ও শ্রদ্ধাঞ্জলিই গ্রহণ করিতেন, তাহা নহে, বঙ্গরমণীর স্বতঃস্ফূর্ত্ত মাতৃভাবপ্রণোদিত সেবাও তাঁহার মধ্যে দেখা যায়,—

সে দিবসে শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী আপনে।
মনের আনন্দে শীঘ্র চলিলা রন্ধনে॥

রন্ধন-পরিবেষণ করিয়া বহু বার তিনি ভক্তবৃন্দকে পরিতোষ সহকারে আহার করাইয়াছেন।

শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণীও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব-সমাজ তাঁহাকে কিরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মানের চক্ষে দেখিত, তাহা আমরা যদুনন্দনদাসের প্রত্যেক অধ্যায়ের পরিসমাপ্তিতে লিখিত নিম্নোদ্ধৃত পয়ার হইতে বুঝিতে পারি।

শ্রীআচার্য্য প্রভুর কন্যা শ্রীল হেমলতা।
প্রেমকল্পবল্লী কিবা নিরমিল ধাতা॥
সেই দুই চরণপদ্ম হৃদয়ে বিলাস।
কর্ণানন্দরস কহে যদুনন্দন দাস॥

হিন্দুরমণীগণ সাধারণতঃ গৃহকোণে তাঁহাদের মাধুর্য্য বিকীর্ণ করিতেন না, মুসলমান মহিলাগণের ন্যায় তাঁহারা পর্দ্দার মধ্যেই আবদ্ধ থাকিতেন না। তাঁহারা সুবিধামত স্বামী বা আত্মীয়ের সহিত তীর্থযাত্রাও করিতেন।

সে বৎসর প্রভু দেখিতে সব ঠাকুরাণী।
চলিলা অদ্বৈত সঙ্গে অচ্যুত-জননী॥
শ্রীবাস পণ্ডিত সঙ্গে চলিলা মালিনী।
শিবানন্দ দাস সঙ্গে তাহার গৃহিণী॥
আচার্য্যরত্ন সঙ্গে চলে তাহার গৃহিণী॥
তাহার প্রেমের কথা কহিতে না জানি॥—চৈঃ চঃ।

মহিলাগণের মধ্যেও যে শিক্ষার প্রচলন ছিল, তাহা আমরা শিখি মাইতির ভগিনী শ্রীমাধবী দেবীর রচিত পদাবলী হইতে জানিতে পারি। সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত পদকল্পতরুর ৭৮৮, ১৮০৪, ২০৯২ ও ২১৯৩ সংখ্যক পদ তাঁহার লিখিত।

পর্য্যটন

রেলগাড়ী না থাকিলেও লোকে দূরদেশে ভ্রমণ করিত। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর, অদ্বৈতপ্রকাশে অদ্বৈতপ্রভুর, চরিতামৃতে মহাপ্রভুর এবং ভক্তিরত্নাকরে শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দের বহুদূরব্যাপী পর্য্যটনের কথা লিপিবদ্ধ আছে। সিংহলেও ভ্রমণকারিগণ গমন করিতেন।

আমি করিলাঙ যে পৃথিবী পর্য্যটন।
অযোধ্যা মথুরা মায়া বদরিকাশ্রম॥
গুজরাট কাশী গয়া বিজয়ানগরী।
সিংহল গেলাঙ আমি যত আছে পুরী॥—চৈঃ ভাঃ।

পথে দস্যু-ভয় হেতু পর্য্যটনকারিগণ দলবদ্ধ হইয়া গমনাগমন করিতেন। এইরূপ একটি দল দেখিয়া ভীত হইয়া রাজদূত প্রতাপরুদ্রকে বলিতেছে,—

পরঃ সহস্রাঃ সহসৈব পারে
চিত্রোৎপলং যে মনুজাঃ সমূঢ়াঃ।

কিং তৌর্থিকান্তে পরচক্রজাঃ কিং
শ্রুতৈব কোলাহলমাগতোঽস্মি।—চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, ৮অঃ।

সঙ্কীর্ত্তন ও আমোদ-প্রমোদ

সঙ্কীর্ত্তন দ্বারাই মহাপ্রভু ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। সঙ্কীর্ত্তন এ দেশে নূতন নহে—শ্রীমদ্ভাগবতে "কলৌ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ" বাক্য আছে। বৌদ্ধগণের দোঁহাও সঙ্কীর্ত্তনরূপে গীত হইত। কিন্তু মহাপ্রভু সেই সঙ্কীর্ত্তনমধ্যে নব ভাবের উন্মাদনা দিয়া তাহার নব-প্রাণ সৃষ্টি করিলেন। নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গড়েরহাটী কীর্ত্তনের রাগ-রাগিণী সৃষ্টি করিয়া খেতুরীর মহোৎসবে ঐ সুরে কীর্ত্তন করেন।

কেহো কহে ঐছে গীতবাদ্যাদি না হয়।
না জানিয়ে নরোত্তম কৈছে প্রকাশয়॥
কেহ কহে মহাপ্রভু স্বরূপের মুখে।
শুনিতেন উচ্চ গীত মহাহর্ষ মনে॥
গীত প্রথারক্ষা, ক্ষোভ নিবৃত্তি নিমিত্তে।
প্রচারিতে সম্যক্ বিচার কৈল চিত্তে॥
সে সময় তাহা প্রেমসম্পুটে রাখিল।
নরোত্তমদ্বারে প্রভু এবে উঘারিল॥—ভক্তি-রত্নাকর।

বঙ্গের জনসাধারণ যে কীর্ত্তনরসে মাতোয়ারা হইয়াছিলেন, তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। পরবর্ত্তী কালে উৎপত্তিস্থানানুসারে মনোহরসাহী, রেণেটী ও মন্দারণ নামে আরও তিনটী কীর্ত্তনশাখা প্রসিদ্ধি লাভ করে। উক্ত প্রকার নামকরণ হইতে বঙ্গদেশে কীর্ত্তনের প্রভাব অনুমান করা যাইতে পারে। শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলার সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলার সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য কীর্ত্তনারম্ভে গৌরচন্দ্রিকা গীত হইয়া থাকে। শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরই বোধ হয় গৌরচন্দ্রিকার সৃষ্টিকর্ত্তা। পদকর্ত্তা বাসুদেব ঘোষ, সরকার ঠাকুরের নিকট ঋণ স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন,—

শ্রীসরকার ঠাকুরের পদামৃত পানে।
পদ্য প্রকাশিব বলি ইচ্ছা হৈল মনে॥

বৃন্দাবনদাসও অধিবাসের একটি পদে গাহিয়াছেন,—

সংকীর্ত্তনের অধিকারী হইলেন নরহরি
বিলসই শ্রীরঘুনন্দন।—গীতরত্নাবলী।

অনেকের ধারণা, মহাপ্রভু মৃদঙ্গের প্রবর্ত্তক। কিন্তু তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ে মৃদঙ্গের উল্লেখ আছে।

লোকে চিত্তবিনোদনের জন্য নাটক অভিনয় করিত। শ্রীচৈতন্যভাগবতে মহাপ্রভুকর্ত্তৃক "রুক্মিণী" নাটক অভিনয়ের কথা আছে। বৈষ্ণব-সাহিত্যে চৈতন্যচন্দ্রোদয়, দানকেলীকৌমুদী, বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব প্রভৃতি নাটক আছে।

লোকে পরম আগ্রহের সহিত মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরি, যোগিপাল, মহীপালের গীত গান করিত। উজ্জ্বলনীলমণিতে ধৈর্য্যশালিনী নায়িকার লক্ষণে বানর পোষার কথা দেখা যায়, "হারং হারয়তে হরিপ্রণিহিতং"। পাশাখেলা এ দেশে প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত ছিল এবং বৈষ্ণব-সাহিত্যে ইহার বর্ণনা আছে।

রাই যব ধরি জিতই লাগল
দশ বা পঞ্চ বলি ডাকই রে।—গোবিন্দদাস।

ফাগুখেলায় খুব আনন্দ হইত,—

কেহ ডম্ফ বাজাইয়া ফিরে কেহ নাচে।
কেহ হস্তে লৈয়া ফাগু ধায় কার পিছে॥—নরোত্তমবিলাস।

চিত্র-শিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য

চিত্রবিদ্যা দেশে সুপ্রচারিত ছিল এবং উচ্চশ্রেণীর নরনারী অঙ্কবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন—

তুয়া অনুরূপ এক পটে লিখিয়া
দেয়ল তাকর আগে।
সো রূপ হেরি মুরছি পড়ু ভূতলে
মানয়ে করম অভাগে॥ -যদুনন্দন।

বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দজীর মন্দির ও তৎকালীন বাঙ্গালার বহু মন্দির দেশের স্থাপত্য-বিদ্যার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। মন্দির ও মূর্ত্তি-শিল্পী সমাজে যথেষ্ট সম্মান পাইতেন। শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে আছে,—

ততঃ সপরিবারাংশ্চ শ্রীমূর্ত্ত্যাদিবিধায়িনঃ।
শিল্পিনোঽভ্যর্চ্চ্য বিবিধৈঃ দ্রব্যৈর্বাক্যৈশ্চ তোষয়েৎ॥

পারিবারিক জীবন

সমাজে দশকর্ম্মের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। ছয় মাসের সময় অন্নপ্রশান ও নামকরণ হইত,—

এক দুই তিন করি পাঁচ ছয় মাসে।
নামকরণ হইল অন্নপ্রাশন দিবসে॥
পুত্রমহোৎসব করে মিশ্র পুরন্দর।
অলঙ্কার ভূষিত সোনার কলেবর॥—চৈঃ মঃ।

পাঁচ বৎসরের সময় হাতেখড়ি ও চূড়াকরণ হইত।

পাঁচ বৎসর প্রভুর হইল বয়স।
দিনে দিনে বাড়ে প্রভুর প্রেমানন্দ বেশ॥
মিশ্র পুরন্দর দেখি আপন তনয়।
হস্তে খড়ি চূড়াকর্ণের এই ত সময়॥
আগে দিলা হাতে খড়ি পড়িবার তরে।
যাহে চৌষট্টি বিদ্যা জিহ্বা অগ্রে স্ফূরে॥
তবে করি চূড়াকর্ণ সংযোগ আপার।
নানা বিদ্যাগ্নীয় আনি করিতে বিচার॥—চৈঃ মঃ।

চূড়াকরণের সময় বেদপাঠ ও যজ্ঞ হইত,—

ব্রাহ্মণেতে বেদ পড়ে গায়নে গায় গীত।
করিল সে যজ্ঞবিধি যে ছিল উচিত॥—চৈঃ মঃ॥

উপবীতকালেও যথেষ্ট ধূমধাম হইত,—

যজ্ঞকর্ম্ম জানে যে জানএ বেদরীত॥
গুবাক চন্দন মালা ব্রাহ্মণেরে দিল।
শত শত কুলবধূ সিন্দূর পড়িল॥—চৈঃ মঃ।

সমাজে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। নরোত্তমের—

বয়ঃক্রম হইল আসি দ্বাদশ বৎসর।
রূপ দেখি পিতামাতার আনন্দ অন্তর॥
বিবাহ লাগি দৈবজ্ঞ বসাইল বিরলে।
বিলম্ব না সহে বিবাহ করাহ সত্বরে॥—প্রেঃ বিঃ।

পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে মহাপ্রভুর সহিত লক্ষ্মীদেবীর বিবাহ হইয়াছিল এবং নিত্যানন্দ প্রভুর বার বৎসর কালে হাড়াই পণ্ডিত তাঁহার বিবাহ দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বহু-বিবাহ সমাজে নিন্দনীয় ছিল না। নিত্যানন্দ বসুধা ও জাহ্নবী নাম্নী দুই ভগিনীকে এক সঙ্গে বিবাহ করেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য—

বৈষ্ণবের অনুরোধে বিবাহ করিল।
কত দিন পরে পুন আর বিভা কৈল॥—কর্ণানন্দ।

বিবাহে সামাজিক ভোজনের কথা বৈষ্ণব-সাহিত্যে উল্লেখ নাই।

"অধিবাসে গুয়া আসি খাইবা বিকালে।"

বলিয়া নিমন্ত্রণ হইত এবং নিমন্ত্রিতগণ আগমন করিলে,—

তবে গন্ধ চন্দন তাম্বুল দিব্যমালা।
ব্রাহ্মণগণেরে সবে দিবারে লাগিলা॥

শিরে মালা সর্ব্ব অঙ্গে লেপিয়া চন্দনে।
এক বাটা তাম্বূল দেন একো জনে ॥—চৈঃ ভাঃ।

আধুনিক কালের ন্যায় তখনও বিবাহের মিছিল বাহির হইত,—

সহস্র সহস্র দীপ লাগিল জ্বলিতে।
নানাবিধ বাজি সব লাগিল করিতে ॥
আগে যত পদাতিক বুদ্ধিমন্ত খাঁর।
চলেন হইয়া দুই সারি পাটোয়ার ॥

বর কন্যার বাটী আসিলে পর নিম্নলিখিত উপায়ে তাঁহাকে বরণ করা হইত,—

হাথেতে উজ্জ্বল দীপ অন্তর উল্লাস ॥
আইহগণ আগে পাছে কন্যার জননী।
বর উরথিতে ধনী চলিলা আপুনি ॥
সাত প্রদক্ষিণ করি সাত দীপ হাতে।
চরণে ঢালিল দধি হরষিত চিতে ॥—চৈঃ মঃ।

শুভদৃষ্টির সময়,—

তবে মধ্যে অন্তঃপট ধরি লোকাচারে।
সপ্ত প্রদক্ষিণ করাইলেন কন্যারে ॥—চৈঃ ভাঃ।

ভাটগণ আসিয়া বর ও কন্যাকুলের গুণকীর্ত্তন করিত। যথা,—

ভাটগণে পড়িতে লাগিল রায়বার।—চৈঃ ভাঃ।

বরপণপ্রথা ছিল বলিয়া কোন উল্লেখ নাই। মহাপ্রভুর বিবাহের সময় আজিকালিকার ন্যায় বরের দর-কষাকষি হয় নাই। বরপক্ষ হইতেই কন্যাপক্ষের নিকট প্রস্তাব গিয়াছিল। তবে কন্যাকর্ত্তা যথেষ্ট যৌতুক বরকে প্রদান করিতেন। যথা,—

তবে দিব্য ধন ভূমি শয্যা দাসী দাস।
অনেক যৌতুক দিয়া করিলা উল্লাস ॥—চৈঃ ভাঃ।

বাসরে যথেষ্ট আমোদ-প্রমোদ হইত, তাহার বর্ণনা চৈতন্যমঙ্গলে আছে। অনুলোম বা প্রতিলোম বিবাহের কোন উদাহরণ বৈষ্ণব-সাহিত্যে পাওয়া যায় না।

বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শ্রীশচীমাতাকে যথোচিত সেবা-শুশ্রূষা করিতেন। তৎকালে বধূ ও শাশুড়ীর মধ্যে যে কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, তাহা শ্রীচৈতন্যের গৃহত্যাগের পর এই সেবাপরায়ণা মহিলার কাহিনী হইতে বুঝিতে পারি। অন্যান্য পারিবারিক সম্বন্ধের চিত্র বৈষ্ণব-সাহিত্যে সবিশেষ অঙ্কিত হয় নাই। অতিথিসেবা গৃহস্থের প্রধান কর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইত। জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে জনৈক তৈর্থিক ব্রাহ্মণ অতিথি হইয়াছিলেন। বালক নিমাই তাঁহার আহার্য্য তিন বার নষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। মিশ্রের আক্ষেপ হইতে আমরা অতিথির প্রতি গৃহস্থের যত্নের পরিমাণ অনুমান করিতে পারি।

দুঃখে বসিলেন মিশ্র হস্ত দিয়া শিরে।
মাথা নাহি তোলে মিশ্র বচন না স্ফুরে ॥—চৈঃ ভাঃ।

গ্রাম্য-নিবেশ

প্রত্যেক গ্রামই স্বসম্পূর্ণ ছিল। বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম মাত্রেই যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য ব্যতীত তন্তুবায়, গোপ, গন্ধবণিক্, মালাকার, তাম্বূলী, শঙ্খবণিক্ ও সর্ব্বজ্ঞ বাস করিত, তাহার প্রমাণ শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে বর্ণিত মহাপ্রভুর নগরভ্রমণ-কাহিনী হইতে জানিতে পারা যায়। প্রত্যেক জাতির জন্য এক একটি পাড়া নির্দ্দিষ্ট ছিল। প্রত্যেক গ্রামেই সর্ব্বজ্ঞ জ্যোতিষী থাকা আমাদের নিকট বিচিত্র বোধ হইতেও পারে, কিন্তু তদানীন্তন হিন্দুসমাজ জ্যোতিষীর মত না লইয়া কোন শুভ-কার্য্যে হাত দিতেন না। চণ্ডীদাসেও আছে, শ্রীকৃষ্ণ—

গ্রহবিপ্রের বেশে যান ভানুর ভবন ॥
পাঁজি লয়ে কক্ষে করি ফিরি দ্বারে দ্বারে।
উপনীত রাই পাশে ভানুরাজপুরে ॥

বিলাতী এসেন্স ব্যবহৃত না হইলেও আমাদের দেশে সুগন্ধি দ্রব্যের বা সৌখীনতার অভাব ছিল না। মহাপ্রভুকে গন্ধবণিক্ বলিতেছে,—

আজি গন্ধ পরি ঘরে যাহত ঠাকুর।
কালি যদি গায়ে গন্ধ থাকয়ে প্রচুর ॥
ধুইলেও যদি গায়ে গন্ধ নাহি ছাড়ে।
তবে কড়ি দিহ মোরে যেই চিত্তে পড়ে ॥—চৈঃ ভাঃ।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে হিন্দুপল্লীর স্নানের ঘাটের যে মনোহর বর্ণনা আছে, নিজে না পড়িলে তাহার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করা যায় না। নবদ্বীপের ঘাটে লক্ষ লক্ষ লোক স্নান করিতেছে। ব্রাহ্মণগণ জলে আবক্ষ ডুবিয়া মন্ত্রপাঠ করিতেছেন—কেহ বা তীরে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন। হিন্দু কুমারীরা নানাবিধ পুষ্পসম্ভারে শিবপূজা করিতেছে—মহিলাগণের শাড়ীতে শাড়ীতে ঘাট আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছে। আধুনিক সহরবাসী বাঙ্গালীর নিকট এ মধুর হিন্দুচিত্র কোন স্বপ্ন-রাজ্যের বলিয়া প্রতীত হয়।

বিবিধ

সের শাহ কর্ত্তৃক ডাক-প্রথা স্থাপিত হইলেও সাধারণে তাহা ব্যবহার করিতে পাইত না বা করিত না। বৈষ্ণব-সাহিত্যে লোক-মারফৎ পত্রাদি প্রেরণের কথাই পাওয়া যায়। পণ্ডিতগণ যে সংস্কৃতেও পত্রাদি লিখিতেন, তাহা কর্ণানন্দে উদ্ধৃত শ্রীজীব গোস্বামীর একখানি পত্র হইতে জানা যায়। তৎকালে দেশে মটর-গাড়ী না থাকিলেও ধনিগণের বিলাসবৈভবের কিছু ত্রুটি হইত না।

বড় বড় বিষয়ী সকল দোলা হৈতে।
নাম্বিয়া করেন নমস্কার বহু মতে ॥—চৈঃ ভাঃ।

সুসজ্জিত হইবার জন্য পুরুষেও অলঙ্কার পরিত। অলঙ্কারের মধ্যে চৈতন্যভাগবত ও পদাবলী হইতে নিম্নলিখিত অলঙ্কারগুলির নাম পাওয়া যায়—সুবর্ণের অঙ্গদ, বলয়, অঙ্গুরীয়ক, হার, কুণ্ডল, নুপুর, মল্ল প্রভৃতি। জয়ানন্দ তাঁহার চৈতন্যমঙ্গলের নদীয়াখণ্ডে নবদ্বীপ-বর্ণনায় তৎকালে ব্যবহৃত তৈজসপত্র ও দ্রব্যের একটি তালিকা দিয়াছেন। সৌখীন দ্রব্যসমূহ ঘরে ঘরে ফিরি করিয়া স্ত্রীগণও বিক্রয় করিত। চণ্ডীদাসে আছে,—

নাগর আপনি হৈলা বণিকিনী
কৌতুক করিয়া মনে।
চুয়া যে চন্দন অমলা বণ্টন
যতন করিয়া আনে॥
কেশর যাবক কস্তূরী দ্রাবক
আনিল বেণার জড়।

পূর্ব্বকালেও দেশী কনসার্ট বাদ্য বাজিত। চৈতন্যমঙ্গলে আছে,—

বীণা বেণুক বিলাস বংশীর নিসান।
রবাব উপাঙ্গ পাখোয়াজ একতান॥

নিম্নলিখিত বাদ্যযন্ত্র প্রচলিত ছিল,—

শঙ্খ দুন্দুভি বাজে ভেউর (ভেরী) কাহাল (ঝাঁঝ)।
মৃদঙ্গ গড়াহ বাজে কাংস্য করতাল॥
ঢাকের হুড়হুড়ি শুনি যোজনের পথে।
শুনিঞা জুড়ায় হিয়া শাহীনি শবদে॥—চৈঃ মঃ।

বৈষ্ণব-সাহিত্যের বহু স্থলে তদানীন্তন খাদ্যসামগ্রীর এমন সকল বর্ণনা আছে যে, পড়িতে পড়িতে প্রসাদ পাইবার দুরন্ত লালসা মনে উপস্থিত হয়। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের এমন একটি বর্ণনা উদ্ধার করিয়া আমরা "মধুরেণ সমাপয়েৎ" নীতি পালন করিব।

পীত সুগন্ধি ঘৃতে অন্ন সিক্ত কৈল।
চারি দিকে পাতে ঘৃত বহিয়া চলিল॥
কেয়াপত্র কলার খোলা ডোঙ্গা সারি সারি।
চারি দিকে ধরিয়াছে নানা ব্যঞ্জন ভরি॥
দশ প্রকারের শাক, নিম্ব সুকুতার ঝোল।
মরিচের ঝাল, ছানাবড়া বড়া ঘোল॥
দুগ্ধতুম্বী, দুগ্ধকুষ্মাণ্ড, বেসারি লাফরা।
মোচাঘণ্ট মোচাভাজা বিবিধ লাফরা॥
বৃদ্ধ কুষ্মাণ্ড বড়ীর ব্যঞ্জন অপার।
ফুলবড়ী ফলমূলে বিবিধ প্রকার॥

নব নিম্বপত্র সহ ভৃষ্ট বার্ত্তাকী।
ফুলবড়ী পটলভাজা কুষ্মাণ্ড মানচাকী॥
ভৃষ্ট মাষ, মুদ্গসূপ অমৃতে নিন্দয়।
মধুরাম্ল বড়াম্লাদি অম্ল পাঁচ ছয়॥
মুদ্গবড়া মাষবড়া কলাবড়া মিষ্ট।
ক্ষীরপুলি নারিকেলপুলী আর কত পিষ্ট॥
কাঞ্জিবড়া দুগ্ধ চিড়া দুগ্ধ লকলকী।
আর যত পিঠা কৈল কহিতে না শকি॥

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

৺প্যারীচাঁদ মিত্র

ইংরাজী ১৮৫৪ সালের ভাদ্র মাসে ৺প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় ৺রাধানাথ শিকদারের সহায়তায় একখানি মাসিক পত্র বাহির করেন। উহার প্রত্যেক সংখ্যার গোড়ায় লেখা থাকিত, "ইহা চলিত ভাষায় লেখা, স্ত্রীলোকদের জন্যই লেখা, পণ্ডিতেরা ইচ্ছা করেন--পড়িতে পারেন, তবে ইহা তাঁহাদের জন্য লেখা নহে।" এইরূপে চলিত ভাষায় লিখিব বলিয়া পণ করিয়া বাঙ্গালা লেখা এই প্রথম। স্ত্রীলোকদিগের জন্য লিখিব বলিয়া পণ করিয়া লেখাও, বোধ হয়, এই প্রথম। ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা ছিল, বাঙ্গালা গদ্য ছিল—কিন্তু সেগুলি সাধুভাষা বা পণ্ডিতি ভাষায় লেখা। চলিত ভাষা থেকে যত দূরে থাকা যায়, ততই ভাষার গৌরব হইবে, পণ্ডিত মহাশয়দের এই ধারণাই ছিল। সে ভাষা স্ত্রীলোকের কথা দূরে থাকুক, অনেক পুরুষের পক্ষে বোঝা কঠিন ছিল। আমি বাল্যকালে এক বৃদ্ধকে তারাশঙ্করের কাদম্বরীর তর্জ্জমা পড়িয়া বলিতে শুনিয়াছিলাম, —আহা! তারাশঙ্কর কি চমৎকার ভাষাই লিখিয়াছে! অভিধান ভিন্ন এক বর্ণও বোঝা যায় না। এই ত লেখার গাম্ভীর্য্য।

যখন ভাষার প্রতি লোকের এইরূপ ভাব, তখন চলিত ভাষায় লিখিতে আরম্ভ করা খুব সাহসের কাজ, খুব দূরদৃষ্টিরও কাজ। প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় বিচক্ষণ লোক ছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, সাধুভাষা লোকে পড়িতে পারে না, বুঝিতে পারে না, সুতরাং সে ভাষায় লেখা আর না লেখা, দুই সমান। তাই তিনি চলিত বাঙ্গালা ধরেন। এ ধরায় বিশেষ উপকার হইয়াছে। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা একটা ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

স্ত্রীলোকদের জন্য লেখা, ইহারও বিশেষত্ব আছে। আগে বাঙ্গালা গদ্যে বই লেখা হইত—তার বিষয় হয় সংস্কৃত হইতে নেওয়া, নয় বিচার, না হয় নাটক ও নভেল—রুচি এমন কদাকার যে, স্ত্রীলোকের হাতে কোনও মতেই দেওয়া যায় না। তাই শুধু মেয়েদের পড়িবার জন্য, তাহাদের আমোদের জন্য, যাহাতে তাহাদের শরীর ও মনের স্ফূর্ত্তি হয়, তাহার জন্য ভাল ভাল উপদেশ দিয়া এই পত্রিকা বাহির করা হয়। বঙ্কিমবাবু ঠিক বলিয়াছেন, ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও ইংরাজীর গণ্ডীর মধ্যে থাকিত, তাহার নিজের গণ্ডী ছিল না। বাবু প্যারীচাঁদ মিত্রই প্রথমে দেখাইয়াছেন যে, বাঙ্গালা দেশেও ঘরের কথা লইয়া বই লেখা যায়, আর সে বই পড়িবার মতনও হয়। আর এই ৭০ বৎসর পরে এখনকার লোকের ধারণা, বাঙ্গালায় ঘরের কথা লইয়াই বই লেখা উচিত এবং তাহা পড়িলেই বেশী উপকার হয়।

প্যারীচাঁদ মিত্রের মাসিক পত্রিকাতেই "আলালের ঘরের দুলাল" প্রথম বাহির হয়। ঐ গল্প পঁচিশ সংখ্যাতে বই হইয়া বাহির হয়। ঐ বইয়ে কিন্তু বাবু প্যারীচাঁদ মিত্রের নাম ছিল না, মলাটে লেখা ছিল, "শ্রীটেকচাঁদ ঠাকুর প্রণীত।" টেকচাঁদ ঠাকুর কে, ইহা কেহই বুঝিতে পারিত না। বাবু প্যারীচাঁদ যখন মেটকাফ হলের সেক্রেটারী ও পবলিক লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান,

সেই সময় আসাম দেশ হইতে একজন বড়লোক কলিকাতায় বেড়াইতে আসেন—তাঁহার নাম ছিল ঢেঁকচন্দ্র ফুকন্। তিনি কলিকাতার বড় বড় বাঙ্গালীদিগের সঙ্গে খুব মিশিয়াছিলেন। তাঁহার নাম হইতেই বোধ হয়, টেকচাঁদ ঠাকুরের উৎপত্তি। সে কালের অনেক লোকেই তাঁহার নাম জানিত, এখনকার লোকে ভুলিয়া গিয়াছে।

বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র যদি দুই একখানি "আলালের ঘরের দুলালে"র মতন গল্পের বই লিখিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতেন, তাহা হইলেও তাঁহাকে গল্পের প্রথম লেখক বলিয়া মান্য করিতে হইত। কিন্তু গল্প লেখার চেয়ে তিনি ঢের বেশী কাজ করিয়া গিয়াছেন। তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালায় সব জিনিষই লেখা যায়, সব ভাবই প্রকাশ করা যায়। বাঙ্গালায় দর্শনবিজ্ঞানেরও বই লেখা যায়। তিনি চাষ ও বাগান করা সম্বন্ধে বাঙ্গালায় অনেক রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি এগ্রি-হর্টিকালচার সোসাইটীর মেম্বর ছিলেন। এই উপলক্ষে চাষ ও বাগানের বিষয়ে তিনি অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন। সেগুলি চলিত ভাষায় লেখা, সহজ করিয়া লেখা, তাহা পড়িলে এখনও লোকের উপকার হইতে পারে। তাঁহার "আধ্যাত্মিকায়" অতি সহজ করিয়া যোগ ও বেদান্তদর্শনের অনেক গভীর কথা বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তাঁহার "অভেদী"তেও এই রকম দর্শনশাস্ত্রের কথা আছে। মাসিকপত্রিকায় তিনি যে সকল ইতিহাসের গল্প লিখিয়াছেন, সেগুলিও বড় মিষ্ট। গজনীর সুলতান মামুদ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া কোন্ বারে কি করিয়াছিলেন, তাঁহার মাসিক পত্রিকায় অতি সুন্দর করিয়া তাহা লেখা আছে। ভণ্ড পাষণ্ডদের কি করিয়া বিদ্রূপ করিতে হয়, তাহা তিনি বেশ জানিতেন। ভবশঙ্করবাবু, বাচস্পতি মহাশয়, গোঁসাইজি প্রভৃতির চরিত্রে ভণ্ডামি কেমন করিয়া ধরাইয়া দিতে হয়, তাহা তিনি বেশ দেখাইয়াছেন। তিনি চৌচাপটে দেখাইয়াছেন যে, বাঙ্গালা ভাষায় সব রকম ভাবই প্রকাশ করা যায়, আর সব রকম সাহিত্যই লেখা যায়।

প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় এক অদ্ভুত প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি খুব খাটিতে পারিতেন। খাটিয়া তিনি কখনও ক্লান্তি বোধ করিতেন না। ছেলে বেলা হইতেই তাঁহার খাটুনির আরম্ভ। হিন্দুকলেজে পড়িতে পড়িতেই তিনি বাড়ীতে এক স্কুল বসাইয়াছিলেন। তিনিই বেশী করিয়া পড়াইতেন। তাহার পর যত বয়স বাড়িতে লাগিল, তাঁহার খাটুনিও বাড়িতে লাগিল। তাঁহার বাপ-পিতামহ কারবারী লোক ছিলেন। কারবারেই তাঁহাদের শ্রীবৃদ্ধি। তিনিও কারবারই করিতেন। লর্ড মেটকাফ কলিকাতা ত্যাগ করিলে তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার জন্য যে আন্দোলন উপস্থিত হয়, প্যারী-বাবু তাহাতে খুব একহাত ছিলেন। তাই সেই স্মৃতির জন্য যখন মেটকাফ হল হইল, তখন লোকে তাঁহাকেই সেক্রেটারী ও সেখানে যে পবলিক লাইব্রেরি হইল, তাহার লাইব্রেরিয়ান করিল। তিনি এত মিশুক ছিলেন ও তাঁহার পড়াশুনা এত বেশী ছিল যে, কি ইংরাজ, কি বাঙ্গালী, যাঁহার যখন কিছু জানিবার দরকার হইত, মেটকাফ হলে লাইব্রেরিতে গিয়া উপস্থিত হইতেন এবং তিনি তাঁহার সাধ্যমত তাঁহাদের উপকার করিতে চেষ্টা করিতেন। মেটকাফ হল তখন বড় রকম একটী পণ্ডিতের আড্ডা হইয়াছিল। এখানে পণ্ডিত শব্দে শুধু সংস্কৃতওয়ালাই নয়, বরং ইংরাজীওয়ালাই বেশী। বাঙ্গালী-সমাজের কোনও বিপদ্ সম্পদ্ উপস্থিত হইলে, একটা বড়

রকম আন্দোলন উপস্থিত হইলে, প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় তাহাতে একহাত আছেনই আছেন। কিন্তু কোথাও প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় প্রধান (অগ্রণী, নেতা) হইবার চেষ্টা করিতেন না। ইংরাজীতে তাঁহার কলম খুব চলিত। সভাসমিতির কাজকর্ম্ম ইংরাজীতেই হইত; সুতরাং প্যারীচাঁদ ভিন্ন চলিত না। তিনিও ইচ্ছা করিয়া ধরা দিতেন এবং খুব খাটিয়া কাজ উদ্ধার করিয়া দিতেন। হেয়ার সাহেবের প্রতি তাঁহার ভক্তি অগাধ ছিল। সুতরাং হেয়ার সাহেবের নামে যে কোনও কার্য্য আরম্ভ হইত, তিনি প্রাণপণে সেই কার্য্যটীকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতেন। এইরূপে তিনি হেয়ার মেমোরিয়াল, হেয়ার প্রাইজ ফণ্ড, হেয়ার এ্যানিভারসারি প্রভৃতি হেয়ার সাহেবের নামের সহিত জড়িত যত কার্য্য ছিল, সেই সব কার্য্যেই জড়িত থাকিতেন।

তিনি ইংরাজীতে হেয়ার সাহেবের একখানি জীবনচরিত লিখিয়াছিলেন। সেই বইখানি প্রত্যেক বাঙ্গালীর, বিশেষতঃ কলিকাতাবাসীর পড়া অবশ্য কর্ত্তব্য। হেয়ার সাহেব যে কয় বছর বিলাতে ছিলেন, এ বইয়ে তাহার কোনও কথা নাই। তিনি ষোল বছর কলিকাতায় ঘড়ির কারবার করিয়াছিলেন, এ বইয়ে সে ষোল বছরের কোনও কথা নাই। ১৮১৬ সালে হেয়ার সাহেব কারবার উঠাইয়া দিয়া কলিকাতার হিন্দুরা যাহাতে ইংরাজী শেখে, ইংরাজী শিখিয়া মানুষ হয়, সে জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেন। ১৮৪২ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই ২৬ বৎসর তিনি অকাতরে টাকা খরচ করিয়াছেন এবং প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াছেন। তিনি সকালেই পাল্কী করিয়া বাহির হইতেন। পাল্কীতে বই থাকিত, ওষুধ থাকিত; তিনি স্কুল দেখিতেন, পাঠশালা দেখিতেন। পাল্কী করিয়া সারা কলিকাতা ঘুরিয়া বেড়াইতেন। বড় বড় ভদ্রলোকের বাড়ী যাইতেন, তাহাদের সঙ্গে মিলিতেন মিশিতেন, তাহাদের রোগে শোকে, উৎসবে ব্যসনে তাহাদের সহিত দেখা করিয়া যাইতেন। ছোট ছোট ছেলেদের খেলানা দিতেন। তাহাদের তালপাতে, কলাপাতে ও কাগজে লেখা দেখিতেন; বই দিতেন, কাগজ দিতেন। প্যারীচাঁদ যে এমন একজন অদ্ভুত প্রকৃতির লোকের ভক্ত হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এই যে ২৬ বৎসর, ইহাতেই কলিকাতায় ইংরাজী শিক্ষার আরম্ভ। এই সময় হিন্দুকলেজ, সংস্কৃত-কলেজ, মেডিকেল কলেজ প্রভৃতি অনেকগুলি কলেজ খোলা হয়, ইংরাজীতে সভাসমিতি হইতে থাকে, ইংরাজীতে ও বাঙ্গালায় অনবরত কাগজ বাহির হইতে থাকে। এই সময় ইংরাজী শিখিবার জন্য একটা ভয়ানক ঝোঁক ও একটা বিশেষ নেশা আসিয়া উপস্থিত হয়। হেয়ার সাহেবই ঐ নেশার গুরুমশায়। সুতরাং কলিকাতায় ইংরাজী শিক্ষার ইতিহাস প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের এই বইখানায় বিশেষ করিয়া লেখা আছে। তাই আমি বলিয়াছি, কলিকাতার বাঙ্গালী মাত্রেরই এই বইখানা পড়া উচিত।

তিনি ইংরাজীতে আরো একখানি জীবনচরিত লিখিয়াছিলেন। সেখানি স্বনামধন্য রামকমল সেন মহাশয়ের। ইঁহার নিবাস গরিফা; কিন্তু কলিকাতায় ইনি খুব প্রতিপত্তি করিয়াছিলেন এবং ব্যাঙ্কের দেওয়ান হইয়াছিলেন। তিনি একজন আস্তিক হিন্দু; সুতরাং রামমোহন রায়ের

ব্রাহ্মসমাজের—সতীদাহ নিবারণের ঘোর বিরোধী ছিলেন। কিন্তু ইংরাজ-মহলে ইঁহার খুব প্রতিপত্তি ছিল। ইংরাজেরা ইঁহাকে ভালবাসিতেন, শ্রদ্ধা করিতেন এবং একটু ভয়ও করিতেন। ইনি এসিয়াটিক সোসাইটীর প্রথম কেরাণী, পরে ধনাধ্যক্ষ ও পরে মেম্বর হইয়াছিলেন। সেখানকার সভায় কাগজ পড়িতেন ও পুরাণ তর্জ্জমা করিতেন। কলিকাতার হিন্দু বাসেন্দাগণ তাঁহাকে খুব বড় লোক বলিয়া মনে করিতেন। রাজা রাধাকান্ত দেব বলিতেন যে, রামকমলের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যে, সে না এলে সভা-সমিতি জমে না। সংস্কৃতকলেজ যখন খোলা হয়, সেন মহাশয় তাহাতে একজন প্রধান উদ্যোগী। সে সভায় রামমোহন রায়কে আসিতে দেওয়া হয় নাই। হেয়ার সাহেব রায় মহাশয়কে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, তুমি গেলে হিন্দুরা আসিবেন না। গবর্ণমেণ্টের একটা কাজ মাঠে মারা যাইবে। সেন মহাশয় সংস্কৃতকলেজের কমিটীর সেক্রেটারী হইয়াছিলেন।

প্যারীচাঁদ ইংরাজীতে আরো একখানি জীবনচরিত লিখিয়াছিলেন। সেখানি "কোলস্‌ওয়ার্দ্দি গ্র্যাণ্ট" সাহেবের জীবনচরিত। এই মহাত্মা আপনার সকল কাজকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, যাহাতে পশুদিগের উপর অত্যাচার নিবারণ হয়, সে বিষয়ে যত্নবান্ হইয়াছিলেন এবং "প্রিভেন্‌সন্ অব ক্রুয়েল্‌টি টু আনিম্যালস্" নামক আইন পাশ করাইয়া দিয়াছিলেন এবং অনেক দিন ধরিয়া সেই আইনমত যাতে কার্য্য হয়, তাহা দেখিবার ভার লইয়াছিলেন।

প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় ইংরাজীতে "স্পিরিচুয়ালিজ্‌মের" উপর অনেক বই লিখিয়াছিলেন। তিনি স্পিরিচুয়ালিজম বিশ্বাস করিতেন, প্ল্যানচেট বিশ্বাস করিতেন, মিডিয়াম্ বিশ্বাস করিতেন এবং এই শাস্ত্রের তিনি খুব উন্নতি করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে ইংলণ্ড আমেরিকা প্রভৃতি স্থানের বড় বড় লোকের সহিত তাঁহার চিঠি লেখালিখি চলিত। এই উপলক্ষেই তিনি যোগ বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার আধ্যাত্মিকায় প্রকাশ। নতুবা তিনি হিন্দু ধর্ম্মের কিছুই বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহার মাসিক পত্রিকায় প্রথম রচনা "শ্রাদ্ধে কোনও ফল নাই।" সেটী চলিত ভাষায় লেখা এবং বেশ জোরের লেখা। তিনি বলেন, শ্রাদ্ধ করিলে যদি লোকে স্বর্গে যায়, তাহা হইলে বড় লোকেই স্বর্গে যাইবে, গরীব মানুষের আর কোন উপায় নাই। ধনী লোকেরা প্রায় জীবনে মদখোর ও বেশ্যাবাজ হয়, তাহারা যদি শ্রাদ্ধের চোটে স্বর্গে যায়, তাহা হইলে স্বর্গ যে বিশেষ কামনার বস্তু হইবে, বোধ হয় না। প্যারীবাবু লিখিবার সময় এরূপ জোর কলমে লিখিলেন। কিন্তু তিনি প্রতি বৎসর যথাসময়ে যথারীতি পিতাপিতামহের শ্রাদ্ধ করিতেন। শেষ বয়সে ইংরাজ গুরুর উপদেশে তাঁহার মত পরিবর্ত্তন হয়। তিনি লিখিয়াছেন,—

The three births, above alluded to, are the natural birth, the regenerated birth and the spiritual birth. The conviction as to the immortality of the soul was so strong that it gave rise to *shraddhas* or offering funeral cakes to the souls of the deceased, which is considered not only

a sacred duty on the part of every Hindu, but a condition of inheritance In the offer of funeral cakes, there is a spirit of charity for the souls of the unfortunate :—"May those who have no father or mother or kinsman, no food or supply of nourishment, be contented with this food offered on the ground and attain like it a happy abode."

Page 7 of the Spiritual Stray Leaves by Peary Chand Mittra.

যাহা হউক, প্যারীবাবু কিরূপ লোক ছিলেন, সে বিষয়ে আলোচনা করিবার আমাদের প্রয়োজন নাই। তিনি চলিত ভাষায় বই লেখার একরকম আদিগুরু। সুতরাং তাঁহার ভাষা সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা করিতে হইবে; আমাদের নিজের উপকারের জন্য—তাঁহার নহে। তিনি এখন স্তুতি-নিন্দার অতীত। স্পিরিচুয়ালিজমের মতে তিনি এখন সপ্তম বা অষ্টম স্বর্গে। কিন্তু তিনি যে ভাষা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা ত সে কালের ভাষা। সে কালের ভাষার সহিত এ কালের ভাষার তুলনা করিলে আমরা অনেক জিনিষ শিখিতে পারিব।

প্যারীবাবুর ভাষার খুব জোর, খুব দৌড়। যে ভাষায় লিখিলে "কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল হায়," ইহা সেই ভাষা—যে হেতু ইহা চলিত ভাষা। এই ভাষায় যে লেখে ও যে পড়ে, তাহাদের মধ্যে ভাষা বলিয়া একটা পর্দ্দাই থাকে না। এই জন্যই এ ভাষায় লিখিলে হাসিবার সময় লোকে হাসে ও কাঁদিবার সময় লোকে কাঁদে। সেই জন্যই মাতাল ভবশঙ্কর কৃষ্ণ সাজিয়া যখন "নবনারীকুঞ্জ" হইতে ধপাত করিয়া পড়িয়া গেলেন, তখন লোকে হাসিয়া অস্থির হইল। আর যখন ঠক্‌চাচা আর বাহুল্য, তুজনে জাল করার জন্য জেলে গেলেন, তখন লোকের আনন্দের আর সীমা রহিল না। আবার যখন আধ্যাত্মিকার পৈতৃক সম্পত্তি সব গেল—বাবাও মারা গেলেন, দেনার দায়ে বাড়ীখানিও বিক্রী হইয়া গেল, অথচ আধ্যাত্মিকার ভ্রূক্ষেপ নাই, শান্তভাবে নির্ব্বিকার চিত্তে যোগ-সাধনায় চলিয়া গেল, তখন লোকে তাহার তুঃখে তুঃখী হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

বাঙ্গালা পদ্যে এ ভাবটা চিরকালই আছে, বাঙ্গালা পদ্য কোনও কালেই পণ্ডিতের জন্য লেখা নয়। বৌদ্ধেরা ধর্ম্ম প্রচারের জন্য লিখিত, হিন্দু কবিরাও ধর্ম্ম প্রচারের জন্য লিখিত, সুতরাং যাদের কাছে প্রচার করিবেন, তাদের ভাষায় লিখ্‌তে হত। নিজের বিদ্যে তাতে ফলাবার জো ছিল না। বাঙ্গালা গদ্যের অবস্থা কিন্তু অন্যরূপ। উহার উৎপত্তি ইউরোপীয় মিশনারীদের হাতে—উচু নীচু, এবড়োথেবড়ো এক রকম ফিরিঙ্গী বাঙ্গালা বললেও হয়। তারপর সে বাঙ্গালা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের হাতে পড়ে। সেটা হল সংস্কৃতের গণ্ডী। তার ভাবও সংস্কৃত, ভাষাও সংস্কৃত। ইহার পরের বিকাশ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হাতে। সেখানে এই সাধু ভাষা, মাজা ঘষা, শুন্‌তে মিষ্টি হয়। কিন্তু সে ভাষা "কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশে" না। তাই প্যারীচাঁদের ভাষার এত আদর।

কিন্তু সাহস করিয়া চলিত ভাষায় লিখিতে গিয়া প্যারীবাবু বেশ বিপদে পড়িয়াছিলেন। অনেক সময় তাঁহার ভাব আসিত ইংরাজীতে, সেগুলিকে বাঙ্গালা করিতে তাঁহার বিশেষ বেগ

পাইতে হইত। আবার সেগুলি সহজ হইলেও চলিত বাঙ্গালা হইত না। সে ইংরাজী-বাঙ্গালা হইত। এই ইংরাজী-বাঙ্গালাটাই শেষ ইংরাজী-শিক্ষিত মহলে বড়ই চলিয়া গিয়াছে। সেটা কিন্তু সংস্কৃত চলার চেয়ে খারাপ হইয়াছে।

ব্রাহ্মসমাজের ভাষায় এই দোষ অত্যন্ত বেশী। ইংরাজীনবিশ বাঙ্গালা লিখিতে গেলেই এই দোষ করিবেন এবং তাহাতে এই ভাষা বাঙ্গালীদের পক্ষে দুর্ব্বোধও হইবে। যাঁহারা রাজনীতি, সমাজনীতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি লেখেন, এই কারণে তাঁহাদের ভাষা লোকের কাছে অত্যন্ত কঠিন বলিয়া বোধ হয়, এবং তাঁহাদের বইও চলে না। এই জন্য আমি একবার রাগ করিয়া বলিয়াছিলাম, "বাবু হে! বাঙ্গালায় ভাবিতে শেখ। যদি তা না পার, তাহা হইলে বাঙ্গালায় কলম ধরিও না।"

প্যারীবাবু স্ত্রীলোকদের জন্য বই লিখিয়াছেন; সুতরাং কোন্‌টা সুরুচি, কোন্‌টা কুরুচি, তাহা তিনি বেশ বুঝেন। তাঁহার রচনার বিষয়ে কুরুচি নাই, থাকিতেও পারে না। কিন্তু কোন্ শব্দটা সুরুচি, কোন্ শব্দটা কুরুচি, ইহা তখনও ঠিক জানা যায় নাই। কারণ, সে সকল কথা বইএ লেখা হয় নাই। সজ্জনে সে সকল কথা আলোচনা করিবার অবসর পান নাই। দুই একটা দৃষ্টান্ত দিব।— প্যারী বাবু লিখিয়াছেন, মদখোর ও বেশ্যাবাজ। মদখোর কথাটা তখনও চলিত ছিল না, এখনও নাই। গাঁজাখোর, গুলিখোর, সুদখোর, ঘুস্‌খোর চলিত, কিন্তু মদখোর চলিত নহে। বেশ্যাবাজ চলিত নহে। যে শব্দটা চলিত, সেটা বড় শ্রুতিকটু—বেশ্যাসক্ত বলে বটে, কিন্তু পাণ্ডিত মহলে। লম্পট শব্দটা এই অর্থে অনেক সময় ব্যবহার হয়।

অধিক দৃষ্টান্ত দিয়া আমরা আর সময় নষ্ট করিব না। অলঙ্কারে যাহাকে দোষ বলে, পদাংশ-দোষ, পদদোষ, শব্দদোষ, অর্থদোষ, বাক্যদোষ—প্যারীচাঁদবাবুর বইয়ে সবই আছে। তিনি নূতন ভাষায় লিখ্‌চেন—হইবারই কথা। কিন্তু তাঁহার বর্ণনার শক্তি অতি অদ্ভুত। পড়িবার সময় মনে হয়, জিনিষটা চোখে দেখিতেছি। ছবিখানি যেন চোখের উপর ভাস্‌ছে। বইগুলি যেন একখানি এলবাম্—তাতে কত কত পুরাণ ছবি রয়েছে। "আলালের ঘরের দুলালে" ব্ল্যাকিয়ার সাহেবের চেহারা, ব্ল্যাকিয়ার সাহেবের আদালত, সুপ্রীম কোর্টের গ্র্যাণ্ডজুরী, পেটীজুরী প্রভৃতির ছবিগুলি যেন পর পর সাজান আছে। রচনা সর্ব্বত্রই প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী। শব্দ অনেক জায়গায়ই সেকেলে, পুরাণ ও একটু কটমট হইলেও ভাব ঠিক আছে। প্যারীবাবুর রচনার একটী বিশেষ গুণ এই যে, ইংরাজীতে যাহাকে হিউমার (Humour) বলে, তাহাতে উহা পরিপূর্ণ। সোজা কথাও প্যারীবাবু একটু বাঁকাইয়া বলেন। এই বাঁকাইয়া বলার নাম বক্রোক্তি। অনেক অনেক আলঙ্কারিকেরা বক্রোক্তিকেই কাব্যের জীবন বলিয়াছেন। ইংরাজেরাও এখন হিউমার-বস্তু ভালবাসেন। প্যারীবাবু ইংরাজের শিষ্য। সুতরাং তিনিও বক্রোক্তি বা হিউমারের ভক্ত। কিন্তু বই লিখিতে গেলে, বিশেষ উপদেশ দিতে গেলে সব জায়গায় বক্রোক্তি চলে না। তখন সোজাভাষায় সোজা কথা বলিতে হয়। সেই সব জায়গায় প্যারীবাবু যেন মনপ্রাণ ঢালিয়া দেন এবং মধ্যে মধ্যে বক্তৃতার ছটা বাহির করেন। তিনি যে সকল মনুষ্যের চরিত্র বর্ণন করিয়াছেন, সেগুলি বেশ টিকল হইয়াছে। তাঁহার ঠক্‌চাচা, বাহুল্য, বাবুরামবাবু, বেণীবাবু, বেচারামবাবু, বরদাবাবু, মতিলালবাবু, বাঞ্ছারামবাবু

মণিরামপুরের মাধববাবু, বটলার সাহেব, জান্ সাহেব, ভবশঙ্করবাবু, বাচস্পতি মহাশয়, গোস্বামী মহাশয়, বক্রেশ্বরবাবু, অন্বেষণবাবু, পতিভাবিনী, জেঁকোবাবু, বাবুসাহেব, লালবুঝকড়, হরদেব তর্কালঙ্কার, আধ্যাত্মিকা, ভজহরিবাবু ও চম্পকলতা—সবগুলিই অতি মনোহর হয়েছে।

প্যারীবাবু শুধু গল্প লিখিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই, চাষ ও বাগান করার কথা অনেক আছে। স্ত্রীলোকদিগকে উপদেশ দেওয়াই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। তাঁহার মাসিক পত্রখানিও স্ত্রীলোকদিগের জন্যই বাহির হইয়াছিল। তাঁহার রামারঞ্জিকা ও বামাতোষিণীও সেই উদ্দেশ্যেই লেখা। প্রথম প্রথম তিনি যেন সাহেবীয়ানার দিকেই বেশী চলিয়াছিলেন। কারণ, তাঁহার মাসিক পত্রিকার প্রথম রচনার নাম "শ্রাদ্ধে কোনও ফল নাই"। ক্রমে যত বয়স হইতে লাগিল, ততই তিনি হিঁদুয়ানীর দিকে আসিতে লাগিলেন। তাঁহার "অভেদী," তাঁহার "আধ্যাত্মিকা" উচ্চ অঙ্গের হিঁদুয়ানী শিক্ষা দিয়াছে। কিন্তু তিনি হিন্দুয়ানী সংস্কার করিয়া লইতে চাহিতেন।

তিনি ভণ্ডামীর বড় বিরোধী ছিলেন। "মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়" বইখানি ভণ্ড তপস্বীদের ভণ্ডামী ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। প্যারীবাবুর কোনও ধর্ম্মেই দ্বেষ ছিল না। তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজ, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ, নূতন ব্রাহ্মসমাজ, মুসলমানসমাজ, ক্রীষ্টানসমাজ—সকল সমাজের কথাই লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু শেষটা তাঁহার হিন্দুধর্ম্মের প্রতিই আস্থা হইয়াছিল। যোগ ও স্পিরিচুয়ালিজ্‌মের উপর তাঁহার খুব ঝোঁক হইয়াছিল। সাহেবরাই তাঁহার বাল্যকালের গুরু, সাহেবদের উপর তাঁহার ভক্তিও অগাধ। তাঁহার আধ্যাত্মিকাতেও এক বিবিসাহেব আসিয়া উপদেশ দিতেছেন। তাঁহার বইগুলি বাঙ্গালায় লেখা হইলেও তিনি ইংরাজীতেই প্রায় ভূমিকা লিখিতেন। এ সব হইলেও তিনি কিন্তু খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন। বাঙ্গালার জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিত। বাঙ্গালার মেয়ে ও পুরুষ যাতে ভাল হয়, তিনি তার চেষ্টা করিতেন। ইতর জন্তুর প্রতিও তাঁহার দয়া কম ছিল না। পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণের জন্য কোলস্‌ওয়ার্দ্দি গ্র্যাণ্ট সাহেব যখন কোমর বাঁধিয়া লাগিলেন, প্যারীবাবুই তখন তাঁহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হইলেন। তিনি যখন বেঙ্গল কাউন্সিলের মেম্বর, সেই সময়ে তাঁহারই উদ্‌যোগে পশুদিগের প্রতি অত্যাচার নিবারণের আইন প্রথম পাশ হয়।

প্যারীচাঁদবাবুর ন্যায় লোকের একখানি ভাল জীবনচরিত হওয়া উচিত। মালমসলা যথেষ্ট সংগ্রহ আছে। একজন সুলেখকের এই কার্য্যের ভার লওয়া উচিত।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

পুরুলিয়ার পাখী

পুরুলিয়াতে লোকে পাখীর খোঁজে আসে না, ভাঙ্গা স্বাস্থ্য জোড়া দিবার জন্যই আসে; অবশ্য যাঁহারা কার্য্যব্যপদেশে এখানে থাকিতে বাধ্য হন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। মানভূম জেলার অধিবাসী-দিগের কথাও স্বতন্ত্র। আগন্তুক বাঙ্গালী যদি আমাদের মত শীতের প্রারম্ভে অবসরকালে চিত্ত-বিনোদনের জন্য নিজের স্বাস্থ্যের বা অস্বাস্থ্যের কথা ভুলিয়া গিয়া, কিছুক্ষণ আযোধ্যার পাহাড়ে, কাঁসাই নদী-তীরে, রাণীবাঁধে অথবা সাহেববাঁধের বুকের উপরে কুঞ্জবনে পাখীর বিচিত্র জীবনলীলা দেখিয়া আনন্দ পান, তাহা হইলে সেই আনন্দ তাঁহার ভাঙ্গা স্বাস্থ্য জোড়া দিবার পক্ষে কতকটা অনুকূল হইতে পারে। লালসার বশবর্ত্তী হইয়া ব্যাধ বা শিকারীর চক্ষে এই সমস্ত বন্য বিহঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে বলিতেছি না, পাখীকে আমাদের ভোজ্য সামগ্রীতে রূপান্তরিত করিবার চেষ্টা করিলে আর যে ফল পাওয়াই যাক, অনাবিল আনন্দরসটুকু পাওয়া যাইবে না।

মানভূম জেলার প্রায় মাঝখানে এই পুরুলিয়া নগর; ইহার বুকের উপর দিয়া বড় বড় রাজপথ বহুদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত; কোনওটা রাঁচি পর্য্যন্ত পশ্চিমাভিমুখে সংসর্পিত, কোনওটা দক্ষিণে পার্ব্বত্য ভূমির ভিতর দিয়া চৈবাসার দিকে চলিয়া গিয়াছে; একটা প্রশস্ত রাজপথ উত্তরে বরাকরাভিমুখে প্রসারিত; কোনওটা বাঁকুড়ার দিকে, কোনওটা মানবাজার অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। প্রশস্ত রাজপথের দুই ধারে বড় বড় অশ্বত্থ, শাল, পলাশ, কুসুম, মহুয়া, জাম, আম, তেঁতুল প্রভৃতি গাছের শ্রেণী। দক্ষিণে দূরে বাঘমণ্ডী গিরিশ্রেণী পর্য্যন্ত প্রসারিত প্রান্তর অত্যন্ত বন্ধুর; মাঝে মাঝে শুষ্কগর্ভ নদীর মত নাতিগভীর দীর্ঘবিসর্পিত 'খাত'; সহরের মধ্যে ও চারিধারে ছোটবড় অনেক-গুলি "বাঁধ",—সাহেব বাঁধ, নাজির বাঁধ, দুল্‌মি বাঁধ, বুড়িবাঁধ, ভাটবাঁধ, আরও কত কি বাঁধ-নামধেয় ছোট বড় জলাশয়। সহরের দক্ষিণে ক্ষীণতোয়া কাঁসাই নদী; আরও দক্ষিণে বাঘমণ্ডী পাহাড় হইতে নিঃসৃত হইয়া মানভূম জেলার দক্ষিণ সীমান্তরেখায় প্রবহমানা সুবর্ণরেখা; দূরে উত্তরে দামোদর; আরও উত্তরে মানভূমের প্রান্তসীমায় বরাকর নদী প্রবহমানা। ভূতত্ত্ববিৎ এখানকার মাটির সম্বন্ধে আলোচনা করিলে হয় ত যুগযুগান্তরবিন্যস্ত যে সকল পাথরের কথা তুলিবেন, মানভূম জেলার মৃত্তিকা এবং মৃদ্‌ভেদী পাষাণ ও খনিজপদার্থসংশ্লিষ্ট বিবিধ ভূস্তর-প্রসঙ্গের অবতারণা করিবেন, তাহা পক্ষিতত্ত্বজ্ঞেরও আলোচনার বিষয়ীভূত হইতে পারে, এ কথা বোধ হয়, কেহ কেহ একেবারে স্বীকার করিয়া লইতে ইতস্ততঃ করিবেন; কিন্তু পাষাণের সঙ্গে পাখীর সম্পর্ক যে নিগূঢ় নৈসর্গিক সূত্রে গ্রথিত, একটু প্রণিধান করিলেই তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের ভূস্তরবৈশিষ্ট্য বিশেষ বিশেষ লতাগুল্ম বৃক্ষাদির উদ্ভবের পক্ষে অনুকূল; ঐ সকল লতা গুল্ম বৃক্ষ আবার বিশেষ বিশেষ বিহঙ্গের স্বভাবতঃ প্রিয় আশ্রয়স্থল। কাঁসাই-দামোদর-বরাকরধৌত মানভূমের বুকের উপরে, বাঘমণ্ডী-পঞ্চকোট ঝাল্‌দে-গিরিশ্রেণী মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; নগরের ভিতরে ও বাহিরে অসংখ্য ছোট বড় বাঁধ; সর্ব্বত্র বড় বড় বৃক্ষশ্রেণী, কোথাও মাঠের উপর অসংখ্য ছোট ছোট ঘন ঝোঁপ; কোথাও ঘন মহুয়া-কেঁদ-

কুসুম-পিয়াল-শিমুল-শিরীষ-হরিতকী-অর্জ্জুন-করঞ্জ-আমলকি-পলাশ-লিপ্সি-নিমের নিবিড় কানন প্রান্তরভূমি সমাচ্ছন্ন করিয়াছে। মানভূমের আদিম অধিবাসী যেমন একান্ত মানভূমেরই সামগ্রী, তেমনই তাহার ভূস্তরের উপরে এই সকল বাঁধের ধারে, নদীতীরে, বৃক্ষশ্রেণীর উপরে, ঝোপে ঝাপে, কাননাভ্যন্তরে যে সকল পাখী দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাদের মানভূমী আখ্যায় পরিচয় লাভ করিবার সময় মনে হয় যে, এই সকল কাওয়া-ঢেবৃচু-হোড়াল-পাঁড়কি-ক্যারক্যাটা-সাম্‌কাহাল-রূপো-কাঁড়োর-বনকুঁকড়ির পক্ষে এই প্রাকৃতিক আবেষ্টনই বিশেষ ভাবে অনুকূল; ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ হয় ত মানভূমেই থাকিবে, পার্শ্ববর্ত্তী সিংভূমে বা ছোটনাগপুরে থাকিতে চাহে না। অনুসন্ধিৎসু, বৃক্ষাদির উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে এই পক্ষিসংস্থানের ভিতরের কথা কতকটা বুঝিতে পারিবেন। ভূবিদ্যার সহিত উদ্ভিদ্‌তত্ত্বের ও বিহঙ্গ-বিদ্যার এতই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তাই স্থানবিশেষে প্রাণিবিশেষের পর্য্যালোচনা করিতে বসিয়া এই সকল কথার অবতারণা বিজ্ঞান হিসাবে একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক নহে; যিনি যে কোনও জেলার যে কোনও জীবের বিষয় বৈজ্ঞানিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন, তিনিই আমাদের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়া তুলিবেন; এই জন্য বিশেষজ্ঞের কাছে আমরা বহুল পরিমাণে ঋণী। পাখীর কথাই ধরা যাক্। মানভূমে যে সকল পাখী দেখা যায়, তাহাদের চলাফেরা, উড়াবসা কোনও নিয়মে শৃঙ্খলিত কি না; কোনও কোনও পাখী দিবাভাগে কোনও বিশেষ দিক্ হইতে উড়িয়া আসিয়া প্রত্যহ দিগন্তরে চলিয়া যায় কি না; এই নদী, বাঁধ, গাছ পাথর পরিবেষ্টনীর মধ্যে কোনও বিশিষ্ট পক্ষিজাতির অবস্থান তাহার জীবন-সংগ্রামের পক্ষে অনুকূল কি না এবং সিংভূম ছোটনাগপুরে ভূস্তরের পার্থক্য বশতঃ তাহাদের জীবনযাপনের উপযোগী বৃক্ষাদি বা জলাশয়ের অভাব আছে কি না, এই সকল সমস্যা সমাধানের চেষ্টা দেশ কাল পাত্র বুঝিয়া পক্ষিবিশেষজ্ঞ করিয়া থাকেন। এ কার্য্যে ব্রতী হইলে কোনও পাখীকেই বাদ দেওয়া চলিবে না। এমন অনেক পাখী আছে, যাহারা অন্যত্র অন্য আবেষ্টনের মধ্যে জীবন যাপন করে; কিন্তু তাই বলিয়া যদি মানভূমে তাহাদের কাহারও সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, তাহা বিজ্ঞান হিসাবে উপেক্ষণীয় নহে। পাশ্চাত্য পণ্ডিত অন্ততঃ তাঁহার Distribution কোঠায় দৃষ্ট বিহঙ্গকে আবদ্ধ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারিবেন; উপরন্তু যদি তিনি লক্ষ্য করেন যে, যে পাখীকে অন্যত্র তিনি যাযাবর দেখিয়াছিলেন, এখানে সে স্থায়ী অধিবাসী, তাঁহার এই নূতন আবিষ্কৃত তথ্য তাঁহাকে যে আনন্দ দান করিবে, তাহার কথা না তুলিলেও ইহা অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, তিনি পক্ষিবিজ্ঞানকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতেছেন।

মানভূম জেলার ভৌগোলিক অধিষ্ঠান মানচিত্রের ২২°৪৩′ ও ২৪°৪′ উত্তর লম্বিমান্তর বা latitudeএর মধ্যে এবং ৮৫°৪৯′ ও ৮৬°৫৪′ পূর্ব্ব দ্রাঘিমান্তর বা longitudeএর মধ্যে। এই সামান্য ভৌগোলিক বৃত্তান্তটি পক্ষিতত্ত্ব হিসাবে নিতান্ত তুচ্ছ নহে। ঋতুবিশেষে এই লম্বিমান্তর ও দ্রাঘিমান্তরের মধ্যে কোন্ কোন্ পাখী আনাগোনা করে, তাহাই প্রথমে অনুসন্ধানের এবং লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই জেলার মধ্যে সুবর্ণরেখা, কাঁসাই, দামোদর, বরাকর প্রভৃতি বড় বড় নদীর গতিরেখা, ছোট ছোট হ্রদ এবং ছোট বড় পাহাড়, জলাভূমি, বন জঙ্গল, এই সমস্তই পক্ষি-

তত্বানুসন্ধিৎসুর বিষয়ীভূত। তা ছাড়া ইহার চারি পার্শ্বে, এই লঘিমান্তর দ্রাঘিমান্তরের বাহিরে উত্তরে সাঁওতাল পরগণা ও হাজারিবাগ, দক্ষিণে সিংভূম, পূর্ব্বে বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর এবং পশ্চিমে রাঁচি ও হাজারিবাগ জেলাগুলিকে একেবারে বাদ দেওয়া চলিবে না। মানভূম জেলার পাখীর আনাগোনা আলোচনা করিতে বসিলে আশপাশের জেলাগুলি মানভূমের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। এই মানভূম জেলার মাঝখানে পুরুলিয়া ২৩°২০′ উত্তর লঘিমান্তরের ও ৮৬°২২′ পূর্ব্ব দ্রাঘিমান্তরের মধ্যে অবস্থিত। কাজেই পুরুলিয়ার পাখীগুলির সহিত মানভূমের অন্তর্গত আশপাশের চারিদিকে গ্রাম নদী পাহাড় জঙ্গলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। সুতরাং বিস্মিত হইলে চলিবে না, যদি মানভূম জেলার কাছাকাছি বাঙ্গালার অথবা ছোটনাগপুরের কোনও পাখীকে মানভূমের মধ্যে, তথা পুরুলিয়ায় দেখিতে পাওয়া যায়। পুরুলিয়ার পাখী বলিলে কেহ যেন মনে না করেন যে, পাখীটি কেবল পুরুলিয়াতেই দেখিতে পাওয়া যায়, মানভূমের অন্যত্র বা বাহিরে পাওয়া যায় না।

বায়স, Corvus splendens

পাখীর তালিকায় প্রথমেই বায়সের নাম করিতে হয়। কাক ঘরে বাহিরে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অসতর্ক গৃহস্থের সযত্নরক্ষিত আহার্য্য দ্রব্যের প্রতি তাহার লোলুপ দৃষ্টি এবং নিঃশঙ্ক চৌর্য্যবৃত্তি সকলকে কিছু সন্ত্রস্ত করিয়া তোলে। ডুমরাকুড়ির মত অতি ক্ষুদ্র গণ্ডগ্রামেও ইহার ব্যতিক্রম দেখা গেল না। কিন্তু সেখানে কাকের অনুপাতে দাঁড়কাক বেশী বলিয়া বোধ হইল। তবে কাকের

C. macrorhynchus, দাঁড়কাক

মত তাহাকে নির্ভীক বলিয়া মনে হইল না। লোকালয়ের কাছে আবর্জনার প্রতি তাহার লোভ বেশী।

সালিক, Acridotheres tristis

আশ্বিনের মাঝামাঝি দেখা গেল যে, সালিকের গৃহস্থালী এবারকার মত শেষ হইয়া গিয়াছে, যদিও অনেক স্থলে শাবকগণ এখনও তাহাদের জনক জননীর সঙ্গ পরিত্যাগ করে নাই; মাঠের উপরে খাদ্যের জন্য তাহাদের জননীর অনুসরণ করিতেছে। ধাড়িগুলার পুরাতন পালক খসিয়া গিয়া এখনও নূতন পালক গজায় নাই; বুড়া সালিকের ঘাড়ে রোঁ চাক্ষুষ দেখা গেল, তবে এই রোঁ ঠিক রোম বা লোম নহে, মাথার ও ঘাড়ের অনাবৃত ত্বকে যে কালো কালো খোঁচার মত দেখা যায়, উহা নবীন পতত্রোদ্গমের পূর্ব্বাভাস। বটফল ও অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী এ সময়ে প্রচুর; ইহারাও সংখ্যায় খুব বেশী। স্নিগ্ধ প্রভাতে ও প্রখর মধ্যাহ্নে নানা জাতি-পরিজন-পরিবৃত হইয়া কল-কোলাহলে রাজপথ ও সাহেববাঁধ মুখরিত করিয়া তোলে। কার্ত্তিকের মাঝামাঝি দেখিতেছি, বুড়া সালিকের ঘাড়ে ঘন পতত্রোদ্গম হইয়াছে, মাথার রং বেশ কাল দাঁড়াইয়াছে; পুচ্ছ এখনও সম্পূর্ণ পরিণতি লাভ করে নাই, পুচ্ছের পালক এখনও ছোট বড়, পুচ্ছপ্রান্তে কোথাও কোথাও শ্বেতবর্ণ প্রকট।

গো-সালিক, Sturnopastor contra

গো-সালিকের বাসা আশ্বিন মাসে অনেক গাছে দেখিতে পাওয়া গেল; সে সকল বাসা কিন্তু তখন পরিত্যক্ত। শাবকগুলির পালক বাহির হইয়াছে; তাহারা খুঁটিয়া খাইতে শিখিয়াছে; ভোজ্য কীটের অন্বেষণে গোময়পুরীষাদি ঘাঁটিতেছে। ইহাদের দেহের বর্ণ দেখিলেই ইহাদিগকে সহজে গো-

সালিকের শাবক বলিয়া চিনিতে পারা যাইতেছে,—রংটা মোটের উপর মেটে মেটে, অর্থাৎ ধাড়িগুলার মত সাদা রংটা পরিষ্কার সাদা নহে, কালোটাও খুব উজ্জ্বল নহে; ঠোঁট লাল্‌চে না হইয়া ঈষৎ কৃষ্ণাভ; আয়তনে ছোট। প্রধানতঃ কীটভুক্‌ হইলেও ফলভরাবনত অশ্বথ-বট-শাখায় দল বাঁধিয়া অন্যান্য জাতি পরিজনের সহিত ফল ভক্ষণ করিতে ইহাদিগকে দেখা যাইতেছে। সংখ্যায় ইহারা এত বেশী যে, অতি প্রত্যুষেও ইহাদিগকে দলে দলে গাছের উপরে, মাঠে, সাহেব-বাঁধে বিচরণ করিতে দেখা যায়। এখানে বাঁধের সংখ্যা যেমন বেশী, তেমনই সেই সকল বাঁধের কাছাকাছি এই পাখীর সংখ্যাও খুব বেশী; তাহা ছাড়া অনেক নীচু জমি এখন জলাশয়ে পরিণত, সেগুলায় জলচর পাখী যেমন মাঝে মাঝে দেখা যায়, তার চেয়েও বেশী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের আশে পাশে বিচরণশীল গো-সালিক। অনেকে একত্র দলবদ্ধ হইয়া থাকাই ইহাদের স্বভাব; এত অধিক গো-সালিকের ঝাঁক পশ্চিম-বাঙ্গালায় এ সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় না। সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে ইহারা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া গিয়া যেখানে রাত্রি যাপন করে, সেই নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষের শাখায় অবতরণ করে। মধ্যাহ্নে বিস্তৃত প্রান্তরের মাঝখান হইতে সহসা এক ঝাঁক গো-সালিক শূন্যে উড়িয়া কিয়দ্দূরে নামিয়া পড়ে, এরূপ দৃশ্য পথিকমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঝাল্‌দের ঘন জঙ্গলের মধ্যে কিন্তু ইহাকে দেখিতে পাইলাম না।

পাউই সালিকেরই জাতি, Sturnidæ পরিবারভুক্ত। ইহাদের মাথা ও ঘাড়ের রং সাদাটে, বুক ও পেট লাল্‌চে; পিঠের রং ধূসর। ইহারাও দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে। ইহাদিগের উড্ডীন গতির বেগ অপেক্ষাকৃত অধিক। কীটভুক্‌ হইলেও ইহারা বন্য ফল খাইতে বড় ভালবাসে; তাই ইহারা বড় বড় বট অশ্বথ বৃক্ষের পত্রান্তরালে অন্যান্য সালিকের সহিত অধিকক্ষণ যাপন করে। লোকালয়ে আসিতে ইহারা সঙ্কোচ বোধ করে; সেই জন্য ইহাদের অপরাপর জাতিবর্গের ন্যায় ইহাদিগকে সর্ব্বত্র মাঠে ঘাটে সব সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় না।

পাউই,
Sturnia malabarica

পুরুলিয়ায় কৃষ্ণশির পাউইকে অতি অল্পই দেখা যায়। লোকালয়ের মধ্যে, বাড়ীর প্রাঙ্গণে, বাগানের ঘাসের উপরে এই পাখীকে মাত্র দুই এক বার দেখিতে পাইলাম।

Temenuchus
pagodarum

গোলাপি সালিক ও গাংসালিক আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে কোথাও আমাদের চোখে পড়িল না, অথচ ঋতুবিশেষে গোলাপি পাখীটাকে সাহেববাঁধের দ্বীপে বহুল সংখ্যায় দেখা যায়; আর গাংসালিক বোধ করি এখানকার পাখী নহে।

Pastor roseus;
A. ginginianus

বঙ্গদেশে সাধারণতঃ যে কয়টা বুলবুল দেখিতে পাওয়া যায়, এখানে তাহাদের কোনওটাকেই দেখা গেল না। যে কালো বুলবুল পুরুলিয়ার পথের পার্শ্বে বাগানে ঝোঁপের ধারে বিচরণ করিতেছে, তাহাকে পর্য্যবেক্ষণ করিলে সহজেই একটা বর্ণবৈষম্য ও দেহায়তনের তারতম্য ধরা পড়ে।

কালো বুলবুল,
Molpastes
hæmorrhous

কালো রংটা মাথার উপর দিয়া পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত ব্যাপৃত না হইয়া স্কন্ধদেশেই থামিয়া গিয়াছে; মোটের উপর পাখীটি তাহার বঙ্গীয় জ্ঞাতির (M. bengalensis) চেয়ে কিছু কম কালো, আয়তনেও সে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র।

কাংড়া বুলবুলের (Otocompsa emeria) কথা মানভূমের প্রাকৃতিক বর্ণনার মধ্যে কেহ কে[illegible] করিয়াছেন, কিন্তু নগরে বা নগরোপান্তে অথবা ঝাল্দের পার্ব্বত্য প্রদেশে একটি কাংড়াও আমার নয়নগোচর হইল না। বুলবুল যাযাবর নহে; স্থায়িভাবে স্থানবিশেষে ভারতবর্ষে অবস্থান করে। মানভূমের অধিবাসী হইলে তাহাকে নিশ্চিতই দেখিতে পাইবার কথা।

বাঙ্গালার পার্ব্বত্য অঞ্চলে যে জরদ্ বুলবুল (Otocompsa flaviventris) আমাদের চোখে পড়ে, মানভূমের পাহাড়তলী জায়গায় তাহার কোনও নিদর্শন পাওয়া গেল না; যদিচ একজন মাত্র বিদেশীয় পক্ষিতত্ত্বজ্ঞের রচিত তালিকায় সে ঢোলভূমের পক্ষিগণভুক্ত হইয়াছে।

হল্‌দে পাখী

বাঙ্গালাদেশে প্রধানতঃ দুই প্রকার হল্‌দে পাখী আমাদের নিকটে পরিচিত,—(১) কৃষ্ণগোকুল (Oriolus melanocephalus), ইহার মাথা, ঘাড় ও গলা কৃষ্ণবর্ণ; (২) কাজলগৌরী (Oriolus indicus), ইহার মাথার পিছনে অর্দ্ধবৃত্তাকার কৃষ্ণরেখা। প্রথমটি বাঙ্গালার স্থায়ী অধিবাসী; দ্বিতীয়টি কিন্তু যাযাবর। শীত ঋতুতে তাহাকে কলিকাতার কাছাকাছি পল্লীমধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। মানভূমে এই দুটিকে ত দেখিতে পাওয়া গেল; তাহা ছাড়া আর একটি হল্‌দে পাখী দৃষ্ট হইল, উহার চোখের কোণে কালো রেখা, কিন্তু মাথাটা সম্পূর্ণ হল্‌দে। এই শেষোক্ত পক্ষীর বৈজ্ঞানিক অভিধা Oriolus kundoo; সংখ্যায় ইহারা অপেক্ষাকৃত অধিক; সমস্ত দিন বৃক্ষের পত্রান্তরালে ইহাদের কল কূজন শ্রুত হয়; কণ্ঠস্বর যখন উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে থাকে, তখন লক্ষ্য করা যায় যে, পুংপক্ষীটা হয় ত স্ত্রীপক্ষীর পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে, অথবা নিকটবর্ত্তী কোনও শাখায় বসিয়া তাহার মনোরঞ্জন করিতেছে।

পুরুলিয়ায় কৃষ্ণগোকুলের সংখ্যা কম বলিয়া মনে হইল, যদিচ ছোটনাগপুর অঞ্চলে তাহার প্রাচুর্য্যের কথা কোনও কোনও বিদেশীয় পক্ষিবিৎ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কাজল-গৌরী পুরুলিয়ায় নেহাৎ কম নহে; অথচ একজন ইংরাজ মানভূমের কোথাও ইহার দেখা পান নাই, রাজমহল পাহাড়ে দুই একটা দেখিয়াছেন মাত্র। এমন কি, তদানীন্তন ছোটনাগপুরের কোথাও ইহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নাই, এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন। বলা বাহুল্য, মানভূম তখন ছোটনাগপুরের অন্তর্গত ছিল।

মাছরাঙা,
Halcyon smyrnensis

মানভূম অঞ্চলে মাছরাঙার চালচলনে কিছুমাত্র ব্যতিক্রম নাই, ঠিক বঙ্গদেশের মত জলাশয়ের ধারে ভক্ষ্য জীবের অপেক্ষায় গাছের উপর বসিয়া থাকিতে অথবা মৎস্য ধরিবার চেষ্টায় জলে ঝাঁপ দিতে দেখা যায়; কখনও বা ভূমির উপরে সঞ্চরমান কৃমিকীট দেখিয়া হয় ত সে গাছ হইতে সহসা অবতরণ করে, অথবা কণ্ঠস্বরে দিগন্ত ধ্বনিত করিয়া বন্ধুর প্রান্তরের উপর দিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়।

'সাহেববাঁধ' এবং অন্যান্য জলাশয়ের ধারে মাছরাঙার একটা ক্ষুদ্রকায় জাতিকে মৎস্য শিকার করিতে দেখা যায়। বড় মাছরাঙার মত কৃমিকীট ভক্ষণ করা ইহার অভ্যাস নহে, কেবলমাত্র মৎস্যই ইহার ভক্ষ্য; এই জন্যই বোধ করি, ইহাকে বাঁধের ধারে ভূমির উপর অথবা অনতিউচ্চ গাছের ডাল হইতে অব্যর্থ সন্ধানে জলমধ্যে ছোট ছোট মাছ ধরিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকিতে দেখা যায়।

মাছরাঙা, ছোট
Alcedo ispida

বড় মাছরাঙার মৎস্যশিকার চেষ্টা হাস্যকর; গাছের উচ্চ ডাল হইতে সবেগে বার বার জল-মধ্যে পতিত হইয়াও সে প্রায় একটিও মাছ চঞ্চুপুটে ধরিতে সমর্থ হয় না; তাহার এই ছোট জাতিটি কিন্তু প্রতিবারই কিছু না কিছু ধরিয়া আনে। কৃমিভুক্ না হইলে বড়টির জীবন ধারণ করা কঠিন হইত; আর এমন অব্যর্থ সন্ধান না থাকিলে ছোটটিও জীবন-সমরে পরাজিত হইত। বর্ণে ও কণ্ঠস্বরে উভয়েই আমাদিগকে আকৃষ্ট করে, তবে ছোটটির কণ্ঠস্বর বড়টির মত তীব্র নহে। এই ছোট মাছরাঙার একটি অত্যন্ত নিকট জাতিকে মানভূমের জঙ্গলে জলাশয়ের ধারে কখনও কখনও মৎস্য শিকার কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে দেখা যায়। এই দুটির মধ্যে আকৃতি ও স্বভাবের বৈলক্ষণ্য বড় বেশী নাই।

Alcedo beavani

ক্রমশঃ

শ্রীসত্যচরণ লাহা

কবি সৈয়দ আলাওলের পদ্মাবতী *

সৈয়দ আলাওল প্রাচীন বাঙ্গালা মুসলমান-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি বলিলে যথেষ্ট হইবে না। বাস্তবিক তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্যে হিন্দু-কবিদের সহিত তুলনায়ও একজন উচ্চপদস্থ কবি ছিলেন বলিতে হইবে। তাঁহার স্থান ভারতচন্দ্র অপেক্ষা কিছুতেই হীন নহে। শ্রদ্ধেয় দীনেশবাবু তাঁহাকে বঙ্গীয় পাঠক-সমাজে সুপরিচিত করিয়াছেন। তাঁহার পদ্মাবতী সাদরে চট্টগ্রামে আজও পঠিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহার একমাত্র বাজার-সংস্করণ এত ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ যে, তাহা হইতে বহু স্থানে পুস্তকের অর্থবোধ করা যায় না। পণ্ডিত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সাহেব অনেক প্রাচীন হিন্দু কবির কাব্যের উদ্ধার করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের এবং ক্ষোভের বিষয় যে, তিনি তাঁহার স্বদেশীয় ও স্বধর্ম্মী এই কবির প্রতি আজও বিমুখ রহিয়াছেন।

বাজার-সংস্করণে পদ্মাবতীর কি দুরবস্থা হইয়াছে, তাহার কয়েকটী নমুনা দিতেছি। প্রথম পৃষ্ঠায়ই দেখিতেছি,—

প্রথমে প্রনাম করি এক করতার ॥
জেই প্রভু জিবদানে স্থাপিল সংসার *
করিল পর্ব্বত আদি যোতির প্রকাশ ॥
তার পরে প্রকটিল সেই কবিলাস *

দীনেশবাবু বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ে (১৩০৭ পৃষ্ঠা হইতে ১৩২৩ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত) আলাওলের যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে আছে,—

প্রথমে প্রণাম করি এক করতার।
যেই প্রভু জীবদানে স্থাপিল সংসার ॥
করিল পর্ব্বত আদি জ্যোতির প্রকাশ।
তার পরে প্রকটিল সেই কবি-লাস ॥

উদ্ধৃত অংশে দীনেশবাবু বাজারের পুথির কেবল বানান সংশোধন করিয়াছেন; কিন্তু প্রকৃত পাঠ উদ্ধার করিতে পারেন নাই। "পর্ব্বত আদি জ্যোতির" কোন অর্থ হয় না। পাদটীকায় কবি-লাস শব্দের অর্থে তিনি বলিতেছেন,—"কবির লাস অর্থাৎ আদিকবির (ব্রহ্মার) ইচ্ছা।" এই অর্থ সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। বাজার-সংস্করণ হিন্দী পদ্মাবতীতে আছে,—

কীন্হেসি প্রথম জ্যোতি পরকাশূ।
কীন্হেসি তিনহি প্রীতি কৈলাশূ ॥ †

---

* ১৩৩১ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নবম মাসিক অধিবেশনে পঠিত

† Asiatic Society of Bengal এর সংস্করণ পদুমাবতির পাঠ,—

কীন্হেসি প্রথম জোতি পরগাসূ।
কীন্হেসি তেহি পরবত কবিলাসূ ॥

অর্থাৎ তিনি প্রথম জ্যোতি প্রকাশ করিলেন। (পরে) তাঁহার প্রীতিতে কৈলাশ করিলেন। এখানে কৈলাশ শব্দের অর্থ স্বর্গলোক। এখানে দরবেশ মলিক মুহম্মদ জায়সী ইস্লাম শাস্ত্র অনুযায়ী সৃষ্টি বর্ণনা করিতেছেন। এই মতে আল্লাহ্ তা'আলা প্রথম আদি জ্যোতিঃ (নূরে মুহম্মদী) সৃষ্টি করেন। পরে তাঁহার প্রীতির জন্য বিশ্বভুবন সৃষ্টি করেন। অন্য স্থানে হযরতের গুণ বর্ণনায় কবি বলিয়াছেন,—

কীন্হেসি পুরুখ এক নিরমরা
নাউঁ মুহম্মদ পুনিউঁ করা॥
প্রথম জোতি বিধি তেহি কই সাজী।
অউ তেহি প্রীতি সিসিটি উপরাজী॥

A. S. B. সংস্করণ, ১৪ পৃঃ।

এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া মনে হয়, বিশুদ্ধ পাঠ নিম্নলিখিতরূপ ছিল,—

করিল প্রথমে আদি-জ্যোতির প্রকাশ।
তার পরে প্রকটিল যেই কবিলাশ॥

ইহার অর্থে বলা হইয়াছে—জিস নে পহিলে জ্যোতিঃস্বরূপ (মহাদেব)কো প্রকাশ কিয়া ঔর উসকে লিয়ে কৈলাস পর্ব্বতকো কিয়া। (মসলানোঁ মেঁ কহাবত হৈ কি হিংদুওঁকা মহাদেব হমারে লোগোঁকা আদম হৈ)॥ এখানে কবিলাস = কৈলাশকে মহাদেবের কৈলাশ মনে করায় ভ্রম হইয়াছে। গ্রন্থকার বহু স্থানে কবিলাস স্বর্গ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন ; যথা,—

সাত সহস হসতী সিংঘলী॥
জনু কবিলাস ইরাবতী বলী॥ A. S. B. সংস্করণ, ৩৯ পৃঃ।

অর্থাৎ সিংহল দেশে সাত সহস্র হস্তী, যেন স্বর্গে (= কবিলাস) বলী ঐরাবত।

উঁচী পবঁরী উঁচ অবাসা।
জনু কবিলাস ইঁদর কর বাসা॥ ঐ সংস্করণ, ৫৫ পৃঃ।

অর্থাৎ উঁচু দেউড়ী, উঁচু আবাস, যেন ইন্দ্রের বাসস্থান স্বর্গ (= কবিলাস)।

কংচন বিরিখ এক তেহি পাসা।
জস কলপতরু ইঁদর কবিলাসা॥ ঐ সংস্করণ, ৬৬ পৃঃ।

অর্থাৎ তার পাশে এক কাঞ্চন বৃক্ষ, যেমন ইন্দ্রের স্বর্গে (= কবিলাস) কল্পতরু।

বরনউঁ রাজ মঁদির রনিবাঁসু।
অছরিন ভরা জানু কবিলাসু॥ ঐ সংস্করণ, ৭৫ পৃঃ।

অর্থাৎ রাজমন্দির রাণী-নিবাস বর্ণন করি। সেগুলি যেন অপ্সরা-ভরা স্বর্গ (= কবিলাস)। ইত্যাদি বহু স্থানে। A. S. B. সংস্করণের অবলম্বিত দুইখানি পুথিতে 'পরবত' স্থানে 'প্রীতি' আছে। তাহাই শুদ্ধ পাঠ। প্রথম জ্যোতি হযরত মুহম্মদ, মহাদেব নহেন। মহাদেব যে আদম, এ কথা মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত নাই। আমি যে অর্থ দিয়াছি, তাহা গ্রন্থকারের অন্য শ্লোক দ্বারা সমর্থিত।—লেখক।

পুথির দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় আছে,—

কাকে কল্য নির্ব্বলি কাহাকে বলি আর ॥
হাড় হস্তে নিম্মিয়া করায় পুনি হাড় *

দীনেশ বাবুর সংশোধিত পাঠ,—

কাকে কল্য নির্ব্বলী কাহাকে বলী আর।
হাড় হস্তে নির্ম্মিয়া করয় পুনি হাড় ॥

তিনি পাদটীকায় লিখিতেছেন,—অস্থি হইতে নির্ম্মাণ করিয়া পুনরায় অস্থিতে পরিণত করেন। এখানে অর্থের সঙ্গতি হইতেছে না। হিন্দী পুস্তকে আছে,—

কীহেসি কোই নিভরোসী, কীহেসি কোই বরিআর।
ছারহি তইঁ সব কীহেসি, পুনি কীহেসি সব ছার ॥

—A. S. B. সংস্করণ, ৫ পৃঃ।

অর্থাৎ কাহাকে দুর্ব্বল (নিভরোসী) করিলেন, কাহাকে বলবান্ করিলেন। ধূলি (ছার) হইতে সব তিনি করেন, পুনরায় সকলকে তিনি ধূলি করেন। বিশুদ্ধ পাঠ এইরূপ হইবে,—

কাকে কৈল নির্ব্বলী, কাহাকে বলী আর।
ছার হস্তে নির্ম্মিয়া করয় পুনি ছার ॥

পুথির চতুর্থ পৃষ্ঠায় আছে,—

অনেক অপার অতি প্রভুর করণ ॥
কহিতে অপূর্ব্ব কথা না যায় বর্ণন *
সপ্ত মহি সপ্ত স্বর্গ বৃক্ষপাত মত ॥
সপ্ত সুম্ভ ভরী যদি স্বজয় বেকত *
এ সপ্ত সাগর আদি জতো নদা নদী ॥
দিঘী পুস্কর্ণি কুপ মহি হয় যদি *
জতো বিধী নবগৃহ আর বৃক্ষ সাখা ॥
যত লোমা বলি আর জতো পক্ষি পাখা *
পৃথিবীর জতো রেনু স্বর্গে জতো তারা ॥
জিব বস্ত স্বাস আর বরীখের ধারা *
জোগে জোগে বসী জদী অস্তত লেখয়।
সহস্র ভাগের এক ভাগ নাহী হয় *

দীনেশবাবু ইহার কিছু অংশ (সম্ভবতঃ অবোধ্য বিবেচনায়) বর্জ্জন করিয়া নিম্নলিখিতরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

অনেক অপার অতি প্রভুর করণ।
কহিতে অকথ্য কথা না যায় বর্ণন ॥
সপ্ত মহী সপ্ত স্বর্গ বৃক্ষপত্র যত।
সপ্ত শূন্য ভরি যদি সৃজয় জগত ॥
যতবিধ নবগৃহ আর বৃক্ষ-শাখা।
যত লোমাবলী আর যত পক্ষী-পাখা ॥
পৃথিবীর যত রেণু স্বর্গে যত তারা।
জীব জন্তু শ্বাস আর বরিষার ধারা ॥
যুগে যুগে বসি যদি স্তুতিএ লেখয়।
সহস্র ভাগের এক ভাগ নাহি হয় ॥

মূল হিন্দীতে আছে,—

অতি অপার করতাকর করনা।
বরনি ন পারই কাহু বরনা ॥
সাত সরগ জউঁ কাগদ করঈ।
ধরতী সাত সমুদ মসি ভরঈ ॥
জাবঁত জগত সাখ বন ঢাঁখা।
জাবঁত কেস রোবঁ পঁখি পাঁখা ॥
জাবঁত খেহ রেহ জহঁ তাঁই।*
মেঘ বূঁদ অউ গগন তরাঈঁ ॥
সব লিখনী কই লিখু সংসারূ।
লিখি ন জাই গতি সমুদ অপারূ ॥　A. S. B. সংস্করণ, ১৩ পৃঃ।

অর্থাৎ কর্ত্তার কার্য্য অতি অপার। কে তাহা বর্ণন করিতে পারে? যদি সাত স্বর্গ কাগজ হয় (এবং) ধরিত্রীর সাত সমুদ্র মসী ভরা হয়, (আর) যত জগতের শাখা, বন জঙ্গল, যত কেশ, লোম, পক্ষি-পাখা, যত মাটি বালি, বৃষ্টি-বিন্দু আর গগনের তারা, সব লেখনী করিয়া সংসার লিখিতে থাকে, (তবুও) অপার সমুদ্রের ন্যায় (তাঁহার) গতি লিখা যায় না।

পুথির বিশুদ্ধ পাঠ সম্ভবতঃ এইরূপ ছিল,—

অনেক অপার অতি প্রভুর করণ।
কহিতে অপূর্ব্ব কথা না যায় বর্ণন ॥
সপ্ত মহী সপ্ত স্বর্গ বৃক্ষপত্র যত।
সপ্তশূন্য ভরি যদি সৃজয় কাগত ॥

---

* বাজার সংস্করণে 'জহঁ তাঁই' স্থানে 'ঢুনয়াঈ'। A. S. B. সংস্করণের কয়েকটী মূল পুথিতে 'ঢুনিয়াঈ' পাঠ আছে। তাহাই মূলের শুদ্ধ পাঠ বলিয়া মনে হয়।—লেখক।

এ সপ্ত সাগর আদি যত নদ নদী।
দীঘি পুষ্করিণী কূপ মসী হয় যদি॥
যতবিধ বন গৃহ আর বৃক্ষ-শাখা।
যত লোমাবলী আর যত পক্ষী-পাখা॥
পৃথিবীর যত রেণু স্বর্গে যত তারা।
জীব জন্তু শ্বাস আর বরিষার ধারা॥
যুগে যুগে বসি যদি অস্তুতি লেখয়।
সহস্র ভাগের এক ভাগ নাহি হয়॥

স্তুতি স্থানে হিন্দী অস্তুতি। এই বর্ণনা কুর্‌আন শরীফের নিম্নলিখিত আয়ত দুইটীর প্রতিধ্বনি,—"এবং পৃথিবীতে যে সকল বৃক্ষ আছে, যদি তাহা লেখনী হয় ও সাগর তাহার মসী হয়, তাহার পরে (অন্ত) সপ্ত সাগর হয়, তথাপি আল্লার কথা সমাপ্ত হইবে না, নিশ্চয় আল্লাহ বিজেতা ও বিজ্ঞানময়।" (সূরাহ লুক্‌মান)। "তুমি বল যে আমার প্রতিপালকের বচনাবলী (লিপির) জন্য যদি সাগর মসী হয়, এবং যদিচ আমরা তৎসদৃশ সাহায্য আনয়ন করি, আমার প্রতিপালকের বচনাবলী সমাপ্ত হওয়ার পূর্ব্বে অবশ্য সমুদ্র সমাপ্ত হইবে।" (সূরাহ কহফ)।

পুথির অষ্টম পৃষ্ঠায় আছে,—

লল্লাট উজ্জল শশি পিউ সবরিসে হাঁসি,
কটাক্ষে মুহিত জবাকুল।

বিশুদ্ধ পাঠ হইবে,—

ললাট উজ্জল শশী, পীযূষ বরিষে হাসি,
কটাক্ষে মোহিত যুবাকুল।

হায় রে! কোথায় যুবাকুল, আর কোথায় জবাকুল! পরবর্ত্তী সংস্কারক হয় ত জবাফুল করিয়া ফেলিবেন।

পুথির ১৯ পৃষ্ঠায় আছে,—

হিন্দুস্থানি ভাবে দীপ নাম এহি বলি॥
জম্বো দিপ পক্ষ আর সক্রেশ শুস্থলি *
কুস দিপ এঞ্চু দিপ সপ্তম কহিল॥
পুস্পের দরিয়া দিপ সপ্তমে পুরিল *

এখানে কবি সপ্ত দ্বীপের বর্ণনা করিতেছেন। কিন্তু তাহাদের নামগুলি কি চমৎকার মৌলিক! বিশুদ্ধ পাঠ এইরূপ হইবে,—

হিন্দুস্থানী ভাষে দ্বীপ-নাম এহি বলি।
জম্বুদ্বীপ প্লক্ষ আর শাক ও শাল্মলি॥

কুশদ্বীপ ক্রৌঞ্চদ্বীপ ষষ্ঠম কহিল।
পুষ্কর বলিয়া দ্বীপ সপ্তমে পুরিল ॥

অজ্ঞ লিপিকরের হাতে আজ সৈয়দ আলাওলের কি দুর্দ্দশা হইয়াছে! মূল হিন্দীর সহিত মিলাইয়া এবং অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া অনেক স্থলে বিশুদ্ধ পাঠ উদ্ধার করা যায়, সন্দেহ নাই। কিন্তু অনেক স্থল এরূপ আছে, যেখানে প্রাচীন পুথি ব্যতীত প্রকৃত পাঠ নির্ণয় করা একেবারে অসম্ভব। দু-একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। বাজারের পুথির ১০ম পৃষ্ঠায় আছে,—

নানা দেসে নানা লোগ, সুনিয়া রোসাঙ্গ ভোগ;
আইসেন্ত নৃপ ছায়াতল। আরবি মিসীর স্থামি,
তুরুকী হাবেসী রুমি, খোরাসানি উজেগ সকল *
লাহুরী মুলতানী সিন্দি, কাসমিরী দক্ষিনী হিন্দী,
কামরোপি আর বঙ্গদেশি ॥ **অহুপিহ**
খুতখণ্ডালি; **কান্নাই** ময়লা বারি, **আছুন্দরী**
কর্ণাঠ **কবাসি** * বহু সেখ সৈএদজাদা,
মোগল পাঠান জুজ্ঝা, রাজপুত্র হিন্দু নানাজাতি ॥
অভাসি করমা স্থাম, ত্রিপুরা কুকির নাম,
কতেক কহিব তাতি ২ * আরমানি অলগুাজ,
ডিনমার ইংরাজ, **কাণ্টিমান** আর ফ্রান্সিস ॥
কামরিভ ফাসমানি, **চোলদার** নসরানী, নানা
জাতি আর **প্রতংকেচ** *

এই উদ্ধৃত অংশের চিহ্নিত শব্দগুলির প্রকৃত পাঠ স্থির করা দুরূহ। পুথির ৯ পৃষ্ঠায় রোসাঙ্গ-রাজের নৌকার বর্ণনায় কবি বলিতেছেন,—

নানাবর্ণ নৌকা সাজে, নাহি শম ক্ষেতি মাজে,
গল্লিয়া অগন ডিঙ্গা রঙ্গে ॥ সমুপা নানান
তাতি, মচুয়া গোরাপ পাতি, জালিয়া নায়রি
নানা রঙ্গে * কোসদা আহুতি ভাল, ফেরাঙ্গির
বজ্রসাল, সাতাইস দাবলা সিংসার। গুন্দর
খেলন রঙ্গি; পিক সব সরি ভঙ্গি, মগদের
নানা বর্ণ আর *

এখানেও সব কথার অর্থবোধ হয় না। কিন্তু প্রাচীন বিশুদ্ধ পুথি ব্যতীত ভ্রান্ত পাঠ সংশোধনের উপায় কি? বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় আলাওলের কোন হস্তলিখিত পুথি নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একখানি আধুনিক হস্তলিখিত পুথি আছে। কিন্তু তাহা বিশুদ্ধ নহে। পণ্ডিত আবদুল করিম সাহেবের নিকট কয়েকখানি প্রাচীন পুথি আছে এবং তিনি

একটী আদর্শ সংস্করণ প্রস্তুত করিতে বহু দিন হইতে ইচ্ছুক আছেন জানি। কিন্তু তাঁহার কার্য্য-বাহুল্য। কয়েকখানি প্রাচীন বিশুদ্ধ পুথি পাইলে আমি এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারি। আশা করি, চট্টগ্রামের বিদ্যোৎসাহী মহোদয়গণ, বিশেষতঃ বন্ধুবর আবদুল করিম সাহেব এ বিষয়ে সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। কবে বাঙ্গালী মুসলমানের গৌরব এই কবিরত্নের কাব্যের উদ্ধার হইবে, তাহার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌

"বাঙ্গালা ভাষায় অনুজ্ঞা" প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য *

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মহাশয় বাঙ্গলা[১] ভাষায় অনুজ্ঞার রূপের যে উৎপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে দুই চারিটী বিষয়ে আমি তাঁহার সহিত একমত হইতে পারিতেছি না।

সাধারণ অনুজ্ঞা (বা বর্ত্তমান কালের অনুজ্ঞা) মধ্যম পুরুষের রূপের যে উৎপত্তি নির্ণয় তিনি করিয়াছেন (যেমন 'চর্, চর' < 'চর, চরহ' < 'চর, চরথ+চরত'), সে বিষয়ে কিছু বক্তব্য নাই। প্রথম পুরুষের সম্বন্ধে খালি এইটুকু বলা আবশ্যক মনে করি যে, প্রথম পুরুষের বহুবচনে (=আধুনিক সম্ভ্রমসূচক প্রথম ও মধ্যম পুরুষে) যে 'উন্' প্রত্যয় বাঙ্গলায় আমরা পাই ('চরুন' ='চর্+উন'), তাহা মূলে আদি-আর্য্যভাষার (সংস্কৃতের) '-অন্তু' প্রত্যয় হইতে উদ্ভূত হইলেও ইহার বিকাশ স্বাভাবিক ভাবে হয় নাই ; সংস্কৃত 'ন্তু' বাঙ্গলায় হয় ''ত'-তে, নয় কেবল 'ন্ত'য়ে পরিণত হইয়া থাকে (যেমন 'দন্ত > দাঁত', 'ত্বরন্ত-> তুরিৎ', 'চলন্ত-> চলিত', 'গৃহ+অন্ত < ঘরত্'[=ঘরে], 'অন্তরে > তরে' [৪র্থীতে], ইত্যাদি), 'ন'-য়ে নহে। 'চলন্তি > চলেন, চলন্তু > চলুন'—এখানে 'ন্তু'র 'ন'য়ে পরিণতি হইল কিরূপে ? এই 'ন' হইতেছে বিশেষ্য পদের বহুবচন-দ্যোতক প্রত্যয়ের প্রভাবে ; সংস্কৃতের ষষ্ঠীর বহুবচনে যে '-আনাম্' প্রত্যয় পাওয়া যায়, প্রাকৃতে তাহা '-আনং, -আন, -আণং, -আণ, -ন,-ণ' রূপে মেলে ; এবং এই '-ন, -ণ' আধুনিক আর্য্যভাষায় বহু স্থলে প্রথমা ও অন্যান্য বিভক্তিরও বহুবচনের প্রত্যয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে (যেমন ব্রজভাষায় 'ঘোরন, ঘোড়ন', পূর্ব্বী হিন্দীতে 'ঘোড়ন', মৈথিলীতে 'ঘোড়নি' ইত্যাদি)। বাঙ্গলায়ও এই বহুবচনের '-ন' বিদ্যমান ছিল, এবং '-গুলা-ন্', প্রাদেশিক 'গুলাইঁ, লোকাইঁ,

---

* ১৩৩১ সাল ১লা চৈত্র বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একত্রিংশ বর্ষের নবম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ্ 'বাঙ্গলা' এইরূপ বানান সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, ইহা না বুৎপত্তিসঙ্গত, না উচ্চারণসঙ্গত ; তিনি 'বাংলা' এইরূপ বানানের পক্ষপাতী। 'বঙ্গাল' > 'বাঙ্গাল, বাঙাল' ; 'বঙ্গাল+আ' > 'বাঙ্গালা' > আধুনিক 'বাঙ্গ্লা, বাঙ্লা' ; 'ঙ্গ' হইতে 'গ' এর লোপে 'ঙ্' উচ্চারণ, এবং আদ্য অক্ষরে স্বরাঘাত বলিষ্ঠ হওয়ায় মধ্যস্থিত অক্ষরের 'আ'-কারের লোপ। 'ঙ্গ'এর দুই প্রকার উচ্চারণ বঙ্গভাষায় বিদ্যমান ; [১] 'ঙ্গ', [২] 'ঙ' ; 'বাঙ্গালা' > 'বা'ঙ্গ্লা', এই বানান ব্যুৎপত্তি ও আধুনিক উচ্চারণ, উভয়েরই অনুগামী। সংস্কৃতে অনুস্বারের উচ্চারণ ছিল, যে স্বরের পরে অনুস্বারের প্রয়োগ হইত, সেই স্বরের অনুনাসিক প্রলম্বীকরণরূপে ; 'অং'='অঅঁ', 'ইং'='ইইঁ', 'উং'='উউঁ' ইত্যাদি। এইরূপ উচ্চারণ প্রাকৃতেও ছিল ; এবং আধুনিক ভারতীয় আর্য্য-ভাষায় তদ্ভব শব্দাবলীতে অনুস্বার অনুনাসিকরূপেই পর্য্যবসিত হইয়াছে ; যেমন 'করণকম্, করণকং' > 'করণয়ং' > মারহাট্টী 'করণেঁ' ; 'চলিতব্যাকং' > 'চলিঅব্ববউং' < গুজরাটী 'চলবুঁ'। আধুনিক যুগের সংস্কৃত উচ্চারণে ও তৎসম শব্দের উচ্চারণে ভারতের নানা প্রদেশে অনুস্বারের প্রাচীন উচ্চারণ আর রক্ষিত নাই, নানা বিশিষ্ট নাসিক্য ধ্বনিতে ইহার বিকার ঘটিয়া গিয়াছে। যেমন দক্ষিণ-ভারতে 'ং'='ম্', 'হংসঃ'='হম্সঃ' ; বঙ্গদেশে 'ং'='ঙ্', 'হংসঃ'='হঙ্শঃ', 'সংস্কৃতম্'='শঙ-শ্ক্রিতম্' ; উত্তর-ভারতে 'ং'='ন্', 'হংসঃ, বংশঃ'='হন্স্, বন্স্', ইত্যাদি। সুতরাং 'বাঙ্গলা, বাঙ্লা' কে 'বাংলা' (অর্থাৎ কিনা 'বাঅঁলা') লিখিলে, অনুস্বারের সংস্কৃত উচ্চারণ ধরিলে এই বানানকেই অশুদ্ধ বলিতে হয়।

লোকাইন্' প্রভৃতিরূপে এই 'ন'কারের অস্তিত্ব আছে[১]। '-ন্তু, -ন্তু'র 'ন'য়ে পরিবর্তনে এই বিশেষ্য পদের '-ন'-কারের প্রভাব আছে বলিয়া মনে হয়। মারহাট্টী 'চরোৎ, চরুৎ-তে' দেখা যাইতেছে যে, '-ন্তু'র 'ওৎ, উৎ' -তে স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারেই পরিবর্তন হইয়াছে।

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার উৎপত্তি শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ এইরূপে নির্দেশ করিয়াছেন :—

	উত্তম পুরুষ		মধ্যম পুরুষ		প্রথম পুরুষ	
	একবচনে	বহুবচনে	একবচনে	বহুবচনে	একবচনে	বহুবচনে
সংস্কৃত	চরিষ্যামি	চরিষ্যামঃ	চরিষ্যসি	চরিষ্যথ	চরিষ্যতি	চরিষ্যন্তি
বাঙ্গলা	চরিউ, চরিউ	চরিমো	*চরিসি	চরিহ	চরিহে, চরিএ	×

ইহার মধ্যে মধ্যম পুরুষ ও প্রথম পুরুষের রূপের উৎপত্তি লইয়া আমার ঐকমত্য আছে। যদিও 'চরিএ'র মত 'হ'-কার-বিহীন '-ইএ' যুক্ত পদকে আমার মূলে কর্ম্ম-বাচ্যের পদ বলিয়াই মনে হয়—এক 'হ'কারযুক্ত রূপকেই ভবিষ্যতের রূপ বলিয়া আমি নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিতে পারি। (এ সম্বন্ধে বিচার ১৩৩০ সালের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় মৎপ্রণীত 'বাঙ্গলাভাষায় কর্ম্ম- ও ভাব-বাচ্যের ক্রিয়া' শীর্ষক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য—পৃঃ ৫৭ প্রভৃতি)।

কিন্তু উত্তম পুরুষের 'চরিমো, চরিউ, চরিউ' এই পদগুলি যে সংস্কৃত 'চরিষ্যামি', চরিষ্যামঃ' হইতে হইয়াছে, তাহা আমি স্বীকার করিতে পারি না। 'চরিমো, চরিউ' এইরূপ 'মো' ও 'ইউ' প্রত্যয় দুইটীর, একটির সহিত আর একটীর একবচন-বহুবচন সম্পর্ক বা অর্থগত সাদৃশ্য কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। বাঙ্গলা ভাষায় চর্য্যাপদের যুগ হইতেই ক্রিয়ার একবচন ও বহুবচনের পার্থক্য বিলুপ্ত হইয়া যায়, সুতরাং কেবল এ ক্ষেত্রে এই পার্থক্য বিদ্যমান থাকা একটু অস্বাভাবিক। অপর, 'মো' বা 'ইমো' প্রত্যয়ান্ত রূপ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে দুষ্প্রাপ্য—শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহের উদ্ধৃত এক 'বঞ্চিমো' (শ্রীকৃ-কীঃ, পৃঃ ৩৮৭) ছাড়া অন্যত্র অপ্রাপ্য বলিলেই হয়। অন্যান্য ক্রিয়ার উত্তম পুরুষে 'ইবোঁ' প্রত্যয়ই পাওয়া যাইতেছে—'করিবোঁ, জাণিবোঁ, খাইবোঁ', ইত্যাদি। (এই 'ইবোঁ'র উৎপত্তি এইরূপ : '-ইতব্য' <'ইঅব্‌ব' <'ইব্‌ব' <'ইব',+'হোঁ'<'হউঁ, হাঁউ' <'হৰ্ঁ'<'হউং' <হকং<'অহকং'<'অহং' : 'চলিতব্য (ক)+অহ(ক)ম্'<'চলিব(া)+হোঁ'>'চলিবাহোঁ,চলিবহোঁ, চলিবোঁ'।) 'বঞ্চিমো' পদ 'বঞ্চিবোঁ'র বিকারেই উদ্ভূত। শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ্ 'ইষ্যামঃ—ইষ্যামি'

১। শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ্ আধুনিক বাঙ্গলার 'তিনি' পদকে সংস্কৃত ক্লীবলিঙ্গ বহুবচন 'তানি' হইতে আগত বলিয়া ধরিয়াছেন। কিন্তু 'তানি' কিছুতেই 'তিনি'র মূল হইতে পারে না ; 'তিনি' প্রা° বা° তে 'তিহঁ, তেহঁ' রূপে মেলে ; 'তেহঁ, তিহঁ'='তেন্‌হ, তিন্‌হ'='*তেন, তেন°,'='তাণং' (>প্রাদেশিক বাঙ্গলা 'তান' =তাঁহার)='*তানাম্,' 'তেষাম্' স্থলে ; 'তেহঁ, তিন্‌হ, তেন, তান' প্রভৃতি মূলে এই 'ন'কারযুক্ত ষষ্ঠীর বহুবচনের রূপ ; 'তেহঁ, তেন' পদে 'ই' প্রত্যয়, (যাহার মূল হইতেছে তৃতীয়ার -'এভিঃ>-এহি>-হি' প্রত্যয়) যোগ করিয়া '*তেঁহি, তেনি>তিনি'র উৎপত্তি। সংস্কৃত শব্দের অন্ত্য স্বর বাঙ্গলায় প্রায় সর্ব্বত্রই লুপ্ত ; যেখানে লোপ হয় নাই, সেখানে বিশেষ কারণ আছে, এবং সে কারণগুলির একটিও 'তানি'র মতো পদকে বাঙ্গালায় ই-কারান্ত করিয়া রাখিবার পক্ষে সমর্থক নহে।

হইতে যথাক্রমে 'ইমো—ইউ' প্রত্যয়দ্বয়ের উৎপত্তি নির্দ্দেশ করিয়া একটু সন্দেহের সঙ্গে বলিয়াছেন, "ব্যুৎপত্তি হইতে দেখা যাইতেছে যে, 'চরিউ' ও 'চরিমো' এই উভয়ের মধ্যে বচন পরিবর্ত্তন হইয়াছে।" ইহা অতীব অদ্ভুত ব্যাপার। যাহা সংস্কৃতে ছিল বহুবচন, তাহা বাঙ্গলায় হইল একবচন; এবং সংস্কৃতের একবচনের প্রত্যয় বাঙ্গলায় দাঁড়াইল বহুবচন। 'ইমো' প্রত্যয় 'ইবোঁ'র বিকারেই উদ্ভূত, এবং এই 'ইমো' শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে অতি বিরল; ইহার সহিত 'ইউ'এর কোনও সম্বন্ধ নাই। 'ইউ'র উৎপত্তি সম্বন্ধে আমার মত আমি "বাঙ্গলাভাষায় কর্ম্ম ও ভাববাচ্যের ক্রিয়া" প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছি (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩০, পৃঃ ৬৯)। 'ইউ' যদি 'ইষ্যামি' (বা 'ইষ্যামঃ') হইতে উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে আমরা সানুনাসিক রূপ ('ইউঁ') পাইতাম। অবশ্য, কৃত্তিবাস হইতে উদ্ধৃত উদাহরণে 'ইউঁ' পাইতেছি; কিন্তু কৃত্তিবাস ঢের পরের লেখক, এবং যে পুথি দুইখানি হইতে পরিষদের অযোধ্যা ও উত্তরাকাণ্ড মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাদের বয়স ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দ ও ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দ; তখন 'ইউ' এই কর্ম্মবাচ্যের ক্রিয়ার প্রয়োগ লুপ্তপ্রায়, সে সময়ে অনাবশ্যক চন্দ্রবিন্দু একটা লিপিকর-প্রমাদ হেতু আসিয়া যাওয়া অসম্ভব নহে। 'ইষ্যামঃ' হইতে 'ইমো'র উৎপত্তি বিষয়ে দুইটা অন্তরায় আছে—[১] সংস্কৃতের অন্ত্য স্বর আধুনিক বাঙ্গলার তদ্ভব পদে বর্ত্তমান থাকে না, [২] সংস্কৃতের দুই স্বরধ্বনির মধ্যে একক অবস্থিত 'ম' বাঙ্গলায় ও অন্যান্য আধুনিক আর্য্যভাষায় 'ৱঁ' ও পরে কেবলমাত্র 'ঁ' তে পরিণত হয়, যেমন 'ভূমি—ভুঁই, স্বামী—সাঁই, সংক্রম—সাঁকোঁ >সাঁকো, গ্রাম—গাঁ, নাম—নাঁ, না' ('কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি, সে না কোন জনা'=কঃ নাম বংশীং বাদয়তে, স নাম কঃ পুনঃ জনঃ)। (যেখানে তৎসম শব্দের বিশেষ প্রভাব আছে, সেখানে ক্বচিৎ 'ম'কারের পুনরধিষ্ঠান ঘটিয়াছে, যেমন 'নাম—না', মারহাট্টি 'নাঁৱ', কিন্তু বাঙ্গলায় সাধারণ ভাবে ব্যবহৃত হয় 'ম'যুক্ত রূপ, 'নাম')।

সংস্কৃতের ভবিষ্যৎ বা লৃট্-এর পদের মধ্যে একমাত্র মধ্যম পুরুষের পদ আজকাল বিদ্যমান, '-ইহ>-ইও' প্রত্যয়ান্ত হইয়া। পশ্চিমভারতীয় পাঞ্জাবী, গুজরাটী, মধ্যদেশের ব্রজভাষা কনৌজিয়া বুন্দেলী, এবং কতকটা পূর্ব্বী-হিন্দী ও ভোজপুরিয়া ছাড়া অন্যান্য আর্য্যভাষায় ইহার ব্যবহার লুপ্তপ্রায়। যেখানে লুপ্ত, সেখানে নূতন প্রত্যয়ের প্রয়োগ আসিয়া গিয়াছে; যেমন 'ইতব্য >-ইব, অব'; শতৃর 'অন্ত >অন্দ, অৎ'।

প্রাদেশিক বাঙ্গলায় ও প্রাচীন বাঙ্গলায় যে '-ইম, ইমু, মু, মোঁ' প্রত্যয় পাওয়া যায়, উত্তম পুরুষের ভবিষ্যতে, তাহা প্রাচীন বাঙ্গলায় 'ইবাহোঁ>'ইবোঁ' হইতেই জাত; চন্দ্রবিন্দু-যুক্ত 'বঁ'র 'ম'য়ে পরিণতি খুবই স্বাভাবিক; 'বোঁ>ৱোঁ>ঙো, ঙ, মো, ম' ইত্যাদি। (প্রাচীন বাঙ্গলায় 'ঙ'=ৱঁ'।) চন্দ্রবিন্দু না থাকিলেও দুই স্বরের মধ্যস্থ কেবল 'ব'এর 'ম'এ পরিণতি অন্যত্র সুলভ; তুলনীয়, উড়িয়া 'দেখিবি<দেখিমি' (উত্তম পুরুষে), মগহী 'লেমা, করমা, চলমা<লেবা, করবা, চলমা' (মধ্যম পুরুষে)।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

আলোচনা

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—

মাননীয় সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পঠিত প্রবন্ধের সম্বন্ধে আমাকে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেবের "বাঙ্গালা ভাষায় অনুজ্ঞা" শীর্ষক প্রবন্ধটী আমি ভাল করিয়া পড়িতে পারি নাই। শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবু ঐ প্রবন্ধটীর সম্বন্ধে যে সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা শুনিয়া আমার মনে দুই একটী বিষয়ে যে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, আমি সে সম্বন্ধেই এখন দুই চারিটী কথা বলিব। আজকাল বাঙ্গালা-সাহিত্যে ভাষাতত্ত্বের আলোচনা বড় একটা দেখা যায় না। বড়ই আনন্দের বিষয় যে, ভাষা-তত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবু, পণ্ডিত শহীদুল্লাহ্ সাহেব, আর তাঁদের মতই আরও দুই এক জন ভাষা-তত্ত্বের আলোচনা করিতেছেন। সুনীতিবাবু এ বিষয়ে আমার অপেক্ষা শতগুণে বেশী অধ্যয়ন ও গবেষণা করিয়াছেন; তিনি এজন্য আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। তাঁহার এই প্রবন্ধটী সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে—আমাদের এ সম্বন্ধে আলোচনা করার সুবিধা হইবে। যাহা হউক, সুনীতি বাবুর মন্তব্য সম্বন্ধে আমার মনে যে সন্দেহ উদিত হইয়াছে, তাহা এই,—

[১] সংস্কৃতের 'তব্য' প্রত্যয়ের অর্থের সহিত ভবিষ্যৎ-কালের ক্রিয়া-বিভক্তির একটু সাদৃশ্য আছে—সন্দেহ নাই; এবং বিভক্তিগুলির বাহুল্য ও জটিলতার বর্জ্জন দ্বারা উহাদের সরলতা-পাদনের দিকেই সকল অপভ্রংশের গতি—ইহাও সত্য বটে; কিন্তু সংস্কৃত 'তব্য' প্রত্যয় হইতে বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়া বিভক্তির 'ব' (করিব, যাইব, খাইব ইত্যাদির) উদ্ভূত হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিলে দেখা যাইবে যে, এ স্থলে সহজ ও স্বাভাবিক 'সে যাইব' (প্রাচীন বাঙ্গালা); 'তুমি যাইবা', 'মুঞি যাইমু' (প্রাচীন বাঙ্গালা) ইত্যাদির direct বা সরল উক্তির পরিবর্ত্তে 'তাহা কর্ত্তৃক যাওয়া হউক' ('তেন গন্তব্যং'), 'আমা কর্ত্তৃক যাওয়া হউক ('ময়া গন্তব্যং'), ইত্যাদি indirect ও round-about অর্থাৎ ঘুরাইয়া বলা বাক্য-রীতি প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রাচীন বা আধুনিক বাঙ্গালা ভাষার ভবিষ্যতের 'সে যাইব,' 'মুঞি যাইমু' ইত্যাদি প্রয়োগের মধ্যে কর্ত্তৃ-পদে, প্রথমা বিভক্তি ছাড়া 'তব্য' প্রত্যয়ের জন্য অপরিহার্য্য তৃতীয়া বিভক্তির ব্যবহার দেখিতে পাই না; এরূপ অবস্থায় সংস্কৃত 'তব্য' প্রত্যয় হইতেই ভবিষ্যতের ক্রিয়া-বিভক্তির 'ব'কার উদ্ভূত হইয়াছে কি না, সে বিষয়ে মনে খুবই সন্দেহ জন্মে।

[২] সংস্কৃত 'তব্য' প্রত্যয় হইতেই বাঙ্গালা ভবিষ্যতের ক্রিয়া-বিভক্তি 'ব'-কারের উৎপত্তি হইয়াছে, স্বীকার করিলেও, 'তব্য' প্রত্যয়ের রূপ প্রথম পুরুষ মধ্যম-পুরুষ ও উত্তম-পুরুষ—তিন পুরুষেই এক প্রকার বলিয়া, বাঙ্গালার ভবিষ্যতের উত্তম-পুরুষেও 'মুঞি করিমু' স্থলে 'মুঞি করিব' প্রয়োগ দৃষ্ট হওয়াই সম্ভবপর ছিল, কিন্তু সেরূপ না হইয়া 'মুঞি করিমু', 'মুঞি যাইমু' ইত্যাদি প্রয়োগ দৃষ্ট হওয়ায় সংস্কৃতের বর্ত্তমানের 'করোমি' 'যামি' ইত্যাদি অপভ্রংশে প্রাচীন বাঙ্গালার 'করোঁ' 'যাওঁ' 'যাউঁ', 'যাঙ' ইত্যাদির ন্যায় সংস্কৃত- ভবিষ্যতের 'স্যামি' বিভক্তি হইতেই 'করিমু' 'যামু' ইত্যাদির 'মু' উদ্ভূত হইয়াছে—এরূপ অনুমানই সমীচীন বলে হয়।

[৩] শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবু যে ভাবে 'করব+হুঁ =করবহুঁ, করবুঁ, করমু' ব্যুৎপাদিত করিয়াছেন, তাহাও সন্তোষজনক মনে হয় না। উত্তম-পুরুষ নিজেই নিজের সম্বন্ধে বলেন বলিয়া 'করোঁ' 'করলুঁ' 'করমু' ইত্যাদির প্রয়োগের স্থলে কর্ত্তৃ-পদ 'মুঞি' উহ্য রাখিলেও অর্থ-প্রতীতির কোনও ব্যাঘাত হয় না; কিন্তু প্রথম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষের স্থলে কর্ত্তৃ-পদ উহ্য রাখিলে—কে কর্ত্তা, সে বিষয়ে অনিবার্য্য সন্দেহ থাকিয়া যায়; এ জন্য 'করব' ইত্যাদি ক্রিয়া-পদের সহিত কর্ত্তৃ-পদ 'হুঁ' (সংস্কৃত 'অহং' শব্দের অপভ্রংশ) যোগ করার কোনও প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও উহা যোগ করায় এবং প্রথম ও মধ্যম পুরুষের ক্রিয়া-পদের স্থলে অনিবার্য্য প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও প্রথম ও মধ্যম পুরুষের কর্ত্তৃ-পদ-সূচক কোনও চিহ্নের প্রয়োগ না করিয়া শুধু 'করব'—যাহার অর্থ প্রাচীন বাঙ্গালায় 'সে করিবে' বা 'তুমি করিবা' দুই-ই হইতে পারে—এরূপ সন্দিগ্ধার্থ ক্রিয়া-পদের প্রয়োগ করা একান্তই অসম্ভব মনে হয়।

[৪] বাঙ্গালা অতীতের বিভক্তি 'ল' যে সংস্কৃতের 'ক্ত' (অতীতের অর্থে কৃদন্ত 'ক্ত' প্রত্যয়) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সে সম্বন্ধে বোধ হয়, ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে কোনও মত-ভেদ নাই। বাঙ্গালা অতীতের উত্তম পুরুষের ক্রিয়া-বিভক্তিতেও আমরা 'লোঁ' 'লুঁ' (পরবর্ত্তী সময়ে 'লু') দেখিতে পাই। 'ক্ত' প্রত্যয়ের অপভ্রংশে 'ল' ব্যতীত 'লোঁ' বা 'লুঁ' আসিতে পারে না; সুতরাং এ স্থলে ল-কারে অনুনাসিক চন্দ্রবিন্দু-সংযোগ সংস্কৃত উত্তম পুরুষের 'অম্‌' বিভক্তির প্রভাব-সম্ভূত না বলিয়া গত্যন্তর দেখা যায় না। প্রাচীন বাঙ্গালার উত্তম-পুরুষের 'করোঁ' 'মরোঁ' ইত্যাদি স্থলেও 'ওঁ'-কে সংস্কৃত 'মি' বিভক্তি হইতে উদ্ধৃত না বলিয়া উপায় নাই। এরূপ অবস্থায় আমাদের বিবেচনায়, বাঙ্গালা বর্ত্তমান ও অতীতের উত্তম-পুরুষের বিভক্তির analogy বা সাদৃশ্য হেতু, বাঙ্গালা ভবিষ্যতের 'মু' বিভক্তিও সেইরূপ সংস্কৃত 'স্যামি' ভবিষ্যতের 'স্যামি' বিভক্তি হইতে উৎপন্ন কিংবা উহারই প্রভাবসম্ভূত, এরূপ সিদ্ধান্তই সমীচীন মনে হয়।

[৫] শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবু সংস্কৃত (ং) অনুস্বারের যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন, এ স্থলে উহার কোনও উপযোগিতা বুঝিতে পারিলাম না। বাংলার 'বাঙ্গালা' শব্দটাকে কেহই সংস্কৃত অনুস্বারের বিশুদ্ধ উচ্চারণ অনুসারে 'বা-আঁ-লা' বলিয়া উচ্চারিত করিবেন না; 'বাঙ্গালা' বা 'বাঙ্গলা' লিখিলেও নিশ্চিতই উহা 'বাঙ্গালা' বা 'বাঙ্‌লা'ই উচ্চারিত হইবে; এ অবস্থায় 'বাংলা' না লিখিয়া 'বাঙ্গালা' বা 'বাঙ্গলা' লিখার বিশেষ কোনও সার্থকতা দেখা যায় না।

শ্রীযুক্ত সতীশ বাবুর মন্তব্য সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবু এই উত্তর দিলেন,—

রাত্রি অধিক হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশ বাবু যে সকল বিষয়ের অবতারণা করিয়া আমার বক্তব্যের সমালোচনা করিলেন, তাহাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার এখন সম্ভবপর হইবে না। তবে মোটামুটি এই কয়টী কথা বলিতে চাহি।

[১] সংস্কৃতের অতীতের ক্রিয়াপদগুলি ক্রমে ক্রমে লোপ হইয়া যায়। প্রাকৃতে কচিৎ একটা আধটা লঙ্‌, লুঙ্‌, লিট্‌-এর পদ দেখা যায়, কিন্তু প্রায় সর্ব্বত্র 'ত' প্রত্যয়ান্ত পদের সাহায্যেই অতীত ক্রিয়ার দ্যোতনা হইয়া থাকে। অকর্ম্মক ক্রিয়া হইলে এই 'ত' প্রত্যয়ান্ত পদ কর্ত্তার

বিশেষণ হয়। সকর্ম্মক হইলে কর্ম্মের বিশেষণ হয় ও কর্ত্তাকে তৃতীয়ায় আনা হয়; যেমন প্রাচীন সংস্কৃতের রীতি অনুসারে—'অহং জগাম, অহং রাজানম্ অপশ্যম্', কিন্তু প্রাকৃতে 'অহং (অহঅং, হকং, হগং, হগে ইত্যাদি) গদো (গও, গদে)', ও 'মএ (=ময়া) রাজা (রাআ, লাযা, লাআ) দেক্খিও (বা দিট্‌ঠো, দিশ্‌টে)।' এই 'ত' প্রত্যয়াস্তরূপে স্বার্থে 'ইল্ল' প্রত্যয় যোগ করিয়া বাঙ্গলায় অতীত কালের 'ইল' প্রত্যয় দাঁড়াইল; 'অহঅং গঅ-ইল্ল'<প্রা-বাং 'হউঁ গেল', 'মএ রাজা দেক্খিঅইল্ল', প্রা-বাং 'মই রাজা দেখিল'। অর্থাৎ অতীতে অকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ত্তৃবাচ্যে প্রয়োগ, সকর্ম্মক ক্রিয়ায় সকর্ম্মক কর্ম্মবাচ্যে প্রয়োগ। হিন্দীতে এই রূপ এখনও বিদ্যমান আছে; যেমন ব্রজভাষায়—'হৌঁ গয়ৌ' (হৌঁ=অহং, গয়ৌ=গঅউ=গঅও=গতকঃ), কিন্তু 'মৈঁ রাজা দেখ্যৌ, (মৈঁ=ময়া, দেখ্যৌ=দেক্খিঅউ=দেক্খি-অও= * দৃক্ষিতকঃ, দৃষ্ট-অর্থে)। তুলনীয় প্রাচীন বাঙ্গলা (চর্য্যাপদ ৫৫) -'এত কাল হাঁউ অচ্ছিলেঁ স্বমোহেঁ। এবেঁ মই বুঝিল সদ্‌গুরুবোহেঁ॥' এখানে 'হাঁউ অচ্ছিলেঁ'=স্থিতোঽহং—হাঁউ বা হউঁ=অহং; 'মই বুঝিল'=ময়া জ্ঞাতং); একই পদে পাশাপাশি প্রথমার হাঁউ=অহং যোগে অকর্ম্মক অচ্ছ বা আছ ধাতুর সঙ্গে কর্ত্তৃবাচ্যে প্রয়োগ ও সকর্ম্মক বুঝ ধাতুর সঙ্গে তৃতীয়ার মই=ময়া যোগে কর্ম্মবাচ্যে প্রয়োগ আমরা পাইতেছি। দেখা যাইতেছে, অতীতে তিঙন্ত পদগুলি অপ্রচলিত হইয়া পড়ায় এইরূপ ঘুরাইয়া বলিবার -সকর্ম্মক ক্রিয়াকে কর্ম্মবাচ্যে আনিয়া বলিবার রেওয়াজ আসিয়া গিয়াছে।

অতীতের ন্যায় ভবিষ্যতেও দেখিতে পাইতেছি যে, 'তব্য'>'ইব' প্রত্যয়াস্তরূপ ভবিষ্যতের লৃট্ বা তিঙন্ত রূপগুলির স্থান অধিকার করিয়াছে। কিন্তু এখানে সকর্ম্মক অকর্ম্মক ক্রিয়ার ভেদ নাই;—উভয় স্থলেই কর্ম্মবাচ্যের প্রয়োগ হয়, যেমন 'যুষ্মাভিঃ ভবিতব্যং', 'ময়া দাতব্যা পৃচ্ছা'= প্রাচীন বাঙ্গলায় 'তুম্‌হে হোইব' (চর্য্যা ৫), 'মই দিবি পিরিচ্ছা' (চর্য্যা ২৯)। প্রাচীন বাঙ্গলায় এই অনুসারে আমরা দেখি—

উত্তম পুরুষ—মই (মুঞি, ইত্যাদি=ময়া), আমি (=অম্হে, অম্হহি=অস্মাভিঃ) জাইব, খাইব (=যাতব্যং, খাদিতব্যং)।

মধ্যম পুরুষ—তই (তুঞি ইত্যাদি=ত্বয়া), তুমি (=তুম্‌হে, তুম্‌হহি=যুষ্মাভিঃ) জাইব, খাইব।

প্রথম পুরুষ—সে জাইব, সে খাইব। এখানে প্রথম পুরুষে তৃতীয়ার 'তেঁ' (=তেন) স্থলে অতি প্রাচীন কাল হইতেই দেখা যাইতেছে যে, প্রথমায় 'সে' ব্যবহৃত হইতেছে। প্রথমা ও তৃতীয়ার পদের অদলবদল প্রা-বাংতে বিরল নহে। প্রা-বাং-র প্রথমার'হাঁউ' (=অহং)-কে তৃতীয়ার 'মই, মই' (=ময়া) বিতাড়িত করিয়াছে। তদ্রূপ প্রা-বাং-র প্রথমা 'তো', 'তু' (<ত্বং)কে তৃতীয়ার 'তুই' (<ত্বয়া) দূরীভূত করিয়াছে। কেবল ইহার ব্যতিক্রম আমরা এই প্রথম পুরুষেই দেখিতে পাইতেছি। প্রা-বাংতে 'তেঁ জাইব, তেঁ খাইব' রূপই হওয়া স্বাভাবিক, ও প্রাকৃত ব্যাকরণের রীতি ধরিয়া দেখিলে এই রূপই অপেক্ষিত; কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গলায় কিরূপ প্রয়োগ ছিল,

আমরা তাহা জানি না। কিন্তু প্রথমা ও তৃতীয়ার গোলমাল অতীতের ক্রিয়ায় যে প্রাচীন বাঙ্গলায় হইয়াছিল, তাহা সহজেই আমরা উপলব্ধি করিতে পারি—যেমন 'হাঁউ সুতেলি'=আমি শুইলাম (চর্য্যা ১৮—এখানে প্রথমার প্রয়োগ), 'হাঁউ অচ্ছিলেঁ=আমি ছিলাম (চর্য্যা ৩৫—প্রথমার প্রয়োগ); কিন্তু 'মই ঘলিলি হাড়েরি মালী'=আমি হাড়ের মালা ফেলিয়া দিলাম (চর্য্যা ১০—তৃতীয়ার প্রয়োগ), 'মই বুঝিল' =আমি বুঝিলাম (চর্য্যা ৫৫—তৃতীয়ার প্রয়োগ); এরূপ স্থলে হাঁউ' 'মই' দুই বিভিন্ন সুবন্ত রূপের মধ্যে গোলমাল ঘটা স্বাভাবিক, স্বীকার করিতেই হইবে। তদ্রূপ প্রথম পুরুষেও 'সে, তেঁ (=সং, তেন)র অদল বদলও অপেক্ষিত, ও ক্রমে যে বহুলতররূপে প্রযুক্ত প্রথমার 'সে' যে তৃতীয়ার 'তেঁ'কে দূরীভূত করিতে পারে, তাহাও বুঝিতে পারা যায়।

[২, ৩, ৪] 'মুঞি করিব, আমি করিব' এইরূপ প্রয়োগ প্রা-বাং-তে খুবই দৃষ্ট হয়। যথা—চর্য্যা ৩৬—'শাখি করিব জালন্ধরিপাএ'=(আমি) জালন্ধরি-পাদকে সাক্ষী করিব। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনেও এইরূপ প্রয়োগ যথেষ্ট আছে; পৃষ্ঠা ১১৪—'তোহ্মার করিব অহ্মে উচিত সমান' (=সম্মান), পৃষ্ঠা ১৮৫ –'আহ্মে বহিব তোর ভার', 'আহ্মে সত্য করিব', ইত্যাদি।

কেবল-মাত্র '-ইল' '-ইব' প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াপদ তিন পুরুষেই ব্যবহৃত হইত। প্রাচীনতম বাঙ্গলায় এই ব্যবস্থা ছিল, ইহা বেশ বুঝা যায়। এখনও বাঙ্গলার কোনও কোনও প্রাদেশিক ভাষায় এই রীতি বিদ্যমান; তুলনা—ঢাকা অঞ্চলে 'সে ক'র্‌ব'=সে করিবে। কিন্তু বাঙ্গলা ভাষায় (চণ্ডীদাসের পূর্ব্বে হইতেই) খালি '-ইল' '-ইব' উত্তম, মধ্যম বা প্রথম পুরুষ বুঝাইবার পক্ষে যথেষ্ট বিবেচিত হইল না। '-ইল, -ইব'র সঙ্গে পুরুষদ্যোতক কিছু জুড়িয়া দেওয়া হইতে লাগিল। যে অংশ জুড়িয়া দেওয়া হইল, তাহা হয় কোনও সর্ব্বনাম-পদ, নয় বর্ত্তমানের ক্রিয়াপদের অনুকরণে আনীত কোনও বিভক্তি। এইরূপ ব্যবস্থা আমরা স্পষ্টই পুরাতন বাঙ্গলায় দেখিতে পাইতেছি। সুতরাং সে সম্বন্ধে কোনও জল্পনা বা অনুমান করিবার প্রয়োজন নাই। যেমন শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে—

উত্তম পুরুষ—অতীতকালে 'কৈল' (=প্রাকৃত কয়-ইল্ল=কৃত+ইল); 'কৈলা+হোঁ'=
'কৈলাহোঁ' (এই 'হোঁ', প্রাচীন বাঙ্গলার 'হাঁউ' হইতে; তুলনীয়—'হৈলাহোঁ'; প্রা, অসমীয়াতে ='আহোঁ' প্রত্যয় মেলে, মৈথিলীতেও 'অহুঁ'); তাহা হইতে 'কৈলাওঁ, কৈলাঙ, কৈলোঁ, কৈলো, কৈলুঁ, কৈলুম্' ইত্যাদি; ও এই প্রকার রূপের প্রসারে—'করিলাহোঁ, করিলাওঁ, করিলোঁ, করিলুম্, ক'রলুম, করনু'; 'করিল+আমি'='করিলাম্'।

মধ্যম পুরুষ—'কৈল'; 'কৈলেহেঁ, কৈলাহা' অসমীয়াতে এই প্রকার রূপ পাওয়া যায়; মৈথিলীতে—'কৈলহ, কৈলেঁ, কৈলঁই<কৈলেহেঁ'; এখানে 'আহা' <'অঃ' প্রত্যয়, বর্ত্তমানের ক্রিয়ার মধ্যম পুরুষের অনুসরণে; যথা 'চলহ, চলাহা'='চলথ'; এবং 'এহেঁ'='আহা, অহ' প্রত্যয়ে বহুবচনদ্যোতক চন্দ্রবিন্দু যোগে। [বহুবচন জানাইবার জন্য চন্দ্রবিন্দু বা '-ন-' বা '-নৃহ-' আধুনিক আর্য্যভাষাগুলিতে খুবই সাধারণ—ও এই চন্দ্রবিন্দু বা 'ন' বা 'নৃহ', বিশেষ্য ও সর্ব্বনাম পদের ষষ্ঠীর বহুবচনের '-আনাম্' বিভক্তির 'ন' হইতে জাত, এ কথা পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে।

তাহা হইতে 'কৈলা, কৈলে, কৈলেঁ (=করিলা, করিলে, করিলেন) ইত্যাদি। অনাদরে 'কৈলি' (='কৈল+ই' ;'ই<হি', সাধারণ অনুজ্ঞার রূপ হইতে অনুমিত হয়),>'করিলি'।

প্রথম পুরুষ—'কৈল'; 'কৈলে' (—'এ' প্রত্যয় এখানে বর্ত্তমান ক্রিয়ার প্রথম পুরুষের এ-কার হইতে অনুমিত হয়); 'কৈলান্তি, কৈলান্ত, কৈলেন্ত, কৈলেন' (বর্ত্তমানের প্রথম পুরুষের বহুবচন হইতে গৃহীত); 'করিল, করিলে>ক'রলে; করিলেন্ত, করিলেন' ইত্যাদি।

তদ্রূপ ভবিষ্যতেও উত্তম পুরুষে—'মুই, আমি, করিব'; 'করিবাহোঁ>করিবোঁ, করিবুঁ, করিমু, করিম্, ক'রমু'। 'করিব+আমি>করিবাম' (ময়মনসিংহের ভাষায়)।

মধ্যম পুরুষে—'তুই, তুমি, করিব'; 'তুমি করিবাহা, করিবাহেঁ, করিবেহেঁ>করিবা, করিবে, করিবেন'। অনাদরে 'তুই করিবি'।

প্রথম পুরুষ—'সে, তাহারা করিব'; 'করিবে'; 'করিবান্ত, করিবেন্ত, করিবেন'।

'করিবোঁ' পদে 'ব' স্পষ্ট বিদ্যমান। 'করিবোঁ' পদের 'ব' সানুনাসিক ওষ্ঠ্য স্বর 'ওঁ' কারের সহিত যুক্ত হওয়ায় সহজেই 'মো', 'মু' হইয়া যায়; 'করিমো>করিমু. ক'রমু'। কিন্তু 'করিব+আমি'—এখানে স্বরবর্ণটী কণ্ঠ্য অ-কার হওয়ার দরুন, 'ব'এর 'ম'য়েতে পরিবর্ত্তনের দিকে প্রবণতা রুদ্ধ হইয়াছে; তদ্রূপ মধ্যম ও প্রথম পুরুষের রূপে 'ওঁ' না থাকায় 'ব'-ই বাহাল আছে।

'কৈলোঁ, করিলোঁ, করিবোঁ'—ইহাদের অনুনাসিক বর্ত্তমানের ক্রিয়ার 'করোঁ, খাওঁ, চলোঁ' প্রভৃতি রূপে যে অনুনাসিক বিদ্যমান, তাহা হইতে হইতে পারে। এই অনুনাসিক সংস্কৃতের '-মি, -মঃ' প্রত্যয়ের বিকারে উৎপন্ন। 'করোমি>* করমি>* করিমি>* করিবিঁ>*করীঁ>করি; কুর্ম্মঃ>* করোমো>* করমো>* করওঁ, করঙ >করোঁ'। ইহা অসম্ভব নহে যে, মধ্যম পুরুষের ও প্রথম পুরুষের রূপের মত অতীতে ও ভবিষ্যতে '-ইল' '-ইব' প্রত্যয়ের সঙ্গে বর্ত্তমানেরই বিভক্তি 'ওঁ' জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে একটী বড় কথা বলা চলে; 'হোঁ' রূপটী পুরাতন বাঙ্গলায় ও অসমীয়াতে, তথা 'অহুঁ' রূপে মৈথিলীতে আমরা পাইতেছি। আর তদ্ভিন্ন 'চলিলাম, করিবাম,'> প্রভৃতি পদে স্পষ্টই '-ইল', '-ইব'+'আমি' পাইতেছি। 'চলিবাহোঁ'>'চলিবোঁ, চলিলাহোঁ>চলিলোঁ' পদে কেবল আধুনিক 'আমি' স্থলে প্রাচীন 'হোঁ, হাঁউ, হউ'। তবে এ ক্ষেত্রে এরূপ মনে করিলে ব্যাখ্যা চলে যে, 'চলিবোঁ, চলিবাহোঁ; চলিলোঁ, চলিলাহোঁ' এই প্রকার রূপে লুপ্ত উত্তম পুরুষের সর্ব্বনাম 'হোঁ' ও বর্ত্তমানের ক্রিয়ার উত্তম পুরুষের রূপের 'ওঁ', এই দুইয়ের-ই অস্তিত্ব আছে।

[৫] 'বাঙ্গালা, বাঙ্গলা, বাঙলা, বাংলা' বানান লইয়া আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা আলোচ্য প্রসঙ্গের বহির্ভূত বলিয়াই পাদটীকায় তাহাকে সন্নিবেশিত করিয়াছি। শ্রীযুক্ত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ 'বাঙ্গলা'—এই বানানকে 'না ব্যুৎপত্তি-সঙ্গত, না উচ্চারণ-সঙ্গত' বলিয়াছিলেন। আমি 'বাঙ্গালা, বাঙ্গলা' ও 'বাঙলা' এই তিন প্রকার বানানই লিখিয়া থাকি, অনুস্বার দিয়া লেখার পক্ষপাতী নই। 'বাঙ্গলা'—এইরূপ বানানকে যে ব্যুৎপত্তি ও উচ্চারণ, দুই দিক্ ধরিয়া

বিচার করিলে বিশেষ ভাবে সমর্থিত করা যায়, তাহা আমার বিশ্বাস; এবং সেই জন্য আমার মন্তব্যে একটু কৈফিয়ৎ দেওয়া আবশ্যক বোধ করিয়াছি।

আজকার প্রবন্ধের সম্বন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সতীশবাবু তাঁহার সন্দেহ কয়টী উল্লেখ করিয়া আমার ব্যাখ্যা করিবার অবসর দিলেন, তজ্জন্য তাঁহার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাইয়া আমার বক্তব্য সমাপন করিতেছি।

শ্রীযুক্ত কিরণবাবু 'আমি, হম্' প্রভৃতি সর্ব্বনাম পদের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছেন। তাঁহার প্রশ্ন আলোচ্য বিষয়ের বহির্ভূত হইলেও যথাসাধ্য সংক্ষেপে সমাধানের চেষ্টা করিব। 'আমি, হম্' সংস্কৃত 'অহম্' শব্দ হইতে উদ্ভূত নহে। বাঙ্গলায় ও আধুনিক আর্য্যভাষায় সর্ব্বনাম উত্তম পুরুষের উৎপত্তি এই,—

প্রথমা একবচনে—বৈদিক বা সংস্কৃতে 'অহম্'। প্রাকৃতে এই 'অহম্' শব্দে একটা স্বার্থে 'ক' জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল; তাহাতে হইল 'অহকং'। 'অহকং' অশোক অনুশাসনে 'হকং'রূপে পাওয়া যায়, সাহিত্যের (সংস্কৃত নাটকের) মাগধী প্রাকৃতে 'হকং'এর পরিবর্ত্তন হয় 'হকে, হগে, হগ্গে'। চলিত ভাষায় সমগ্র উত্তরভারতে 'হকং' পদটী, 'হগং, হঅং, হবং, হউঁ' এইরূপে পরিবর্ত্তিত হয়। এই 'হউঁ' পদটী গুজরাটীতে 'হুঁ', পশ্চিমা-হিন্দী (ব্রজভাষা)তে 'হৌঁ', ও প্রাচীন বাঙ্গলাতে (চর্য্যাপদের ভাষায়) 'হাঁউ' রূপে মেলে (যেমন 'হাঁউ নিরাসী খমন ভতারে'=চর্য্যা ২০; 'তু লো ডোম্বী হাঁউ কপালী'=চর্য্যা ১০; 'এত কাল হাঁউ অছিলেঁ স্বমোহেঁ'=চর্য্যা ৩৫)। গুজরাটী ও ব্রজভাষাতে 'অহম্—অহকং'-পদ-জাত কর্ত্তৃকারকের একবচনের রূপ 'হুঁ, হৌঁ' এখনও বিদ্যমান। কিন্তু ইহা প্রাচীন বাঙ্গলার যুগের পর হইতেই বাঙ্গলা-ভাষায় লোপ পাইয়াছে।

তৃতীয়া একবচনে—সংস্কৃতে 'ময়া'। প্রাকৃতে ইহা 'মএ' রূপ গ্রহণ করে, তৎপরে অপভ্রংশে 'মই'। বিশেষ্য পদে তৃতীয়ায় সংস্কৃতের '-এন' প্রত্যয় অন্ত্য যুগের প্রাকৃতে 'এং' বা 'এঁ'তে পরিণত হয়; যেমন 'হস্তেন > হত্থেণং, হত্থেণ > হত্থেং, হত্থেঁ > হাথেঁ, হাথে, হাতে'; এই বিশেষ্য পদের রূপ হইতে 'এন'-বিভক্তি-জাত চন্দ্রবিন্দু, 'মই' পদের উপর প্রভাব করে, তাই 'মইঁ' রূপটি আমরা পাই। এই 'মইঁ' হইতেছে আমাদের বাঙ্গলায় 'মুই, মুঞি, মুয়িঁ, মুহি' ইত্যাদি। হিন্দীর 'মৈঁ'ও এই একই শব্দ।

চতুর্থী একবচনে—'মহ্যম্'। প্রাকৃতে 'মজ্ঝ, মজ্ঝু'। ইহা হইতে হিন্দীর 'মুঝ' (যেমন 'মুঝকো'=আমাকে, 'মুঝে'=আমায়)। হিন্দীর প্রভাবে বাঙ্গলার ব্রজবুলী সাহিত্যে 'মঝু' =আমার।

ষষ্ঠী একবচনে—'মম'। 'মম' ক্রমে 'মবঁ' ও পরে 'মো' হইয়া দাঁড়ায়। ষষ্ঠী বিভক্তিতে 'মো' প্রাচীন বাঙ্গলায় মেলে। 'মো'-তে আবার নূতন করিয়া ষষ্ঠীর '-র' বিভক্তি যোগ করিয়া 'মোর'।

প্রথমা বহুবচন—সংস্কৃতে 'বয়ম্'। কিন্তু প্রথমা ছাড়া অন্য বিভক্তিতে বহুবচনে সংস্কৃতে যে 'অস্ম'-রূপ আসে, প্রাকৃতে তাহাই অবলম্বন করিয়া বহুবচনে 'অম্হে' পদের সৃষ্টি হয়। এই 'অম্হে'

হইতে প্রাচীন বাঙ্গলা 'আম্‌হি' (আহ্মি), ও পরে 'আমি'। হিন্দীর 'হম্'ও 'অম্‌হে' এই পদ হইতে, এবং সাধু হিন্দীতে 'হম্' সদাই বহুবচন।

তৃতীয়া বহুবচন—'অস্মাভিঃ' হইতে প্রাকৃতে 'অম্‌হেহি' ও 'অম্‌হহি'। ইহা হইতে প্রাচীন বাঙ্গলায় 'আম্‌হে' (আহ্মে), উড়িয়ায় 'আম্ভে'। প্রথমার 'আহ্মি' ও তৃতীয়ার 'আহ্মে' এই দুই রূপ কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গলার যুগ হইতে আর তাহাদের পার্থক্য বজায় রাখে নাই—উভয়েই আধুনিক বাঙ্গলা 'আমি'তে মিলিয়া গিয়াছে।

বহুবচনের অন্য বিভক্তির রূপ বাঙ্গলায় আসে নাই। দেখা যাইতেছে, উৎপত্তি-হিসাবে বাঙ্গলার উত্তমপুরুষের সর্ব্বনামের কতকগুলি পদ হইতেছে একবচনের, আর একটী পদ বহু-বচনের। যথা,—

একবচন	বহুবচন
প্রথমা—(অহম্ > অহকং >) হাঁউ [লুপ্ত]	(অস্মে > অম্‌হে > আহ্মি) > আমি
তৃতীয়া—(ময়া > মএ >) মই, মইঁ, মুই	(অস্মাভিঃ > অম্‌হেহি >) আহ্মে > আমি
চতুর্থী—(মহ্যম্ > মজ্ঝ >) মজ্‌ঝ [ব্রজবুলী]	
ষষ্ঠী—(মম >) মো, মো + র = মোর	

অসমীয়া ভাষায় এখনও 'মই' = একবচনে = আমি, ও 'আমি' = বহুবচনে, আমরা অর্থে। প্রাচীন বাঙ্গলায় 'আমি' পদটী একবচনে ব্যবহৃত হইতে থাকে ; 'মই, মুই' ও 'আমি'র মধ্যে বচন-ঘটিত পার্থক্য চলিয়া যায়। সুতরাং পরবর্ত্তী কালে নূতন বহুবচনের আবশ্যকতা আসিয়া পড়ায়, 'আমি-সব, আমা-সব, মো-সব, মুই-সব,' ও 'মোরা, আমরা'—এই প্রকার বহুবচনের নবীন রূপগুলি সৃষ্ট হয়। হিন্দীতেও সেইরূপ 'হম্' শব্দ একবচনে প্রযুক্ত হইতে থাকিলে নূতন বহুবচনের রূপ 'হম-লোগ'এর উদ্ভব।

'অর্থশাস্ত্রে' দুর্ব্বল রাজার আত্মরক্ষা*

প্রবলের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষাকল্পে দুর্ব্বল রাজার জন্য কৌটিল্য যে সকল উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, প্রধানতঃ তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

'অর্থশাস্ত্র' প্রবল বা দুর্ব্বল সকল রাজার পক্ষেই সমান উপযোগী; ইহাতে যেমন পরাক্রান্ত জয়াভিলাষী রাজার পক্ষে শত্রুজয়ের উপায় বর্ণিত দেখা যায়, তেমনই আবার অসহায় ও অসমর্থ রাজা শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে তাঁহার তদানীন্তন কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে সবিশেষ উপদেশও লক্ষিত হয়। বরং আক্রমণ অপেক্ষা আত্মরক্ষার ব্যবস্থাই এই গ্রন্থে অধিক বিস্তৃতভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে।

অর্থশাস্ত্রে' (১২, ১) 'ধর্ম্মবিজয়ী', 'লোভবিজয়ী' ও 'অসুরবিজয়ী' এই তিন প্রকার 'অভিযোক্তা' বা আক্রমণকারীর উল্লেখ আছে। শত্রু নত হইবা মাত্রই 'ধর্ম্মবিজয়ী' রাজা তাঁহার অপকারের চেষ্টা হইতে বিরত হন, অধিকন্তু তাঁহার বিপদে সহায়তাও করিয়া থাকেন। 'ভূমি' ও 'অর্থে' 'লোভবিজয়ী'র লোভ; অভিলষিত বস্তু পাইলে তিনি আর আক্রমণ করেন না। কিন্তু ভূমি, অর্থ, স্ত্রী, পুত্র এবং সর্ব্বশেষে প্রাণ হরণ করা 'অসুরবিজয়ী'র উদ্দেশ্য, সুতরাং তাঁহাকে সন্তুষ্ট করা দুঃসাধ্য। ধনাদি উপহার দ্বারা এইরূপ 'অভিযোক্তা'কে কথঞ্চিৎ শান্ত করিয়া আক্রান্ত ব্যক্তি গোপনে প্রতিকারের চেষ্টা করিবে। এইরূপ স্থলে কৌটিল্য অসাধু উপায়ের আশ্রয় লওয়াও নিন্দনীয় বলিয়া মনে করেন না; নিষ্ঠুর প্রতিপক্ষের সর্ব্বধ্বংসী আক্রমণের কবল হইতে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করিবার জন্য তিনি শক্তিহীন রাজার পক্ষে অগত্যা ছল-চাতুরী ও ক্রূর উপায় অবলম্বনের ব্যবস্থাও দিয়াছেন। সকল উপায় ব্যর্থ হইলে, মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া 'অগ্নিপতঙ্গে'র ন্যায় সম্মুখ-সমরে প্রবৃত্ত হওয়ার উপদেশও 'অর্থশাস্ত্রে' (৭, ১৫) পাওয়া যায়। কিন্তু শত্রুর নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিয়া, উপযুক্ত সমাদর পাইলে বিশ্বাসঘাতকতা করা কৌটিল্যের অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না। তিনি দণ্ডোপনতের কর্ত্তব্য-বর্ণন কালে (৭, ১৫) বলিয়াছেন,—দুর্ব্ব[illegible]জা ধনাদি উপহার সহ দূত পাঠাইয়া প্রবল শত্রুর বশ্যতা স্বীকার করিবে এবং অভয় পাইলে তাঁহার আজ্ঞাবহরূপে সকল বিষয়ে য[illegible]ক্ত[illegible]পকা[illegible]রিবে; আবার 'দণ্ডোপনায়িবৃত্ত' নামক প্রকরণে (৭, ১৬) প্রবল রাজার প্রতি উপদেশ আছে যে, ভীত আশ্রয়প্রার্থীকে অভয় দিয়া পিতার ন্যায় পালন করিতে হইবে। 'মণ্ডল'স্থ অপর রাজগণের বিরাগভাজন হওয়ার ভয়েও 'অর্থশাস্ত্রে' 'উপনত'কে উৎপীড়ন করা নিষিদ্ধ হইয়াছে; কারণ, ঐরূপ করিলে উদ্বিগ্ন রাজমণ্ডল উৎপীড়নকারীর বিনাশের জন্য বদ্ধপরিকর হইতে পারে।

শক্তিহীন রাজাকে রক্ষা করিবার জন্য 'অর্থশাস্ত্রে' বহু উপায়ের নির্দ্দেশ আছে। 'যাতব্যবৃত্তি' নামক প্রকরণে (৭, ৪) প্রবলের দ্বারা আক্রান্ত অশক্ত রাজার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ পাওয়া যায়। 'হীনশক্তিপূরণ' নামক অপর প্রকরণে (৭, ১৪) ক্ষীণশক্তি বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা দেখিতে পাই। আর এক প্রকরণে (৭, ১৫) শক্তিশালীর অত্যাচার হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য

---

* মুন্সীগঞ্জে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ১৬শ অধিবেশনে ইতিহাস-শাখায় পঠিত।

দুর্ব্বল রাজাকে দুর্গ আশ্রয় করিয়া যথাসাধ্য প্রতিকার করিতে বলা হইয়াছে। 'আবলীয়সম্' নামক সমগ্র অধিকরণটি কেবল 'অবলীয়ান্' অর্থাৎ দুর্ব্বলের কর্ত্তব্য-কথায় পূর্ণ। এই অধিকরণের অন্তর্গত 'দূতকর্ম্ম', 'মন্ত্রযুদ্ধ', 'সেনামুখ্যবধ' প্রভৃতি নয়টি প্রকরণে নানারূপে শত্রুবঞ্চনার কৌশল বর্ণিত আছে।

উপরিউক্ত প্রকরণগুলির সার মর্ম্ম এই যে, প্রথমতঃ ভেদনীতি অবলম্বনে দুর্ব্বল রাজা আক্রমণকারী ও তাঁহার সুহৃদ্‌বর্গের মধ্যে বিবাদ ঘটাইতে চেষ্টা করিবেন এবং শত্রু অপেক্ষা অধিক বলশালী রাজার সহায়তা লইয়া কিংবা তাদৃশ সাহায্যের অভাবে আক্রমণকারীর তুল্যবলসম্পন্ন এক বা বহু রাজার সহিত সম্মিলিত হইয়া, অথবা তাহারও অভাব হইলে তদপেক্ষা হীনবল সহায়ই বহুসংখ্যক সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইবেন। ইহার কোনটিই সুলভ না হইলে দুর্ভেদ্য দুর্গের আশ্রয়ে থাকিয়া নানা উপায়ে প্রবল শত্রুর বলক্ষয় করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। তথায় অবস্থানকালে নিজের বন্ধুবর্গ এবং 'মধ্যম' ও 'উদাসীন'কে উক্ত 'অভিযোক্তা'র বিরুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করা আবশ্যক।

ভেদনীতির সাহায্যে শত্রুর আত্মীয় ও প্রতিবেশী রাজাদিগকে তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া, পরপক্ষের রাষ্ট্র, দুর্গ ও স্কন্ধাবারের মধ্যে নানা উপায়ে অসন্তোষ উৎপাদন করিয়া বিদ্রোহ সৃষ্টি করিবে। এইরূপে বিবিধ কৌশলে অনিষ্ট সাধন দ্বারা শত্রুকে বিব্রত করিয়া অবশেষে চর দ্বারা তাহাকে গোপনে হত্যা করাও কৌটিল্য অনুমোদন করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী কৌটিল্য কেবল নিজ প্রভুর সাম্রাজ্য-নীতির অনুকূলেই অর্থশাস্ত্র প্রণয়ন করেন নাই; তিনি প্রবল ও দুর্ব্বল, উভয় প্রকার রাজার পক্ষেই সমান উপযোগী করিয়া এই রাজনীতিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

ত্রিংশ সাংবৎসরিক কার্য্য-বিবরণ

বর্ত্তমান ১৩৩১ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ত্রিংশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া একত্রিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল। সদস্যগণ ও সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে ত্রিংশ বর্ষের কার্য্য-বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল।

বান্ধব — পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও পরিষদের তিন জন বান্ধব ছিলেন,—মহারাজ শ্রীযুক্ত স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর, মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত স্যর বিজয়চন্দ মহাতাব বাহাদুর এবং মহারাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর। আলোচ্য বর্ষে পরিষদের বান্ধব-সংখ্যা বৃদ্ধি হয় নাই।

সদস্য — ১৩৩০ বঙ্গাব্দের প্রারম্ভে পরিষদের সদস্য-সংখ্যা এইরূপ ছিল,—বিশিষ্ট—৯ আজীবন—৬, অধ্যাপক—৫, মৌলবী—০, সহায়ক—২০, সাধারণ ২২৭৮, (কলিকাতা—১২৬৯ ও মফস্বল—১০০৯) মোট—২৩১৮।

(ক) বিশিষ্ট—আলোচ্য বর্ষে মনীষী শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্ত-রত্ন এম্ এ, বি এল্ মহাশয় পরিষদের বিশিষ্ট-সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বর্ষ-শেষে বিশিষ্ট-সদস্যের সংখ্যা ১০ হইয়াছে।

(খ) আজীবন-সদস্য—বর্ষারম্ভে পরিষদের ৬ জন আজীবন-সদস্য ছিলেন। বর্ষমধ্যে নূতন কেহ আজীবন-সদস্যপদ গ্রহণ করেন নাই।

(গ) অধ্যাপক-সদস্য—আলোচ্য বর্ষে নূতন কোনও ব্যক্তি অধ্যাপক-সদস্য-পদে নির্ব্বাচিত হন নাই। সুতরাং এই সদস্য-সংখ্যা পূর্ব্ববর্ষের ন্যায় ৫ আছে।

(ঘ) মৌলবী-সদস্য—বড়ই দুঃখের সহিত জানাইতে হইতেছে যে, মৌলবী-সদস্য সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রণয়নের পর এ পর্য্যন্ত একজনও বঙ্গীয় মুসলমান মৌলবী-সদস্য-পদ গ্রহণ করেন নাই। বাঙ্গালা দেশে শিক্ষিত মুসলমানের সংখ্যা অকিঞ্চিৎকর নহে এবং তন্মধ্যে মাদ্রাসা বা মোক্তবের লব্ধপ্রতিষ্ঠ মৌলবীগণেরও সংখ্যা বঙ্গদেশে অপ্রচুর নহে। পরিষৎ আশা করেন যে, অচিরে এই সকল জ্ঞানী মৌলবীগণ পরিষদের মৌলবী-সদস্যপদ গ্রহণ করিয়া মাতৃভাষার সেবায় পরিষৎকে সাহায্য করিবেন।

(ঙ) সহায়ক-সদস্য—আলোচ্য বর্ষে প্রথমে ২০ জন সহায়ক সদস্য ছিলেন। তন্মধ্যে ৪ জন সদস্যের স্থিতিকাল পূর্ণ হাওয়ায় বার্ষিক অধিবেশনে তাঁহারা পুনরায় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং দুই জন সহায়ক-সদস্য তন নির্ব্বাচিতন্ হইয়াছেন। অন্যতম সহায়ক-সদস্য পঞ্চানন

বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ মহাশয় অকালে পরলোকগমন করায় পরিষৎ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। বর্ষশেষে এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা ২১ হইয়াছে।

(চ) সাধারণ-সদস্য—(১) আলোচ্য বর্ষের প্রারম্ভে ১২৬৯ জন কলিকাতাবাসী পরিষদের সদস্য ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ৯৫ জনের নাম চাঁদা অনাদায় হেতু ও সদস্য-পদ ত্যাগ করার জন্য বাদ দেওয়া হইয়াছে। ১৮ জন সদস্য পরলোকগত হইয়াছেন এবং ৪৫ জন কলিকাতাবাসী নূতন সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়াছেন। কলিকাতা হইতে ১০ জন সদস্য মফস্বলে গিয়াছেন এবং মফস্বল হইতে ১৪ জন সদস্য কলিকাতায় আসিয়াছেন। একজন বিশিষ্ট-সদস্য ও দুইজন সহায়ক-সদস্য হইয়াছেন। এই প্রকার পরিবর্ত্তনাদির পর বর্ষশেষে কলিকাতা-বাসী সদস্যের সংখ্যা ১২০২ হইয়াছে।

(২) বর্ষারম্ভে পরিষদের মফস্বলবাসী সদস্য-সংখ্যা ১০০৯ ছিল। তাঁহাদের মধ্যে পদ-ত্যাগ করায় এবং চাঁদা অনাদায় জন্য ২২৩ জনের নাম সদস্য-তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। ৭ জন সদস্যের পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে এবং ৩০ জন মফস্বলবাসী নূতন সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়াছেন। মফস্বল হইতে ১৪ জন সদস্য কলিকাতায় আসিয়াছেন এবং কলিকাতা হইতে ১০ জন সদস্য মফস্বলে গিয়াছেন। এইরূপ পরিবর্ত্তনের পর বর্ষান্তে মফস্বলবাসী সদস্য-সংখ্যা ৮০৫ হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষের শেষে পরিষদের সদস্য-সংখ্যা এইরূপ ছিল,—

বিশিষ্ট———১০
আজীবন———৬
অধ্যাপক———৫
মৌলবী———০
সহায়ক———২১

সাধারণ———২০০৭
কলিকাতা—১২০২
মফস্বল———৮০৫
———
২০০৭
———
মোট ২০৪৯

কলিকাতা ও মফস্বলবাসী ২০০৭ জন সদস্যের মধ্যে বহুদিন হইতে ৩৪২ জনের নিকট কোন চাঁদা পাওয়া যাইতেছে না। অনেক চেষ্টা করিয়া মাত্র ২ জন পুনরায় রীতিমত চাঁদা দিতেছেন।

পরলোকগত-সদস্য

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের ২৫ জন সাধারণ-সদস্য এবং ১ জন সহায়ক-সদস্য পরলোকগত হইয়াছেন। ইহাঁদের মৃত্যুতে পরিষৎ বিশেষ অভাব অনুভব করিয়াছেন এবং প্রত্যেকের মৃত্যুতেই স্বতন্ত্রভাবে শোক-প্রকাশ করা হইয়াছে। এ স্থলেও পুনরায় তাঁহাদের পরিবারবর্গের নিকট আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করা হইতেছে।

সহায়ক-সদস্য

১। পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ।

সাধারণ-সদস্য

১। অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় (টালা, কলিকাতা)।
২। অবিনাশচন্দ্র দাস গুপ্ত এম্ এ, বি এল্ (কলিকাতা)
৩। কালীপ্রসন্ন পাইন (কলিকাতা)।
৪। খগেন্দ্রনাথ দে বি এ, এটর্ণি (কলিকাতা)।
৫। রাজমন্ত্র-প্রবীণ কাব্যানন্দ দেওয়ান বাহাদুর জ্ঞানশরণ চক্রবর্ত্তী এম্ এ (কলিকাতা)
৬। দামোদরদাস বর্ম্মন (কলিকাতা)।
৭। নকড়ি রায় গুপ্ত (কলিকাতা)।
৮। নলিনীনাথ রায় এম্ এল সি (কলিকাতা)।
৯। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ (কলিকাতা)।
১০। রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর এম্ এ, বি এল্ (পাটনা)।
১১। প্রিয়নাথ মল্লিক (কলিকাতা)।
১২। ভবানীনাথ রায় (পাবনা)।
১৩। রায় ভূপতিনাথ দাস বাহাদুর এম্ এ, বি এস্‌সি, এফ্ সি এস্ (হুগলী)।
১৪। রাজা যোগেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী বাহাদুর (রামগোপালপুর)।
১৫। রাখালরাজ রায় এম্ এ (রাজপুত তেঘড়ি, মুরশিদাবাদ)।
১৬। কবিরাজ রাজেন্দ্রনাথ সেন (কলিকাতা)।
১৭। ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ (কলিকাতা)।
১৮। ললিতমোহন মৈত্র (তালন্দ, রাজসাহী)।
১৯। শ্রীনিবাস দাস (কলিকাতা)।
২০। সতীশচন্দ্র মিত্র (হাওড়া)।
২১। সুকুমার রায় বি এস্‌সি (কলিকাতা)।
২২। কবিরাজ হরিনাথ বিদ্যারত্ন (কলিকাতা)।
২৩। হেমেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, বি এল্ (কলিকাতা)।
২৪। কবিরাজ হেমেন্দ্রনারায়ণ দেব (কলিকাতা)।
২৫। হৃষীকেশ পাল (কলিকাতা)

পরলোকগত সাহিত্যসেবী

আলোচ্য বর্ষে লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যসেবী পণ্ডিত উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। ইহাঁর মৃত্যুতেও ক্ষতি অনুভব করিয়া পরিষৎ দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। তিনি এক সময়ে পরিষদের সদস্য ছিলেন।

বার্ষিক অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষের ৬ই শ্রাবণ তারিখে ঊনত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশন হয়। পরিষদের সহকারী

সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। যথারীতি গত মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইবার পর কতিপয় সদস্য ও সাহিত্যসেবীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়। তৎপরে ২৯শ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইলে ত্রিংশ বার্ষিক আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ বিজ্ঞাপিত ও গৃহীত হয়। তাহার পর বিশিষ্ট, সহায়ক ও সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ত্রিংশ বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যনির্ব্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপন, ত্রিংশ বর্ষের জন্য পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন হইলে কতিপয় প্রাচীন মুদ্রা, প্রস্তরখণ্ড ও খোদিত ইষ্টক প্রদর্শিত এবং পাঁচখানি চিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

মাসিক অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে দশটি মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। এই সকল অধিবেশনের তারিখ, অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ ও প্রবন্ধ-লেখকের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

প্রথম মাসিক অধিবেশন—৩০এ ভাদ্র, রবিবার। প্রবন্ধ—(ক) প্রাচীন বাঙ্গালা আহুট, আউট ও সার্দ্ধসংখ্যাবাচক শব্দাবলী—শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্। (খ) পদসাহিত্য ও গোবিন্দদাসের পদের ভাষা—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম্ এ।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন—৬ই আশ্বিন, রবিবার। প্রবন্ধ—(ক) চণ্ডীদাস ও বাসুলী-দেবী—শ্রীযুক্ত হরিদাস মিত্র এম্ এ, ও (খ) প্রাণিবিজ্ঞান-বিষয়ক পরিভাষা—ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ দাস্ ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্‌সি।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন—১৩ই আশ্বিন, রবিবার। প্রবন্ধ—আমাদিগের অয়নাংশ—ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্‌সি।

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন—২০এ আশ্বিন, রবিবার। প্রবন্ধ—কৌলমার্গরহস্য—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন—১৩ই মাঘ, রবিবার। প্রবন্ধ—উৎকলে নবাবিষ্কৃত শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধীয় পুথি—শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার ভাগবত-রত্ন এম্ এ।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন—২০এ মাঘ, রবিবার। প্রবন্ধ—জালন্দার গড়—শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্ক-নাথ রায়।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন—৫ই ফাল্গুন, রবিবার। প্রবন্ধ—নেপালে প্রাপ্ত গোপীচন্দ্র নাটক—শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্।

অষ্টম মাসিক অধিবেশন—১৯এ ফাল্গুন, রবিবার। প্রবন্ধ—(ক) অর্থশাস্ত্রে ধর্ম্ম ও সংস্কার—শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ও (খ) নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ।

নবম মাসিক অধিবেশন—৩রা চৈত্র, রবিবার। প্রবন্ধ—মুরশিদাবাদের একটি প্রাচীন লিপি—শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার এম্ এ, বি এল্।

দশম মাসিক অধিবেশন—১০ই চৈত্র, রবিবার। প্রবন্ধ—(ক) বাঙ্গালা ভাষায় অনুজ্ঞা

—মৌলবী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম্ এ, বি এল্ ও (খ) শব্দ-সংগ্রহ—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বি এল্।

মাসিক অধিবেশনে প্রদর্শিত দ্রব্য

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন—৪টি প্রাচীন মথুরার মূর্ত্তি, প্রদাতা—শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার এম্ এ, বি এল্।

বিশেষ অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য-পরিষদের দশটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। নিম্নে অধিবেশনগুলির বিবরণ প্রদত্ত হইল ;—

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন—১৬ই ও ১৯এ শ্রাবণ, বুধ ও শনিবার। এই দুই বিশেষ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্ত-রত্ন এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং "বিদ্যাপতির" সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় "বৈষ্ণব কাব্য অর্থাৎ চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস ও রায়শেখর প্রভৃতির পদ" এবং চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ও মুসলমান বৈষ্ণব কবিগণের পদ সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন—২৯এ ভাদ্র, শনিবার। এই অধিবেশনে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই মহোদয়-লিখিত "বিদ্যাপতি" নামক প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় পাঠ করেন।

চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন—২১এ পৌষ, রবিবার। সভাপতি শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ। এই অধিবেশনে রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম্ এ বাহাদুর "হিন্দুর বিবাহে সুজন্ত-বিদ্যা (Eugenics)" বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

পঞ্চম বিশেষ অধিবেশন—১৬ই মাঘ, বুধবার। শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রেবতীরমণ বেদান্তবাগীশ মহাশয় "উপনিষদে প্রাণতত্ত্ব" বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশন—১৯এ মাঘ, শনিবার। ৺পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশের জন্য এই অধিবেশন আহূত হয়। পরিষদের সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু নাট্যকলাসুধাকর মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত অজিতকুমার রায় মহাশয় পাঁচকড়ি বাবুর উদ্দেশে একটি গান করেন এবং কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ, শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ কবিভূষণ, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ দত্ত বি এ, এটর্ণি, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত এবং সভাপতি মহাশয় স্বর্গীয় পাঁচকড়ি বাবুর গুণাবলী উল্লেখ করিয়া বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় মৃত মহাত্মার একখানি তৈলচিত্র পরিষৎকে দান করিতে প্রতিশ্রুত হন। এই প্রতিশ্রুতির জন্য শ্রীযুক্ত নলিনীবাবু পরিষদের ধন্যবাদভাজন।

সপ্তম বিশেষ অধিবেশন—২৩এ মাঘ, রবিবার। স্বর্গীয় দেবেন্দ্রবিজয় বসু এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের চিত্র-প্রতিষ্ঠার্থ এই অধিবেশন আহূত হয়। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বি এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় একটি কবিতা পাঠ করেন; সভাপতি মহাশয় ৺দেবেন্দ্র বাবুর চিত্রাবরণ উন্মোচন করেন। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং শ্রীযুক্ত মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাশ গুপ্ত এম্ এ এবং সভাপতি মহাশয় স্বর্গগত মহাত্মার নানাবিধ গুণাবলীর উল্লেখ করিয়া বক্তৃতা করেন।

অষ্টম বিশেষ অধিবেশন—২৬এ মাঘ, বুধবার। শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং শ্রীযুক্ত হরিমোহন ভট্টাচার্য্য এম্ এ মহাশয় "জৈনদর্শনে স্যাদ্‌বাদ" বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন।

নবম বিশেষ অধিবেশন—৪ঠা ফাল্গুন, শনিবার। স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশার্থ এই অধিবেশন আহূত হয়। শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার ঘোষাল, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্ত-রত্ন এম্ এ, বি এল্ ও শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মৃত মহাত্মার গুণকীর্ত্তন করেন।

দশম বিশেষ অধিবেশন—৯ই চৈত্র, শনিবার। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্ত-রত্ন এম্ এ, বি এল্ মহাশয় এই অধিবেশনের সভাপতি হন। শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় "জৈন দর্শন" বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

শতবার্ষিক জন্মোৎসব

আলোচ্য বর্ষে ১২ই মাঘ শনিবার কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের শতবার্ষিক জন্মোৎসব পরিষদের মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়। পরিষদের ইতিহাসে ইহা একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের গঠনকর্ত্তৃগণের মধ্যে মধুসূদনের স্থান কত উচ্চে তাহা বাঙ্গালী মাত্রেরই সুবিদিত। ১২৩০ বঙ্গাব্দে কবি এই বঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হন। আলোচ্য বর্ষের উক্ত তারিখে তাঁহার একশত বার্ষিক জন্মদিন। কবির জীবন-চরিত্র-লেখক এবং পরিষদের হিতৈষী সদস্য শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয়ের প্রস্তাবে পরিষদের এই উৎসবের আয়োজন হয়। পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নেতৃত্বে উক্ত দিবস পরিষদে এই জন্মোৎসব-সভার অধিবেশন হয়। এই অনুষ্ঠানের জন্য অনেকে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম ও অর্থের পরিমাণ পরিশিষ্টে দেওয়া হইল। এই

সভার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল। পরিষৎ এই কবির স্মৃতির প্রতি সভক্তি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিবার আয়োজন করিয়া ধন্য হইয়াছেন এবং একটি অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন।

সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় উদ্বোধন-সঙ্গীত গান করিলে পর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় কবির জীবনী আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপরে ডাঃ শ্রীযুক্ত কালীপদ ঘোষ মহাশয়ের চারি বৎসর বয়স্কা কন্যা শ্রীমতী ইলারাণী একটি কীর্ত্তন গান করিলে পর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব, শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু, শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেন গুপ্ত, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত এবং শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবী স্ব স্ব কবিতা পাঠ করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু নাট্যকলাসুধাকর মহাশয় একটী দীর্ঘ বক্তৃতা করিলে পর শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু মহাশয় 'ব্রজাঙ্গনা' হইতে কীর্ত্তন গান করেন এবং শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয় 'মেঘনাদবধ কাব্য' হইতে কিয়দংশ আবৃত্তি করেন। পরে শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার ভাগবত-রত্ন এম্ এ মহাশয় মধুসূদনের কাব্য আলোচনা করিয়া একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় মধুসূদনের কাব্য হইতে কয়েকটি স্থান আবৃত্তি করেন এবং শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্ত-রত্ন এম্ এ, বি এল্ মহাশয় ও সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা করেন।

কার্য্যালয়

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সদস্যগণ পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ-পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন :—

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই

সহকারী সভাপতি—শ্রীযুক্ত রায় জলধর সেন বাহাদুর

„ রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব

„ অমৃতলাল বসু নাট্যকলাসুধাকর

„ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ

মহারাজাধিরাজ „ স্যর বিজয়চন্দ মহাতাপ বাহাদুর জি সি এস্ আই, কে সি এস্ আই, কে সি আই ই, আই ও এম্

কুমার „ শরৎকুমার রায় এম্ এ

„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম্ এ, আই সি এস্

রায় „ যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর বিদ্যানিধি এম্ এ

সম্পাদক— শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

সহকারী সম্পাদক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত

„ হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ

„ গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ
,, দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্‌সি
,, গিরিজাকুমার বসু
পত্রিকাধ্যক্ষ— শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্
কোষাধ্যক্ষ— শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর
চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই
ছাত্রাধ্যক্ষ— শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ
গ্রন্থাধ্যক্ষ— শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই
পরে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত
আয়-ব্যয়-পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
পরে ,, অনাথনাথ ঘোষ
,, ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের উপর কার্য্যালয়ের যাবতীয় কর্ম্মভার ন্যস্ত ছিল। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের উপর ছাপাখানা-সমিতি, গ্রন্থপ্রকাশ বিভাগ এবং পরিষদের হিসাব সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্যভার অর্পিত ছিল। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন ও শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু মহাশয়দ্বয়ের প্রতি চাঁদা আদায় ও অন্যান্য বিষয়ে আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্যভার ন্যস্ত ছিল এবং শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্‌সি মহাশয়ের উপর মাসিক ও বিশেষ অধিবেশন সম্বন্ধীয় কার্য্য ন্যস্ত ছিল। দুঃখের বিষয়, বৎসরের শেষ ভাগে শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু মহাশয় সহকারী সম্পাদক-পদ ত্যাগ করেন। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি ঐ পদত্যাগ প্রস্তাব গ্রহণ করেন। সহকারী সম্পাদকগণ বিশেষ যত্নের সহিত নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদন করিয়া সম্পাদকের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

পত্রিকাধ্যক্ষ ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্ মহাশয় বিশেষ যত্নের সহিত ত্রিংশ বর্ষের পরিষৎ-পত্রিকার সম্পাদন-কার্য্য করিয়া ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয় পরিষদের অর্থ রক্ষণাবেক্ষণের সুব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহার কার্য্য বরাবরই সুশৃঙ্খলচালিত। তিনি বিশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয় অক্লান্ত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া চিত্রশালার যথেষ্ট উন্নতি বিধান করিয়াছেন। তিনি বিশেষভাবে ধন্যবাদভাজন।

গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই মহাশয়ের চেষ্টা ও যত্নে গ্রন্থশালার বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, শ্রীযুক্ত অনঙ্গ বাবু বর্ষের শেষভাগে গ্রন্থাধ্যক্ষ-পদ ত্যাগ করেন। তজ্জন্য পরিষৎ বিশেষ দুঃখিত। তাঁহার স্থলে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি 'জন্মভূমি' সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়কে গ্রন্থাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন করিয়াছেন।

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়

এবং শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ মহাশয়গণ যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিয়া পরিষদের হিসাবাদি পরীক্ষা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বর্ষমধ্যে কর্ম্মোপলক্ষ্যে দিল্লী গমন করায় তাঁহার স্থলে শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ মহাশয় অন্যতম আয়-ব্যয়-পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন। ইঁহাদিগের অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য ইঁহাদিগকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সদস্যগণ কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন,—

(১) সাধারণ-সদস্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্ত-রত্ন, এম্ এ, বি এল
" খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ
রায় " ডাঃ চুণীলাল বসু বাহাদুর সি আই ই, আই এস্ ও, এম্ বি, এফ সি এস্
" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
" ডাঃ কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা এম্ এ, বি এল, পিএচ ডি
" হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ
অধ্যাপক " হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ, এফ জি এস্
" " জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল
" " মন্মথমোহন বসু এম্ এ
" " বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ
" মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
" প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, এফ সি এস (লণ্ডন)
" ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্‌সি
" হেমচন্দ্র সরকার এম্ এ
" বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্বনিধি এম্ এ
" সত্যচরণ লাহা এম্ এ, বি এল্, এফ জেড্ এস্
" রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী
অধ্যাপক " নিবারণচন্দ্র রায় এম্ এ

(২) শাখা-পরিষৎসমূহ হইতে নির্ব্বাচিত

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
" রায় যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর বি এ
" সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
" হরিহর শাস্ত্রী
" ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়
, মহেন্দ্রচন্দ্র রায় তত্ত্বনিধি

আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির চৌদ্দটি সাধারণ অধিবেশন এবং একটি বিশেষ অধিবেশন হয় এবং চারিবার সার্কুলার পাঠাইয়া কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণের মতামত গ্রহণ করিয়া কোন কোন কার্য্য সম্পাদন করা হয়।

অন্যান্য আনুষ্ঠানিক কার্য্য ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি নিম্নলিখিত বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—

(১) দর্শন শাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের গ্রন্থ পৃথক্ পৃথক্ খণ্ডে প্রকাশের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

(২) ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়-লিখিত "জগৎ-কথা" প্রকাশের আলোচনা চলিতেছে।

(৩) রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম্ এ বাহাদুর-লিখিত 'শব্দকোষে'র পরিশিষ্ট প্রকাশের আলোচনা চলিতেছে।

(৪) 'সারদাতিলক' গ্রন্থ প্রকাশের আলোচনা চলিতেছে।

(৫) গ্রন্থাগার হইতে পাঠার্থ পুস্তক বাড়ী লইয়া যাইবার পূর্ব্বে তিন টাকা গচ্ছিত রাখিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

(৬) 'কলিকাতা প্রদর্শনীতে' পরিষদের চিত্রশালার দ্রব্যাদি প্রেরণ করা সম্বন্ধে ইম্পি-রিয়াল রেকর্ড অফিসের কর্ত্তৃপক্ষের পত্র আলোচিত হয় ও দ্রব্যাদি তাঁহাদের জিম্বায় পাঠাই-বার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(৭) মহিলাগণের গ্রন্থাদি পাঠের ও দ্রব্যাদি পরিদর্শনের জন্য মাসে একটি বৃহস্পতিবারে পরিষদ্-মন্দির খুলিয়া রাখিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

(৮) সংস্কৃত কলেজ, সংস্কৃত এসোসিয়েশন, টোল প্রভৃতির বর্ত্তমান অবস্থা এবং ঐ সকল অনুষ্ঠানের কার্য্য-পরিচালনার বিষয়ে মন্তব্য দিবার জন্য বঙ্গীয় গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক যে শাখা-সমিতি গঠিত হয়, তাহাতে গবর্মেণ্টের আহ্বানে পরিষদের পক্ষে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ মহাশয় প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন।

(৯) স্বর্গীয় স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত "কমলা-লেক্চারশিপ"এর বিষয় নির্ব্বাচন জন্য গঠিত শাখা-সমিতিতে পরিষদের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ মহাশয় প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন।

(১০) সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান এবং চিত্রশালা, পুস্তকালয়, আয়-ব্যয় ও ছাপাখানা, এই আটটি শাখা-সমিতি ব্যতীত, পুরস্কার-প্রবন্ধ নির্ব্বাচন-সমিতি, চাঁদা অনাদায় ও পদত্যাগ পত্র আলোচনার জন্য শাখা-সমিতি, বেঙ্গল মিউনিসিপাল বিল আলোচনা-সমিতি, বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ পরিদর্শন-সমিতি ও বাঙ্গালায় শর্টহ্যাণ্ড লেখার বিষয়ে মন্তব্য দিবার জন্য শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে।

(১১) পরিষৎ কর্ত্তৃক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-উৎসবের আয়োজন

করার বিষয় আলোচিত হয় এবং এ সম্বন্ধে ৺ বঙ্কিমবাবুর দৌহিত্রগণের সহিত পত্র ব্যবহার করা হয়।

(১২) পরিষদের আয়-ব্যয়ের সমতা রক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হয় ও এ সম্বন্ধে আয়-ব্যয়-সমিতির মন্তব্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির এক বিশেষ অধিবেশনে আলোচিত হয়।

(১৩) চণ্ডীদাসের পদাবলীর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের প্রস্তাব আলোচনাধীন রহিয়াছে।

(১৪) বিভিন্ন বিশিষ্ট ভাণ্ডারের হিসাব সম্বন্ধে আয়-ব্যয়-সমিতির মন্তব্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির এক বিশেষ অধিবেশনে আলোচিত হয়। স্থির হয় যে, যে সকল ভাণ্ডারের অর্থ কোন বিশেষ নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্যের জন্য ব্যয়িত হইবে বলিয়া স্থির আছে, সেই সেই তহবিল হইতে পরিষদের সাধারণ-তহবিলে গৃহীত হাওলাতি টাকার উপর ১৩৩১ বঙ্গাব্দ হইতে ডাক ঘরের সেভিংস্ ব্যাঙ্কের হারে সুদ দিতে হইবে, এবং সেই সেই তহবিলের ব্যয় (কর্ম্মচারীর বেতন ব্যতীত) সেই সেই তহবিল হইতে নির্ব্বাহ করা হইবে।

(১৫) পরিষদ্ গ্রন্থাবলীভুক্ত ৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের লিখিত "হেমচন্দ্র" নামক গ্রন্থ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং আলোচ্য বর্ষে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যের মধ্যে উক্ত গ্রন্থ হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

সাহিত্যাদি চারি শাখা

আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞান,—এই চারিটি শাখার কার্য্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। মাসিক অধিবেশনে পাঠ ও পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রবন্ধ নির্ব্বাচন, মুদ্রণের উপযুক্ত গ্রন্থ স্থিরীকরণ, বিবিধ বিষয়ে লোকশিক্ষামূলক বক্তৃতার ব্যবস্থা প্রভৃতি নানাবিধ কার্য্য এই সকল শাখার তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত হয়।

(ক) সাহিত্য-শাখা

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী মহাশয় সাহিত্য-শাখার সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় আহ্বানকারী ছিলেন। সভ্যগণের নাম পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

এই শাখার পাঁচটি অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনগুলিতে ১৫টি প্রবন্ধ অলোচনার জন্য উপস্থিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ৪টি প্রবন্ধ অনুপযুক্ত বিবেচনায় পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং ১০টি প্রবন্ধ অধিবেশনে পঠিত ও পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। একটির বিষয়ে এখনও কিছু মীমাংসা হয় নাই। নিম্নে প্রবন্ধ ও প্রবন্ধলেখকের নাম প্রদত্ত হইল,—

প্রবন্ধ	লেখক
১। চণ্ডীদাস ও বাসুলী দেবী	শ্রীযুক্ত হরিদাস মিত্র এম্ এ।
২। বাঙ্গালা ভাষার কর্ম্ম ও ভাববাচ্যের ক্রিয়া	শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্

প্রবন্ধ	লেখক
৩ পদসাহিত্য ও গোবিন্দদাসের পদের ভাষা	শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম্ এ।
৪। প্রাচীন বাঙ্গালা আহুট, আউট ও সার্দ্ধসংখ্যাবাচক শব্দাবলী	শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্।
৫। বিদ্যাপতি	মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।
৬। নেপালে প্রাপ্ত গোপীচন্দ্র নাটক	শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্।
৭। উৎকলে শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধীয় নবাবিষ্কৃত প্রাচীন পুথি	শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার ভাগবত-রত্ন এম্ এ।
৮। শব্দ-সংগ্রহ	শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বি এল্।
৯। বাঙ্গালা ভাষার অনুজ্ঞা	মৌলবী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম্ এ, বি এল্।
১০। নাথধর্ম্মে সৃষ্টিতত্ত্ব	শ্রীযুক্ত রাজমোহন নাথ।

প্রবন্ধ নির্ব্বাচন ব্যতীত, গ্রন্থাগারের জন্য আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য সম্বন্ধীয় কোন্ কোন্ পুস্তক খরিদ করা হইবে, তাহা এই শাখা কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।

দুঃখের বিষয়, আলোচ্য বর্ষে এই শাখার অন্যতম সভ্য ৺রাখালরাজ রায় এম্ এ মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। এই জন্য এই শাখা বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।

(খ) দর্শন-শাখা

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্ত-রত্ন এম্ এ, বি এল মহাশয় এই শাখার সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় আহ্বানকারী ছিলেন। সভ্যগণের নাম পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

আলোচ্য বর্ষে এই শাখার দুইটি অধিবেশন হইয়াছিল। এই অধিবেশনগুলিতে মাসিক অধিবেশনে পাঠের জন্য প্রবন্ধ নির্ব্বাচন, দার্শনিক পরিভাষা সঙ্কলনের উপায় নির্দ্ধারণ, ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে গ্রন্থাবলী প্রকাশ করা সম্বন্ধে প্রশাখা-সমিতি গঠন, বিভিন্ন দর্শন সম্বন্ধে লোকশিক্ষামূলক বক্তৃতার ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয় নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। নিম্নে প্রবন্ধ ও প্রবন্ধ-লেখকের নাম এবং বক্তা ও বক্তৃতার বিষয় প্রদত্ত হইল।

প্রবন্ধ	লেখক
১। কৌলমার্গ-রহস্য	শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ।

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত তিনটি বক্তৃতা হইয়াছিল।

বক্তা	বক্তৃতার বিষয়—
(১) শ্রীযুক্ত রেবতীরমণ বেদান্তবাগীশ	উপনিষদে প্রাণতত্ত্ব
(২) শ্রীযুক্ত হরিমোহন ভট্টাচার্য্য এম্ এ	জৈনদর্শনে "স্যাদ্বাদ"
(৩) শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য	জৈনদর্শন

(গ) ইতিহাস-শাখা

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ মহাশয় এই শাখার সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয় আহ্বানকারী ছিলেন। সভ্যগণের নাম পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

এই শাখার তিনটি অধিবেশন হয়, তাহাতে ৫টি প্রবন্ধ এবং ১ খানি গ্রন্থ অলোচনার জন্য উপস্থিত হইয়াছিল। ৪টি প্রবন্ধ মাসিক অধিবেশনে পঠিত ও পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে এবং একটি প্রবন্ধ বিবেচনাধীন রহিয়াছে। 'কামন্দকীয় নীতিসার' গ্রন্থের সম্পাদন-প্রণালী শাখা-সমিতি স্থির করিয়া দিয়াছেন। গ্রন্থ-সম্পাদক, সমিতির নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে পুনরায় গ্রন্থখানি সম্পাদন করিয়া দিতে সম্মত না হইলে তাঁহাকে পাণ্ডুলিপি ফেরত দেওয়া হইবে, স্থির হইয়াছে।

প্রবন্ধ	লেখক
১। জালন্দার গড়	শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্কনাথ রায়।
২। অর্থশাস্ত্রে ধর্ম্ম ও সংস্কার	শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ।
৩। মুরশিদাবাদের একটি প্রাচীন লিপি	শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার এম্ এ, বি এল্।
৪। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়	শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ।

বড়ই আনন্দের বিষয় যে, পরিষদের পরম হিতৈষী সদস্য শ্রীযুক্ত গৌরচরণ লাহা মহাশয় ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের ও প্রাচীন পুথি সংগ্রহের জন্য পরিষৎকে ৫০০৲ দান করিয়াছেন। এই জন্য তিনি পরিষদের এবং দেশবাসীর বিশেষ ধন্যবাদভাজন। আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার ভগবতরত্ন এম্ এ উড়িষ্যায় অনুসন্ধানের সূচনা করিয়াছেন। আগামী বর্ষে এই অর্থে ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের আয়োজন করা যাইবে।

(ঘ) বিজ্ঞান-শাখা

ডাঃ শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্‌সি (এডিন), এফ আর এস ই মহাশয় এই শাখার সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, এফ সি এস্ (লণ্ডন) মহাশয় আহ্বানকারী ছিলেন। এই বর্ষে শাখার তিনটি অধিবেশন হয়, তাহাতে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি মাসিক অধিবেশনে পঠিত ও পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

১। প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক পরিভাষা—শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্‌সি।

২। আমাদের অয়নাংশ— ঐ

আলোচ্য বর্ষে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলন-কার্য্য বহু দূর অগ্রসর হইয়াছে। প্রায় ১৫০ খানি গ্রন্থ হইতে পারিভাষিক শব্দ সংগ্রহ করা হইয়াছে। বঙ্গভাষায় বহু বৈজ্ঞানিক শব্দের পারিভাষিক শব্দ রচিত ও গ্রন্থমধ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। সকল গ্রন্থের সন্ধান করা দুরূহ ব্যাপার। বিজ্ঞান-শাখার আহ্বানকারী শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই উদ্দেশ্যে পরিষৎপত্রিকায় এক

বিজ্ঞাপন দিয়া সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। যাঁহারা বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের সন্ধান পাইবেন তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক পরিভাষা সঙ্কলন-কার্য্যের জন্য পরিষৎকে সেই সকল গ্রন্থ কিছু দিনের জন্য ধার দিলে বিজ্ঞান-শাখা বিশেষ অনুগৃহীত হইবেন। সম্প্রতি সংগৃহীত পারিভাষিক শব্দগুলি অকারাদিক্রমে সাজান হইতেছে। পরে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্ব্বাচিত রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম্ এ বাহাদুরের সম্পাদনে পরিভাষা গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি এই কার্য্য সম্পাদনের জন্য একজন পৃথক্ বেতনভোগী অস্থায়ী কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়াছেন।

ফলিত জ্যোতিষ ও গণিত প্রশাখা-সমিতি

আলোচ্য বর্ষে বিজ্ঞান-শাখার এই প্রশাখা-সমিতির দুইটি অধিবেশন হইয়াছে। জ্যোতিষিক গ্রন্থাদি ও অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহ এবং জ্যোতিষ বিজ্ঞানের সর্ব্ববিধ উন্নতির উপায় নির্দ্ধারণ করিবার জন্য এই সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। এই সমিতির একজন সভ্য পঞ্চানন বন্দ্যো-পাধ্যায় বি এ মহাশয় পরলোকগমন করায় সমিতির বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। রিপন কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ এবং বহরমপুর কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এম্ এ মহাশয় এই সমিতির নূতন সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই সমিতির আহ্বানকারী শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় বিশেষ আগ্রহের সহিত এই সমিতির কার্য্য সম্পাদনে যত্ন ও পরিশ্রম করিতেছেন। তজ্জন্য তিনি পরিষদের ধন্যবাদভাজন।

চিকিৎসা প্রশাখা-সমিতি

বিজ্ঞান-শাখার এই প্রশাখা-সমিতির আলোচ্য বর্ষে কোন কাজ হয় নাই। এই শাখার আহ্বানকারী শ্রীযুক্ত ডাঃ সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় এম্ বি।

উপরিউক্ত সমিতিগুলির সভ্য ও আহ্বানকারিগণের নাম পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। তাঁহাদের নিকট পরিষৎ বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

গ্রন্থাগার

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই মহাশয় গ্রন্থাধ্যক্ষ ছিলেন এবং কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ১৩ জন সদস্য পুস্তকালয়-সমিতির সভ্য ছিলেন। সভ্য-গণের নাম-তালিকা পরিশিষ্টে প্রকাশিত হইল।

কলিকাতা করপোরেশন হইতে এ বৎসরেও পুস্তক-পত্রিকাদি ক্রয় করিবার জন্য ৬৫০৲ টাকা সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। এই টাকা হইতে এবং পরিষদের সাধারণ তহবিল হইতে ১১৩ খানি বিবিধ বিষয়ের পুস্তক ও সাময়িক পত্রিকা খরিদ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে বিজ্ঞান বিষয়ে ৮ খানি সাহিত্য বিষয়ে ২৪ খানি, দর্শন শাস্ত্রের ৪ খানি, ইতিহাসবিষয়ক ২৫ খানি, দুষ্প্রাপ্য ১৪ খানি এবং বিবিধ বিষয়ে ৩৮ খানি পুস্তক খরিদ করা হয়।

গ্রন্থাগার সম্পর্কে কর্ম্মচারিগণের বেতন সমেত ১৮৭০।৩ টাকা ব্যয় হইয়াছে। তন্মধ্যে ৬৫০৲ কলিকাতা করপোরেশন হইতে ও অবশিষ্ট পরিষদের সাধারণ-তহবিল হইতে পাওয়া গিয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে ৯০৯ খানি বাঙ্গালা পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৪৩ খানি ক্রীত ও অবশিষ্ট ৮৬৬ খানি উপহারস্বরূপ পাওয়া গিয়াছে। ২৩৫ খানি সংগৃহীত ইংরাজী পুস্তকের মধ্যে ৩৫ খানি ক্রীত ও অবশিষ্ট ২০০ খানি উপহারস্বরূপ পাওয়া গিয়াছে। বর্ষমধ্যে সর্ব্বসমেত ১১৪৪ খানি পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে।

গ্রন্থাগারের পুষ্টি-সাধনে যে সকল সদস্য স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া পুস্তক-সংগ্রহ-কার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত সুশীলকৃষ্ণ মিত্র, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে প্রভৃতি মহাশয়গণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কতিপয় গ্রন্থকার ও প্রকাশককে তাঁহাদের প্রণীত বা প্রকাশিত গ্রন্থের এক এক খণ্ড পরিষদের গ্রন্থাগারে উপহার দিবার জন্য আবেদন-পত্র পাঠান হইয়াছিল। ফলে কয়েকজন অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদের গ্রন্থগুলি উপহার দিয়াছেন। সকল গ্রন্থকারের গ্রন্থ মুদ্রিত হইলেই যথাসম্ভব শীঘ্র যাহাতে পরিষদে উপহার পাওয়া যায়, তাহার জন্য প্রত্যেক গ্রন্থকার বা প্রকাশকগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাইতেছি।

ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের ইম্পিরিয়াল রেকর্ড ডিপার্টমেণ্ট হইতে ৩৩ খানি মূল্যবান্ গ্রন্থ (Press List) উপহার পাওয়া গিয়াছে। Director of Industries, Bengal, তাঁহাদের প্রকাশিত পুস্তকাগুলি পাঠাইয়াছেন।

আমেরিকার Smithsonian Institution হইতে ১৯ খানি পুস্তক-পুস্তিকা যথারীতি উপহার পাওয়া গিয়াছে। আমেরিকার Anthropological Association Museum of Fine Arts, Boston, Naval Observatory এবং ফ্রান্সের Bulletin'de La Societe De Linguistique De Paris তাঁহাদের প্রকাশিত পত্রিকাগুলি যথারীতি পাঠাইতেছেন।

চন্দননগরের 'প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউসের' কর্ম্মকর্ত্তা এবং কাশীর "জ্ঞান মণ্ডল" সম্পাদক তাঁহাদের প্রকাশিত গ্রন্থগুলি সাগ্রহে উপহার পাঠাইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের সমগ্র গ্রন্থের এক এক খণ্ড সংগ্রহ করিয়া উপহার দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন রায় বহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম্ এ মহাশয় নিম্নলিখিত ১০ খানি দুষ্প্রাপ্য পুস্তক উপহার দিয়াছেন,—(১) সঙ্গীত গোপীচন্দ্র ভরথরী, (২) ভরথরী-চরিত্র, (৩) গোবিন্দচন্দ গাথা, (৪) গোপীচন্দ ভরথরী, (৫) গোপীচন্দ, (৬) সিহরূপী গোপীচন্দ্র, (৭) সঙ্গীত গোপীচন্দ নাটক, (৮) নবনাথ ভক্তিসার (৯) সঙ্গীত গোপীচন্দ্র ও (১০) গোপীচন্দ্র রাজাকো খেয়াল।

সাময়িক পত্রের মধ্যে ১৩ খানি দৈনিক, ৪২ খানি সাপ্তাহিক, ২ খানি পাক্ষিক, ৬১ খানি মাসিক, ২ খানি দ্বৈমাসিক ও ৬ খানি ত্রৈমাসিক পত্রিকা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে পাওয়া গিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত কলিকাতা গেজেট বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে নিয়মিতরূপে পাওয়া যাইতেছে। গত বৎসর হইতে ইণ্ডিয়া গেজেট আর পাওয়া যাইতেছে না।

Indian Antiquary, Modern Review ও মাসিক বসুমতী; এই তিনখানি পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হওয়া গিয়াছে এবং দৈনিক বসুমতী, বন্দেমাতরম্, নায়ক, The

Englishman, Indian Daily News, এই পাঁচখানি দৈনিক পত্র নগদ মূল্যে ক্রয় করা হইতেছে। [সাময়িক পত্রের তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য]।

আলোচ্য বর্ষে পুস্তকালয়-সমিতির চারিটি অধিবেশন হইয়াছিল। 'কলিকাতা প্রদর্শনীতে' গ্রন্থাগার হইতে ১৪ খানি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ প্রদর্শনার্থ পাঠান হইয়াছিল। বলা বাহুল্য গ্রন্থগুলি পরিষদের সম্পূর্ণ দায়িত্বে ও তত্ত্বাবধানে প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে পাঠাইবার ব্যবস্থা ছিল।

বর্ণানুক্রমিক তালিকা প্রস্তুত হইতেছে এবং সাময়িক পত্রিকাদির সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে। সাময়িক পত্রিকার তালিকার পাণ্ডুলিপি শীঘ্রই প্রেসে দেওয়া হইবে এবং বর্ণানুক্রমিক তালিকার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইলেই প্রেসে দেওয়া হইবে।

পরিষদের পাঠাগার নির্দ্দিষ্ট ছুটীর দিন ব্যতীত প্রত্যহ বেলা ২টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত সাধারণের পাঠের জন্য উন্মুক্ত ছিল। ৫॥০টা হইতে ৭॥০টা পর্য্যন্ত সদস্যগণ পুস্তক আদান-প্রদান করিয়াছিলেন। প্রতিদিন গড়ে ১০০ জন পাঠক সংবাদ-পত্র ও পুস্তকাদি পাঠের জন্য আসিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত কয়েকজন গবেষণা করিবার জন্য যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া পুস্তকাদি পাঠ করিতেন।

সাধারণে পাঠাগারে বসিয়া যাহাতে পুস্তকাদি পাঠ ও গবেষণা করিতে পারেন, তাহার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

পুথিশালা

১৩৩০ বঙ্গাব্দের প্রারম্ভে হস্তলিখিত প্রাচীন পুথির সংখ্যা ছিল—৪৫৪৯। তৎপরে বর্ষমধ্যে পরিষদের হিতৈষিগণের নিকট হইতে ৮৫ খানি পুথি উপহারস্বরূপ পাওয়া গিয়াছে, ১১ খানি সংস্কৃত পুথি ক্রীত হইয়াছে এবং ১ খানি পুথি অন্য স্থান হইতে আনাইয়া নকল করিয়া রাখা হইয়াছে। ইহার মধ্যে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস মহাশয় ৪৯ খানি, শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় ২৪ খানি, শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমার তন্ত্ররত্ন মহাশয় ৩ খানি, ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ মহাশয় ২ খানি, শ্রীযুক্ত চিত্তসুখ সান্যাল মহাশয় ১ খানি, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলকৃষ্ণ দেব মহাশয় ১ খানি এবং শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ১ খানি পুথি উপহার দিয়াছেন। এই সকল প্রাপ্ত পুথির মধ্যে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস মহাশয়ের প্রদত্ত বঙ্গাক্ষরে লিখিত ঋগ্‌বেদসংহিতা, বাজসনেয় সংহিতা, সামবিধান ব্রাহ্মণ এবং অনান্য কয়েকখানি তন্ত্রের পুথি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উপহাররূপে প্রাপ্ত ৮৫ খানি পুথির মধ্যে ৫৭ খানি সংস্কৃত এবং ২৮ খানি পুথি বাঙ্গালা। বর্ষশেষে পুথির সংখ্যা হইয়াছে—৪৬৪৬।

পুথির শ্রেণী

বাঙ্গালা পুথি	২৯৫৫
সংস্কৃত "	১৪২৬
অসমীয়া "	
ওড়িয়া "	

হিন্দী পুথি	২
ফার্সী "	১২
তিব্বতীয় "	২৪৪
ইংরেজী "	১
	৪৬৪৬

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন 'বাঙ্গলা পুথির বিবরণের' প্রথম খণ্ড মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে ১ হইতে ১০০ সংখ্যক পুথির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে এবং ৩০০ সংখ্যা পর্য্যন্ত পুথির বিবরণযুক্ত তালিকা লিখিত হইয়াছে। আশা করা যায়, আগামী বর্ষে ইহার দ্বিতীয় খণ্ড মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইবে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও মহাকবি সঞ্জয় এবং কাশীরামদাসের মহাভারত অবলম্বনে উভয় গ্রন্থের উপাখ্যানগত বিভিন্নতা সম্বন্ধে পুথিশালা হইতে মাসিক অধিবেশনে আলোচনা করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পুথিশালা হইতে কলিকাতা প্রদর্শনীতে বহু বাঙ্গালা ও সংস্কৃত প্রাচীন পুথি প্রদর্শনার্থ প্রেরিত হইয়াছিল।

পুথি-সংগ্রহ

বড়ই আনন্দের বিষয় যে, পরিষদের পরম হিতৈষী সদস্য শ্রীযুক্ত গৌরচরণ লাহা মহাশয় প্রাচীন পুথি সংগ্রহ ও ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের জন্য পরিষদের হস্তে ৫০০৲ দান করিয়াছেন। বঙ্গের বাহিরে উড়িষ্যা, নেপাল, আসাম প্রভৃতি স্থানে বঙ্গদেশ ও বঙ্গদেশের সাহিত্য, ধর্ম্ম প্রভৃতি সংক্রান্ত কত যে পুথি রহিয়াছে, তাহা নিরাকরণ করা দুরূহ ব্যাপার। ঐ সকল পুথি আবিষ্কৃত হইলে বঙ্গসাহিত্যের বহু লুপ্ত রত্নের উদ্ধার হইবে। সম্প্রতি উৎকলদেশে পুরীতে শ্রীচৈতন্যসম্বন্ধীয় কতকগুলি পুথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে একখানি পুথি অবলম্বন করিয়া পরিষদের উৎসাহী সদস্য শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার ভাগবতরত্ন এম্ এ মহাশয় পরিষদের মাসিক অধিবেশনে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির আদেশে ঐ সকল পুথির নকল আনিবার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং শ্রীযুক্ত গৌর বাবুর অর্থের দ্বারা সম্প্রতি ঐ সকল বহুমূল্য পুথির নকল করা হইতেছে। শ্রীযুক্ত বিমান বাবু স্বয়ং এই কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া পরিষদের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। তজ্জন্য তিনি পরিষদের ধন্যবাদভাজন। এতদ্ব্যতীত প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য পুথি সংগ্রহ করিবার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি এই ভাণ্ডার হইতে অর্থ সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। পরিষদের হিতৈষী সদস্যগণ এই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য দুষ্প্রাপ্য পুথির সন্ধান দিলে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি বিশেষ উপকৃত হইবেন।

চিত্রশালা

শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয় আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালাধ্যক্ষ ছিলেন। বর্ষমধ্যে চিত্রশালা-সমিতির তিনটি অধিবেশন হইয়াছিল। এই সকল অধিবেশনে নিরূপিত কার্য্য ব্যতীত ইডেন গার্ডেনে অনুষ্ঠিত 'কলিকাতা প্রদর্শনীতে' পরিষদের দ্রব্যাদি প্রেরণের ব্যবস্থার

আলোচনা হইয়াছিল। এই প্রদর্শনীতে কতিপয় প্রাচীন চিত্র, দলিল, দুষ্প্রাপ্য বাঙ্গালা হস্তলিখিত পুথি ও মুদ্রিত পুস্তক প্রভৃতি প্রদর্শিত হইয়াছিল।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালায় সংগৃহীত হইয়াছে,—

(১) ৺ প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস মহাশয়ের তৈল-চিত্র। প্রদাতা—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

(২) ৺দেবেন্দ্রবিজয় বসু মহাশয়ের ব্রোমাইড চিত্র। প্রদাতা—শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বসু এবং ভ্রাতৃগণ।

(৩) চারিটি রৌপ্য মুদ্রা। প্রদাতা—শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমার তন্ত্ররত্ন।

(৪) বঙ্গাব্দ ১১১২। ১১ই ভাদ্র তারিখের এক সনন্দ

(৫) „ ১১১২। ২৬ „ „ পাট্টা

(৬) „ ১১১২। ৭ মাঘ „ পাট্টা

(৭) „ ১১১২। ১২ মাঘ „ সনন্দ ও আমলনামা

(৮) „ ১২২৮ এক পত্র।

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র রায়।

৯।১০।১১।১২ চারিটি আধার সমেত মথুরার ভাস্কর্য্যের নিদর্শন (প্লাষ্টার অব পারিসের ছাঁচ)। প্রদাতা—শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার এম্ এ, বি এল্।

বলা বাহুল্য, এই সকল দ্রব্য পাইয়া পরিষদের চিত্রশালার বিশেষ উপকার হইয়াছে এবং প্রদাতৃগণ এই সকল দ্রব্য দানের জন্য পরিষদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন।

দুঃখের বিষয়, অর্থকৃচ্ছ্রতা নিবন্ধন আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালার জন্য আশানুরূপ দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই। বিগত বর্ষে প্রাচীন মুদ্রা খরিদ করিবার জন্য কুমার শ্রীযুক্ত ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় ৫১৲ দান করিয়াছিলেন। সেই অর্থে কোনও মুদ্রা খরিদ করিতে পারা যায় নাই এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সম্পাদক মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক পরিষদের চিত্রশালার মুদ্রার তালিকা প্রস্তুতের যে ভার লইয়াছিলেন, তাহারও কোন বিশেষ ব্যবস্থা হয় নাই।

চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর "বাস্তুবিদ্যা" নামক শিল্পবিষয়ক সংস্কৃত গ্রন্থের সম্পাদন ও বঙ্গানুবাদ করিবার ভার অর্পিত হইয়াছিল। তিনি এ বিষয়ে বহু দূর অগ্রসর হইয়াছেন। বিষয়টি এত জটিল যে, অনেক অংশের সুস্পষ্ট অর্থবোধে অসমর্থ হওয়ায় এ বিষয়ে সাহায্য করিতে উপযুক্ত কোন ব্যক্তির চেষ্টা করিয়াও তিনি সন্ধান পান নাই।

আশা করা গিয়াছিল যে, আলোচ্য বর্ষে রমেশ-ভবন সম্পূর্ণ হইয়া উঠিবে এবং চিত্রশালার দ্রব্যাদি তথায় সজ্জিত করিতে পারা যাইবে। চিত্রশালা-সমিতি আরও সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে, "রমেশ-ভবনের" গৃহে পরিষদের চিত্রশালার সমস্ত দ্রব্য স্থানান্তরিত করিয়া একটি সাধারণ প্রদর্শনী খোলা হইবে ও বিশেষজ্ঞগণ দ্বারা চিত্রশালা সংক্রান্ত এবং ঐতিহাসিক বিষয়ে বক্তৃতা

দেওয়াইবার ব্যবস্থা হইবে। অর্থকৃচ্ছ্রতা নিবন্ধন 'রমেশ-ভবন' সম্পূর্ণ না হওয়ায় চিত্রশালা-সমিতির উক্ত সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারা যায় নাই।

রমেশ-ভবন

আলোচ্য বর্ষের মধ্যে রমেশ-ভবনের নির্ম্মাণ-কার্য্য প্রায় শেষ হইয়াছে। ভিতরের হলের মেঝের পাথর বসান, কার্ণিশ ও সিঁড়ির উপর পাথর বসান এবং জানালা দরজার রং বার্ণিশ হইলেই কাজ সম্পূর্ণ হয়। বৈদ্যুতিক আলো ও পাখার তার বসান পর্য্যন্ত শেষ হইয়াছে। অর্থের অস্বচ্ছলতাবশতঃ মন্দিরের ঐ সকল টুকরা কাজ বাকী রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত কে সি ঘোষ এণ্ড কোম্পানী কণ্ট্রাক্‌টার মহাশয়গণ রমেশ-ভবন নির্ম্মাণ-কার্য্যে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিয়া কাজ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের বিলের টাকা ফেলিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা রমেশ-ভবন কমিটির বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। আনুমানিক ত্রিশ হাজার টাকার উপর এষ্টিমেট হইয়াছিল। তন্মধ্যে আঠার হাজার টাকা দিতে পারা গিয়াছে। তহবিলে যে টাকা রহিয়াছে, তাহার উপর এখনও ১২।১৩ হাজার টাকার অভাব রহিয়াছে। ঐ টাকা সংগৃহীত হইলে মন্দির পূর্ণাঙ্গ করিতে পারা যাইবে, আশা করা যায়।

রমেশ-ভবন সম্পূর্ণ হইলে পর রমেশ-ভবন কমিটির কর্ত্তৃপক্ষের সাহায্যে সাহায্য-কারিগণের নাম ও সাহায্যের-পরিমাণ সহ মন্দির নির্ম্মাণের সম্পূর্ণ হিসাব প্রকাশ করিতে পারা যাইবে।

স্মৃতি-রক্ষণ

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত পরলোকগত সাহিত্যিকগণের স্মৃতি-রক্ষার কার্য্য নিম্নোক্তরূপে সম্পাদন করা হইয়াছিল।

১। ইঁহাদের স্মৃতি এই ভাবে রক্ষিত হইয়াছে,—

(ক) কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের একখানি তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। চিত্র-প্রদাতা—কবির পুত্র শ্রীযুক্ত শরৎকুমার চক্রবর্ত্তী ব্যারিষ্টার।

(খ) রাজা স্যর সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের একখানি তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। চিত্র-প্রদাতা—মৃত মহাত্মার পৌত্র শ্রীযুক্ত অবনীমোহন ঠাকুর।

(গ) দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়ের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। চিত্র-প্রদাত্রী—মৃত মহাত্মার পুত্রবধূ শ্রীমতী ফুল্লনলিনী রায় চৌধুরী।

(ঘ) চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ এবং (চ) পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এই দুই জনের ব্রোমাইড চিত্র "গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডারের" অর্থে প্রস্তুত হইয়া পরিষদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(চ) চন্দ্রশেখর কর বিদ্যাবিনোদ বি এ মহাশয়ের একখানি রঞ্জিত ব্রোমাইড চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের চেষ্টায় ও তাঁহার সংগৃহীত অর্থে এই চিত্র পাওয়া গিয়াছে।

(ছ) দেবেন্দ্রবিজয় বসু এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের একখানি ব্রোমাইড চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের চেষ্টায় মৃত মহাত্মার পুত্র শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বসু এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণের নিকট হইতে এই চিত্র সংগৃহীত হইয়াছে।

২। পূর্ব্বসঙ্কল্পিত স্মৃতি-রক্ষার কার্য্যগুলি এই ভাবে সম্পাদনের ব্যবস্থা হইয়াছে,—

(ক) পরিষদের প্রথম সভাপতি রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের মূর্ত্তি রমেশ-ভবন প্রতিষ্ঠার দিন প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাঁহার তৈলচিত্রখানি আলোচ্য বর্ষেও প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই। ইহা শ্রীযুক্ত কালিদাস মিত্র মহাশয় সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

(খ) ভূতপূর্ব্ব সভাপতি সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের তৈলচিত্র। উহা অদ্যকার অধিবেশনে প্রতিষ্ঠিত হইবে। চিত্র-প্রদাতা—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

(গ) দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের তৈলচিত্র। অদ্যকার অধিবেশনে এই চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। চিত্র-প্রদাতা—শ্রীযুক্ত জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়।

(ঘ) দেবেন্দ্রনাথ সেন এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের ব্রোমাইড চিত্র। পূর্ব্বসংগৃহীত অর্থ হইতে প্রস্তুত হইতেছে।

৩। নিম্নোক্ত মহাশয়গণের নামে যে সকল ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত আছে আলোচ্য বর্ষে সেই সকল ভাণ্ডারের অবস্থা নিম্নে বিজ্ঞাপিত হইল,—

(ক) কাশীরাম দাস স্মৃতি-তহবিল। এই তহবিলে কোন আয়-ব্যয় হয় নাই। বর্ষশেষে ২৮৬৵৯ টাকা উদ্বৃত্ত রহিয়াছে।

(খ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল। বর্ষমধ্যে এই তহবিলের কোন আয়-ব্যয় হয় নাই। পূর্ব্ব বৎসরের বিজ্ঞাপিত ৪২৬৵৯ টাকাই উদ্বৃত্ত রহিয়াছে। ৺বঙ্কিম বাবুর কন্যা শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী মহোদয়ার নিকট হইতে তাঁহার প্রতিশ্রুত ৫০০৲ আলোচ্য বর্ষেও পাওয়া যায় নাই।

(গ) হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল—আলোচ্য বর্ষে 'কবি হেমচন্দ্র' পুস্তক বিক্রয় দ্বারা ১৷৶৬ পাওয়া গিয়াছে। বর্ষশেষে এই তহবিলে ৬৫২৬৵৯ উদ্বৃত্ত রহিয়াছে।

(ঘ) আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি-তহবিল। এই তহবিলে বর্ষশেষে ১৭৮৪৵৯ উদ্বৃত্ত রহিয়াছে। কোন আয়-ব্যয় হয় নাই।

(ঙ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত স্মৃতি-তহবিল—এই তহবিলে বার্ষিক স্মৃতি-উৎসবের জন্য কোন চাঁদা সংগৃহীত হয় নাই, কিন্তু উৎসবে ১৩৷৵০ ব্যয় হইয়াছিল। বর্ষশেষে ৭৭।৶০ উদ্বৃত্ত রহিয়াছে।

(চ) আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার স্মৃতি-তহবিল। আলোচ্য বর্ষে এই তহবিলের কোন আয়-ব্যয় হয় নাই, বর্ষশেষে ১।৶৩ উদ্বৃত্ত রহিয়াছে।

(ছ) স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল। গত বর্ষের উদ্বৃত্ত ৭৫।০ হইতে "৫০টি অপ্রকাশিত প্রবাদবাক্য" সংগ্রাহককে ১০৲ মূল্যের একটি রৌপ্যপদক দানের পর এই তহবিলে ৬৫।০ উদ্বৃত্ত রহিয়াছে।

(জ) অক্ষয়কুমার বড়াল স্মৃতি-তহবিল। তিন বৎসর পূর্ব্বে এই তহবিলে প্রাপ্ত ২০০৲ টাকা কোম্পানীর কাগজের সুদ বাবদ ১০৲ আলোচ্য বর্ষে পাওয়া গিয়াছে। বর্ষশেষে ২৩০৲ উদ্বৃত্ত রহিয়াছে। এই অর্থে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের সংগৃহীত কবির লিখিত অপ্রকাশিত "ওমার খায়ম" প্রকাশিত হইবে। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত আছে এবং কবির উত্তরাধিকারিগণের সহিত কথাবার্ত্তা স্থির হইলে উহা প্রেসে দেওয়া হইবে।

(ঝ) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডার। আলোচ্য বর্ষে এই তহবিলে ৫০৲ চাঁদা মৃত মহাত্মার পুত্র শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট পাওয়া গিয়াছে। রায় সাহেব বিহারীলাল সরকার মহাশয়ের তৈলচিত্র এই অর্থে প্রস্তুত হইয়াছে ও সেই তৈলচিত্র-খানি অদ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(ঞ) রজনীকান্ত সেন স্মৃতি-তহবিল—বর্ষশেষে এই তহবিলে ৩৪।৵০ উদ্বৃত্ত রহিয়াছে। কোন আয়-ব্যয় হয় নাই। এই অর্থদ্বারা কি করা হইবে, তাহা এখনও স্থির হয় নাই।

(ট) সুরেশচন্দ্র সমাজপতি স্মৃতি-তহবিল। এই তহবিলে পূর্ব্বসংগৃহীত ১০০৲ রহিয়াছে।

(ঠ) মনোমোহন চক্রবর্ত্তী স্মৃতি-তহবিল। এই তহবিলে পূর্ব্বসংগৃহীত ৫০৲ টাকা রহিয়াছে। স্মৃতি-রক্ষার কোন ব্যবস্থা হয় নাই।

(ড) কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের জন্মভূমি সেনহাটী গ্রামে একটি স্মৃতি-স্তম্ভ প্রস্তুত করিয়া প্রস্তর-ফলক বসাইবার সঙ্কল্প হইয়া রহিয়াছে এবং ফলকও প্রস্তুত হইয়া পরিষদ্ মন্দিরে রক্ষিত আছে। এখনও স্তম্ভ প্রস্তুত হয় নাই বলিয়া কার্য্য শেষ হইতেছে না।

(ঢ) কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী স্মৃতি-তহবিল। কবিরাজ মহাশয়ের চিত্র প্রতিষ্ঠার পর এই তহবিলে ২৪৲ উদ্বৃত্ত রহিয়াছে।

(ণ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতি-তহবিল। স্মৃতি-রক্ষার জন্য গঠিত শাখা-সমিতির সভ্যগণ অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছেন। পূর্ব্ব বৎসরে ৪৫৲ চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছিল। বিশ্বভারতীর নিকট হইতে সম্প্রতি ১০০৲ চাঁদা পাওয়া গিয়াছে। এই অর্থে পুস্তকাধার প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। আশা করা যায়, আগামী বর্ষে আবশ্যকমত অর্থ সংগৃহীত হইবে এবং সঙ্কল্পিত কার্য্যগুলি সম্পাদন করিতে পারা যাইবে।

৪। নিম্নলিখিত পরলোকগত সাহিত্যিকের মধ্যে কয়েকজনের স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা সত্বরেই হইবে আশা করা যায়। অনেকের চিত্র প্রস্তুত করিবার উপযোগী ফটো সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু অধিকাংশেরই স্মৃতি-রক্ষার কোন ব্যবস্থা হয় নাই। সহৃদয় সদস্যগণের অনেকেই ইচ্ছা করিলে এক এক জন এক এক জন সাহিত্যিকের চিত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়া পরিষৎকে সাহায্য করিতে পারেন। পরিষৎ এই জন্য তাঁহাদের নিকট বিনীত আবেদন জানাইতেছেন।

(ক) রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর, (খ) গিরিশচন্দ্র ঘোষ, (গ) মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ, (ঘ) রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর, (ঙ) শিবনাথ শাস্ত্রী, (চ) ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়,

(ছ) দামোদর মুখোপাধ্যায়, (জ) ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর, (ঝ) শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, (ঞ) জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, (ট) নীলরতন মুখোপাধ্যায়, (ঠ) হরিশ্চন্দ্র তর্করত্ন, (ড) প্রাণনাথ দত্ত, (ঢ) অদ্বৈতচরণ আঢ্য (ণ) চারুচন্দ্র ঘোষ, (ত) কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ এবং (থ) রায় নবীনচন্দ্র দাস বাহাদুর।

স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের তৈলচিত্র প্রস্তুত করিয়া শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় শীঘ্রই পরিষৎকে দান করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন।

৫। আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সাহিত্যিকগণের স্মৃতি-রক্ষার ভার পরিষদের উপর অর্পিত হইয়াছে।

(ক) পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। একখানি তৈলচিত্র হইবে স্থির হইয়াছে এবং শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় এই চিত্র প্রস্তুত করাইয়া দিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

(খ) অশ্বিনীকুমার দত্ত। একখানি চিত্র প্রস্তুত করাইয়া পরিষদ্ মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হইবে। পরিষদের অনুরোধে মৃত মহাত্মার সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত সুকুমার দত্ত এম্ এ, বি এল্ মহাশয় একখানি চিত্র পরিষৎকে দান করিবার সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

(গ) প্রাণতোষিণীতন্ত্র-প্রণেতা প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস মহাশয়ের একখানি চিত্র পরিষদ্ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইবে স্থির হওয়ায় মৃত মহাত্মার বংশধর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস মহাশয় একখানি তৈলচিত্র পরিষৎকে দান করিয়াছেন। অদ্যকার অধিবেশনে উহা প্রতিষ্ঠিত হইবে।

উল্লিখিত সাহিত্যিকগণের স্মৃতি-রক্ষার জন্য যে সকল মহোদয় অর্থ ও চিত্রাদি দান করিয়া এবং সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন বা দিবার প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করিয়াছেন, পরিষৎ তাঁহাদের সকলের নিকটই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

শাখা-পরিষৎ

আলোচ্য বর্ষে নোয়াখালী, বাঁকুড়া কোতুলপুর এবং বাঁশবেড়েতে পরিষদের নূতন শাখা স্থাপনের প্রস্তাব আসিয়াছে। ঐ সকল প্রস্তাবকর্ত্তার সহিত পত্রব্যবহার চলিতেছে। এতদ্ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে চন্দ্রকোণায় মেদিনীপুর শাখা-পরিষদের একটি শাখা স্থাপিত হইয়াছে। পুরাতন শাখাগুলির মধ্যে রাজসাহী ও মুরশিদাবাদ শাখার অস্তিত্ব লোপের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এ সংবাদ অত্যন্ত নিরাশাব্যঞ্জক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। মূল-পরিষদের অনুসরণে স্থানীয় নানাবিধ সাহিত্যিক অনুসন্ধানের জন্যই বিভিন্ন স্থানে পরিষদের শাখা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। উপযুক্ত কর্ম্মীর অভাবেই কোন কার্য্য হয় না বলিয়া শাখার অস্তিত্ব লোপ হয়। বঙ্গদেশের সকল স্থান হইতেই বঙ্গবাণীর ভাণ্ডারে নানা রত্নের সঞ্চয় হইতে পারে এবং মাতৃভাষানুরক্ত ব্যক্তিগণ তজ্জন্য সামান্য পরিশ্রম করিলেই চলিতে পারে। দেশের এই নব জাগরণের দিনে বঙ্গবাসী এ ভাবে পিছাইয়া পড়িলে বাস্তবিকই নিরুৎসাহ হইতে হয়। আশা করা যায়, ভবিষ্যতে বঙ্গবাসিগণ নবীন উদ্যমে স্থানে স্থানে পরিষদের শাখা স্থাপন করিয়া দেশমধ্যে বঙ্গভাষার সর্ব্বাঙ্গীন অনুশীলনে যত্নপর হইবেন।

পুরাতন শাখাগুলির মধ্যে মেদিনীপুর, কাশী, গৌহাটী, রঙ্গপুর, ত্রিপুরা, নদীয়া, উত্তরপাড়া, ভাগলপুর প্রভৃতির কার্য্যের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। অন্যান্য শাখা যাহাতে ভবিষ্যতে সজাগ হইয়া উঠে, তজ্জন্য তাহাদের পরিচালকগণের নিকট সম্পাদক বিনীত অনুরোধ জানাইতেছেন। আনন্দের বিষয় যে, অন্যান্য কার্য্যের মধ্যে মেদিনীপুর-শাখা মূল-পরিষদের পরম হিতৈষী শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের সংবর্দ্ধনা করিয়াছিলেন।

ছাত্রসভা

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয় আলোচ্য বর্ষে ছাত্রাধ্যক্ষ ছিলেন। এ বৎসর ছাত্রসভ্যগণের কোন অধিবেশন হয় নাই। নানা পারিবারিক অসুবিধায় পড়িয়া ছাত্রাধ্যক্ষ মহাশয় এই সভার বিশেষ কিছু কার্য্য করিতে পারেন নাই। আলোচ্য বর্ষে একজন ছাত্র ছাত্র-সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।

নিয়ম পরিবর্ত্তন

বিগত বর্ষে পরিষদের কতিপয় নিয়ম পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব আসিয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্তৃক গঠিত শাখা-সমিতি সেগুলি আলোচনা করিয়াছেন। আগামী বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে সেই মন্তব্য উপস্থিত করা হইবে। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি সেগুলি আলোচনা করিয়া সাধারণ-সদস্যগণের নিকট সে বিষয়ে মন্তব্য চাহিবেন।

ছাপাখানা সমিতি

সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই বর্ষে ছাপাখানা-সমিতির সম্পাদকপদে নিযুক্ত ছিলেন। এই বর্ষে এই সমিতির ৭টি অধিবেশন হইয়াছিল।

ছাপাখানা-সমিতির তত্ত্বাবধানে এ বৎসর মুদ্রণবিভাগীয় কার্য্য-সকল যথাসাধ্য সুন্দররূপে পরিচালিত হইয়াছে। চারি সংখ্যা পরিষৎ-পত্রিকা এবং তৎসহ পরিষদের বার্ষিক ও মাসিক কার্য্যবিবরণ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এ বৎসর 'উদ্ভিদ্-জ্ঞান' গ্রন্থের ১ম পর্ব্ব সূচী ও পরিশিষ্ট, পারিভাষিক শব্দ-সূচী অর্থ সহ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। পরিষৎ-পুথিশালায় রক্ষিত বাঙ্গালা পুথির তালিকা তৃতীয় খণ্ড প্রথম সংখ্যারূপে প্রকাশিত হইয়াছে। অন্যান্য গ্রন্থগুলির মধ্যে পদকল্পতরু ৪র্থ খণ্ড (১—১০) ১০ ফর্ম্মা, সংকীর্ত্তনামৃত (১—২) ২ ফর্ম্মা, ন্যায়দর্শন ৩য় খণ্ড (৭—১৭) ১১ ফর্ম্মা, ন্যায়দর্শন ৪র্থ খণ্ড (১—৫) ৫ ফর্ম্মা, সাধক-রঞ্জন (১—২) ২ ফর্ম্মা, রসকদম্ব (১—৫) ৫ ফর্ম্মা এবং শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল (৬—১২) ৭ ফর্ম্মা, মুদ্রিত হইয়াছে। উদ্ভিদ্-জ্ঞান ২য় খণ্ড, পারিভাষিক শব্দের সূচী প্রস্তুত না হওয়ায় মুদ্রণ শেষ হয় নাই। লেখমালানুক্রমণী গ্রন্থের ১ম খণ্ড প্রকাশিত হইল।

ঐ সকল গ্রন্থের মুদ্রণ ব্যতীত এই সমিতিতে ছাপাখানার বিল মঞ্জুর, ছাপাখানা নির্ব্বাচন, দর নির্ণয়, মুদ্রিত গ্রন্থের মূল্য নির্দ্ধারণ প্রভৃতি বহু বিষয় আলোচিত হইয়াছে। ছাপাখানা-সমিতির সভ্য মহোদয়গণের মধ্যে অনেকে উপস্থিত হইয়া গত বর্ষে এই বিভাগীয় কার্য্য সম্পাদনে সহায়তা করিয়াছেন। উঁহারা সকলেই বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

আয়-ব্যয়

আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সর্ব্বসমেত আয় ১৩৪৯৭৸৶২ টাকা এবং ব্যয় ১৪০৮৯৶১১ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরের সাধারণ-তহবিলের ও বিশিষ্ট ভাণ্ডারের উদ্বৃত্ত ১৮১৯৸৶৯ টাকা (কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট মজুত এবং কার্য্যালয়ে সম্পাদক মহাশয়ের নিকট নগদ ও ডাক টিকিট ধরিয়া) বর্ষশেষে সাধারণ-তহবিলের মোট ১২২৮৶০ টাকা (কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট মজুত, কার্য্যালয়ে নগদ ও ডাক টিকিট মজুত ধরিয়া) উদ্বৃত্ত ছিল। বর্ত্তমান বর্ষে পরিষদের সর্ব্ববিধ আয় অপেক্ষা ৫৯১৸৭ টাকা বেশী ব্যয় হইয়াছে। বজেটের ধৃত টাকার মধ্যে ২২৫০৮৶০ টাকা চাঁদা আদায় কম হইয়াছে। পরিষদের সদস্যগণের নিকট বকেয়া ও বর্ত্তমান বর্ষের দরুন ৮০৯৫৸৶ টাকা চাঁদা অনাদায়ী রহিয়াছে। বাকী চাঁদার অন্ততঃ কতক অংশ অথবা বর্ত্তমান বর্ষের দেয় পুরা চাঁদার টাকা আদায় হইলেও আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়া বর্ষশেষে উদ্বৃত্তের পরিমাণ অনেক বাড়িয়া যাইত এবং সঙ্গে সঙ্গে পরিষদের ঋণ অনেক কমিতে পারিত। চাঁদা অনাদায় বা কম আদায়ের পক্ষে নিম্নোক্ত হেতুগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। (ক) গ্রন্থাগারে ৩৲ তিন টাকা গচ্ছিত রাখিয়া সদস্যগণকে পাঠার্থ পুস্তক দেওয়ার প্রথা প্রচলন হওয়ার পর হইতে প্রায় তিন শত সদস্য এই প্রথার প্রতিবাদস্বরূপ চাঁদা দেওয়া বন্ধ করিয়াছেন এবং ৭৩ জন সদস্য এই হেতু পদত্যাগ করিয়াছেন এবং এতদ্ব্যতীত চাঁদা অনাদায় হওয়ায় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি ৩১২ জন সদস্যের নাম বাদ দিয়াছেন। (খ) কলিকাতায় চাঁদা আদায় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু মহাশয় সম্বৎসর কোন কার্য্য না করায় আদায় বিভাগের অত্যন্ত অসুবিধা ঘটে। এই অসুবিধার মধ্যে অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বিশেষ চেষ্টায় আদায়ের কার্য্যের ব্যবস্থা করা হয়। বর্ষশেষে সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা সহর ও মফস্বলে ২০০৭ ছিল দেখান হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রায় ১৪ ০ সদস্যের নিকট নিয়মিত চাঁদা পাওয়া গিয়াছিল। অবশিষ্ট সদস্যের নিকট হইতে আদৌ চাঁদা পাওয়া যায় নাই। এতদ্ব্যতীত দেশের দুর্ব্বৎসর জন্য চাঁদা আদায় আশানুরূপ সহজসাধ্য বা সন্তোষজনক হয় নাই। এইরূপে বর্ষশেষে সদস্যগণের নিকট ৮০৯৫৲ টাকা চাঁদা বাকী পড়িয়াছে। সদস্যগণের নিকট যে চাঁদার টাকা অনাদায় রহিয়াছে, তজ্জন্য পরিষৎ যথাসম্ভব চেষ্টা করিয়াও তাহা আদায় করিতে সমর্থ হন নাই। সদস্যগণের দেয় চাঁদার টাকার উপরই পরিষদের জীবন নির্ভর করিতেছে এবং এই চাঁদার টাকার ভরসাতেই পরিষৎ বর্ষারম্ভে যাবতীয় কার্য্য আরম্ভ করিয়া থাকেন। কিন্তু বর্ষশেষে নিয়মিত চাঁদার টাকা আদায় না হইলে পরিষৎকে বড়ই অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। পরিষদের সদস্যগণের দেয় বার্ষিক চাঁদার টাকা যাহাতে বর্ষমধ্যেই আদায় হইয়া যায়, তজ্জন্য পরিষৎ সদস্যগণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতেছেন এবং আরও সদস্যগণের নিকট সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছেন যে, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদের নিজ নিজ দেয় চাঁদা বা প্রতিশ্রুত দান যেন বর্ষমধ্যেই প্রদান করিয়া বাঙ্গালীর এই জাতীয় বাণী-

প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক কার্য্যে আমাদিগকে সহায়তা করেন। আশা করি, পরিষদের বিশেষ হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু ও সদস্যগণের নিকট আমাদিগের এই অনুরোধ বিফল হইবে না।

পূর্ব্ব বৎসরে পরিষদ্ মন্দির মেরামতের কথা আপনাদিগের গোচরে আনা হইয়াছিল। মন্দির মেরামতের কার্য্য কতক পরিমাণে হইয়াছে। কিন্তু কন্ট্রাক্টার এখনও তাঁহার বিলের প্রাপ্য পান নাই। অর্থাভাবে পরিষদ্ মন্দিরের আরও কয়েকটি অত্যাবশ্যক কার্য্য সমাধা করিতে পারা যাইতেছে না। মন্দির মেরামতের জন্য বর্ত্তমান বর্ষের ৫০৲ টাকার একটি দান ব্যতীত আর কোন সাহায্য পাওয়া যায় নাই। গৃহ-নির্ম্মাণের সময় পরিষদের যে সকল হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু গৃহ-নির্ম্মাণকল্পে চাঁদা দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাঁহারা যদি এই সময় অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রতিশ্রুতির টাকা প্রদান করেন, তাহা হইলে মন্দির মেরামতের কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করা হইবে। তজ্জন্য পরিষৎ তাঁহাদের নিকট সানুনয় প্রার্থনা জানাইতেছেন।

পরিষদের বিভিন্ন কার্য্যের জন্য যে সকল টাকা এখনও অনাদায়ী রহিয়াছে, সেই সকল টাকা যাহাতে আদায় হইতে পারে তজ্জন্য পরিষদের বিশেষ হিতৈষী বন্ধু বিখ্যাত এটর্ণী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, বি এল্, এম্ এল্ সি মহাশয় বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। ইহা ব্যতীত তিনি পরিষদের সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্য যেরূপ যত্ন করিতেছেন তাহাতে আমরা আশা করি যে, তাঁহার চেষ্টা পরিষদের নানা উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করিবে, এজন্য শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র বাবুকে পরিষৎ বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাইতেছেন।

পরিষদের অন্যতম আয়-ব্যয়-পরীক্ষক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ মহাশয় কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতার বাহিরে যাওয়ায় তাঁহার স্থানে শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ মহাশয় আয়-ব্যয়-পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত অনাথ বাবু এবং শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় যেরূপ শ্রম স্বীকার করিয়া পরিষদের আয়-ব্যয়-পরীক্ষার কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন ও করিতেছেন তজ্জন্য পরিষৎ তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

আলোচ্য বর্ষে আয়-ব্যয়-সমিতির ৭টি অধিবেশন হইয়াছিল। আয়-ব্যয়-সমিতির অধিবেশনসমূহে উপস্থিত থাকিয়া সমিতির যে সকল সভ্য কার্য্য পরিচালনায় সাহায্য করিয়াছেন তাঁহারা পরিষদের ধন্যবাদভাজন।

বিশেষ দান

১। আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত গৌরচরণ লাহা মহাশয় ঐতিহাসিক অনুসন্ধান এবং দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন পুথি সংগ্রহের জন্য পরিষদের হস্তে ৫০০৲ দান করিয়াছেন।

২। স্বনাম-প্রসিদ্ধ কন্ট্রাক্টার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পরিষদ্ মন্দির সংস্কারের জন্য ৫০৲ দান করিয়াছেন এবং তিনি পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ৺সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের একখানি তৈলচিত্র স্বব্যয়ে প্রস্তুত করাইয়া পরিষৎকে দান করিয়াছেন। এই দুই দানের জন্য পরিষৎ তাঁহার নিকট বিশেষভাবে ঋণী

৩। শ্রীযুক্ত জটলেশ্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের একখানি তৈলচিত্র প্রস্তুত করাইয়া দান করিয়াছেন।

এই সকল অর্থ ও চিত্র দানের জন্য পরিষৎ দাতৃগণের নিকট বিশেষ উপকৃত।

দুঃস্থ সাহিত্যিক-ভাণ্ডার

এই ভাণ্ডারে বর্ষশেষে শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয়ের প্রদত্ত ১৬০০৲ কোম্পানীর কাগজের সুদ ৫৯॥০ টাকা, শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি ঘোষ এবং উত্তরপাড়া শাখা-পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রদত্ত গ্রন্থাবলী বিক্রয় বাবদ ১৩।০ টাকা, মোট ৭২৸০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। এই অর্থ ব্যয় সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন। পরিষৎ আশা করেন যে, সহৃদয় বঙ্গবাসী এই ভাণ্ডার স্ফীত করিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে দুঃস্থ সাহিত্যিক ও তাঁহাদের দুঃস্থ পরিবারের সাহায্য করিয়া দেশবাসীর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিবেন।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্ মহাশয় আলোচ্য বর্ষে পত্রিকাধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার পরিচালনে ঐ বর্ষে ত্রিংশ ভাগ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার চারি সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। এই চারি সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি সমস্তই সাহিত্য-ইতিহাস-দর্শন-বিজ্ঞান-শাখার অনুমোদিত হইয়াছিল। সর্ব্বসমেত ১৫টি প্রবন্ধ এই ত্রিংশ ভাগে রহিয়াছে। নিম্নে শ্রেণীভেদে প্রবন্ধগুলির ও তাহাদের লেখকগণের নাম দেওয়া গেল।

প্রাচীন-সাহিত্য—(১) উৎকলে নবাবিষ্কৃত শ্রীচৈতন্যসম্বন্ধীয় পুথি।—শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার ভাগবত-রত্ন এম্ এ।

সাহিত্য—(১) সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যে 'কথা' ও আখ্যায়িকা—শ্রীযুক্ত ডাঃ সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্, ডি লিট্।

দর্শন—(১) জৈন দর্শনে স্যাদ্বাদ (১ম অংশ), শ্রীযুক্ত হরিমোহন ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ এম্ এ।

ইতিহাস—(১-২) অর্থ-শাস্ত্রে সমাজ-চিত্র (দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশ), এবং (৩) অর্থ-শাস্ত্রে ধর্ম্ম এবং সংস্কার—শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, (৪) আসামের নানা কথা—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্ এ। (৫) পবনদূতের বিজয়পুর কোথায়?—শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল্, (৬) ঐ প্রবন্ধের আলোচনা—শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার ভাগবত-রত্ন এম্ এ, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ এবং শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ।

ভাষাতত্ত্ব—(১) প্রাচীন বাঙ্গালা 'আহুট', 'আউট' ও সার্দ্ধ-সংখ্যাবাচক শব্দাবলী—এবং (২) বাঙ্গালা ভাষার কর্ম্ম ও ভাব-বাচ্যের ক্রিয়া—শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্।

বিজ্ঞান—(১) যোগেন্দ্র বাবুর স্বতঃসিদ্ধের প্রমাণ—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণতারণ রায় চৌধুরী।

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা—(১) আলোক বিজ্ঞানের পরিভাষা সম্বন্ধে দুই একটি কথা, এবং (১) চৌম্বক ও তাড়িত-বিজ্ঞানের পরিভাষা—শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই, (৩) বৈজ্ঞানিক পরিভাষা (প্রকৃতি-বিজ্ঞান ও নাদ-বিজ্ঞান)—শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্‌সি।

শ্রেণীভেদে প্রবন্ধগুলির সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হইল—

প্রাচীন-সাহিত্য ১, সাহিত্য ১, দর্শন ১, ইতিহাস ৬, ভাষাতত্ত্ব ২, বিজ্ঞান ১ এবং বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ৩।

গ্রন্থ-প্রকাশ-বিভাগ

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির মুদ্রণ-কার্য্য চলিয়াছিল,—

১। শ্রীশ্রীপদকল্পতরু (৪র্থ খণ্ড)—সম্পাদক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ।

২। শ্রীসংকীর্ত্তনামৃত—সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

৩। ন্যায়দর্শন (৩য় ও ৪র্থ খণ্ড)—সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ।

৪। উদ্ভিদ্‌জ্ঞান (১।২ পর্ব্ব)—সম্পাদক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু এম্ এ, এফ সি এস্।

৫। শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল—সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।

৬। রসকদম্ব—সম্পাদক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ এবং শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্ এ

৭। সাধক-রঞ্জন—সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ।

৮। লেখমালানুক্রমণী—সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ।

৯। প্রাচীন পুথির বিবরণ (১ম খণ্ড) সঙ্কলয়িতা—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ

ইহার মধ্যে উদ্ভিদ্-জ্ঞান ১ম পর্ব্ব, প্রাচীন পুথির বিবরণ ১ম খণ্ড এবং লেখমালানুক্রমণী ১ম ভাগ ১ম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে।

ঐতিহাসিক অনুসন্ধান

বঙ্গদেশে ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা আজকাল সকলেই বিশেষভাবে অনুভব করিতেছেন। অনুসন্ধানের ফলে বাঙ্গালার ইতিহাসের বিভিন্ন দিকে দিন দিন কত আলোক সম্পাত হইতেছে। এই অনুসন্ধান-কার্য্য বিপুল অর্থসাপেক্ষ। বঙ্গদেশে 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি' এ বিষয়ে বহু তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। 'বীরভূম অনুসন্ধান সমিতি' ও আরও অনেক অনুসন্ধান-সমিতির চেষ্টায় দেশের প্রভূত উপকার হইয়াছে। সম্প্রতি অর্থাভাবে পরিষৎ এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই। যদিও পূর্ব্বে কতিপয় হিতৈষী সদস্য স্বব্যয়ে এবং পরিষদের ব্যয়ে বঙ্গের নানাস্থান অনুসন্ধান করিয়াছিলেন তথাপি সে সকল অনুসন্ধান পর্য্যাপ্ত নহে—তাহা সকলেই স্বীকার করেন। পরিষদের এই অভাব লক্ষ্য করিয়া বিগত বর্ষে শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ মহাশয় পরিষদের হস্তে এক হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ দান করিয়াছিলেন। আলোচ্য বর্ষেও শ্রীযুক্ত গৌরচরণ লাহা মহাশয় এই উদ্দেশ্যে ও প্রাচীন

পুথি উদ্ধারের জন্য ৫০০৲ দান করিয়াছেন। এখনও বহু অর্থের প্রয়োজন। পরিষৎ আশা করেন যে, দেশের হিতৈষী ব্যক্তিগণ এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, বঙ্গের লুপ্ত গৌরব—সাহিত্যে-শিল্পে বঙ্গমাতার পূর্ণ সম্পদ্ উদ্ধারের জন্য পরিষৎকে অর্থ-সাহায্য করিয়া উৎসাহিত করিবেন।

ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের জন্য শ্রীযুক্ত অধর বাবুর প্রদত্ত অর্থের সুদ কি ভাবে ব্যয়িত হইবে তাহা এখনও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি স্থির করেন নাই।

পদক ও পুরস্কার

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির জন্য প্রবন্ধ লিখিতে সাধারণকে আহ্বান করা হয়। বহুদিন ধরিয়া এই সকল বিষয় বিজ্ঞাপিত হইয়া আসিতেছে, অথচ উপযুক্ত প্রবন্ধ পাওয়া যাইতেছে না। এই জন্য প্রবন্ধের বিষয়ের পরিবর্ত্তন আবশ্যক কি না, তদ্বিষয়ে সম্পাদক পদক ও পুরস্কারদাতৃগণের সহিত আলোচনা করিবেন। এই সমস্ত কারণে পদক ও পুরস্কারের বিজ্ঞাপন আলোচ্য বর্ষে দিতে পারা যায় নাই।

(১) ব্যোমকেশ মুস্তফী সুবর্ণ-পদক। বিষয়—২৪ পরগণা ও কলিকাতার জলযান ও তৎসংক্রান্ত প্রচলিত শব্দ ও তাহার সুনির্দ্দিষ্ট অর্থ ও প্রয়োগ।

(২) হেমচন্দ্র রৌপ্য-পদক। বিষয়—বঙ্কিমচন্দ্রে ও হেমচন্দ্রে জাতীয় ভাব।

(৩) রামগোপাল রৌপ্য-পদক। বিষয়—কবি অক্ষয়কুমার বড়াল মহাশয়ের 'এষা' কাব্য সমালোচনা।

(৪) অক্ষয়কুমার বড়াল রৌপ্য-পদক (ক)—বিষয়—বাঙ্গালার গীতিকাব্যে কবি অক্ষয়-কুমার বড়ালের স্থান।

(৫) অক্ষয়কুমার বড়াল রৌপ্য-পদক(খ)। বিষয়—অক্ষয়কুমার বড়ালের কাব্যে নারী চরিত্র।

(৬) সুরেশচন্দ্র সমাজপতি রৌপ্য-পদক। বিষয়—বাঙ্গালা সাহিত্যে সুরেশচন্দ্র।

(৭) আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি-পুরস্কার (১০০৲)। বিষয়—শতপথ, গোপথ ও তাণ্ড্য ব্রাহ্মণের আখ্যান ও উপাখ্যানসমূহের বিবরণ ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা।

আলোচ্য বর্ষে আরও দুইটি পদকের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে,—

(১) কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের সূচী প্রণয়ন জন্য কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন সেন মহাশয় একটি সুবর্ণ-পদক দান করিবেন।

(২) মাইকেল মধুসূদন দত্তের শত বার্ষিক জন্মোৎসব স্মরণীয় করিবার জন্য মাইকেলের জীবনী ও গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে প্রবন্ধ-লেখককে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার এম্ এ মহাশয় 'দেওয়ান বাহাদুর জ্ঞানশরণ চক্রবর্ত্তী পদক' নামে এক রৌপ্য-পদক দিবেন।

এই দুই পদক দানের প্রস্তাবের জন্য দাতৃগণের নিকট পরিষৎ আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছেন।

কলিকাতা করপোরেশন

আলোচ্য বর্ষের আবেদনের ফলে কলিকাতা করপোরেশন পূর্ব্বে বৎসরের ন্যায় ইং ১৯২৩।২৪ সালের জন্য পরিষদ্ মন্দিরের ট্যাক্স রেহাই দিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত করপোরেশন হইতে পরিষদের গ্রন্থাগারে পূর্ব্ব বর্ষের এবারেও ৬৫০৲ টাকা দান পাওয়া গিয়াছে। করপোরেশনের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এই জন্য পরিষৎ বিশেষভাবে ঋণী ও কৃতজ্ঞ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

বিগত ৬ই ও ৭ই বৈশাখ ১৩৩১ তারিখে হুগলী জেলার অন্তর্গত রাধানগর গ্রামে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের জন্মভূমিতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের পঞ্চদশ অধিবেশন হয়। মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, বি এল মহাশয় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, বি এল্, এম্ এল্ সি, এটর্ণি এবং কবিরাজ শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন গুপ্ত কাব্যতীর্থ এম্ এ মহাশয় সম্পাদক হইয়াছিলেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সম্মিলনের সভাপতি হইয়াছিলেন। মূল সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, ও শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্‌সি, মহাশয় যথাক্রমে সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি হইয়াছিলেন। এই সম্মিলনের বিশেষত্ব এই যে, এবার সাহিত্যিকগণের মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থান দর্শন করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল।

উপসংহার

সংক্ষেপে পরিষদের ত্রিংশ বর্ষের কার্য্যবিবরণ অদ্যকার বার্ষিক সভায় উপস্থিত করিলাম। এই কার্য্যবিবরণ হইতে পরিষদের সকল বিভাগের কার্য্যের পরিচয় পাওয়া যাইবে। আলোচ্য বর্ষে পরিষদের কার্য্য সকল দিক্ দিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য কয়েকটী নূতন উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে কয়েকটীর উল্লেখ করা আবশ্যক।

[১] পরিষদের কার্য্যালয়ে প্রথম বর্ষ হইতে আজ পর্য্যন্ত যে সমস্ত নথি, খাতাপত্র প্রভৃতি আছে, অনেক সময় ঐ সমস্ত পুরাতন নথি বাহির করিয়া দেখিয়া কাজ করিতে হয়। কিন্তু সেগুলি খুঁজিবার সময় পরিষদের কর্ম্মচারীদের বড়ই হয়রাণ হইতে হইত। নথি সম্বন্ধে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করিলেও সময়মত উত্তর পাওয়া যাইত না। এইরূপ বহু অসুবিধা হইত এইরূপ নানাবিধ অসুবিধা দূর করিবার জন্য আলোচ্য বর্ষে নথি ও খাতাপত্রাদির একটী বিস্তৃত Index বা সূচী প্রস্তুত করা হইয়াছে। ইহার সাহায্যে কার্য্যালয়ের নথিপত্রাদি সম্বন্ধে যথেষ্ট সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয়।

[২] মাসিক অধিবেশনে পাঠ্য প্রবন্ধ সম্বন্ধে যাহাতে সদস্য ও বিশেষজ্ঞগণের আলোচনার সুবিধা হয় তজ্জন্য আলোচ্য বর্ষ হইতে অধিবেশনের পত্রে প্রবন্ধের নামের সহিত তাহার আলোচ্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

[৩] পুথিশালায় পাঁচ হাজার পুথি সংগৃহীত হইয়াছে। ক্রমিক সংখ্যা দিয়া পুথিগুলির একটী তালিকাও আছে। কিন্তু কাহাকেও কোন বিশেষ বিষয়ের পুথি দেখিতে হইলে সমস্ত তালিকা না খুঁজিলে সে বিষয়ের পুথির অস্তিত্ব বুঝিবার উপায় থাকে না। কিন্তু যদি বিষয়ানুসারে একটী সূচী (Subject Catalogue) থাকে তাহা হইলে অনুসন্ধানকারীর কাজের সুবিধা হয়। এ বৎসর পরিষৎ বাঙ্গালা পুথির এইরূপ একটী সম্পূর্ণ সূচী প্রস্তুত করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন আর একটী কার্য্যে পরিষৎ আলোচ্য বর্ষে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। অন্যান্য পুথিশালায় রক্ষিত দুষ্প্রাপ্য পুথির নকল করাইয়া পরিষদের পুথিশালায় রাখিবার জন্য চেষ্টা হইতেছে। এ বৎসর সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে রঘুনন্দনের পুরুষোত্তম-তত্ত্বের দুষ্প্রাপ্য পুথির অনুলিপি পরিষৎ পুথিশালায় রক্ষিত হইয়াছে। এজন্য সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ আমাদের ধন্যবাদভাজন।

[৪] বাঙ্গালা দেশে এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্নাল ব্যতীত কোন পত্রিকার বিষয়-সূচী (Subject Index) দিবার ব্যবস্থা নাই। বিষয়-সূচীর উপকারিতা কেহই অস্বীকার করিবেন না। এই সূচী থাকিলে গবেষণাকারীর অনুসন্ধানের সুবিধা হয়। আমাদের পরিষৎ-পত্রিকা ত্রিশ বৎসর বাহির হইতেছে। পূর্ব্বে পত্রিকার এক বৎসর পূর্ণ হইলে পত্রিকার এক বৎসরের ৪ সংখ্যার বিষয়-সূচী প্রকাশিত হইত না। সুখের বিষয়, এ বৎসর ১৩২৯ বঙ্গাব্দের পত্রিকার বিষয়-সূচী প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষের পত্রিকারও বিষয়-সূচী মুদ্রিত হইয়াছে, শীঘ্রই সদস্যগণের নিকট প্রেরিত হইবে।

[৫] দেখা যাইতেছে, ইউরোপ ও আমেরিকায় পরিষৎ-পত্রিকার যথেষ্ট প্রচার হইয়াছে। অনেক বিশিষ্ট স্থান হইতে আমরা বিনিময়ে পত্রিকা পাইয়া থাকি ও পাইবার আশা রাখি। ইউরোপের পত্রাদিতে পরিষৎ-পত্রিকার উল্লেখও দেখা যায়। পরিষদের গবেষণার সহিত বিদেশী মনীষীদের পরিচিত রাখিবার জন্য এ বৎসর পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের সারমর্ম্ম ইংরেজিতে স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিত হইয়াছে।

[৬] বাঙ্গালা ও বাঙ্গালার বাহিরে সাহিত্যিক গবেষণায় সাহিত্যিকগণকে সাহায্য করিবার জন্য পরিষৎ Bureau of Information বা অনুসন্ধান-সমিতিরূপে আলোচ্য বর্ষে প্রায় পঞ্চাশ জন সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগীকে সাহায্য করিয়াছেন। পরিষৎ সাহিত্যিকগণকে প্রবন্ধ, পুস্তক বা সংবাদাদির সন্ধান দিতে সকল সময়ই প্রস্তুত। এ বৎসর যাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া সাহিত্যিক সন্ধান জানিতে চাহিয়াছেন, পরিষৎ তাঁহাদিগকে সংবাদদানে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে ত্রুটি করেন নাই।

[৭] পরিভাষা-সঙ্কলনের কার্য্যের সূচনা পরিষৎ অনেক দিন হইতেই করিয়াছেন। কিন্তু এতদিন কর্ম্মীর অভাবে এই কার্য্য বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। সুখের বিষয়, বিজ্ঞান-শাখার আহ্বানকারী শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্ন ও চেষ্টায় এবার বৈজ্ঞানিক পরিভাষার কার্য্য যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছে। আশা করা যায়, আগামী বর্ষে বৈজ্ঞানিক পরিভাষার একখানি সম্পূর্ণ গ্রন্থ আপনাদের নিকট উপস্থিত করা যাইবে।

পরিষদের অনেক কর্ত্তব্য রহিয়াছে এবং সেই কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য পরিষদের কি কি বিষয়ে অভাব তাহাও আপনাদিগকে জানান উচিত মনে করি। পরিষদের কর্ম্মক্ষেত্র দিন দিন বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। এই বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্রে পরিষদের কর্ত্তব্য যথাযথ সম্পন্ন করিতে হইলে প্রধানতঃ দুইটী জিনিসের আবশ্যক—প্রথম উপযুক্ত কর্ম্মী, দ্বিতীয়—অর্থ। বঙ্গদেশে বাণী ও লক্ষ্মীর কৃপাভাজন বঙ্গবাণীর সুসন্তানের অভাব নাই। তাঁহাদের নিকট আমার নিবেদন, তাঁহারা এই বাণী-মন্দিরে সমবেত হইয়া তাঁহাদের নিজ নিজ সামর্থ্য ও সুবিধা অনুসারে বঙ্গবাণীর সেবায় তৎপর হউন। তাঁহাদের সমবেত চেষ্টায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পৃথিবীর বিদ্বৎসমাজের নিকট বরেণ্য স্থান লাভ করুক। আর পরিষৎ যে সকল কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, উপযুক্ত অর্থের অভাবে তাহার অনেকগুলি এ পর্য্যন্ত সম্পন্ন হইয়া উঠে নাই। আপনাদের নিকট আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, আপনারা একটু সচেষ্ট হইয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া পরিষদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিবিধান করুন।

পরিশেষে একটী কথা না বলিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিতেছি না। এই এক বৎসর কাল সম্পাদকরূপে পরিষদের সেবা করিতে গিয়া আমার অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটিয়াছে। তজ্জন্য আপনাদের নিকটও আমি ক্ষমা প্রার্থী। পরিষদের কার্য্য-পরিচালনে পরিষদের যে সকল কর্ম্মাধ্যক্ষ ও সদস্য, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ও বিভিন্ন শাখা-সমিতির সভ্য আমাকে পরামর্শ ও উপদেশ দান করিয়াছেন এবং পরিশ্রম করিয়া নিজ নিজ বিভাগের কার্য্য সম্পাদন করিয়া পরিষদের সেবা করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই নিকট আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহাদের সাহায্য ব্যতীত পরিষদের গুরুভার বহন করা আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে সম্ভব হইত না, ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

কার্য্যব্যপদেশে হয়ত অনেক সময় তাঁহাদের সহিত আমার মতভেদ হইয়া থাকিবে; আমি আশা করি তজ্জন্য তাঁহারা আমাকে যেন ক্ষমা করেন। তাঁহাদের উপদেশ, উৎসাহ, পরিশ্রম ও অধ্যবসায় লইয়া তাঁহারা আগামী বর্ষে পরিষদের কর্ম্মক্ষেত্রে—মাতৃভাষার সেবাযজ্ঞে আত্মনিয়োগ করিয়া ধন্য হউন এবং ভাষাজননীর সর্ব্বাঙ্গীন সম্পদ্ বৃদ্ধি করুন—এই প্রার্থনা জানাইয়া এই কার্য্যবিবরণের পরিসমাপ্তি করিলাম।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির
বঙ্গাব্দ ১৩৩১, ৪ঠা শ্রাবণ।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সম্পাদক।

পরিশিষ্ট

বিভিন্ন শাখা-সমিতির সভ্যগণ

(ক) সাহিত্য-শাখা

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী এম্ এ ব্যারিষ্টার—সভাপতি, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্, মৌলবী মুহম্মদ শহীহুল্লাহ্ এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্বনিধি এম্ এ, শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ বেণীমাধব বড়ুয়া এম্ এ, ডি লিট্, শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় এম্ এ, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম্ এ, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু এম্ এ, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর এবং পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত—আহ্বানকারী।

(খ) দর্শন-শাখা

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ বেদান্ত-রত্ন এম্ এ, বি এল্—সভাপতি, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, শ্রীযুক্ত ডাঃ বেণীমাধব বড়ুয়া এম্ এ, ডি লিট্, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীযুক্ত হরিমোহন ভট্টাচার্য্য এম্ এ, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত রেবতীরমণ বেদান্তবাগীশ, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত ডাঃ শিশিরকুমার মৈত্র এম্ এ, পিএচ্ ডি, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ এবং পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক। শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য—আহ্বানকারী।

(গ) ইতিহাস-শাখা

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ—সভাপতি, শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্ এ, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সি আই ই, বি এল্, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল্, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা এম্ এ, বি এল্, পিএচ্ ডি, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু পুরাতত্ত্বভূষণ, শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চাকলাদার এম্ এ, এবং পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই—আহ্বানকারী।

(ঘ) বিজ্ঞান-শাখা

শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এসসি— সভাপতি, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু এম্ এ, এফ্ সি এস্, মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন এম্ এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ

দাস ঘোষ এম্ এস্‌সি, এম্ ডি, শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম্ এ, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ এ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ শেঠ এম্ এস্‌সি, শ্রীযুক্ত হৃদয়কৃষ্ণ দে এম্ এ, শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ এম্ এ, শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্‌সি, রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস্, শ্রীযুক্ত ডাঃ সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় এম্ বি, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ, এফ্ জি এস্, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ, শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই, শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার মজুমদার এম্ এ, এবং পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, এফ সি এস্ (লণ্ডন)—আহ্বানকারী।

[ঙ] ফলিত-জ্যোতিষ ও গণিত প্রশাখা-সমিতি

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্‌সি, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্নি, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এম্ এ, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ এবং শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন (আহ্বানকারী)।

[চ] চিকিৎসা প্রশাখা-সমিতি

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সি আই ই, আই এস্ ও, এম্ বি, এফ সি এস, শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি, এম্ এসসি, শ্রীযুক্ত ডাঃ করুণাকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ ডি, শ্রীযুক্ত কবিরাজ সত্যেন্দ্রনাথ রায় এবং শ্রীযুক্ত ডাঃ সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ এম্ বি (আহ্বানকারী)।

[ছ] পুস্তকালয়-সমিতি

শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, এফ সি এস্ (লণ্ডন), শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু এম্ এ, শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ, শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর ঘোষ, শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, বি ই, শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম ডি, এম্ এস্‌সি, শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার দাস বি এল্, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু বি এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ সুধীরকুমার বসু এম বি, পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক, শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই (গ্রন্থাধ্যক্ষ), পরে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত—আহ্বানকারী (গ্রন্থাধ্যক্ষ)।

[জ] চিত্রশালা-সমিতি

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, এটর্নি, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্‌সি, (এডিন), শ্রীযুক্ত কুমার ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা এম্ এ, বি এল, পিএচ ডি, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি আই ই, ডি লিট্, শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চাকলাদার এম্ এ, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ, এফ জি এস্, শ্রীযুক্ত ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট, শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই, পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই (চিত্রশালাধ্যক্ষ)—আহ্বানকারী।

[ঝ] ছাপাখানা-সমিতি

শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ, শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার দাস বি এল, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ, শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন বি এ, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম্ এ, বৈদ্যমহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন সেন, শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, এবং পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত—সহকারী সম্পাদক।

[ঞ] আয়-ব্যয়-সমিতি

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত অনন্তচরণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা এম্ এ, বি এল্, এফ জেড এম, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত রায় বিনোদবিহারী বসু বি এ, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, বৈদ্যমহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন সেন, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম্ এ, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্নি, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ঘোষ এবং পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত (সহকারী সম্পাদক)—আহ্বানকারী।

[ট] কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতি-সমিতি

পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক, শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব, মৌলবী কাজি নজরুল ইস্লাম, শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি এল্, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী বি এ, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়, শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পাল বি এ, শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী এম্ এ, শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

[ঠ] নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন শাখা-সমিতি

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ—আহ্বানকারী।

[ড] সম্মিলন-পরিচালন-সমিতি—১৪শ বর্ষ

শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম্ এ, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন, শ্রীযুক্ত শশধর রায় এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্ এ, প্রাজ্ঞ, শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্সি (এডিন), শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় বি এ, ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার, মৌলভী মোজাম্মেল হক কাব্যকণ্ঠ এবং পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ।

[ঢ] আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি সমিতির কার্য্যকরী সমিতি

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই, (সভাপতি), রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস্ ও, এম্ বি, এফ সি এস, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায় এম্ এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ শিশিরকুমার মৈত্র এম্ এ, পিএচ ডি, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু এম্ এ, এফ সি এস্, শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ দত্ত বি এল্, এটর্নি, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ, এফ জি এস্, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্নি, ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত—সহকারী সম্পাদক।

পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে প্রাপ্ত সাময়িক পত্রাদি

দৈনিক

১। The Amrita Bazar Patrika.
২। The Bengalee.
৩। The Calcutta Exchange Gazette.
৪। Forward.
৫। The Indian Mirror.
৬। আনন্দ-বাজার-পত্রিকা
৭। স্বরাজ
৮। স্বদেশ
৯। হিন্দুস্থান

সাপ্তাহিক

১। The Calcutta Gazette.
২। The Mussalman.
৩। The Telegraph.
৪। The World and the New Dispensation.
৫। আত্মশক্তি
৬। এডুকেশন গেজেট
৭। খুলনা-বাসী
৮। গৌড়-দূত
৯। গৌড়ীয়
১০। চারুমিহির
১১। চুঁচুড়া-বার্ত্তাবহ
১২। ছোল্তান
১৩। জাগরণ
১৪। ঢাকা-প্রকাশ
১৫। নব-সঙ্ঘ
১৬। নীহার
১৭। নোয়াখালি-সম্মিলনী
১৮। পল্লীবাসী
১৯। ফরিদপুর-হিতৈষিণী
২০। বঙ্গবাসী
২১। বঙ্গরত্ন
২২। বরিশাল-হিতৈষী
২৩। বর্দ্ধমান-সঞ্জীবনী
২৪। বসুমতী
২৫। বাঁকুড়া-দর্পণ
২৬। বাঁশরী
২৭। বিজলী
২৮। বীরভূম-বার্ত্তা
২৯। ময়মনসিংহ-সমাচার

৩০। মালদহ-সমাচার
৩১। মেদিনীপুর-হিতৈষী
৩২। মোহাম্মদী
৩৩। যুগান্তর
৩৪। যুগবার্ত্তা
৩৫। শঙ্খ
৩৬। শিক্ষা-সমাচার
৩৭। শিশির
৩৮। সচিত্র শিশির
৩৯। শ্রীকৃষ্ণ
৪০। সঞ্জয়
৪১। সঞ্জীবনী
৪২। সময়
৪৩। স্বরাজ
৪৪। সোনার বাংলা
৪৫। হিতবাদী

পাক্ষিক

১। ধর্ম্মতত্ত্ব

মাসিক

১। American Anthropologist.
২। The Calcutta Medical Journal.
৩। The Calcutta Review.
৪। Commercial India.
৫। Devalaya Review.
৬। Health and Happiness.
৭। Industry.
৮। Indian Medical Record.
৯। Journal of the North China Branch of the Royal Asiatic Society.
১০। Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal.
১১। The Mahamandal Magazine.
১২। Success.
১৩। The Vedanta Kesari.
১৪। অর্চ্চনা
১৫। আমার দেশ
১৬। আর্য্যদর্পণ
১৭। আয়ুর্ব্বেদ
১৮। আলোচনা
১৯। ইস্‌লাম-দর্শন
২০। উৎসব
২১। উদ্বোধন
২২। উপাসনা
২৩। কায়স্থ
২৪। কায়স্থ-পত্রিকা
২৫। কায়স্থ-সমাজ
২৬। কৃষক
২৭। কৃষি-সম্পদ্
২৮। গন্ধবণিক্ মাসিক পত্রিকা
২৯। চিকিৎসা-প্রকাশ
৩০। জন্মভূমি
৩১। তরুণ
৩২। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা
৩৩। তাম্বুলী পত্রিকা
৩৪। ত্রিশূল
৩৫। ধর্ম্মপ্রচারক
৩৬। নব্যভারত
৩৭। পরিচারিকা
৩৮। প্রজাপতি
৩৯। প্রবর্ত্তক
৪০। প্রভাতী
৪১। প্রতিভা
৪২। প্রবাসী

৪৩। প্রাচী
৪৪। বঙ্গবাণী
৪৫। ব্রহ্মবাদী
৪৬। ব্রহ্মবিদ্যা
৪৭। ব্রাহ্মণসমাজ
৪৮। ভক্তি
৪৯। ভারতবর্ষ
৫০। ভারতী
৫১। মাতৃ-মন্দির
৫২। মাধবী
৫৩। মাধুকরী
৫৪। মানসী ও মর্ম্মবাণী
৫৫। মাহিষ্য-সমাজ
৫৬। যমুনা
৫৭। যোগিসখা
৫৮। শিক্ষক
৫৯। শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবক
৬০। সন্দেশ
৬১। সরস্বতী (হিন্দী
৬২। সাহিত্য
৬৩। সাহিত্য-সংবাদ
৬৪। সুবর্ণবণিক্-সমাচার
৬৫। সৌরভ, ৬৬। স্বাস্থ্য-সমাচার
৬৭। সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

দ্বৈমাসিক

১। প্রভাতী [বসন্ত সংখ্যার পর মাসিক আকারে]
২। Museum of Fine Arts Bulletin. Boston.
৩। সাম্যবাদী

ত্রৈমাসিক

১। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা
২। সাহিত্য-সংহিতা
৩। সংস্কৃত-ভারতী
৪। নাগরীপ্রচারিণী পত্রিকা (হিন্দী)
৫। Quarterly Journal of the Mythic Society.
৬। বঙ্গ-সাহিত্য
৭। পুরাতত্ত্ব (হিন্দী)
৮। কংসবণিক্ পত্রিকা

—o—

কার্য্যালয়ে মজুত পরিষদ্ গ্রন্থাবলী

	গ্রন্থের নাম	১৩২৯ বঙ্গাব্দের শেষে উদ্বৃত্ত	খরচ হইয়াছে	বর্ষশেষে মজুত	ছিন্ন ও কীটদষ্ট	ভাল অবস্থায় গণনা করিয়া পাওয়া গেল উদ্বৃত্ত
১।	কৃত্তিবাসী রামায়ণ	২১	২	১৯	৬	১৩
২।	রসমঞ্জরী	১৬	২	১৪	০	১৪
৩।	বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত	৬৬	০	০	৬৬	০
৪।	ছুটীখানের মহাভারত	১৮	২	১৬	২	১৪
৫।	বনমালীদাসের জয়দেব-চরিত্র	৬৮	৬	৬২	২	৬০
৬।	বাসুদেব ঘোষের পদাবলী	৬৮	১০	৫৮	০	৫৮
৭।	জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গল	১৯	২	১৭	১	১৬
৮।	ধর্ম্ম-মঙ্গল	২৭	২	২৫	৪	২১
৯।	শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী	২৫	২	২৩	৪	১৯
১০।	গৌরপদতরঙ্গিণী	২৪	২	২২	০	২২
১১।	কাশী-পরিক্রমা	২৪	২	২২	০	২২
১২।	রাধিকার মানভঙ্গ	৯৩	১১	৮২	৫	৭৭
১৩।	রামায়ণ-তত্ত্ব ১ম	৬	০	৬	০	৬
১৪।	রাধিকা-মঙ্গল	২২	০	২২	০	২২
১৫।	বৌদ্ধধর্ম্ম	৭৮	৮	৭০	০	৭০
১৬।	ব্রজ-পরিক্রমা	৩০	১	২৯	২	২৭
১৭।	শঙ্কর ও শাক্যমুনি	৬২	৭	৫৫	৭	৪৮
১৮।	শূন্যপুরাণ	২০	১	১৯	৫	১৪
১৯।	নবদ্বীপ-পরিক্রমা	২	০	২	০	২
২০।	শতপথব্রাহ্মণ ১ম খণ্ড	২৯	০	২৯	০	২৯
২১।	,, ২য় ,,	২৬	০	২৬	৬	২০
২২।	চন্দ্রনাথ বসু	২৮	০	২৮	০	২৮
২৩।	কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর	৩৮	০	৩৮	৫	৩৩
২৪।	বিষ্ণুমূর্ত্তি-পরিচয়	১৪৬০	১৪	১৪৪৬	২০	১৪২৬+১১
২৫।	মায়াপুরী	১৮৬	১৪	১৭২	৭	১৬৫
২৬।	প্রাচীন গ্রীসের জাতীয়-শিক্ষা	৩৮	৩	৩৫	০	৩৫+১১
২৭।	ঐতরেয় ব্রাহ্মণ	২৪	০	২৪	৮	১৬
২৮।	কবি হেমচন্দ্র	২০১	১	২০০	১০০	১০০

	গ্রন্থের নাম	১৩২৯ বঙ্গাব্দের শেষে উদ্বৃত্ত	খরচ হইয়াছে	বর্ষশেষে মজুত	ছিন্ন ও কীটদষ্ট	ভাল অবস্থায় গণনা করিয়া পাওয়া গেল উদ্বৃত্ত
২৯।	শ্রীভাষ্য ১ম	১	০	১	০	১
৩০।	,, ২য়	২৬	১	২৫	৪	২১
৩১।	,, ৩য়	৪২	১	৪১	৪	৩৭
৩২।	,, ৪র্থ	৪৪	১	৪৩	৩	৪০
৩৩।	,, ৫ম	৫৫	০	৫৫	০	৫৫
৩৪।	বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা ১ম	১	০	১	০	১
৩৫।	,, ২য়	৩৭	২	৩৫	১৫	২০
৩৬।	,, ৩য়	২১৪	২	২১২	১৫৪	৫৮
৩৭।	,, ৪র্থ	২৩৪	৪	২৩০	৫	২২৫
৩৮।	শব্দকোষ ১ম	৬০	৩	৫৭	৭	৫১
৩৯।	,, ২য়	৭২	৩	৬৯	৭	৬২
৪০।	,, ৩য়	৯৩	৩	৯০	৩	৮৭
৪১।	,, ৪র্থ	১৯৯	৩	১৯[illegible]	২১	১৭৫
৪২।	ব্যাকরণ	৪৮	০	৪৮	০	৪৮
৪৩।	ব্রতকথা	৭	১	৬	০	৬
৪৪।	রাসায়নিক পরিভাষা	২১	১	২০	০	২০
৪৫।	কল্কিপুরাণ	৬৩	২	৬১	০	৬১
৪৬।	জ্যোতিষ-দর্পণ	১৬৭	১২	১৫৫	০	১৫৫
৪৭।	প্রাচীন পুথির বিবরণ ১ম খণ্ড, ১ম সং	৪৭	০	৪৭	০	৪৭+১৬
৪৮।	ঐ ,, ২য় সং	৬১	১	৬০	০	৬০+৯০
৪৯।	ঐ ২য় খণ্ড, ১ম সং	২৪১৬	১২	২৪০৪	১২৯	২২৭৫
৫০।	দুর্গামঙ্গল	১৪৯	১৩	১৩৬	০	১৩৬
৫১।	সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম ১ম	৮৬৩	৫	৮৫৮	০	৮৫৮
৫২।	ঐ ২য়	৮৫৭	৫	৮৫২	০	৮৫২
৫৩।	ঐ ৩য়	৮৩৫	৭	৮২৮	০	৮২৮
৫৪।	চণ্ডীদাসের পদাবলী	২৭	০	২৭	১৭	১০
৫৫।	তীর্থমঙ্গল	৪০০	১২	৩৮৮	২	৩৮৬
৫৬।	মৃগলুব্ধ	৫৮৬	১১	৫৭৫	০	৫৭৫
৫৭।	সত্যনারায়ণের পুথি	৭৬	০	৭৬	৫	৭১

	গ্রন্থের নাম	১৩২৯ বঙ্গাব্দের শেষে উদ্বৃত্ত	খরচ হইয়াছে	বর্ষশেষে মজুত	ছিন্ন ও কীটদষ্ট	ভাল অবস্থায় গণনা করিয়া পাওয়া গেল উদ্বৃত্ত
৫৮।	পদকল্পতরু ১ম খণ্ড	৭৮৪	৪৯	৭৩৫	১৪৪	৫৯১
৫৯।	,, ২য় খণ্ড	১৫১৭	৪৭	১৪৭০	০	১৪৭০
৬০।	,, ৩য় খণ্ড	১৫৭৯	৫০	১৫২৯	০	১৫২৯+৩৮
৬১।	মৃগলুব্ধসংবাদ	৪৩৩	১২	৪২১	০	৪২১
৬২।	তীর্থভ্রমণ	২৭৬	১৩	২৬৩	৬	২৫৭
৬৩।	গঙ্গামঙ্গল	৯৩	১১	৮২	০	৮২+৪
৬৪।	বৌদ্ধগান ও দোঁহা	১৩৪	১৯	১১৫	০	১১৫+৫০
৬৫।	ধর্ম্মপূজাবিধান	৩৮৩	৩	৩৮০	০	৩৮০+২২
৬৬।	মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা	৭৭	১	৭৬	০	৭৬+২৪
৬৭।	শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন	৪৫৪	৬১	৩৯৩	৫	৩৮৮
৬৮।	জ্ঞানসাগর	১৬০	১২	১৪৮	০	১৪৮
৬৯।	সারদামঙ্গল	১৭৭	১২	১৬৫	৬	১৫৯
৭০।	নেপালে বাঙ্গালা নাটক	১৫৪	১৪	১৪০	০	১৪০
৭১।	গৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস	১৬৯	১	১৬৮	৪৫	১২৩
৭২।	ন্যায়দর্শন ১ম	৫৩৫	৪৮	৪৮৭	৭	৪৮০
৭৩।	ঐ ২য়	৭৮৫	৪৭	৭৩৮	৭	৭৩১
৭৪।	শ্রীকৃষ্ণবিলাস	৪২২	১২	৪১০	১৫	৩৯৫
৭৫।	সর্ব্বসংবাদিনী	৮৯৬	২০	৮৭৬	১৫	৮৬১
৭৬।	মনোবিজ্ঞান	৮৮৭	১৪	৮৭৩	২৩	৮৫০
৭৭।	গোরক্ষ-বিজয়	৬৮৭	৫	৬৮২	০	৬৮২
৭৮।	চিত্রশালার তালিকা	৫৯৭	৬	৫৯১	০	৫৯১
৭৯।	উদ্ভিদ্‌জ্ঞান ১ম খণ্ড	৯৭২	১০	৯৬২	০	৯৬২

শ্রীগণপতি সরকার
সহকারী সম্পাদক।
৩।৪।৩১

শ্রীহরপ্রসাদ্ শাস্ত্রী
সভাপতি।
৬।৪।৩১

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

একত্রিংশ ভাগ

পত্রিকাধ্যক্ষ শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা

বঙ্গাব্দ, ১৩৩১

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদ্
মন্দির হইতে
শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

একত্রিংশ ভাগের সূচী